२०८/००8

বামাবোধিনী পত্রিকা।

September, 1912.

" কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ। "

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫০ বর্ষ। ৫৮৭ সংখ্যা। | ভাদ্র, ১৩১৯। | ১০ম কল্প। ১ম ভাগ।

বামাবোধিনীর পঞ্চাশৎ জন্মোৎসব।

যে মঙ্গলময় বিশ্ববিধাতার অশেষ কৃপায় বামাবোধিনী এই সুদীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসর কাল ভারতের রমণীগণের সেবা করিয়া পুনরায় নববর্ষে পদার্পণ করিতে সক্ষম হইয়াছে, আজ বিশেষ ভাবে সেই বিশ্বদেবের চরণে কৃতজ্ঞ হৃদয়ে প্রণত হইয়া তাঁহার কৃপা ও আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করি। মঙ্গলময় প্রভু! তুমি এই সুদীর্ঘ কাল শত বিঘ্নবাধা হইতে রক্ষা করিয়া এই পত্রিকাকে তোমার সেবায় নিয়োজিত রাখিয়াছ ও ইহার উদ্দেশ্য সাধনের সহায় হইয়া রহিয়াছ। তুমি কৃপা করিয়া ইহার ক্ষুদ্র প্রাণকে রক্ষা করিয়াছ, তাই আজও ইহা জীবিত আছে। দয়াময়! তুমি ইহাকে আরও সুচারুরূপে ইহার উদ্দেশ্য সাধনে সক্ষম কর ও ইহাকে দীর্ঘজীবিনী কর, তোমার চরণে এই আমাদের প্রার্থনা।

১২৯৫ সালের ভাদ্র মাসের সংখ্যায় বামাবোধিনীর যে ইতিহাস প্রকাশিত হইয়াছিল আমরা আবার তাহাই প্রকাশ করিতেছি। ১২৭০ সালের ভাদ্র মাসে বামাবোধিনীর জন্ম হয়। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে যখন এদেশের স্ত্রীজাতির অবস্থা অতি হীন ছিল, তাঁহাদিগের শিক্ষার্থ বিদ্যালয় সকল অঙ্গুলির অগ্রে গণনা করা যাইত, তাঁহাদিগের পাঠ্য পুস্তকের সংখ্যা অতি অল্প ছিল, তাঁহাদিগের বিশেষ অভাব পূরণ জন্য একখানিও সাময়িক পত্রিকা বিদ্যমান ছিল না, তাঁহাদিগের উন্নতির জন্য একটীও নারী-সভা স্থাপিত হয় নাই, কেবল কতকগুলি দেশহিতোৎসাহী কৃতবিদ্য পুরুষ "স্ত্রী-জাতির বিদ্যা শিক্ষার আবশ্যকতা" বিষয়ে প্রকাশ্য সভায় বক্তৃতাদি করিতেন,

করিলেন। যথাকালে ব্রাহ্মণী গর্ভবতী হইয়া, দশ মাস দশ দিনে দেবতুল্য একটি কুমার প্রসব করিলেন। পুত্রের মুখ নিরীক্ষণ করিয়া ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণপত্নীর আনন্দের সীমা রহিল না। পুনরায় লোটন ষষ্ঠীর আগমনে ব্রাহ্মণী আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইয়া ষষ্ঠীদেবীর অর্চ্চনার বাহুল্যে ব্যাপৃত হইলেন। আজ লোটন ষষ্ঠীর দিন, দেবীর মঞ্চে ৬টী সুবর্ণময় লোটন (ক্ষুদ্রাকার লোড়া) শোভা পাইতে লাগিল। তন্নিম্নস্থিত ঘটোপরি আম্রশাখা ও চতুষ্পার্শ্বে পুষ্প, ফল, মূল, নৈবেদ্যাদি থরে থরে সুসজ্জিত হইল, এবং ধূপ ধুনার গন্ধে চতুর্দ্দিক আমোদিত হইতে লাগিল। ব্রাহ্মণী ভক্তিগদ্‌গদ চিত্তে কুমার ক্রোড়ে ধারণ করতঃ পরম করুণাময়ী ষষ্ঠী দেবীর অর্চ্চনা করিলেন। পূজা শেষ হইলে তিনি সহাস্যবদনে ৬টী গোময়নির্ম্মিত লোটন ভক্ষণ করিলেন।

এইরূপে কিছুকাল অতিবাহিত হইল। ব্রাহ্মণী ক্রমে যৌবনাবস্থা অতিক্রম করিয়া প্রৌঢ়াবস্থায় উপস্থিত হইলেন। এখন তাঁহার সুখের সীমা নাই, দুই পুত্র ও এক কন্যা। তাহাদের সকলেরই বিবাহ হইয়াছে, তাঁহার দুঃখের ঘরে আজ সুখের অনন্ত রশ্মি বিরাজ করিতেছে। তাঁহার আর সে পূর্ব্বের অবস্থা নাই, এখন তিনি গৃহের কর্ত্রী হইয়াছেন, ব্রাহ্মণ কর্ত্তা। পুত্র, পুত্রবধূ, কন্যা ও তাহাদের সন্তানাদিতে আজ তাঁহার গৃহ উজ্জ্বল করিয়াছে। ব্রাহ্মণী এবম্বিধ সুখে কালাতিপাত করিলেও ষষ্ঠী দেবীর অনুগ্রহ কখনও বিস্মৃত হন নাই। মানুষ নিজের অবস্থা পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্ব বৃত্তান্ত প্রায় বিস্মৃত হয়, কিন্তু ব্রাহ্মণী সেরূপ প্রকৃতির রমণী ছিলেন না, তিনি এখনও ভক্তি সহকারে লোটন ষষ্ঠীর অর্চ্চনা করিয়া গোময় লোটন ভক্ষণ করেন এবং পুত্রবধূ ও কন্যাদিগকে চিপিটকাদি দ্বারা প্রস্তুত লোটন ভক্ষণের ব্যবস্থা দিয়াছেন।

এইরূপে কিছু কাল সুখ-সচ্ছন্দে অতিবাহিত হইবার পর ব্রাহ্মণী বার্দ্ধক্যদশায় উপনীতা হইলেন। তাঁহার কাল পূর্ণ হইল, তিনি সুবর্ণময় লোটন ৬টীর পরিবর্ত্তে তাঁহার পুত্রবধূদ্বয় ও কন্যাকে ষষ্ঠী দেবীর চরণে প্রণিপাতপূর্ব্বক অর্পণ করিলেন। নিয়তি শিরোভাগে আসিয়া দণ্ডায়মানা হইল। সতী ধীরে ধীরে স্বামীর পদধূলি শিরে গ্রহণ করিয়া, পরব্রহ্ম নাম স্মরণ করিতে করিতে স্বামীর ক্রোড়ে মস্তক স্থাপনপূর্ব্বক, পুত্রকন্যাদিগকে এ পৃথিবীতে রাখিয়া অমরধামে চলিয়া গেলেন। তিনি চলিয়া গেলেন, থাকিল তাঁহার প্রাণশূন্য দেহ!

দেশে তাঁহা কর্ত্তৃক লোটন ষষ্ঠী পূজার প্রচলন হইল। তাঁহার দুঃখের সংসারে সুখের আবির্ভাব দর্শনে সমস্ত বঙ্গরমণী, যে করুণাময়ী দেবীর কৃপায় ব্রাহ্মণীর এমন সুখসৌভাগ্য বিকশিত হইয়াছিল, সেই লোটন ষষ্ঠীর পূজা করিতে আরম্ভ করিল। সেই হইতে আজ পর্য্যন্ত বঙ্গের ঘরে ঘরে, বঙ্গরমণী সন্তানদিগের কল্যাণার্থ,

তো আগে জল খেতে চল"। "জল খাইবার আজ তত ইচ্ছা নাই, কাগজ খানা আন না"।

নীরজা শুনিল না, খাবারের রেকাবী হাতে করিয়া আনিয়া সম্মুখে ধরিয়া বলিল "নূতন খবর দেখ্‌লে বুঝি ক্ষুধা তৃষ্ণাও উড়ে যায়? একটু খাও, আমি তো আর পালাচ্ছিনা, কাগজখানাও পালাবে না"। মোহিত হাসিতে হাসিতে বলিল "কি জানি, আমার সব সময়ে সে বিশ্বাসটা থাকে না. কাগজখানা যেমন রাস্তা দিয়ে আসিতে আসিতে অক্লেশে পকেট থেকে পড়ে যেতে পারে, তোমার বিষয়েও আমার তেমনি একটু ভয় আছে। তবে জলখাবারটা যখন হাতের কাছেই এনে ধরেছ, তখন আর ভেবে চিন্তে কাজ নাই, কি বল"? নীরজা হাসিয়া বলিল "সেই ভাল কথা"।

মোহিত জলযোগ শেষ করিয়া মুখে পান পুরিয়া একখানা চেয়ার টানিয়া বসিয়া পড়িল। নীরজা তাহার পকেট হইতে একখানা ইংরাজী সংবাদপত্র আনিয়া তাহার হাতে দিয়া বলিল "এই-বার কি সংবাদ বল? এখন নিশ্চিন্ত হয়ে শোনা যাবে;" মোহিত হাসিয়া বলিল "তুমিই পড় না"।

"অত্য কাজ নাই, আমি পড়িতে জানি না, শুনাতে ইচ্ছে হয় তো শুনাও" বলিয়া নীরজা একটা পেনি লইয়া সেলাই করিতে বসিল। মোহিত পড়িল— "হরিশপুরের জমিদার নবকিশোর বাবু সম্প্রতি বিগ্রহের মন্দির স্থাপন উপলক্ষে অজস্র দান করিয়াছেন। শত শত কাঙালীকে অর্থ, অন্ন, বস্ত্রাদি দান করিয়াছেন। তিনি কতকটা জমিদারী দেবত্র করিয়া দিয়াছেন, একটি পাঠশালা স্থাপন করিয়াছেন, দুই তিনটা জলাশয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন এবং এইরূপ সৎকর্ম্ম সর্ব্বদাই করিতেছেন। নবকিশোর বাবু হিন্দুর আদর্শস্থল।"

নিরজা নীরবে বসিয়া রহিল। মোহিত বলিল "নিরো কথা কচ্চ না যে"? নিঃশ্বাস ফেলিয়া নীরজা বলিল "তবে বোধ হয় দাদাকে কিছুই দেবেন না, তাকেও ত্যাগ করবেন"। "সে তো কবে বোঝা গেছে। তোমার বাবা মৃত্যুর পূর্ব্বে 'আমার অপরাধ মাপ্ করুন' বলে দুখানা পত্র লিখ্‌লে তার উত্তরে তিনি লিখেছিলেন 'তুই, তোর পুত্র, কন্যা, সব আমার ত্যজ্য'। তখনই বুঝা গিয়াছিল এ রাগ তাঁর যাবে না।" নীরজা অনেকক্ষণ পরে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল "আমিই সবারি মনকষ্টের মূল"। "আর একটা খবর আছে, দেখ"।

নীরজা সংবাদপত্র লইয়া দেখিল "প্রসিদ্ধ জমিদার নন্দলাল বন্দোপাধ্যায় সমস্ত বিষয় কনিষ্ঠ পুত্র সতীশকুমারকে উইল করিয়া দিয়া কাশীবাস করিতে গেলেন"।

মোহিত নীরজাকে বহুক্ষণ নতমুখে থাকিতে দেখিয়া বলিল "নিরো"। নীরজা উত্তর দিল না। মোহিত নিকটে

আসিয়া তাহার মুখ তুলিয়া দেখিল নীরজা কাঁদিতেছে। মোহিত আদর করিয়া তাহার চক্ষু মুছাইয়া দিয়া বলিল, "কাঁদো কেন নিরো, ইহাতে এমন দুঃখ কি ?" "আমার জন্য তুমি এত সইলে।" নীরজা তাহার বক্ষের মধ্যে মুখ লুকাইল। মোহিত তাহার মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া চুম্বন করিয়া বলিল "তুমিও তো অনেক সয়েছ। তোমার দাদা বাবুও তো তোমার উপর রাগ করেছেন। আমি তোমার জন্য সয়েছি, তুমি আমার জন্য সয়েছ, এ কথাটা আর এখন নূতন কথা কি নিরো ?"

তবুও নীরজা কিয়ৎক্ষণ কাঁদিল। মোহিত তাহার জন্য কেন এত সহিল ভাবিয়া কাঁদিল। তাহার জন্য কেহ এত সহ্য করিতে পারে এমন গুণ তাহাতে কি আছে ভাবিয়া কাঁদিল। তার পর লীলা বেড়াইয়া আসিল। লীলার সহিত মোহিতের ক্রীড়া দেখিয়া নীরজা ক্রমে ক্রমে প্রফুল্ল হইয়া উঠিল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

ইহার পর আরও তিন বৎসর অতিবাহিত হইয়া গেল। লীলা এখন আর দাসীর অঙ্কে বেড়ায় না। সে এখন চারি বৎসরের হইয়াছে। বৈকালে সিল্কের গাউন ও জুতা মোজা পরিয়া কোঁকড়া কোঁকড়া চুলগুলি স্কন্ধে ফেলিয়া পিতার হাত ধরিয়া বেড়াইয়া বেড়ায়। সে মাতার কাছে সন্ধ্যার আলোকে প্রথম ভাগ লইয়া "অ'য় অজগর আস্‌ছে তেড়ে" ইত্যাদি বলে। পিতার মাথা আঁচড়াইয়া দেয়, খাবার আনিয়া সম্মুখে ধরার ভারটাও মাতার নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়াছে। মোহিত হাসিয়া বলিত "লীলা আর একটু বড় হলে দেখ্‌ছি, ও আমাকে এ ঘর, ও ঘর কর্‌তে দেবে না।" লীলা মৃদু হাসিয়া বলিত "আমি তো তোমার কলে কল্‌তে পালিনে বাবা"। মোহিত অত্যন্ত হাসিয়া উঠিত। মোহিতের এখন পূর্ব্বাপেক্ষা পসার বৃদ্ধি হইয়াছে, তবে দানশীলতার জন্য হাতে কিছু জমাতে পারিত না।

পূর্ণিমার দিন সন্ধ্যার পর মোহিত ও নীরজা ছাতে বসিয়া অতীত কালের কথা আলোচনা করিতেছিল। মোহিত তাহার সেই স্কুলে যাওয়ার কথা, দানের কথা, নিজের দাঁড়াইয়া দেখার কথা গল্প করিতেছিল। নীরজা শুনিয়া হাসিতেছিল, আর সেই সময়ের সুখময় জীবনের কথা ভাবিতেছিল। সেই স্নেহময় পিতা মাতার কথা মনে পড়িয়া মাঝে মাঝে চক্ষুতে জল আসিয়া পড়িতেছিল। চারি দিক চন্দ্রকিরণে হাসিতেছিল।

এমন সময়ে দাসী আসিয়া একখানা পত্র আনিয়া মোহিতের হাতে দিল। মোহিত খুলিয়া দেখিল লণ্ডন হইতে সুরেন্দ্র লিখিয়াছে। এক বৎসর হইল সুরেন্দ্র সিবিল সার্ব্বিস পরীক্ষায় পাশ হইয়াছে। মোহিত পত্র পড়িয়া হাসিয়া বলিল "নিরো সুসংবাদ।" "কি সুসংবাদ ?" "আগে সন্দেশ খাওয়াও, তবে বল্‌ব।" "এমন কি কথা ?" "নয় কেন ? তোমার

ভাজ হয়েছে, সুসংবাদ নয় ?" "সে কি ? দাদা মেম বিয়ে করেছে বুঝি" ? "তা নাত আর বিলাতে হিন্দুর মেয়ে পাবে কোথায়'' ? "ছিঃ ছিঃ, শেষে মেম বিয়ে কর্‌লে"। "যেমন দেশে বাস তেমনি তো রুচি হবে। যস্মিন্ দেশে যদাচারঃ। আজ যদি তোমার বাবা বেঁচে থাকতেন তো এ বিবাহ হ'তে পারতো না।'' সঙ্গে সঙ্গে নিজের কথা মনে পড়িয়া গেল, মোহিত অধোবদন হইল, নীরজা অত লক্ষ্য করিল না। নীরজা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল "দাদার ছোট বেলা থেকে অমনি সাহেবী পছন্দ, মা থাক্‌লে তো বিলাতী বৌ নিয়ে একদিনও ঘরকন্না করতে পার্‌তেন না''। নিজেকে সাম্‌লাইয়া মোহিত বলিল "এখন যা হবার হ'য়ে গেছে, আনন্দ প্রকাশ করে একটা টেলি-গ্রাম করিগে চল। আর ছাতে বসে থাক্‌ব না, আজ শরীরটা ভাল নাই। এখন কেমন একটু শীতও কর্‌ছে"। নীরজা উঠিয়া বলিল "তবে এতক্ষণ ছাতে বসে থাক্‌লে কেন, শীঘ্র নীচে চল"।

রাত্রিতে মোহিত বলিল "নীরো গায়ের একটা কাপড় দাও, বড় শীত কচ্ছে"। নীরজা মোহিতের কপালে হাত দিয়া বলিল "একি, গা যে গরম"। "তবে বুঝি জ্বর হ'ল" বলিয়া মোহিত আপাদমস্তক ঢাকিয়া শয়ন করিল। অর্দ্ধ রাত্রে নীরজা ধীরে ধীরে মোহিতের ললাট স্পর্শ করিয়া দেখিল কপালটা একটু বেশী গরম হইয়াছে। মোহিত তখন ঘুমাইতেছে, নীরজার মনটা আজ কেমন করিতেছিল, মোহিতের পূর্ব্বে এরূপ জ্বর কতবার হইয়াছে, কিন্তু কোন দিন ত এমন মন খারাপ হয় নাই। নীরজা মনকে বুঝাইল "এমন জ্বর ত কত দিন হয়"। নানা কথা ভাবিতে ভাবিতে নীরজা ঘুমাইয়া পড়িল।

সকালে মোহিত সুরেন্দ্রের নিকট টেলিগ্রাম পাঠাইয়া বলিল "জ্বরটা বেশই হয়েছে"। নীরজা থার্ম্মোমিটার লাগাইয়া দেখিল জ্বরের উত্তাপ একশ দুই ডিগ্রী হইয়াছে। নীরজার সমস্ত দিন কাজে হাত পা উঠিতেছিল না। লীলা পিতার কপালে ক্ষুদ্র হাতখানি বুলাইতে বুলাইতে বলিল "বাবা তোমার অসুখ করেছে ?"

মোহিত বলিল "হাঁ মা, তুমি একটু আমার গায়ে হাত বুলিয়ে দাও, ভাল হয়ে যাবে"। বৈকালে নীরজা বলিল "এখনও জ্বর তেমনি আছে, ডাক্তার আন্‌তে পাঠাও"। "আজ থাক্, কাল ডাক্‌ব, অসুখ হতে হতেই ঔষধ খেলে কোন ফল হয় না।"

(ক্রমশঃ)

শিশুজীবন ও কিণ্ডারগার্টেন।

আজকাল অন্যান্য পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীলোকেরা যে সংসারে নিজেদের অধিকার বৃদ্ধির জন্য চেষ্টা করিতেছেন—ইহা সভ্য জগতের একটি সুলক্ষণ। কুসংস্কার ও গোঁড়ামি সকল সমাজেই দেখা যায়, বিশেষত উহার প্রভাবে আমাদের নারীগণের সীমাবদ্ধ জীবন অধিকতর অপ্রশস্ত হইয়া উঠে। সেই কারণে তাঁহারা ঐ অত্যাচার দূর করিবার জন্য যত বেশী ব্যগ্র হন ও আপনাদিগকে সমাজের প্রয়োজনীয় কার্য্যের উপযুক্ত করিবার নিমিত্ত যত অধিক উৎসুক হন, ততই সংসারের পক্ষে মঙ্গল।

যে সকল লোক স্ত্রীলোকদিগকে সংসারের ন্যায্য অধিকার দিতে অনিচ্ছুক, তাঁহারা উহার স্বপক্ষে এরূপ যুক্তি দেখান যে, তাহা অবিবেচক ও অনভিজ্ঞ ব্যক্তির উক্তি বলিয়া বোধ হয়। তাঁহাদিগের প্রথম আপত্তি এই যে—"যদি সকল সাধারণ কাজে নারীজাতিকে যোগ দিবার অধিকার দেওয়া যায়, তাহা হইলে তাহারা গৃহকর্ম্মে ও সন্তানপালনে অবহেলা করিবে।" কিন্তু স্ত্রীজাতির স্বাভাবিক জ্ঞান এত প্রখর যে, তাহা উহা দ্বারা বিনাশ পাইবার কোন সম্ভাবনা নাই। প্রকৃতি স্ত্রীজাতিকে যে জীবনের উপযোগী করিয়া নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তাঁহারা সেই জীবনেরই প্রসার ও উন্নত অবস্থা লাভের নিমিত্ত উৎসুক। ঐ প্রকার স্বাধীনতা কখন তাঁহাদের সংসারপ্রেমের অপকার করিতে পারে না, কিম্বা জননীর পবিত্র কর্ত্তব্যের প্রতি অবহেলা জন্মাইতে পারে না। সেই কারণে, সংসারে পুরুষের ন্যায় স্ত্রীলোকদিগেরও জ্ঞানচর্চ্চা, বুদ্ধিবিকাশ ও চরিত্রগঠন করা আমাদের এখন প্রধান কাজ। আশা করি, বর্ত্তমান কালের জ্ঞানতৃষ্ণা ও উন্নতি লাভের বাসনা আমাদের ঐ মহৎ কার্য্যের সহায় স্বরূপ হইবে।

এইরূপে স্ত্রীজাতি হইতে আরম্ভ করিয়া আমরা এখন আমাদের প্রকৃত প্রস্তাবে আসিলাম। এই বিংশ শতাব্দীতে সর্ব্বত্রই প্রশস্ত জ্ঞানচর্চ্চা ও বিস্তার গৌরব দেখা যাইতেছে, এবং ঐ আকাঙ্ক্ষাতৃপ্তির জন্য অন্যান্য স্থানের ন্যায় আমাদের দেশেও সকল বিভাগে নানা স্কুল, কলেজ ও শিক্ষালয় স্থাপিত হইয়াছে। যুবকেরা উহা দ্বারা নিজেদের উন্নতি সাধন করিয়া উচ্চ পদ ও উচ্চ অধিকার প্রাপ্তির আশায় নিযুক্ত রহিয়াছে।

কিন্তু ঐ যুবকদিগের শিক্ষকগণ যে ভূমিতে জ্ঞানাঙ্কুর রোপণ করিবার জন্য ব্যস্ত, সে ভূমি কি পিতামাতার দ্বারা সযত্নে কর্ষিত ও শিক্ষার বীজ বপনের উপযোগী করিয়া প্রস্তুত করা হইয়া থাকে?

এ প্রশ্নের উত্তর অনেকের নিকট অপ্রিয় বোধ হইলেও বালকদিগের ভবিষ্যৎ মঙ্গলের আশায় আমরা তাহা করিতে বাধ্য হইলাম। যে শিক্ষা বালকবালিকা-দিগের জীবনের প্রারম্ভেই শেষ হয়, যে অসম্পূর্ণ বিদ্যা তাহাদিগকে প্রকৃত জ্ঞানের পথ পর্য্যন্তও দেখাইতে পারে না এবং যাহা তাহাদিগকে প্রাপ্ত বয়সের উপযুক্ত বুদ্ধি ও বিবেক দিতে অপারগ, সে শিক্ষা নিশ্চয়ই যুবকদিগের পক্ষে অনুপযুক্ত ও সংসারের ক্ষতিকারক। ঐরূপ অপকারী বিদ্যা শিক্ষাই আমাদের সমাজের শোচনীয় অবস্থা ও বিপদের প্রধান কারণ। নীতি-জ্ঞানশূন্য দুরাকাঙ্ক্ষ ব্যক্তিগণই অর্দ্ধশিক্ষিত যুবকদিগের মস্তক বিগড়াইয়া দিয়া দেশের সর্ব্বনাশ করিতেছে, জ্ঞানী ও সাধু লোক-দিগের উপদেশ পাথরে জলসেচনের ন্যায় ঐ অপক্ব মস্তিষ্কে লাগিয়া ছিট্‌কাইয়া পড়িতেছে। অধিকাংশ দেশেরই যত প্রকার সামাজিক ভ্রম এই অর্দ্ধশিক্ষা হইতে জন্মিয়া থাকে। বুদ্ধিমান্, অভিজ্ঞ, মহৎ ব্যক্তিদিগের হিতকর বাক্য ও উপদেশ যথার্থ বুঝিয়া কাজ করিলে কোন জাতিই শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক শ্রীবৃদ্ধি সাধনে অকৃতকার্য্য হয় না। কিন্তু অযোগ্য লোকেরা ঐ সকল উন্নত বাক্য ও ভাব লইয়া প্রচার করিতে আরম্ভ করিলে উহা অর্দ্ধশিক্ষিত লোকদিগকে এরূপ ভয়ঙ্কর অবস্থায় উপনীত করে যে, অনেক কষ্ট ব্যতিরেকে তাহা-দিগকে তাহা হইতে উদ্ধার করা একরূপ অসম্ভব হইয়া উঠে। সেই কারণে শিশুদিগের জন্ম হইতে তাহাদিগের মন প্রাণ উন্নত করিবার চেষ্টা করার ন্যায় উৎকৃষ্ট শিশুশিক্ষার উপায় আর কিছুই নাই। সুতরাং ঐ শিক্ষা দিবার নিমিত্ত সংসারে স্ত্রীলোকের কাজ যে কত মহৎ ও কঠিন, আর মানবজাতির সুখ সচ্ছন্দতা বৃদ্ধির জন্য তাহাদিগকে সকল বিষয়ে যে কতদূর জ্ঞানশালিনী ও শিক্ষিতা করা উচিত, তাহা বলা যায় না। ইহা কে অস্বীকার করিতে পারেন যে, নারীজাতির অবস্থা আরও উন্নত ও তাহাদের জীবন আরও অধিক প্রশস্ত হইলে তাহারা জননীর কর্ত্তব্যে বিমুখ হওয়ার পরিবর্ত্তে অধিকতর যত্ন ও আগ্রহের সহিত উহাতে প্রবেশ করিবে ?

অতি শিশুকাল হইতে সন্তানদিগকে রীতিমত শিক্ষা দিয়া তাহাদিগকে মানুষ করার পক্ষে সাধারণ লোকের বড় আপত্তি দেখা যায়—আপত্তি কেন, এ কথার উল্লেখ করিলে প্রাচীন মাতা ও দিদিমারা আমাকে বাতুল বলিয়া স্থির করিবেন। তাঁহাদের মতে বালিকা মাতারা যতই কেন অল্পবয়স্ক ও অনভিজ্ঞ হউক না—সন্তানের জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই তাহারা শিশুপালনের উপযুক্ত জ্ঞান ও শিক্ষা আপনা হইতেই লাভ করিয়া থাকে। জননীর অসীম প্রেম ও স্বাভাবিক জ্ঞানের উপর তাঁহাদের একান্ত নির্ভর, শিশুকে প্রকৃতরূপে শিক্ষা দিয়া লালন করিতে হইলে ঐ অপরিসীম স্নেহ ও যত্নের উপর আরও যে কোন শিক্ষার




আবশ্যক তা তাঁহারা ধারণা করিতে পারেন না। সুতরাং সাধারণ লোকের ঐ কুসংস্কার মানবসমাজের, বিশেষতঃ আমাদের দেশের উন্নতিলাভের পক্ষে মহা প্রতিবন্ধক।

শিক্ষার আরম্ভ।

অনেকে জানেন, উপযুক্ত শারীরিক যত্নের অভাবে কত হাজার হাজার শিশু এক বৎসরের পূর্ব্বেই মারা যায়। কিন্তু যাহারা ঐ অকাল মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা পায়, তাহারা নীতিজ্ঞান শিক্ষার অভাবে পর জীবনে কিরূপ চিররুগ্ন থাকে, তাহার দিকে আমরা একটুও দৃষ্টি রাখি না। মানবসমাজে যে সকল অপকারী ও বিপদজনক রীতি নীতি দেখা যায়, তাহা কেবল অশিক্ষিত বা অশাসিত বাল্যাবস্থা হইতেই জন্মে।

সেজন্য আমরা সকল দিক পর্য্যালোচনা ও পরীক্ষা করিয়া আগে দেখিব, পরে বিচার করিব। সদ্যোজাত মানবশিশুর ন্যায় এ সংসারে অসহায় ও দয়ার পাত্র আর কি আছে? অন্য কোন জন্তুকে জন্মকালে ওরূপ অসহায় বোধ হয় না বা যত্নাভাবে উহা বিনাশ পায় না। তথাচ ঐ দুর্ব্বল শিশুজীবন কি মিষ্ট ও হৃদয়াকর্ষক। ঐ সুন্দর দৃশ্য দেখিতে দেখিতে হৃদয় স্নেহে ভরিয়া উঠে! কত যত্নে উহা বুকে তুলিয়া লইবার জন্য প্রাণ ব্যগ্র হয়! কিন্তু ঐ কোমল জীবকে বাঁচাইয়া মানুষের উপযুক্ত করিতে মাতৃস্নেহের সঙ্গে আরও কত জ্ঞানের আবশ্যক! জীবনের প্রথম বৎসরে শিশু তিন গুণ বাড়ে, আর কোন বৎসরে এরূপ বাড় বাড়ে না। কিন্তু শারীরিক স্বাস্থ্যবিধানের অজ্ঞতা ও পিতামাতার অনবধানতা বশতঃ ঐ প্রথম বৎসরেই অধিকাংশ শিশু বিনাশ পায়।

মাতার প্রেম শিশুর জীবনধারণে বাতাসের ন্যায়, উহা ব্যতীত শিশু এক দণ্ড বাঁচিতে পারে না। সুখের বিষয়, এ জগতে মাতৃস্নেহের কোন অপ্রতুল নাই। কিন্তু শিশুর প্রাণধারণের জন্য নিঃশ্বাস গ্রহণের সঙ্গে যেমন আরও অন্যান্য দ্রব্যের আবশ্যক, সেইরূপ উহার সম্পূর্ণ সুখসচ্ছন্দতার জন্য প্রেমের সঙ্গে আরও অন্যান্য শিক্ষার প্রয়োজন। ঐ ক্ষুদ্র দেহটীর যত্ন শুধু স্নেহ দ্বারা হইলে চলিবে না, বুদ্ধির দ্বারাও হওয়া উচিত। বালিকা মাতার স্বাভাবিক বুদ্ধির অপেক্ষা অধিকতর জ্ঞানী ও বিবেচক ব্যক্তিদিগের উপদেশমতে। উহাদিগের শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক পুষ্টি সাধন করা একান্ত কর্ত্তব্য। সকলেই জ্ঞাত আছেন যে, আমাদের দেশের বালিকাদিগের প্রথম সন্তান মাতামহী বা পিতামহীদিগের দ্বারাই প্রায় প্রতিপালিত হইয়া থাকে। মাতার সন্তানপালনে অক্ষমতা বশতঃই যে এই প্রথার প্রাচুর্য্য দেখা যায়, সে বিষয়ে সন্দেহ কি? ডাক্তারেরা সচরাচর বলেন যে, শিশুকালের ন্যায় মানবজীবনে আর কোন কালে অত সংঘাতিক পীড়া হয় না, কিম্বা মৃত্যুর আশঙ্কা থাকে না। শিশুদিগের দেহ স্বভাবতঃ অতি কোমল এবং সাধারণ




লোকে কিছুতেই বুঝিতে পারে না যে, অযোগ্য খাদ্য ও অবিশুদ্ধ বাতাস কচি ছেলের জীবনে সর্ব্বদা বিষের কাজ করে। শিশুজীবনের প্রথম বৎসর কাটিয়া যাইলে জীবননাশের সম্ভাবনা কিছু কমিয়া আসে, কিন্তু পাঁচ বৎসরের পূর্ব্বে সন্তানদিগকে কখন একেবারে নিরাপদ মনে করা যাইতে পারে না।

এখন শিশুদিগের এই প্রথম পাঁচ বৎসর কাল তাহাদের শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক শিক্ষা ও পুষ্টি সাধনের বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখা আমাদের উচিত। জীবনের আর কোন কালে তাহারা এত অধিক জ্ঞান লাভ করিতে পারিবে না।

(ক্রমশঃ)

শ্রীকৃষ্ণভাবিনী দাস।

জলপ্লাবন।

সকল দেশেরই পুরাবৃত্তে জলপ্লাবনের বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। বাইবেলে উল্লিখিত বিবরণ অনুসারে ঐ জলপ্লাবন সৃষ্টির ২৩৪৯ বৎসর পরে সংঘটিত হইয়াছিল। পৃথিবী পাপাত্মায় পরিপূর্ণ হওয়াতে পরমেশ্বর ধার্ম্মিকবর নোয়াকে নিজের ও পরিবারবর্গের রক্ষার্থ একখানি তরী নির্ম্মাণ করিবার আদেশ করেন, সেই তরীর আয়তন ৩০০ হস্ত দীর্ঘ, ৫০ হস্ত প্রস্থ ও ৩০ হস্ত গভীর। তরীখানি নির্ম্মিত হইলে, ঈশ্বর পুণ্যাত্মা নোয়াকে তন্মধ্যে সকল প্রাণীর স্ত্রী পুরুষ এবং তাহাদিগের আহারীয় দ্রব্য গ্রহণ করিতে আজ্ঞা করিলেন। তৎপরে যে জলপ্লাবন হয়, তাহাতে চল্লিশ দিন এবং চল্লিশ রাত্রি অবিশ্রান্ত বৃষ্টি হইয়াছিল। এইরূপ বর্ণিত আছে যে, যতদিন না সর্ব্বোচ্চ পর্ব্বতের শিখরদেশ জলে প্লাবিত হইয়াছিল ততদিন বর্ষণের অবসান হয় নাই। সুযোগ্য বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা বলেন যে, হিমালয়ের উচ্চতম শৃঙ্গে যে সকল জলজন্তুর কঙ্কাল প্রাপ্ত হওয়া যায়, এরূপ একটী জলপ্লাবন না হইলে তাহা সম্ভব হইত না।

অদ্য আমি যে জলপ্লাবনের বৃত্তান্ত পাঠিকাদিগকে উপহার দিব, তাহা বেদের শতপথ ব্রাহ্মণ হইতে গৃহীত। যে সকল পাঠিকা সংস্কৃতে অনভিজ্ঞ, তাঁহারা মহাভারতের বনপর্ব্বের ১৮৭ অধ্যায়ে ঐ জলপ্লাবনের বিবরণ দেখিতে পাইবেন। আমরা সংক্ষেপে তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। বৈবস্বত মনুর সম্বন্ধে এই আখ্যায়িকা প্রচারিত হইয়াছিল

একদা বৈবস্বত মনু চিরিণী নদীর তীরে আর্দ্র বস্ত্রে তপস্যা করিতেছিলেন, এমন সময়ে একটী মৎস্য আসিয়া তাঁহাকে বলিল "মহর্ষে বিধাতার নিয়ম অনুসারে প্রবল প্রাণিগণ দুর্ব্বলদিগকে বিনাশ করে। আমি দুর্ব্বল মৎস্য, আপনি



আমাকে এইরূপ বিনাশ হইতে রক্ষা করুন, সুযোগ উপস্থিত হইলে আমি আপনার প্রত্যুপকার করিব"। মুনি এই বাক্য শুনিয়া মৎস্যটীকে আপনার হস্তে লইয়া গৃহে আগমন করিলেন। তিনি তাহাকে অঞ্জলি-পরিমিত জল-পূর্ণ এক পাত্রে রক্ষা করিলেন। মৎস্য মনুর স্নেহে ক্রমে ক্রমে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। কিন্তু তাহার শরীর ক্রমে এরূপ দীর্ঘ হইল যে, সেই ক্ষুদ্র পাত্রে আর তাহা সঞ্চালন করিবার স্থান হইল না। তখন মৎস্য আবার মনুকে বলিল "প্রভো! আমাকে অন্য এক বৃহৎ পাত্রে স্থাপন করুন"। বৈবস্বত মনু তদনুসারে তাহাকে দুই যোজন দীর্ঘ ও এক যোজন প্রস্থ এক বাপীতে রক্ষা করিলেন। ক্রমে সেখানেও মৎস্যের স্বীয় অঙ্গ সঞ্চালনের স্থানাভাব বোধ হইতে লাগিল এবং মৎস্য মনুকে আবার বলিল "মহর্ষে আমাকে সমুদ্রের প্রিয়মহিষী গঙ্গাতে রক্ষা করুন।" মনু তাহাই করিলেন, কিন্তু গঙ্গাতেও স্বীয় শরীর সঞ্চালনের সুবিধা না হওয়ায় মৎস্য মনুকে বলিল "মহর্ষে আপনি আমাকে এখন সমুদ্রে নিক্ষেপ করুন। এখন ভয়ঙ্কর সময় উপস্থিত হইতেছে, আপনি একখানি সুদৃঢ় পোত নির্ম্মাণ করুন এবং সপ্তর্ষিদিগের সহিত তাহাতে আরোহণ করুন। এখন সকল স্থানের সমুদায় জীব ধ্বংস হইবে। পৃথিবী জল-মগ্ন হইলে কেবল সপ্তর্ষিগণ এবং আপনি জীবিত থাকিবেন। আমি শৃঙ্গ ধারণ করিয়া আপনার নিকট উপস্থিত হইব, আমার শৃঙ্গে আপনি ঐ নৌকা আবদ্ধ করিবেন"। অতঃপর বৃষ্টি আরম্ভ হইল এবং সকল দিক্ জলমগ্ন হইল। মুনি সেই সময় মৎস্যকে স্মরণ করিতে লাগিলেন এবং মৎস্যও মুনির আন্তরিক ভাব জানিতে পারিয়া তৎসমীপে উপস্থিত হইল। বৈবস্বত মুনি মৎস্যের শৃঙ্গে স্বীয় তরণী আবদ্ধ করিলেন এবং জলরাশির বক্ষে ভাসিতে ভাসিতে হিমালয়ের অত্যুচ্চ শৃঙ্গে উপনীত হইয়া তথায় স্বীয় পোত বন্ধন করিলেন। হিমাচলের ঐ স্থান এখনও নৌবন্ধন বলিয়া সাধারণ্যে বিদিত আছে।

মৎস্য এক্ষণে আপনার প্রকৃত স্বরূপ মুনির নিকট ব্যক্ত করিল। সে বলিল "আমি প্রজাপতি ব্রহ্মা, মৎস্যরূপ ধারণ করিয়া তোমাদিগকে এই ভয় হইতে পরিত্রাণ করিলাম"। পরে মনু পুনর্ব্বার প্রজা সৃষ্টি করিলেন।

বাইবেল গ্রন্থেও এইরূপ বর্ণিত আছে যে, নোয়া তাঁহার স্ত্রী, তিন পুত্র ও পুত্রবধূ এবং সর্ব্ববিধ জীবজন্তু লইয়া তরণীযোগে আরারাট (Ararat) নামক তৎকালীন সর্ব্বোচ্চ পর্ব্বতের শৃঙ্গে উপনীত হন। পরে তাঁহাদিগের দ্বারাই প্রজাসৃষ্টি হয়।

এরারাট্ পর্ব্বতের উচ্চতা ৫০০০ ফুট ও হিমালয়ের ধবলগিরির উচ্চতা ছাব্বিশ হাজার আট শত ফুট।



স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র দত্ত।

খৃঃ ১৮৮৯ সালে উমেশ বাবুর সদ্ব্যবহারে মোহিত হইয়া আমি প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়া শেষ করিয়া, সিটি কলেজ হইতে উপাধি পরীক্ষা দি।

১৮৮৫ সালে এন্‌ট্রান্স পাস করিয়া আমি কলিকাতায় পড়িতে আসি। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ছাত্রসমাজে যোগ দেওয়াতে উমেশ বাবু, শিবনাথ বাবু, বিজয় বাবু, নগেন্দ্র বাবু ও রামকুমার বাবু প্রভৃতি কয়টী সজ্জনের সহিত আমার যোগ হয়।

উমেশ বাবু সিটি কলেজের প্রধান অধ্যাপক ছিলেন। কিন্তু তাঁহার শারীরিক রূপ বা অধ্যাপনার গুণে যে লোকে মোহিত হইত তাহা নহে। আমি কখনও তাঁহার নিকট পড়ি নাই। আমি বি, এল পাঠ প্রেসিডেন্সিতে সাঙ্গ করিয়া, ফি দাখিল করি উমেশ বাবুর কলেজে।

অন্যান্য ছাত্রদিগের মুখে শুনিতাম উমেশ বাবুর পড়ান অতি সাধারণ রকমের, অথচ মন্দ নহে।

তাঁহার মহত্ব দেহের বল বা সৌন্দর্য্যে ছিল না। তাঁহার গৌরব বিদ্যা বুদ্ধির বলে নহে।

উমেশ বাবু একজন অকপট, সাধু, পরোপকারী, নিষ্ঠাবান্ গৃহী ও কর্ম্মযোগী, ভক্ত ও সাধক ছিলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ আমাকে বলিতেন যে, ব্রাহ্ম সমাজে উমেশচন্দ্রই সকলের চেয়ে ভাল লোক। মহর্ষির এ কথাটী বুঝিতে আমার অনেক দিন লাগিয়াছিল। মহর্ষির উমেশ বাবুর সম্বন্ধে মত যৌবনকালে বুঝিতে পারি নাই, কেবল মানিয়া লইয়াছিলাম।

যৌবন অপগত হইলে, জীবনের সংগ্রামে পড়িয়া, বিশেষ অভিজ্ঞ হইয়া দেখিলাম যে, গ্রীষ্মকালে তপনতাপে তাপিত পথিক যেমন সতৃষ্ণনয়নে কূপের দিকে, বটচ্ছায়ার দিকে, ও নিজের সঙ্গীর দিকে দৃষ্টিপাত করে,—আমিও তেমনি সংসার-মরুর মাঝে ভ্রমণ করিতে করিতে ক্লান্ত হইয়া, মাঝে মাঝে উমেশ বাবুর সুমধুর ও স্নিগ্ধ সহবাসের জন্য লালায়িত হইতাম।

আমার সঙ্গে তাঁহার বয়ঃক্রমের অন্ততঃ ২০ বৎসর প্রভেদ। আমার মতের সঙ্গে তাঁহার সকল মতের মিল ছিল না। অথচ দেখার পরদিন হইতেই তাঁহার সহিত অকপট বন্ধুতা জন্মিয়াছিল। তাহার মূলে কোন প্রকার স্বার্থ ছিল না।

১৮৮৯ সালে আমি "প্রেম" নামক গ্রন্থ রচনা করি। আমার সহধর্ম্মিণীও উমেশ বাবুর অনুরোধে বামাবোধিনীতে লিখিতে আরম্ভ করেন। উমেশ বাবু

বলিতেন যে, আমা অপেক্ষা তিনি ভাল রচনা করিতেন। আমারও ঐ মত। রচনা ও ধর্ম্মসাধন সম্বন্ধে তিনি আমার উত্তরসাধক। কিন্তু সন্তান হওয়ার পর হইতেই তিনি মানসিক সন্তানগণের প্রতি উদাসীনা হইলেন। উমেশ বাবু তাঁহাকে ২৪ পরগণা ইউনিয়নের পরীক্ষা দেওয়াইয়াছিলেন। তাহাতে তিনি সর্ব্বপ্রথম পুরস্কার প্রাপ্ত হন। উমেশ বাবুকে তিনি অত্যন্ত ভক্তি করিতেন ও করেন। উমেশ বাবু সংসারের কার্য্যকে ধর্ম্মসাধনরূপে সম্পাদন করিতেন। সংসার তাঁহার পক্ষে ধর্ম্মের অন্তরায় ছিল না। সংসারই তাঁহার ধর্ম্মসাধনের ক্ষেত্র ছিল। সংসারই তাঁহার ধর্ম্মসাধনের উপায় ছিল। তিনি কলেজের চাকুরী যেমন নিষ্ঠার সহিত করিতেন, বামাবোধিনী মূক ও বধির বিদ্যালয়, সদ্‌সৎ-সভা প্রভৃতি নানা জনহিতকর কার্য্য তেমনি ঘড়ির কাঁটার মত ঠিক সময়ে ও ঠিক নিয়মে সম্পন্ন করিতেন। এত কার্য্য তিনি কি প্রকারে করিতেন, আমরা ভাবিয়া ঠিক্ করিতে পারিতাম না। তিনি অসাধারণশক্তিসম্পন্ন লোক না হইলেও, সাধারণ অনেকগুলি কাজ যথানিয়মে বহুকাল ধরিয়া নিষ্পন্ন করা তাঁহার অসাধারণ শৃঙ্খলা ও কার্য্যপ্রণালীর, ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার, নিষ্ঠা ও প্রেমের পরিচায়ক। অধিকাংশ কর্ম্মই তিনি নিঃস্বার্থ ভাবে করিতেন।

এমন ধীর, বুদ্ধিমান্, সহিষ্ণু, সাবধান, বিনয়ী, নম্র, আড়ম্বরশূন্য ব্যক্তি সহসা নয়নগোচর হয় না।

উমেশ বাবুকে দেখিলেই বুঝা যাইত যে, সংস্কৃত ভাষায় কেন যোগীকে "ধীর" বলিয়াছে। শ্রীচৈতন্যদেব উপদেশ করিয়াছেন,—

"তৃণাদপি সুনীচেন, তরোরিব সহিষ্ণুনা,
অমানিনা মানদেন, কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥"

হরিনাম লইবার অধিকারী হইতে হইলে যে সব গুণ থাকা আবশ্যক, তাহা উমেশ বাবুর ছিল। যে কোন সমাজে এ প্রকার লোক থাকেন, সেই সমাজই ধন্য হয়।

উমেশ বাবু হিন্দুসমাজে জন্মিয়া, হিন্দুভাব ও সাধনার মধ্য দিয়া আদর্শ গৃহী, কর্ম্মী ও সাধকরূপে ব্রাহ্মসমাজকে অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মসমাজে সাধকের বড়ই অভাব,—কথকের অভাব নাই। উমেশ বাবু নীরব কর্ম্মবীর ছিলেন, বাচাল ছিলেন না,—ধর্ম্মোপদেশ দিতে হইলেও কথকতার প্রকৃতি ও প্রতিভা তাঁহার ছিল না।

উমেশ বাবু বাক্যে ব্রহ্মজ্ঞানী ছিলেন না,—প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞানী ছিলেন, তাই তিনি কাহাকেও ঘৃণা করিতেন না, সকলকেই ভাল বাসিতেন। গদ্যে, পদ্যে, বাক্যে, বিদ্যা জাহির করা অনায়াসেই হয়, ব্রহ্মবিদ্যাকে জীবনে ফলিত করাই কঠিন। উমেশ বাবু তাহা সুন্দররূপে করিতে পারিয়াছিলেন।

যাঁহাকে দেখিলে হরিনাম স্ফূর্ত্তি পায়,





তাঁহাকেই বৈষ্ণবপ্রধান বলিয়া গণ্য করিতে পারা যায়। কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থে এই কথা বলিয়াছেন। উমেশ বাবুকে দেখিলে, তাঁর সঙ্গে আলাপ করিলে হরিভক্তি স্ফূর্ত্তি পাইত। অতএব তাঁহাকেই আমি ব্রাহ্ম বলি। যাঁহার সহবাসে থাকিলে, ব্রহ্মের শান্তি সম্ভোগ করা যায় ও ব্রহ্মনিঃশ্বাস অনুভব করা যায়, তিনিই আমার মতে ব্রাহ্ম। এই প্রকার ব্রাহ্মই প্রকৃত ব্রাহ্ম, আর সব জাতি-ব্রাহ্ম,—নানা কারণে,—নানা রকম ব্রাহ্ম,—কখনই ব্রহ্মজ্ঞ নহেন॥

উমেশ বাবু সম্পৎসময়েও যেমন আমার খোঁজ খবর লইতেন, আপৎসময়েও তদ্রূপ খোঁজ লইতেন,—বরং বিপৎ-কালে বেশি খোঁজ লইতেন। যখন আমি জুড়িগাড়িতে হাওয়া খাই ও ত্রিতল-গৃহে বসিয়া সংসার-তবলায় চাটি মারি, তখন অনেকেই হাসিমুখে সর্ব্বদাই আমার খোঁজ খবর লইতে ও লুচি মণ্ডার তত্ত্ব লইতে ব্যস্ত হন। কিন্তু যখন পদ-ব্রজে ধরণীর ধূলি আকাশে উড়াইয়া ভব-ঘুরে বেশে ভূপ্রদক্ষিণ করি, তখন বন্ধু-বান্ধবেরা আর ঘন ঘন আমার দ্বারে আসেন না। তখন আর আমার খোঁজ লওয়া তাঁহারা বিহিত মনে করেন না,—আমাকে মলিন বেশে দেখিলে, মুখ ফিরাইয়া রাস্তার অপর পার্শ্ব দিয়া চলিয়া যান। বিদ্যাসাগর মহাশয়, মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ, রাজনারায়ণ বাবু, রামতনু বাবু, উমেশ বাবু সে জাতীয় বন্ধু ছিলেন না। খবর না দিলেও, উমেশ বাবু স্বয়ং আমাকে খুঁজিয়া লইতেন। সকলের প্রতিই তাঁহার এমনই প্রেমের ব্যবহার ছিল। একদা আমি আসাম ও রংপুর বাস-জনিত জ্বররোগে ত্রিশ মাস ভুগি,—সকল চিকিৎসক ও জ্ঞাতিবর্গ আমার আশা ছাড়িয়াছিলেন। ছাড়ি নাই কেবল আমি।

ডাক্তার, কবিরাজ, আত্মীয়, বন্ধু আমাকে ও আমার আশাকে ত্যাগ করিলেও, আমি প্রতিজ্ঞা করিলাম যে "আমি বাঁচিবই বাঁচিব,—না বাঁচিলে আমার চলিবে না,—আমার এখানকার কাজ যে বাকি রহিয়াছে।" সম্ভবতঃ যে যে ডাক্তার ও কবিরাজ, সংশ্রমারী হইয়াও, আমাকে শেষ করিতে পারেন নাই, হয় তো আমিই তাঁহাদের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিবার জন্য কত বর্ষ জীবিত থাকিব, কে জানে?

এই দীর্ঘকালব্যাপী রোগশয্যার পার্শ্বে কোন বন্ধুকেই দেখিতে পাই নাই। কেবল উমেশ বাবু খুব প্রত্যূষে, এণ্টনী বাগান হইতে ৩৬নং শ্যামবাজারে আমার বাসার দ্বারে যাইয়া কড়া নাড়িতেন ও সেই তাঁহার ক্ষুদ্র ও সুমিষ্ট কণ্ঠে "হেমেন্দ্র" বলিয়া ডাকিতেন।

উমেশ বাবুই সেই মৃত্যুশয্যাতে আমাকে দেখিতে যাইতেন।

হঠাৎ দ্বারভাঙ্গার মহারাজা সেই অবস্থাতেই আমাকে এক কর্ম্ম প্রদান করিলেন। সে ১৯০৬, অক্টোবর।



কি করি? এ অবস্থায় বিছানা হইতে উঠিয়া অন্য ঘরে যাওয়া ক্লেশকর, কি করিয়া একলা দ্বারভাঙ্গা যাই। তখনও বাতে পঙ্গু, প্রত্যহ রোজ ৩টার সময়ে জ্বর আসে, রাত্রি ৯টায় ছাড়ে।

উমেশ বাবু বলিলেন—"তোমার কেহ ভাই বন্ধু সহায় নাই,—থাকিয়াও নাই। বেশ, এ অবস্থায় দ্বারভাঙ্গায় যদি নিতান্তই যাও, তো আমি একজন লোক ঠিক করে দিব, নচেৎ নিজের ছেলেকে পাঠাব, না হয় তো নিজেই যাবো"।

অন্য লোক স্থির হইল না। তাঁহার বড় ছেলে সুকুমারের তখন শিবপুর কলেজে কৃষিবিদ্যার শেষ পরীক্ষা। উমেশ বাবু বলিলেন "পরীক্ষা পরে হইবে,—সে তোমাকে দ্বারভাঙ্গায় রাখিয়া আসুক। আর ১৫ দিন বাদ পরীক্ষা। না হয় তো আর বছর দিবে।"

এ কথা শুনিয়া আমি অবাক্!

ছেলে শেষ পরীক্ষায় পাস্ হোক বা না হোক, আর একজন রুগ্ন লোকের সঙ্গে ঘর হইতে প্রায় ৪০০ মাইল দূরে, তাহাকে পঁহুছাইতে যাক্, এ কেবল উমেশ বাবুর মহাপ্রাণই বলিতে পারে, আর পারিতেন আমার পিতা, পিতামহ ও উপরি উক্ত কয়েক জন মহাপুরুষ।

তাহার পর, সেই মহাত্মার "সুপুত্র সুকুমার আমাকে সঙ্গে লইয়া, অশেষ বাধা বিঘ্ন অতিক্রমপূর্ব্বক দ্বারভাঙ্গায় লইয়া গিয়া, বাসায় স্থিত করিয়া দিয়া আসিলেন। ভগবৎকৃপায় তিনি পাস্ হইয়া কর্ম্মের উপযুক্ত হইলেন।

কেবল সন্তানকে পরীক্ষা ফেলিয়া সঙ্গে যাইতে দিলেন, তাহাই নহে।

একদিন কাছারীতে বসিয়া পায়ে শেক্ লইতেছি, মহারাজার এক সিপাহি বলিল, —"হুজুর! কল্‌কাতাসে এক বাবু আয়া।" আমি অম্‌নি তাড়াতাড়ি গাড়ি আনিয়া, বাসায় যাইয়া দেখি, সেই বামাবোধিনীর কপি ও প্রুফের ব্যাগ্, সেই দোয়াৎ ও সেই পৃথিবীপ্রবাসী স্বর্গের দেবতা উমেশচন্দ্র!

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"আপনি কি প্রকারে এখানে এলেন?"

উমেশ বাবু—"তুমি অসম্ভব রোগে ভুগিয়া, মৃতবৎ দেহ লইয়া এলে,—তাই তোমাকে দেখ্‌তে এলাম্, কেমন আছ!"

আমি—"আপনি বৃদ্ধ। এত দূর দেশে আমাকে দেখিতে এলেন? ইহাও কি কেহ করে?"

উমেশ বাবু—"তোমাকে দেখিবার জন্য প্রাণটা ব্যাকুল হলো, তাই এলাম, বলি একবার দেখে যাই।"

হায়! কে জানিত যে, সেই শেষ দেখা! মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বেই আমাকে দেখিতে ও দেখা দিতে এতদূর, এত কষ্ট ও এত ব্যয় করিয়া, পরে কি কখনও দেখিতে যায়?

তবে, তিনি পর ছিলেন না।—তিনি আমার আত্মার আত্মীয়,—হৃদয়ের বন্ধু



ছিলেন। আমি তাঁহার শোণিতের সম্পর্কীয় নহি,—পড়ো, শিষ্য, সমবয়স্ক বা অনুগত লোক নহি। বরং অনেক বিষয়ে তাঁহার মতের বিরোধী ছিলাম।

আমাকে ১৯০৬ নবেম্বরে দ্বারভাঙ্গায় দেখিয়া বলিলেন —"হেমু! Thy faith has made thee whole!" দ্বারভাঙ্গা হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া এক পোষ্টকার্ডেও ঐ কথা লিখিয়াছিলেন। তিনি সর্ব্বদাই বলিতেন—"তুমি বিশ্বাসের বলে বাঁচিলে।" তাঁহার যাতায়াতের খরচ দিতে গেলে লইলেন না, বলিলেন "তোমার অনেক খরচ, বরং আমি কিছু দিয়া যাই।"

তাঁহার শেষ পত্র পাইবার দিন কতক পরেই ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জারে পড়িলাম যে, এই নররূপী দেবতা ভবধাম পরিত্যাগ-পূর্ব্বক লোকান্তরে, কর্ম্মান্তরে, সাধনান্তরে গমন করিয়াছেন।

এখনও যেন সেই সুবিমল প্রেমময় মুখখানি দেখিতেছি, তাঁহার স্নেহবাণী শ্রবণ করিতেছি ও ক্ষুদ্র সস্নেহ কণ্ঠে "হেমু" বলিয়া ডাক্ শুনিতেছি।

আমি মৃত্যুতে বিশ্বাস করি না।

মৃত্যু নাই, যাহা আছে, তাহা এক, অনন্ত জীবন। সেই অনন্ত জীবন সাগরে, আমি ও তিনি সেই পূর্ব্বকালের মত, অন্যান্য প্রিয় জনগণের সহিত, এক নিত্য প্রেম-লহরী-লীলায় নিযুক্ত রহিয়াছি। সেই ক্ষণিকের, বদ্ধ জীবনের শেষ পরিচ্ছেদ ও অভিনয় এই রঙ্গমঞ্চে সমাপ্ত হইয়া যবনিকার পতন হইলেও,—নূতন পরিচ্ছেদ ও নূতন পত্র খুলিয়াছে, ও নূতন আকাশে, নূতন সূর্য্যের স্নেহ দৃষ্টিতে নিত্য পুরাতন, নূতন লীলা করিতেছেন, ইহাই অনুভব করিতেছি।

তাঁহার বিষয় ভাবিতে ভাবিতে চক্ষু স্নেহাশ্রুকণাসিক্ত হইয়া আসিলেও ভাবি যে, এ অশ্রু তাঁহার জন্য নহে, ইহা আমার বন্ধুহীনতার জন্য ও সমাজের বর্ত্তমান দারিদ্র্যের জন্য। বামাবোধিনী, মূক-বধির বিদ্যালয়, সিটি কলেজ প্রভৃতি জন-হিতকর কীর্ত্তিকলাপ সাধু উমেশচন্দ্র দত্তের নামকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবে। ব্রাহ্মসমাজ ও সঙ্গত-সভা এই দেবতার নীরব সাধনার স্মৃতিমন্দির হইয়া চিরদিন আমাদিগকে মানব-আত্মার অবিনশ্বরত্ব ও চিরবর্ত্তমানতার সাক্ষ্য দিবে।

কোনও একটী অদ্ভুতশক্তি তাঁহার না থাকিলেও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুণের ও সাধুতার এমন অসাধারণ সমাবেশ কোনও লোকে সহসা দেখা যায় না। যদিও কোন যুগ-ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক ও অবতার হইবার যোগ্য মনোভাব তাঁহাতে ছিল না, তথাপি তিনি যে মহাভাব ও মহাপুরুষের একজন নিতান্ত অনুগত ও নিষ্ঠাবান্ ভক্ত ছিলেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

তাঁহার স্মৃতি আমাদের জীবনকে মধুময় ও অমৃতময় করুক।

শ্রীহেমেন্দ্রনাথ সিংহ।

৭১।১ সিমলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আমার ভগিনী

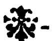
আমার ভগিনী সেকেলে মেয়ে নহেন। তিনি বঙ্গের যে সময়ে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, সে সময়ে স্ত্রীলোক শিক্ষা লাভ করিলেই অকালে বিধবা হয়েন, এই কুসংস্কারটা একটু নিষ্প্রভ হইয়াছিল। তাই বলিয়া তখনও পল্লিগ্রামে মেয়েদের জন্য কোন বিদ্যালয় স্থাপিত হয় নাই, এবং অন্তঃপুর-স্ত্রীশিক্ষারও প্রচলন হয় নাই। তিনি গৃহে বসিয়াই বর্ণ পরিচয়ের পর সহজ সহজ বই পড়িতে শিখিয়াছিলেন। তাঁহার নিকটই আমার প্রথম বর্ণ পরিচয় হয়। তিনি সামান্য শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু মন উন্নত করিতে পারেন নাই। শিক্ষাতে রুচি মার্জ্জিত হইতে পারে, কিন্তু উহা সকল সময় শিক্ষিত ব্যক্তির চরিত্র আমূল পরিবর্ত্তিত করিতে পারে না। কত সুশিক্ষিত পুরুষ ও মহিলা অতি অপকৃষ্ট চরিত্রের নিদর্শন স্বরূপ হইয়া সাধারণ লোকের অশ্রদ্ধাভাজন হইতেছেন। যাক, এ অবাস্তব কথায় আর কাজ নাই। আমি বক্তৃতা করিতে পারিতাম। আমার গ্রামের ও চতুষ্পার্শ্বের লোক তাহা জানিতেন। আমি এক সময়ে বিদেশ হইতে গ্রামে উপস্থিত হইয়াছি। নিকটবর্ত্তী কোন গ্রাম্য বিদ্যালয়ের বালকগণ সংবাদ পাইয়া আমাকে তাঁহাদের বিদ্যালয়ে বক্তৃতা দিবার জন্য অনুরোধ করেন। আমি তাহাদের অনুরোধক্রমে যথাসময়ে তাঁহাদের গ্রামে যাইতে উদ্যত হইলাম। তখন সূর্য্য প্রচণ্ড তাপে সকলকে তপ্ত করিতেছিল। আমি এই প্রচণ্ড রৌদ্রের মধ্যে দূরবর্ত্তী গ্রামে যাইতে প্রস্তুত হইতেছি দেখিয়া ভগিনী প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন, ভাল তোমায় জিজ্ঞাসা করি, এঁরা কি তোমায় কিছু দিবেন? তবে তুমি এই বিষম রোদের মধ্যে কেন বাড়ীর বাহির হচ্ছ"? আমি একটু হাসিয়া বলিলাম "পরের উপকার কর্ত্তে যেয়ে কি আবার কিছু প্রত্যাশা রাখ্‌তে হবে? পরের জন্য খাটিতে গেলেই একটু কষ্ট স্বীকার কর্ত্তে হয়। একটু স্বার্থ ত্যাগ না কর্ত্তে পাল্লে কিরূপে পরের উপকার কর্ব্বো?" আমার ভগিনী এ কথার মর্ম্ম বুঝিতে পারিলেন না, খাটিতে হইলেই তাহার পরিবর্ত্তে কিছু ধরিবার ছুঁইবার মত জিনিষ পাইতে হয়, ইহাই তাঁহার বদ্ধমূল সংস্কার। জ্ঞানাভাবই তাঁহার এ সংস্কারের ভিত্তি। তিনি একটু বিচার করিলেই বুঝিতে পারিতেন যে, যদি আনন্দলাভই জীবনের লক্ষ্য হয়, তাহা হইলে নিঃস্বার্থ ভাবে পরোপকার করিতে পারিলে তাহাতে যে বিমল আনন্দ অনুভব করা যায়, লক্ষ কোটি টাকায় সে আনন্দ ক্রয় করিতে পারা যায় না।

আর এক সময় আমি গ্রামে গিয়াছি,

সে সময় একদিন আমার জনৈক পিতৃব্য আসিয়া আমাকে তাঁহার বাড়ীতে আহার করিতে অনুরোধ করিলেন। আমি সম্মত হইলাম। আমার ভগিনী আমাকে যাইতে নিষেধ করিলেন। তিনি বলিলেন "ইহাঁরা আমাদের ভিন্ন দলের লোক, "ইহাঁদের বাড়ীতে যাইয়া আমরা সামাজিক ভাবে আহার করিতে পারি না। ওরূপ করিলে আমাদের দলের লোকেরা আমাদিগকে পরিত্যাগ করিবে।" আমি প্রত্যুত্তরে বলিলাম "আপনাকেত যাইতে বলা হয় নাই, তবে আপনার ভয়ের কারণ কি আছে?" তিনি বিরক্ত হইয়া বলিলেন "তুমি যে আমাদের লোক, তুমি খাইলেই আমাদের খাওয়া হইল, সমাজ ইহাতে রাগ্‌বে"। আমি সম্প্রদায়ের বন্ধন ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছিলাম, তথাপি দেখিতে পাইলাম আত্মীয়বর্গ আমায় ভুল বুঝিতে দেন। তাঁহারা আরও মনে করিতেন যে, আমি তাঁহাদের হইয়া বিরুদ্ধ দলের সহিত মিশিব না। আমার ভগিনীর এই ভ্রমাত্মক সংস্কার বুঝাইয়া দিবার জন্য বলিলাম "আমি বেদলে লোক, কোন দলেরই নহি। সুতরাং যিনি আমাকে ডাকিবেন, আমি তাঁহারই বাড়ী যাইব। ইহাতে যদি আপনারা বিপদাপন্ন মনে করেন, তবে আমার সরে যাওয়াই ভাল"।

ভগিনী নিরুপায় ভাবিয়া আর বাঙ্‌-নিষ্পত্তি করিলেন না।

আর এক সময় বাড়ী যাইলে পর তিনি একদিন কথোপকথন করিতে করিতে বলিলেন "তোমাদের সকলই ভাল, তবে যে জাতটা মান না, সকল জাতের হাতে খাও, এটাই তোমাদের মন্দ"। আমি বলিলাম "কেন আপনারাও ত খেয়ে থাকেন"। অমনি তিনি বাধা দিয়া বলিলেন "ছি ছি অমন কথা বল না, আমরা হিন্দু হয়ে, বামুন হয়ে, সব জাতের হাতে খেয়ে থাকি, এ মিথ্যে কথা।" আমি একটু হাসিয়া বলিলাম "মিথ্যা কথা নয়? আপনি পুরীতে জগন্নাথ ক্ষেত্রের কথা জানেন না কি? শুনেছি তথায় বামুনে চাঁড়ালে ভেদ নাই। বাজারে অন্ন বিক্রয় হয়, সকল জাতিই তাহা ছুঁইতে পারে। কেহ তাহা লইতে ঘৃণা কল্লে পাপ হয়? এ কথা সত্য নয় কি।" তিনি ভক্তিরসমিশ্রিত স্বরে উত্তর করিলেন "সেখানে যে জগন্নাথ স্বয়ং রয়েছেন, সুতরাং সেটা ধর্ম্মক্ষেত্র। সেখানে সব জাতির ছোঁয়া অন্ন খেলে পাপ নাই, তাই বলে কি যেখানে সেখানে খাওয়া যেতে পারে"? আমি সুযোগ বুঝিয়া জাতিভেদের অসারতা তাঁহাকে বুঝাইতে লাগিলাম; বলিলাম, "আপনার জগন্নাথ কেবল পুরী ক্ষেত্রেই আবদ্ধ, আমার জগন্নাথ জগদ্‌ব্যাপী, সর্ব্বস্থানেই আছেন, এই জন্যই তাঁহার নাম জগন্নাথ হয়েছে। তিনি যে স্থানে, সে স্থানে যদি জাতিভেদ না থাকে, তাহা হইলে জগতের কোন স্থানেই জাতিভেদ থাক্‌তে পারে না"। তিনি আমার যুক্তির সারবত্তা বুঝিতে পারিয়া নির্ব্বাক রহিলেন।



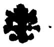
উপরি-উক্ত কয়টি ঘটনাই আমার ভগিনীর সঙ্কীর্ণ হৃদয়ের পরিচায়ক, কিংবা তাঁহার গভীর তত্ত্বজ্ঞানের অভাব প্রকাশ করিতেছে। যাহার হৃদয় উদার হইয়াছে, সে ব্যক্তিমাত্রকেই আপনার ন্যায় ভাল বাসিবে। সে আপনাকে কষ্ট দিতে যেমন প্রস্তুত হয় না, অপরকে কোন রূপ ব্যথা দিতেও তাহার মন অগ্রসর হইবে না। প্রসিদ্ধ চাণক্য পণ্ডিত বলিয়াছেন "আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যতি সঃ পণ্ডিতঃ"—যে আপনার ন্যায় সর্ব্বজীবকে দর্শন করে অর্থাৎ প্রেম করে, সেই পণ্ডিত অর্থাৎ জ্ঞানী। যীশু খ্রীষ্টও ঠিক সেই কথা বলিয়া গিয়াছেন "Love thy neighbour as thyself"—তোমার প্রতিবেশী অর্থাৎ অপর ব্যক্তিকে আপনার ন্যায় ভাল বাসিবে। এইটি তিনি ধর্ম্মের একটি শ্রেষ্ঠ উপদেশ মনে করিতেন। "উদারচরিতানাস্তু বসুধৈব কুটুম্বকং"—উদারচরিত্র ব্যক্তিদিগের নিকট বসুধাই কুটুম্ব। পরকে আপনার মত দেখা মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম্ম নহে। মানুষের স্বভাব জানিতে হইলে বালক ও অসভ্য জাতির স্বভাব পরীক্ষা করিতে হয়। তাহাদের মধ্যে আমরা আত্মপ্রেমের ষোল আনা খেলা দেখিতে পাই, তাহারা স্বার্থকেই বড় দেখে, পরের জন্য স্বার্থকে বলিদান করা তাহাদের জীবনে বড় দেখিতে পাওয়া যায় না। সুতরাং হৃদয়কে প্রসারিত করিয়া বিশ্বজনীন প্রেমের আবাসভূমি করিতে হইলে সৎশিক্ষা ও বিবিমত অনুশীলনের বিশেষ প্রয়োজন দেখা যায়। কেহ মাতৃজঠোর হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়াই উদারপ্রেমিক হইতে পারে না। এজন্য আমার ভগিনীর হৃদয়ের দৌর্ব্বল্যব্যঞ্জক ঘটনা কয়টি প্রকাশ করিলেও তাঁহাকে তজ্জন্য দোষী মনে করি না। উপযুক্ত অবস্থায় পড়িয়া হৃদয়ের উৎকর্ষ সাধনের সুবিধা পাইলে তাঁহারও সংকীর্ণতা অপনোদিত হইত। তাঁহার সামাজিক ও পারিবারিক অবস্থা তাঁহার তাদৃশ প্রেমানুশীলনের বিরোধী ছিল। যে পরিবারে স্বার্থের ষোল আনা বিকাশ, যে সমাজে সংকীর্ণতা এবং দলাদলির রাজত্ব, সে পরিবারে ও সে সমাজে বর্দ্ধিত বালক বালিকা উদার চরিত্র লাভ করিতে পারে না। সুতরাং যদি কাহাকেও বিশ্বজনীন প্রেমের দীক্ষায় দীক্ষিত করিতে হয়, তাহা হইলে অগ্রে পরিবার ও সমাজের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করা কর্ত্তব্য। উদার লোকদিগের সংসর্গে পড়িলে লোক উদার হয়, তদ্বিপরীত সংসর্গে লোকে তদ্বিপরীত স্বভাব প্রাপ্ত হয়। যে সমাজে উদার লোকের সংখ্যা কম এবং সংকীর্ণ লোকের সংখ্যা বেশী, সে সমাজে উদারচরিত্র লোকদিগকেও আত্মরক্ষার জন্য বিষম সংগ্রাম করিতে হয়। দুর্ব্বল ও সংকীর্ণ প্রকৃতির লোকদিগের সমধর্ম্মীদিগের সহিত মিলিবার জন্যই আকাঙ্ক্ষা জন্মে, সুতরাং সমাজকে সমগ্রভাবে উদারতার দিকে আকর্ষণ করিয়া লইবার প্রয়োজন নাই অথবা এরূপ করিয়া বিশেষ

ফল পাইবার সম্ভাবনা নাই। সমাজকে আকর্ষণ করিতে হইলে পরিবারগুলি সংশোধিত করিতে হইবে। কারণ সমাজের স্বতন্ত্র কোন অস্তিত্ব নাই, পরিবারসমষ্টিই সমাজ। সুতরাং ব্যষ্টিভাবে পরিবারের লোক সকল উদার-প্রেমিক না হইলে সমষ্টিভাবে সমাজে সদ্‌দৃষ্টান্ত থাকিতে পারিবে না। তাই বলি আমাদের পরিবারই এই সংস্কারের প্রথম সোপান, তাহা হইতেই সংস্কার আরম্ভ করিতে হয়।

শ্রীচণ্ডীকিশোর কুশারি।

ঈশ্বর নানারূপে কল্পিত।

ঈশ্বর কার্য্যভেদে এই জগতে বহুরূপে ও বহুগুণে কল্পিত হইয়াছেন। ঈশ্বরের রূপকল্পনাভেদে যে সকল দেবমূর্ত্তি জগতে প্রকাশিত হইয়াছে, তৎসমস্তই ঐশ্বরিক গুণ ও ক্রিয়াদি অনুধ্যান ও পূজা করণের তাৎপর্য্য, কেবলই সাধকদিগের ধারণার উন্নতি মাত্র। শাক্ত, শৈব ও বৈষ্ণব প্রভৃতির সাধনমতে ঈশ্বর সাধনার ধন হইয়া জগতে নানারূপে অর্চ্চিত হইতেছেন। প্রত্যেক মূর্ত্তিকল্পনার ভাব বোধ হয় অত্যল্প লোকেই অবগত আছেন। প্রত্যেক মূর্ত্তির যে এক একটী নিগূঢ় ভাব আছে, তাহা সাধারণের হৃদয়ঙ্গম জন্য এই স্থলে দুই চারিটী মূর্ত্তির কিঞ্চিন্মাত্র ঐশ্বরিক ভাব প্রকাশ করা যাইতেছে। মনে কর, উপাসক যদি শাক্ত হন, তাহা হইলে তিনি দুর্গামূর্ত্তি ভাবনা করিলেই তাহার পর ব্রহ্মের অর্চ্চনা হয়। 'দুর্গা' এই নামটী উচ্চারণ করিলেই দশভুজা, গৌরাঙ্গী, ত্রিনয়না, সিংহারূঢ়া, ও অস্ত্রাদিহস্তা একটী প্রকৃতমূর্ত্তি বলিয়া বুঝিতে হইবে। বস্তুতঃ ঐ দুর্গামূর্ত্তি ঈশ্বরের মায়া-শক্তির রূপান্তর মাত্র। ঈশ্বর এই জগতের সৃষ্টি কল্পনা করিয়া আপনার চৈতন্য ঐ মায়াশক্তিতে আরোপ করিয়াছিলেন। মায়া, চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া বিদ্যা ও অবিদ্যাভাবে এই সংসার প্রকাশ করিয়া পালন করিতেছেন। ঈশ্বর আপনার স্বরূপ মায়াতে আরোপ করিয়াছেন বলিয়া মায়া স্ত্রীরূপে কল্পিতা হইয়াছেন। জগতের দশ দিকেই মায়া অবস্থান করিয়া জগৎ শাসন ও উদ্ভাবন করিতেছেন। এই মায়ার ভাব প্রদর্শনকরণার্থ দুর্গানাম্নী মূর্ত্তির জগতে প্রকাশ। দুর্গার দশ হস্ত দশ দিক্, দশহস্তস্থিত অস্ত্রশস্ত্রাদি জীবাত্মার উপকরণ স্বরূপ দশ ইন্দ্রিয়, ত্রিনয়ন সত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণ, অসুর রিপু, সিংহ বল, এবং সর্প চৈতন্য-স্বরূপ। ঈশ্বরের মায়া জগতে কিরূপে বিরাজিত আছে, তাহা এই দুর্গামূর্ত্তিতে অনায়াসেই প্রত্যক্ষ হয়। দুর্গাপূজার মন্ত্র সকলও



সাধকের সাধনার উপদেশ মাত্র। বস্তুতঃ যে নিত্যা, অদ্বিতীয়া, তেজোরূপা, সমানাকারা প্রকৃতি প্রভৃত প্রজা সৃষ্টি করিতেছেন, নিত্য বিজ্ঞানাত্মা সেই প্রকৃতির সেবা করিয়া অজ্ঞানরূপ অন্ধকার পরিত্যাগ করেন। আত্মা প্রকৃতির আশ্রয়ে ভোগ্য বস্তু ভোজ্য করিয়া আচার্য্যাদির উপদেশবাক্যে কাম্যকর্ম্মাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক ভগবদ্‌ভক্তি লাভ করেন। অধুনা কল্পমাহাত্ম্যে যে তামসিক ভাবে সেই প্রকৃতির দুর্গামূর্ত্তি সকল অর্চ্চিত হয়, তাহার অন্তরে পূর্ব্বোক্ত সূক্ষ্মভাব সকল বিদ্যমান রহিয়াছে।

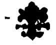
কালী রহস্য

উপাসকদিগের কার্য্যসাধনার্থ গুণ ও ক্রিয়ানুসারে সেই ভগবতীর বহুবিধ রূপ কল্পিত হইয়াছে। শ্বেত, পীতাদি বর্ণ সকল যেমন কৃষ্ণবর্ণে বিলীন হয়, সেইরূপ সর্ব্বভূতই (কালশক্তি) কালীতে প্রবিষ্ট হয়। এই নিমিত্ত যোগিগণের হিতকারিণী সেই নির্গুণা নিরাকারা কালশক্তির বর্ণ কৃষ্ণ বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে। তিনি নিত্যা, কালরূপা, অব্যয়া ও কল্যাণস্বরূপা। তাঁহার ললাটে চন্দ্রকলা-চিহ্ন অমৃত প্রযুক্ত কল্পিত হইয়াছে। যেহেতু তিনি নিত্য স্বরূপ চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নি দ্বারা কালসম্ভূত নিখিল জগৎ সন্দর্শন করেন, এই জন্য তাঁহার নয়নত্রয় কল্পিত হইয়াছে। তিনি যাবতীয় প্রাণীকে গ্রাস করেন ও কালদণ্ড দ্বারা চর্ব্বণ করেন বলিয়া সর্ব্ব প্রাণীর রুধিরসমূহ সেই মহেশ্বরীর রক্তবসনরূপে কল্পিত হইয়াছে। সময়ে সময়ে জীবগণকে বিপদ হইতে রক্ষা এবং তাহাদিগকে নিজ নিজ কার্য্যে প্রেরণ করা তাঁহার বর ও অভয় রূপে কথিত হইয়াছে। তিনি রজোগুণজনিত বিশ্বে অধিষ্ঠান করিতেছেন, এই নিমিত্ত তিনি রক্তকমলাসনস্থিতা রূপে কল্পিত হইয়াছেন। জ্ঞান-স্বরূপা, সর্ব্বজনের সাক্ষিস্বরূপিণী সেই দেবী মোহময়ী সুরাপানস করিয়া ক্রীড়াকারী কাল কর্ত্তৃক সমুদ্ভূত এই জগৎকে দর্শন করিতেছেন। অল্পবুদ্ধি ভক্তগণের হিতানুষ্ঠানের নিমিত্ত উক্ত প্রকার গুণানুসারে সেই ভগবতীর বহুবিধ রূপ কল্পিত হইয়াছে।

কালী মূর্ত্তির আর একটী নিগূঢ় অর্থ।

শাস্ত্রানুসারে ভগবানের সর্ব্বব্যাপক চৈতন্য অংশ বা পুরুষাংশটী নিতান্ত নিষ্ক্রিয় ও নির্গুণ, তাহার কোন প্রকার ক্রিয়া নাই এবং কোন প্রকার গুণও নাই। যত কিছু ক্রিয়া, যত কিছু গুণ, সমস্তই তাঁহার প্রকৃতি বা মায়া অংশের। তাঁহার সেই নিষ্ক্রিয় চৈতন্যাংশের বক্ষে দাঁড়াইয়া তাঁহার সর্ব্বব্যাপিনী শক্তি



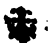
অনন্ত জগতের নির্ম্মাণাদি কার্য্য দ্বারা সর্ব্বদা ক্রীড়া করিতেছেন। শিবের বক্ষে কালী এই গূঢ় রহস্য প্রকাশ করিয়া দিতেছেন। শিব তাঁহার চৈতন্যের প্রতিমূর্ত্তি, আর কালী তাঁহার মায়াংশের প্রতিমূর্ত্তি। তাঁহার পুরুষাংশ বা চৈতন্যাংশ শববৎ নিষ্ক্রিয়ভাবে পড়িয়া আছেন। মায়া সমস্ত গুণসম্পন্ন ও সক্রিয়, তাই তিনি সাধকের নিকট সক্রিয় ও সগুণ ভাবে নৃত্য করিতেছেন।

চৈতন্য স্বপ্রকাশ স্বরূপ, সুতরাং নিতান্ত স্বচ্ছ ও নির্ম্মল, তাই কালী মূর্ত্তির পদঃ তলবর্ত্তী শিবও নিতান্ত নির্ম্মল, শ্বেতবর্ণ, শুদ্ধ স্ফটিকসন্নিভ। মহামায়া স্বয়ং প্রকাশ স্বরূপ নহেন, চৈতন্যের সাহায্যেই তিনি প্রকাশ পাইয়া থাকেন, তাই তিনি চৈতন্যের নিকটে অন্ধকার কালিমবর্ণা, তাই কালী কৃষ্ণবর্ণা সাজিয়া বিরাজ করিতেছেন।

শবশিব এবং মহামায়া দিগম্বরীবেশে থাকিয়া দেখাইতেছেন যে, তিনি সর্ব্বব্যাপক বস্তু, অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড তাঁহারই গর্ভে অবস্থিতি করিতেছে, সুতরাং আর তাঁহাকে কিসের দ্বারা আবৃত করা যাইতে পারে? তাঁহা হইতে বৃহৎ বস্তু না হইলে তাঁহাকে আবৃত করা যায় না, সুতরাং তাঁহার দেহের আবরক স্বরূপ বস্ত্রাদি কিছুই নাই। কালী উলঙ্গিনী, কেবল ইহাই নহে, তিনি এই বেশধারিণী হইয়াও দেখাইতেছেন যে, তিনিই একমাত্র অদ্বিতীয় বস্তু, তাঁহা হইতে অতিরিক্ত আর কিছুই নাই, তিনিই সমস্ত-স্বরূপা, সুতরাং আর লজ্জা হইবে কাহাকে দেখিয়া? নিজেকে দেখিয়া, কি নিজের লজ্জা হইতে পারে, সুতরাং তাঁহার লজ্জা নাই, লজ্জা রক্ষার নিমিত্তই বস্ত্র পরিধান করিতে হয়, সুতরাং তাঁহার বস্ত্র নাই।

তৃতীয়তঃ, কালী এই বেশে সাজিয়া, ইহাও দেখাইতেছেন যে, তাঁহার কোনও প্রকার অজ্ঞানতা নাই, সর্ব্বদাই তাঁহাতে পরিপূর্ণ বিবেক জ্যোতিঃ বিরাজ করিতেছে। লজ্জাদি গুণ বিকৃত জ্ঞানের ফল, যাঁহার পূর্ণ মাত্রায় বিবেক থাকে, তাঁহার লজ্জা আসিতে পারে না, দেহাভিমান এবং স্ত্রীত্ব পুরুষত্বাদি বিকৃত জ্ঞান হইতেই লজ্জা বোধ হইয়া থাকে, তাঁহার এইরূপ বিকৃত জ্ঞান নাই, লজ্জাও নাই, সুতরাং বস্ত্র পরিধানও করেন না।

মহামায়া সাম্যাবস্থাপন্ন ত্রিগুণময়ী। সত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণ তাঁহাতে অবিকৃত ভাবে বিরাজ করে, তাহাই তিনি এই কালিকা মূর্ত্তিতে দেখাইতেছেন। দক্ষিণ করযুগলের দ্বারা বর এবং অভয় প্রদানের দ্বারা তাঁহার মধ্যে যে সত্ব-সমুদ্ভূতা অতুল শান্তি ও অকৃত্রিম করুণা বিরাজ করিতেছে, তাহা দেখাইতেছেন। আর বাম হস্তে বিধৃত অসি ও মুণ্ড দ্বারা দেখাইতেছেন যে, তাঁহাতে পূর্ণমাত্রায় রজোগুণও আছে। সত্ব এবং রজোভাব প্রকাশের সঙ্গে তমোভাব প্রকাশ করা সম্ভবে না, তাঁহার পক্ষে সমস্তই সম্ভব হইলেও আমাদের







বুঝিবার পক্ষে তাহা সম্ভবে না। তাই কালিকা রূপের মধ্যে তমোভাবপ্রকাশক কোন চিহ্ন ধারণ করেন নাই, কিন্তু বাস্তবিক ইহাঁর মধ্যে তমোগুণও পূর্ণ মাত্রায় আছে। এইরূপে তিনি সম-ভাবাপন্না।

র্ত্তির লোল জিহ্বা ও করাল-দংষ্ট্র মুখভঙ্গিমা দ্বারা প্রবল রজোগুণের ভাব প্রকাশ পাইতেছে, আবার হাস্য-ভাবযুক্ত অধর-পল্লব দ্বারা অতুল সত্ত্বগুণ সমুদ্ভূত শান্তি ও সন্তোষের ভাব বিরাজ্ঞ করে।

তিনি ব্রহ্মাণ্ডস্বরূপ বিরাটদেহধারিণী, এবং সেই দেহে এই দৃশ্যমান চন্দ্র, সূর্য্য এবং অগ্নিই তাঁহার নেত্রস্বরূপে গণ্য, তাই তাঁহার তিন প্রকার জ্যোতির্যুক্ত তিনটী নয়ন। একটী নয়ন চন্দ্রের ন্যায় শীতল কিরণ বিকীর্ণ করিতেছে, আর একটী নয়ন সূর্য্যের ন্যায় তীক্ষ্ণ জ্যোতিঃ ছড়াইতেছে। আর একটী নয়ন অগ্নির ন্যায় পাণ্ডুর তীক্ষ্ণ জ্যোতিঃ প্রকাশ করিতেছে।

কালী পূর্ণমাত্রায় বিবেকিনী, তাঁহার ভ্রান্তি জ্ঞানের লেশও নাই, তাই ভ্রান্তি জ্ঞান বিজৃম্ভিত কেশ বিন্যাস লালসা বিহীনা, সুতরাং তাঁহার কেশে বিন্যাসাদি কিছুই নাই, তিনি মুক্তকেশী।

ইহাও এক কথা বটে যে, ভক্ত উপাসকের নিকট পাদপদ্মযুগল ধ্যান করিতে পারিলেই ভক্তগণ কৃতার্থ হইতে পারেন, যোগী ঋষিগণ তাহারই ধ্যানারাধনা করিয়া থাকেন। কালীর আপাদতলবিলম্বিত কেশপাশ এই উপদেশ প্রদান করিতেছে। কেশকলাপ মস্তক হইতে পদ-তলে আসিয়া যেন দেখাইতেছে যে, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ অপেক্ষা পদযুগলের মূল্য অধিকতর, তাই তিনি মুক্তকেশী।

মুণ্ডমালা দ্বারা এই ভাব প্রকাশ পায় যে, সমস্ত ভাষার মূল কারণ বা মস্তক স্বরূপ অকারাদি পঞ্চাশৎ বর্ণ (মাতৃকা বর্ণ) তাঁহার এক একটী মন্ত্র বা নাম স্বরূপ। মন্ত্র বা নাম তাঁহার নিতান্ত প্রিয় সামগ্রী, তাই তিনি সেই পঞ্চাশৎ-বর্ণাত্মক পঞ্চাশৎ মুণ্ডের মালা কণ্ঠে ধারণ করিয়া এই ভাবটী প্রকাশ করিতেছেন যে, কত শত ব্রহ্মা অতীত হইয়া যান, কিন্তু জগৎ-প্রসূতি মহামায়া তাহার সাক্ষী স্বরূপ অবস্থিতি করিতেছেন।

কালী শ্মশানে বাস করিয়া ইহাই দেখাইতেছেন যে, অনন্ত জগৎপ্রসূতি সেই পরমেশ্বরই কেবল একমাত্র আমাদের অন্তের বন্ধু, এবং তিনি সর্ব্বান্তে অবস্থিতি করেন, আর শ্মশানই সমস্ত বিকাররহিত স্থান, পরমেশ্বর ভ্রান্তি বিজৃম্ভিত অট্টালিকা ভোগাদি-লালসা পরিশূন্য, তাই তিনি শ্মশানে বিচরণ করেন।




কত কাছে

দয়াময়! প্রেমময়! জীবনবল্লভ!
হৃদয়ের কত কাছে করিছ বিরাজ
নীরবে গোপনে তুমি! সপুলকে আজ
করিতেছি মর্ম্মে-মর্ম্মে যেন অনুভব!
তপনের খর রশ্মি, চাঁদের জোছনা,
তারকার ক্ষীণ প্রভা, মলয় মাধুরী,
কুসুমের চারু হাসি, কাকলি-চাতুরী,
কত কাছে আছ তুমি করিছে সূচনা।

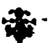
শান্তির আলয় তুমি তব এ ধরণী
কত শান্তি, কত তৃপ্তি করিছে প্রদান!
স্নেহ-প্রেম-দয়া প্রীতি দিবস-রজনী
তুমি আছ কত কাছে দিতেছে সন্ধান!
জন্ম-জন্মান্তর যদি কর্ম্মে অনুসরি
সঙ্গে সঙ্গে রহ তুমি কত কাছে হরি!!

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

৺উমেশ চন্দ্র দত্ত মহাশয়ের আত্মজীবনী।

ঠাকুর মাতা।

ঠাকুরমাতা স্বর্গীয়া শশিমুখী ২৪ পরগণার কাটাবেণে গ্রামে বসুবংশে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার মাতা করঞ্জলীর প্রসিদ্ধ ঘোষবংশের কন্যা। এই কাটাবেণে গ্রামে আমার পূর্ব্বপুরুষেরা বাস করিতেন। পিতামহ ষষ্ঠীচরণ দত্ত শৈশবে পিতৃহীন হইয়া তাঁহার কুটুম্ব মজিলপুরের দত্ত জমীদারদিগের সরকারে আজীবন কর্ম্ম করেন। তিনি উক্ত শশিমুখীকে বিবাহ করিয়া আত্মীয় বসুপরিবারের বাটীর এক অংশে বাস করেন। ইহাঁদিগের কয়েকটী পুত্র কন্যা হয়, তন্মধ্যে আমার পিতা ৺হরমোহন দত্ত ব্যতীত আর সকলে বাল্যকালেই পরলোক গমন করেন। পিতামহ বিশ্বাসী, কর্ম্মনিষ্ঠ ও ধর্ম্মভীরু ছিলেন। জমীদারদিগের পরিবার আবাদে কাজ করিতে করিতে একদিন ডাকাইতদিগের কর্ত্তৃক আক্রান্ত হন। তিনি তথাপি তহবিলাদি পরিত্যাগ না করিয়া সাহসের সহিত তাহা রক্ষা করেন। এজন্য ডাকাইতদিগের কর্ত্তৃক প্রহারিত ও বিশেষ নিগৃহীত হন। পিতামহী অনেক শোকতাপে পাগলের মত হইয়াছিলেন, আবার স্বামীর এই দুর্ঘটনায় উন্মত্তপ্রায় হন। জমীদারেরা তাঁহাকে সান্ত্বনা করেন ও পরিবারের খোর পোষের জন্য কয়েক বিঘা জমী দান করেন। পিতামহী সর্ব্বদাই বলিতেন "ও রে আমার অর্থ বলে বোধ ছিল না"। স্বামীর উপার্জ্জিত অর্থ তিনি সকলই ব্যয় করিয়া ফেলিতেন, কল্য কি খাইবেন তাহার সংস্থান রাখিতেন না।





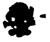


তাঁহার একমাত্র পুত্র আমার পিতাও বাল্যকালে পিতৃহীন হন। পাঠশালের শিক্ষালাভ করিয়া দত্ত জমীদারের সরকারে গোমস্তাগিরী কর্ম্ম লাভ করেন। পিতা অতি নম্র, ধীর, মিতাচারী, পরোপকারী ও ধর্ম্মনিষ্ঠ ছিলেন। তিনি প্রথম যে সংসার করেন, তাহা গত হয়। পরে আমার মাতা সর্ব্বমঙ্গলাকে বিবাহ করিয়া ঘরসংসার করেন। বন্ধুদিগের বাটীতে অবস্থিতিকালে সর্ব্বপ্রথমে আমার একটী ভগিনী হইয়াই মৃত হয়। পরে জ্যেষ্ঠ সহোদর অভয়াচরণ দত্ত জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি পিতামহীর বড় আদরের ধন হইলেন এবং তাঁহাকে "চণ্ডীর পুথী" বলিয়া কোলে করিয়া থাকিতেন। আমার জন্মের পূর্ব্বে পিতা আমাদিগের বর্ত্তমান ভদ্রাসন ক্রয় করিয়া তথায় গৃহ নির্ম্মাণ-পূর্ব্বক স্বাধীন ভাবে থাকিবার ব্যবস্থা করেন। মাতা লক্ষ্মীর অবতারবিশেষ ছিলেন এবং এই গৃহলক্ষ্মীর গুণে দিন দিন তাঁহার সংসারের শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল। ক্রমে আমি ও আমার কনিষ্ঠ সহোদর এবং কনিষ্ঠা দুই ভগিনীর জন্ম হইল। পিতা তিন পুত্রের জন্য বহু পরিশ্রম ও ক্লেশ স্বীকার করিয়া ক্রমে তিনখানি চক করিলেন। আবাদ সকল হইতে আমাদের বাটীতে বিস্তর ধান্য ও মৎস্যাদি আসিত, অতিথি অভ্যাগতেরও অভাব ছিল না। আমাদের জ্ঞাতি ও অধিকাংশ আত্মীয় কুটুম্বের বাস গঙ্গাহীন মুড়াগাছা অঞ্চলে। তাঁহারা গঙ্গাস্নানে, দোল-দুর্গোৎসবে ও অন্যান্য পালপার্ব্বণে আসিয়া আমাদের বাটীতে বাস করিতেন। তদ্ভিন্ন ঐ অঞ্চলের যাহার মারাত্মক পীড়া হইত, তাহাকে গঙ্গাতীরস্থ করিবার জন্য আমাদের বাটীতেই আনা হইত। আমার মাতা প্রাণপণে ইহাদিগের সেবা শুশ্রূষাদি করিতেন। পিতামহী পাগলস্বভাব থাকায় কখনও ভাল মনে আছেন, সকলকে আদর যত্ন করিতেছেন, কখনও মেজাজ খারাপ হইলে কেবল বকুনি ও লোকের উপর ঝাল ঝাড়া। তিনি মাতার শমনদণ্ড হইয়াছিলেন এবং প্রতিদিন তাঁহা দ্বারা মাতা অগ্নি-পরীক্ষায় পরীক্ষিত হইতেন।

(ক্রমশঃ)

পাচন ও মুষ্টিযোগ।

১। বলা মূলের ছাল চূর্ণ করিয়া দুগ্ধ ও চিনির সহিত সংযুক্ত করিয়া পান করিলে মূত্রাতিসার বিনষ্ট হয়। মহাবলা চূর্ণ করিয়া দুগ্ধ ও চিনির সহিত পান করিলে মূত্রকৃচ্ছ্রের শান্তি এবং বিপথগামী বায়ু স্বপথগামী হয়। অতিবলা চূর্ণ করিয়া দুগ্ধ ও চিনির সহিত পান করিলে প্রমেহ আরোগ্য হয়।




২। ধুতুরা পাতার রসের সহিত অথবা পানের রসের সহিত পারদ মিশ্রিত করতঃ লেপন করিলে থুকা (উকুন) বিনষ্ট হয়।

৩। দাড়িম-পুষ্পের রস, আমের আঁঠীর রস কিম্বা দুর্ব্বার রস কিম্বা পলাণ্ডুর (পেঁয়াজের) রসের নস্য লইলে নাসিকা হইতে রক্তস্রাব নিবারিত হয়।

৪। কণ্টকারীর কাথ প্রস্তুত করতঃ পিপুলচূর্ণ সহযোগে পান করিলে সর্ব্ব প্রকার কফ বিনষ্ট হয়। মধু সহযোগে পান করিবে।

৫। অশ্বত্থ বৃক্ষের ছাল শুষ্ক করতঃ অগ্নিতে পোড়াইবে, পরে উহা জলে নিক্ষেপ করিয়া সেই জল পান করিলে অতি দুঃসাধ্য বমি রোগ নিবারিত হয়।

৬। ত্রিফলা, দারুহরিদ্রা, রাখালকাশা, ও মুস্তফা ইহাদের কাথ করতঃ তাহাতে হরিদ্রাচূর্ণ ও মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে সর্ব্ব প্রকার প্রমেহ নষ্ট হয়

৭। করবীর মূল জল সহযোগে পেষণ করতঃ প্রলেপ দিলে অসাধ্য উপদংশও আরোগ্য হয়।

৮। সহদেবীর (গণ্ডোৎপলের) মূল মস্তকে (ধারণ) বন্ধন করিলে জ্বর নষ্ট হয়।

৯। সজিনার বঙ্কল ও পত্র বেদনা প্রশমনের পক্ষে শ্রেষ্ঠ। সজিনার বীজের নস্য লইলে শিরোরোগ নষ্ট হয়।

১০। নারিকেল পাতলা করিয়া কাটিয়া তাহাকে খণ্ড খণ্ড করিবে, পরে গোদুগ্ধ, চিনি ও গব্য ঘৃত সহ একত্র মিলিত করিয়া মৃদু অগ্নির উত্তাপে পাক করিবে। ইহাকে নারিকেল-ক্ষীর বলে। ইহা স্নিগ্ধ, শীতল, অতিশয় পুষ্টিকারক, গুরু, মধুর-রস, শুক্রবর্দ্ধক, এবং রক্তপিত্ত ও বায়ুনাশক।

১১। ভাজা-সিদ্ধি-চূর্ণ মধুর সহিত রাত্রিতে ভক্ষণ করিলে অনিদ্রা, অতিসার, গ্রহণী, ও অগ্নিমান্দ্য রোগ নষ্ট হয়।

১২। পিপলীচূর্ণ মধুর সহিত সেবন করিলে শ্বাস, কাস, জ্বর, প্লীহা, ও হিক্কা নষ্ট হয়। ইহা বালকদিগের পক্ষেও প্রশস্ত।

১৩। রসোন বাটিয়া তিলতৈল ও সৈন্ধব সহযোগে প্রাতে সেবন করিলে বিষম জ্বর এবং নানা প্রকার বাত রোগ নষ্ট হয়।

১৪। শুঁঠ, কৃষ্ণজীরা, এবং গুড় সমভাগে পেষণ করতঃ উষ্ণ জলে, পুরাতন মদ্য বা তক্রের সহিত পান করিলে তীব্রতর শীত-জ্বর বিনষ্ট হয়।

১৫। গুলঞ্চচূর্ণ বস্ত্র দ্বারা ছাঁকিয়া উহার ষোল ভাগ, গুড় ষোল ভাগ, মধু ষোল ভাগ এবং ঘৃত ষোল ভাগ সমস্ত একত্র মিশ্রিত করতঃ অগ্নির বলাবল বিবেচনা করিয়া যথা মাত্রায় সেবন করিবে। ইহাতে মেধাবুদ্ধি ও ত্রিদোষ নষ্ট হয়, কখনও ব্যাধি, বার্দ্ধক্য, বিষম-জ্বর, মেহ, বাতরক্ত, নেত্ররোগ উপস্থিত হয় না, এবং দীর্ঘ জীবন লাভ হয়।

১৬। রবিবারে অপাঙ্গের মূল সাত






গাছি লাল রঙ্গের সূত্রের দ্বারা কটিদেশে বন্ধন করিলে তৃতীয়ক জ্বর নষ্ট হয়।

১৭। সৈন্ধব অতি সূক্ষ্ম করিয়া জলের সহিত নস্য লইলে নিশ্চয়ই হিক্কা নষ্ট হয়। শুঁঠ চূর্ণ চিনির সহিত মিলিত করিয়া নস্য লইলে অথবা হিঙ্গুর ধূপ দিলেও হিক্কা নষ্ট হয়। বাসক পাতার রস মধুর সহিত সেবন করিলে হিক্কা নিবারিত হয়।

১৮। কৃষ্ণতিলের ১ ভাগ, চিনি ৪ ভাগ, ছাগদুগ্ধের সহিত সেবন করিলে সত্বই রক্তাতিসার নিবারিত হয়।

গিরিধি ব্রাহ্মিকা-সমাজে প্রদত্ত উপদেশ।

রাজর্ষি দায়ুদের গীতের কোন স্থানে "ক্রন্দন" মাংস বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। এটি বড় ভাবিবার কথা। মাংস যেমন শরীরের পুষ্টিসাধন করে, চিন্তা করিলে দেখিতে পাই প্রকৃতভাবে সরল প্রাণের ক্রন্দনও আত্মার পক্ষে তেমনি পুষ্টিকর। কাঁদিতে পারিলে তো হয়।

যত সেই পরম প্রভুর চরণতলে কাঁদিতে পারিব, তত আত্মার তেজ ও শক্তি বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। যে কেহ প্রকৃতরূপে কাঁদিতে শিখিয়াছে, তাহার আর ভাবনা কিসের? পৃথিবীর লোকমাত্রেই কাঁদে। ধনী ধনক্ষয়ে চক্ষুর জল ফেলিয়া আকুল হয়েন। স্বার্থপর মানুষ আমরা, স্বার্থের মূলে, বাসনার মূলে আঘাত পড়িলে আমরা কাঁদিয়া থাকি। আত্মীয় স্বজনের বিচ্ছেদে প্রাণ আশাশূন্য ও শোকে মুহ্যমান হয়। হৃদয়ের ধন সন্তান হারাইয়া কত শত জননী দিনরাত হাহাকার করিতেছেন। বৈধব্যের যাতনায় কত নারী চির-অশ্রুতে বুক ভাসাইতেছেন। মৃত্যু-জনিত শোকের ক্রন্দনে প্রাণ অস্থির হয় নাই বা বুক ভাসে নাই এমন তো কেহ জগতে নাই। কিন্তু রাজর্ষি দায়ুদ সে পার্থিব ক্রন্দনের কথা বলেন নাই। তাঁহার অটল ভক্তি ও গভীর ভাবপূর্ণ গীতের "ক্রন্দন" পার্থিব মায়ামমতা-জনিত ক্রন্দন নয়।

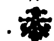
"স্বীয় কৃত অপরাধে বঞ্চিত তব প্রসাদে,
গভীর বিষাদে তাই জীবন হারাই।"

এই অবস্থার পরে প্রাণের ব্যাকুল ক্রন্দন। মানুষ নিজেকে অসহায় অনাথ জেনে, পাপ যন্ত্রণায় অন্ধকার দেখে। যখন পতিত-পাবন প্রভুর উদ্দেশে কেঁদে আকুল হয়, তখনই মানবের চক্ষুর জল ফেলা স্বার্থক হয়। দেখ দেখি, কে কি ভাবে দিন কাটিয়েছি। ব্যাকুল ক্রন্দন কাকে বলে তাকি ভেবেছি? ভেবে দেখ, অনুতাপের অগ্নিতে কি হৃদয়নিহিত গুপ্ত পাপ বাসনা-গুলিকে নিক্ষিপ্ত করিতে পেরেছি? প্রাণে ভক্তির অভাব, হৃদয়ের শুষ্ক ভাব, কর্ত্তব্যে ঔদাসীন্য দেখে



করে স্বীয় অযোগ্যতা অনুভব করে কি গোপনে চক্ষুর জল ফেলেছি? কলঙ্কিত জীবনের পাপভারে অবসন্ন শ্রান্ত পথিক আমরা, আমরা কি প্রকৃত কান্নার মর্ম্ম বুঝি? হায় তা যদি বুঝিব তো আজ মলিন হয়ে থাক্‌বো কেন? এই পরিবর্ত্তনশীল জগতে পুণ্যধামের যাত্রী যাহারা, তাহাদের ক্রন্দনই সম্বল। প্রাণ খুলে পিতার চরণে কাঁদিতে পারিলে আর তো ভয় থাকে না। অনুতাপের অশ্রুতে সেই চরণ ধোয়াইতে পারিলে আর আমাদের কিসের ভাবনা? পাপরোগে জর্জ্জরিত, সংসার-মরুতে তৃষিত, শোক ভয়ে অবসন্ন আমরা। এসো বোন, আমরা ভাল করে রাজর্ষির বাক্যের মর্ম্ম বুঝিতে চেষ্টা করি।

রাজর্ষি দায়ূদ প্রাচীন কালের এক মহাপ্রতাপশালী রাজা ছিলেন। জগতে যা কিছু মানবের বাঞ্ছনীয় ও কাম্য বস্তু, তাঁহার তো সে সকলের কিছুরই অভাব ছিল না। ধন, ঐশ্বর্য্যে তাঁহার ভাণ্ডার পূর্ণ ছিল, বিশ্বব্যাপী যশোমানে তাঁহার নাম উচ্চারিত হইত, কিন্তু পৃথিবীর রাজসিংহাসনে বসিয়া সুখসম্পদের ক্রোড়ে অবিস্থিত থাকিয়াও তাঁর মন তৃপ্তি মানিল না। তিনি ফকিরের মত বীণাযোগে গাহিলেন "ক্রন্দনই আমার সম্বল"। কোথায় তাঁহার অস্ত্র শস্ত্র, কোথায় তাঁর রণভেরী, কোথায় তাঁর সৈন্য সামন্ত? মহারথী, মহাবীর, দীনবেশে, সামান্য দুঃখী কাঙালের মত, দেবাদিদেব পরম প্রভুর চরণ উদ্দেশে চখের জলে বুক ভাসাইয়া বলিলেন "প্রভু ক্রন্দনই আমার সব।" দুর্দ্দমনীয় প্রবৃত্তিকুলকে বিনাশ করিতে হইলে পিতার নিকট কাঁদিতে হইবে। সকলেরই জানা আছে দুর্ব্বল শিশুর ক্রন্দনই সম্বল। কাঁদিয়া সে জননীর প্রাণকে আকৃষ্ট করে। আমরা দুর্ব্বল পাপরোগে ক্লিষ্ট সন্তান, তেমনি কেঁদে কেঁদে আমাদের স্বর্গীয় জননীর ক্রোড়ে স্থান পাব। শিশুর কান্নায় মার প্রাণ অস্থির হয়, তিনি ছুটে এসে কোলে তুলে সন্তানকে সুস্থির করেন। যা অভাবে চোখে জল, মাতা নিজে বুঝে তার প্রতিকার করেন। আমাদের পরম মাতা পার্থিব মাতা অপেক্ষাও যত্নে আমাদের কান্না শুনেন, বোঝেন। তাঁর চরণে কান্না মানবের একমাত্র মুক্তির সোপান। মানবের আধ্যাত্মিক চক্ষুর উন্মিলনে, প্রাণের ব্যাকুলতায়, স্বীয় কৃত পাপের যাতনায় যে চোখের জল পতিত হয়, যে ব্যাকুল নির্ভরের ভাব আসে, পরম জননী তাহা কখনই উপেক্ষা করেন না। প্রকৃত কথা, যে ব্যক্তি বিষাদপূর্ণ দুর্ব্বল হৃদয়ে ঈশ্বরের শরণাগত হয়, তিনি তাহাকে আনন্দ ও শান্তি প্রদান করেন। স্বীয় শক্তিতে উঠিব, স্বীয় চেষ্টায় সাধুতা লাভ করিব, এ সব অহঙ্কারের কথা। গোপনে আত্মপরীক্ষা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট বুঝিতে পারি কি দুর্ব্বল আমরা। প্রকৃতিগত দুর্ব্বলতায়, প্রবৃত্তিকুলের উত্তেজনায়, মানুষ কি না অন্যায় করিয়া



থাকে। কিন্তু এত অযোগ্যতা সত্বেও আমরা পরমদেবের বিশেষ করুণায় বুঝিতে পারি যে, আমারা নিজের রক্ষক নিজে নহি, আমাদের উদ্ধার নিজে হয় না। যেই এই ভাব প্রাণে উদিত হয়, অমনি অহঙ্কারী হৃদয় লজ্জায় নত হয়, জ্ঞানাভিমান দূরে পলায়। কি করে তখন বল পাই, কি উপায়ে মোহমায়ার বন্ধন ছেদন করি, পাপশৃঙ্খল মোচন করি, কিসে নবজীবন পাইব, হৃদয়ে কেবল এই চিন্তা আসিয়া আমাদিগকে অস্থির করিয়া তোলে, চক্ষুতে আপনা হতে জল আসে। কাঁদিয়া তখনি আমরা বলি "আমার কি হবে উপায় দয়াময়"। যত ঐ কথা ভাবিব, ততই এই পাপ সংগ্রামে প্রবৃত্ত আত্মা, পাপ ব্যাধি জর্জ্জরিত হৃদয় কাঁদিয়া আকুল হবে। অসহায় কাঙাল জ্ঞানে আমরা পিতার চরণ ধরিবার জন্য ব্যাকুল হব।

এসো সকলে মিলে বলি, ভক্তিভরে বলি "মা আমি ছাড়ব না তোমায়, ঐ চরণের ছায়ায় নিলাম শরণ, অধমতারণ আমায় তার দয়াময়"। বলি এস প্রভু কাঁদিবার শক্তি দাও আমাদিগকে, তোমার দ্বারে হত্যা দিতে শিখাও আমাদিগকে"। এ দেশের লোকের বিশ্বাস ঠাকুরের কাছে হত্যা দিলে মনোভিষ্ট সিদ্ধ হয়। আমাদের ঠাকুর যে সর্ব্বশক্তিমান্ মঙ্গলময় প্রভু পরমেশ্বর। এস কেঁদে তাঁর দ্বারে সবাই হত্যা দিয়ে পড়ি, তিনি সিদ্ধিদাতা, সন্তানের অভাব মোচন করিবেনই করিবেন। যে কান্নায় নবজীবন লাভ হয়, সেই অশ্রুতে পিতার চরণ ধৌত করিতে হবে। জগতের রাজাধিরাজ বলিলেন "প্রভু কান্নাই আমার অন্নপান," অতএব সকলে ভেবে দেখুন এ কান্না কি? রাজ-সিংহাসনে বসে পরমধার্ম্মিক রাজা, জগতে যাঁর কোন অভাব নাই, অতুল যশ, অতুল ঐশ্বর্য্য, তিনি কিনা সব ছেড়ে বীণাযন্ত্র যোগে গাহিলেন "প্রভু কান্নাই আমার সব"। তবে আমাদের এ বিষয় কত গভীর ভাবে ভাবা উচিত তাহা বলা বাহুল্য।

নূতন সংবাদ।

১। বঙ্গের লাট লর্ড কারমাইকেলের নিমিত্ত ৫০টী অশ্বের প্রয়োজন। সম্প্রতি ৩০টী ক্রয় করা হইবে, পরে আর ২০টী ক্রয় করা হইবে। ইহা ব্যতীত লাট সাহেবের নিমিত্ত ৯ খানি মোটর গাড়ীর ব্যবস্থা হইয়াছে।

২। সম্প্রতি ডিক্টোগ্রাফ নামে একটী নূতন যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই যন্ত্রটী এরূপ কৌশলে নির্ম্মিত যে, ইহা বাটীর যে কোন গুপ্ত স্থানে রাখিয়া, তাঁরযোগে ইহার সহিত সকল গৃহের সংযোগ করিয়া দিয়া কল টিপিলে গৃহের

ভিতরকার সকল কথাবার্ত্তা গ্রামোফোনের ন্যায় শুনিতে পাওয়া যায়।

৩। কলিকাতার প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত অনাথনাথ দেব কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে ৫০০০৲ হাজার টাকা প্রদান করিয়াছেন। ঐ টাকার সুদ হইতে প্রতি বৎসর দুইটী করিয়া স্বর্ণপদক বঙ্গ ভাষায় উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ রচনার জন্য প্রদত্ত হইবে। প্রবন্ধরচনায় প্রতিযোগিতা করিতে কেবল মহিলাদিগের অধিকার থাকিবে।

৪। বঙ্গের গভর্ণর লর্ড কারমাইকেল কলিকাতার সাহিত্য সভার অভিভাবক (Patron) পদ গ্রহণ করিতে সম্মত হইয়াছেন।

৫। মাননীয় শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয়কে এবর্ডিন বিশ্ব বিদ্যালয় ডি, এল উপাধি দানে সম্মানিত করিয়াছেন।

৬। গবর্ণমেণ্ট সুপ্রসিদ্ধ বিজ্ঞানাচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়কে সি, আই, ই উপাধি দান করিয়াছেন; এবং ডারহাম বিশ্ববিদ্যালয় ডাক্তার রায়কে ডি, এস্, সি উপাধি প্রদান করিয়াছেন।

৭। স্বর্গীয় কবিরাজ দ্বারকানাথ সেন মহামহোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রস্তরনির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তি বিডনস্কোয়ারে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার লরেন্স জেঙ্কিন্স এই প্রতিষ্ঠাকার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন।

৮। হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব ব্যারিষ্টার মিঃ টি পালিত মহাশয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে নগদ চারি লক্ষ ষাট হাজার টাকা ও তাঁহার পার্শি বাগানের বাড়ী প্রদান করিয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ এই বাড়ীতে এক বিজ্ঞান-কলেজের প্রতিষ্ঠা করিবেন। ইহার তত্ত্বাবধায়ক-পদে ভারতবাসীকে নিযুক্ত করিতে হইবে এই সর্ত্তে সম্পত্তি প্রদান করা হইয়াছে।

৯। এইরূপ শুনা যাইতেছে যে, জাপানেও চাউলের দাম দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে। জাপান হইতে রেঙ্গুনের চাউলের অভাব পরিলক্ষিত হইতেছে।

১০। বিলাতের ভোটপ্রার্থিনী ২১ জন রমণী জেলে আহার করিতে অস্বীকার করায় তাঁহাদিগকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে। ইহাঁদের মধ্যে একজন রমণী ওয়েষ্টমিনিষ্টারের সেণ্টষ্টিফেন হলের জানালা ভাঙ্গিয়াছেন বলিয়া ধৃত হইয়াছেন। ২৬এ জুন রাজা ও রাণী ন্যাসান্যাল কেথিড্রালে যাইতেছিলেন, সঙ্গে মিঃ ম্যাককেন্না ছিলেন, এমন সময় একজন রমণী চিৎকার করিতে করিতে তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত হন। তিনি রাজা ও রাণীকে রাজনৈতিক অধিকারপ্রার্থিনী রমণীদিগকে সাহায্য করিতে অনুরোধ করেন। ইনিও ধৃত হইয়াছেন। ভোটপ্রার্থনীগণ বিলাতে বিষম কাণ্ড আরম্ভ করিয়াছেন। ইহাঁরা কখনও প্রধান মন্ত্রীকে প্রহার করিতেছেন, কখনও

পার্লামেণ্টে সভা গৃহের দরজা জানালা ভাঙ্গিতেছেন, কখনও মন্ত্রিসভার সভ্যদিগকে যথেষ্ট গালাগালি দিতেছেন।

বামারচনা।

চতুর্থী। *

স্নেহময়ি মাগো হায়!
তোমার চতুর্থী আজ!
প্রকৃতি তনয়া আমি,
করিতেছি প্রেত-কাজ।

অন্তরের অভ্যন্তরে
বিষাদ কুহেলি ঘোর।
চোখে অশ্রু, মনে স্মৃতি,
অবসন্ন তনু মোর।

আশৈশব পিতৃহীনা,
তাই কত মোরে নিতি,
পিতা-মাতা একাধারে
করিতে মমতা প্রীতি।

করেছ যে স্নেহ-যত্ন,
হৃদয় করি বিদীর্ণ,—
বুকের রুধির দিয়ে,—
দেহখানি করি শীর্ণ!!

অপার্থিব সে স্নেহের
এই কি মা! বিনিময়?
সতৈজস-অন্নজল,
—ফল তিল সমুদায়!

হীনা আমি, অজ্ঞ আমি,
জানি না বুঝি না কিছু।
এ বস্তু দেহান্ত জীব
পায় কি না পায় পিছু?

জীবের মরণ নাই,
জীব ধ্রুব সত্য মূল।
বিয়োগান্তে মিশে পুনঃ,
সূক্ষ্মে সূক্ষ্ম, স্থূলে স্থূল।

তবে তো আছ মা! তুমি
অসীম অনন্ত রূপে।
শুধু এ বিয়োগ ব্যথা,
সসীমের মায়া-কূপে!

মাতৃহীন হ'য়ে মোরা
দুটি বোন, এক ভাই।
—করিতেছি হাহাকার
সাশ্রুনয়নে সদাই।

সাধের—স্নেহের তব—
'রবি "রাণী' প্রাণ-প্রিয়,
—দৌহিত্র দৌহিত্রী দুটি
কাঁদিছে অসহনীয়!

* এই কবিতাটি গত ১৩১৮ সালের ২৬শে ফাল্গুন তারিখে আমার পরমারাধ্যা স্বর্গীয়া স্নেহময়ী মাতাঠাকুরাণীর আদ্য চতুর্থী উপলক্ষে লিখিত হয়।

—ভাগ্যহীনা লেখিকা।

বা, বো, বিজ্ঞাপন।

সূচীপত্র।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 588. August, 1912.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৪৯ বর্ষ। ৫৮৮ সংখ্যা। | শ্রাবণ, ১৩১৯। | ১০ম কল্প। ১ম ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

লাট সাহেবের সিমলা যাত্রা—শুনা যাইতেছে, আগামী ১লা সেপ্টেম্বর বঙ্গের গবর্ণর লর্ড কারমাইকেল সিমলায় যাত্রা করিবেন, এবং ৮ই সেপ্টেম্বর তথা হইতে দার্জ্জিলিং যাত্রা করিবেন, এইরূপ স্থির হইয়াছে।

লর্ড কারমাইকেল বাহাদুরের কলিকাতার নানাস্থান পরিদর্শন—লর্ড কারমাইকেল ও লেডী কারমাইকেল দার্জ্জিলিং হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া কলিকাতার নানাস্থান পরিদর্শন করিতেছেন। মিউজিয়ম, ভিক্টোরিয়া স্মৃতিমন্দির, ফ্রিস্কুল, সিটি কলেজ, রিপন কলেজ, হিন্দু হোষ্টেল প্রভৃতি পরিদর্শন করিয়াছেন। লেডী কারমাইকেল হিরণ্ময়ী দেবী প্রতিষ্ঠিত মহিলা শিল্পাশ্রম পরিদর্শন করিতে গিয়াছিলেন। লর্ড ও লেডী কারমাইকেল মেডিকেল কলেজও পরিদর্শন করিয়াছেন। লেডী কারমাইকেল শিশু-রোগীদিগের সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়াছিলেন।

রমণীর পাণ্ডিত্য—চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত জগৎপুর আশ্রম হইতে নিম্নলিখিত রমণীগণ সংস্কৃত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। (১) ন্যায় দর্শনে শ্রীমতী সরলা সুন্দরী, সাংখ্য দর্শনে শ্রীমতী যোগেশ্বরী, ব্যাকরণে শ্রীমতী যোগপ্রভা দ্বিতীয় বিভাগে উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হইয়াছেন। সংস্কৃত উপাধি পরীক্ষায় রমণীদিগের পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাইয়া আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম। আশা করি, রমণীগণ মাতৃভাষায় দিন দিন অধিকতর পাণ্ডিত্য লাভ করিবেন।

দার্জ্জিলিং মহারাণী বালিকা বিদ্যালয়—দার্জ্জিলিংএ অবস্থিতিকালে লেডী কারমাইকেল তথাকার মহারাণী বালিকা বিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণ কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন।

দিল্লীতে ছোট আদালত—দিল্লীতে শীঘ্রই একটী ছোট আদালত প্রতিষ্ঠিত হইবে, এইরূপ শুনা যাইতেছে।

লর্ড ক্লাইবের প্রতিমূর্ত্তি—লর্ড ক্লাইবের প্রতিমূর্ত্তি কলিকাতায় আসিয়া পৌছিয়াছে। ভিক্টোরিয়া স্মৃতিমন্দিরে এই মূর্ত্তি রক্ষিত হইবে।

বাঙ্গালীর সম্মান—গত বৎসর যখন আমাদের সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জ ও সম্রাজ্ঞী মেরী কলিকাতায় আগমন করেন, সেই সময় তাঁহারা একদিন আলিপুর পশুশালা দর্শন করিতে যান। আলিপুর পশুশালার অধ্যক্ষ বাবু বিজয় কুমার বসু তাঁহাদিগকে বিশেষ যত্ন ও সম্মান সহকারে সকল স্থান পরিদর্শন করান, ইহাতে সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জ বিশেষ প্রীত হন। সম্প্রতি বাবু বিজয় কুমার বসু মহাশয় বিলাতে গমন করিয়াছেন। এইরূপ শুনা যাইতেছে যে, সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জ বসু মহাশয়কে যথোচিত সমাদর করিয়াছেন এবং তাঁহার সহিত একত্র হইয়া একখানি ফটোগ্রাম তুলিয়াছেন ও তাঁহাকে গলায় বাঁধিবার হীরকখচিত "স্কার্ফ পিন" উপহার দিয়াছেন। ঐ পিনে সম্রাট্ মহোদয়ের নামের আদ্যাক্ষর খোদিত আছে। সম্রাটের নিকট বসু মহাশয়ের এই অভূতপূর্ব্ব সম্মানলাভে বঙ্গবাসিমাত্রেই গৌরবান্বিত হইয়াছেন। বসু মহাশয় নির্ব্বিঘ্নে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, এই আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা।

পানিহাটী শ্রীরাধারমণ সেবাশ্রম—গত প্রথম রথের দিবস পানিহাটী গ্রামে শ্রীযুক্ত অর্দ্ধচন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত অমূল্যধন রায়, শ্রীযুক্ত মাণিকলাল দাস, শ্রীযুক্ত হরিপ্রসাদ মল্লিক প্রভৃতির প্রভূত চেষ্টায় উক্ত সেবাশ্রমের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। তত্রস্থ নারায়ণের সর্ব্ব বিষয়ের অভাব মোচনের চেষ্টা ও সেবা এই আশ্রমের উদ্দেশ্য। "সাধু যাঁহাদের ইচ্ছা ভগবান্ তাঁহাদের সহায়।" ইহাঁদের উদ্দেশ্য সফল হউক।

পুষ্পোৎসব—বিগত ২৬শে জুন রাজমাতা মহারাণী আলেকজান্দ্রীয়ার সম্মানার্থ লণ্ডনে এক মহা আনন্দোৎসব হইয়া গিয়াছে। সম্ভ্রান্ত মহিলাগণ শ্বেতবস্ত্র পরিধান করিয়া গোলাপফুল লইয়া পথে ও সর্ব্ব স্থানে বিচরণ করিয়াছেন। ৪৫০,০০০ টাকার ফুল বিক্রীত হইয়াছে। অনেকগুলি পুরস্কারও প্রদান করা হইয়াছে।

শিশু জীবন ও কিণ্ডার গার্টেন।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

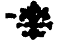
তবে জননীদিগের স্বাভাবিক জ্ঞান কি শিশুদিগের সম্পূর্ণ যত্ন ও শিক্ষার নিমিত্ত যথেষ্ট বোধ হয়? শিশুর ক্ষুদ্র শরীরটী যখন সম্পূর্ণরূপে অংগের উপর নির্ভর

করিয়া থাকে, তখন উহার মন কি আত্ম-নির্ভর ও আত্মপুষ্টি করিতে সক্ষম? প্রসিদ্ধ দার্শনিক জিয়ান পল বলিয়াছেন, জীবনের প্রথম তিন বৎসর শিশুর আত্মা অতি স্বচ্ছ ও নির্ম্মল থাকে, তাহার পর আত্মার দরজা অর্থাৎ বাক্‌শক্তি দ্বারা সে বাহ্য জগতের অনেক বিষয় নিজ মনে অঙ্কিত করে। সেই জন্য এই তিন বৎসরে উপযুক্ত শিক্ষা দিলে শিশুদিগের বাল্যকালের অনেক মন্দ স্বভাব ও দোষ সংশোধন করিবার আবশ্যক হয় না। শিশু এত দিন পর্য্যন্ত অতি বিশুদ্ধ, সরল ও বাক্যহীন অবস্থায় থাকে, সেই জন্য ঐ তিন বৎসরে তার পরজীবনের অনেক ভাব ও অভ্যাস স্থিরীকৃত হইয়া যায়। পিতা মাতা শিশু চারাটিকে ঢাকিয়া ছাউনীর নীচে রাখিতে পারেন বটে, কিন্তু বড় বিকাশ-প্রাপ্ত বৃক্ষকে ইচ্ছামত আচ্ছাদন করিয়া রাখা সুকঠিন। সেই কারণে প্রথম শিশুকালের ভ্রমগুলি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ক্ষতিকর হয়। মানসিক পীড়া শারীরিক ব্যাধির ন্যায় যত অল্প বয়সে জন্মে, ততই তাহা অধিক বিপজ্জনক হইয়া উঠে। বিশেষতঃ, শিশু যত বড় হইতে থাকে, ততই তাহার স্বভাব-সংশোধন অধিকতর আয়াসসাধ্য হইয়া পড়ে। আর সমস্ত জীবন শিক্ষার কাল ধরিলে ইহা আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি যে, পরিণত বয়সে সমস্ত জগৎ ঘুরিয়া এক জন লোক যে জ্ঞান লাভ করে, শিশু অবস্থায় ঝিয়ের কোলে বেড়াইয়া সে তাহা অপেক্ষা অধিক শিক্ষা ও জ্ঞান লাভ করিতে পারে।

প্রথম কয়েক বৎসর শিশুর প্রতি অপরিসীম যত্ন করা অত্যন্ত আবশ্যক, কেননা, ঐ সময় অতি অল্প বুদ্ধিকেও বুদ্ধি ও বিবেচনা পূর্ব্বক খাটাইলে অনেক লাভ হয়। কিন্তু ঐ সময় অবহেলা করিয়া বালকের পরজীবনে হাজার যত্ন করিলেও তাহার দশাংশের একাংশও উপকার পাওয়া যায় না। কারণ, তখন অনেক বৎসরের মন্দ অভ্যাস ও অশিক্ষিত অবস্থা মনকে এরূপ দৃঢ় করে যে, উহা শীঘ্র ও সহজে সকল বিষয় ধরিতে পারে না। প্রথম, নীতি বিষয়ে ভাবিয়া দেখ। পূর্ণ বয়সে মহৎ ধর্ম্মের ও সচ্চরিত্রের কত উদাহরণ আমাদের সম্মুখ দিয়া চলিয়া যায়, কিন্তু একটা চলন্ত ধূমকেতু যেমন পৃথিবীর কিছুই করিতে পারে না, সেইরূপ ঐ সকল মহৎ দৃষ্টান্তও প্রাপ্তবয়স্কদিগের জীবনে কোন কার্য্য করিতে সক্ষম হয় না। বাল্যকালের স্নেহ, দয়া, আদর, শাসন বা অবিচার, যে কোন বিষয় শিশুর মনে প্রথম অঙ্কিত হয়, তাহা তাহার সমস্ত ভবিষ্যৎ জীবনকে চালাইয়া থাকে। খ্রীষ্টধর্ম্ম-মতে আদমের প্রথম পাপ যেমন সমস্ত পৃথিবীকে পাপময় করিয়াছে, সেইরূপ শিশুকালের ভালমন্দ শিক্ষা মানুষের ভাগ্য স্থির করে। মানুষের মধ্য হইতে স্বর্গীয় পদার্থ শিশুর জন্ম। যে অন্তরাত্মা মানুষকে সকল বিষয়ে দায়ী করে, তাহাতে স্বর্গীয় আত্মা বাস করে, আর যে জীবাত্মা

নিজের পরীক্ষার সময় কেবল পাপ কর্ম্ম দেখিতে পায়, তার দুর্গতির ও যন্ত্রণার শেষ নাই। এ পর্য্যন্ত মানুষের ঐ সংশয়-কাল ও উহার ফলের প্রতি কেহই মনোযোগী হয় নাই। কিন্তু এমন কতক-গুলি লোক আছেন, যাঁহারা কোন কোন সময়ে জীবনের জ্ঞান ও দায়িত্ব স্মরণ করিয়া তাহাতে বিশ্বপাতার মহিমা দেখিয়া বিস্মিত হন। মানুষের প্রাণ, বিশেষতঃ, নৈতিক জীবন, প্রথমে উড়ে, তার পর চলে, অবশেষে বিশ্রাম করে। প্রত্যেক গতিশীল বৎসরের সঙ্গে মানব-স্বভাব অধিকতর কঠিন হইয়া আসে। সেই জন্য একজন শিক্ষক কোন দুষ্ট যুবক অপেক্ষা দুষ্ট বালককে বেশী শীঘ্র শুধ্‌রাইতে পারেন। প্রথম দৃষ্ট দ্রব্যের বা শ্রুত কথার ধারণা বালকের মনে অনেক দিন থাকে, প্রথম-দৃষ্ট উজ্জ্বল বর্ণ, প্রথম-শ্রুত বাদ্য, প্রথম ফুলের রং বা প্রথম কঠোর স্বর শিশুর ভবিষ্যৎ জীবনের সকল কাজে প্রতিফলিত হয়। সেই কারণে কোমল বয়সে শিশুকে ঐ সকল কঠোর স্বর বা অতিরিক্ত বর্ণের ধারণা হইতে দূরে রাখা কর্ত্তব্য। নতুবা উহার কোমল, অস্ফুট ও চঞ্চল স্বভাব কোনরূপ মিথ্যা জ্ঞান বা মন্দ ধারণার দ্বারা নষ্ট ও বিকৃত হইয়া যাইবার সম্ভাবনা।

প্রকৃত শিক্ষার ফল কখন একেবারে সংগ্রহ করা যায় না। আমরা যতই শিশুদের শিক্ষা দিই, ততই অনেক বিষয় অবশিষ্ট থাকে দেখিয়া আশ্চর্য্য হই। কিন্তু অনেক বৎসরের পর আমাদের পরিশ্রমের ফল দেখা যায়। যেমন বীজ পুতিলে প্রথমে তাহার খোলা ভাঙ্গিয়া অঙ্কুর গজায়, তাহার পর চারা মাথা তুলিয়া ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে, অবশেষে যথা-সময়ে ফল ধরে। যদি এই সকল বাক্যে কাহারও সন্দেহ হয়, তাহা হইলে তিনি সতর্ক ভাবে কিছু দিন বালকবালিকা-দিগের স্বভাব পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিবেন। পাঠকপাঠিকাগণ, আপনারা প্রথমে নিজের হৃদয় পরীক্ষা করিয়া দেখুন, পরে দেখিতে পাইবেন, আপনাদের সন্তানদের যত দোষ গুণ তাহার অধি-কাংশই আপনাদের নিজ নিজ চরিত্রের প্রতিবিম্বমাত্র। দেখিবেন, আপনাদের পুত্রের একগুঁয়ে স্বভাব আপনাদের অতিরিক্ত শাসন দ্বারা ঘটিয়া থাকে, তার অবাধ্যতা আপনাদের অস্থির মতের স্বাভাবিক ফল, আপনাদের নিজের স্বার্থ-পরতা দেখিয়া সে স্বার্থপর হইতে শিখে, আর তার গুরুজনের প্রতি অবজ্ঞা ও অশ্রদ্ধা সে আপনাদের মুখ হইতে শুনিয়া শিখিয়াছে, না হইলে ঐ সরল, নির্ম্মল শিশুর মন কি প্রকারে ঐরূপ দুষ্ট ও কর্কশ হইবে। নিশ্চয় জানিবেন, নূতন চক্‌-চকে কাঁসার বা পিতলের বাসনে তৈল না লাগিলে কখন কলঙ্ক ধরে না। আপনারা ইহাও নিশ্চয় জানিবেন যে, বালক বালিকার পর জীবনের দুর্ব্বলতা ও ভীরুতা শিশু-কালের মিথ্যা ভয় ও অন্যায় শাসন হইতেই জন্মিয়া থাকে। আপনারা আপাত-শান্তির



আশায় যে সব নানাপ্রকার বীভৎস আকার ও ভয়ঙ্কর শব্দের দ্বারা শিশুদের রোদন থামাইবার চেষ্টা করেন, তাহা ঐ কোমল মনে প্রবেশ করিয়া চিরজীবনের মত উহাকে আচ্ছন্ন করিয়া থাকে। সদ্যোজাত শিশুর আত্মার অজ্ঞতা, কর্ত্তব্য কর্ম্মে অবহেলা ও সকল বিষয়ে অদৃষ্টের উপর নির্ভর করা হইতে নিরন্তর শিশুশিক্ষা সম্বন্ধে যে কত অসংখ্য ভ্রম ও অপকার ঘটিয়া থাকে, তাহা বর্ণনাতীত।

এখন ঐ বিষয়ে প্রকৃত উন্নতির উপায় সকল পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা যাউক। শিশুদিগের হিতৈষী বন্ধু অনেক মহাত্মা শিশুশিক্ষা সম্বন্ধে অনেক চিন্তা করিয়া তাহাদের উন্নতিসাধনের উপযুক্ত পুস্তক সকল লিখিয়াছেন, ও অনেক উপদেশ দিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে বিখ্যাত জর্ম্মণ পণ্ডিত ফ্রোবেল ও পেষ্টেলজি শিশুস্বভাবের গভীর তত্ত্বের ভিতর প্রবেশ করিতে পারিয়াছেন। দার্শনিক জিয়ান পল দৈববাণী স্বরূপ বলিয়াছেন,—"কিরূপে শিশুচরিত্র গঠন করা যাইতে পারে ও কিরূপ আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া উহা প্রস্তুত করা যাইতে পারে, এ বিষয়ে সকলে নিঃসন্দেহে আমাকে জিজ্ঞাসা করিবেন। কিন্তু এ সম্বন্ধে হাজার বই লিখিলে বা পড়িলে তাহা কোন কাজে আসিবে না, কারণ ঐ সকল পুস্তকের এমন সকল অসামান্য গুণ ও উপায় থাকা উচিত যাহা দ্বারা অফুটন্ত শিশুস্বভাবের সকল দিক প্রকৃতরূপে বুঝাইয়া দিবে। শিশুতে আমারাত পূর্ণবয়স্ক মানুষ দেখি না, কেবল উহার চারা মাত্র দেখি। সেইজন্য যাঁহারা পদার্থতত্ত্ববিৎ নহেন, তাঁহাদের নিকট আণ্ডার মধ্যে প্রজাপতির রং আবিষ্কার করা যেমন কঠিন, সাধারণ লোকের পক্ষে শিশুর স্বভাব উত্তমরূপে বুঝাও তেমনি দুষ্কর"।

জর্ম্মণ দার্শনিক ফ্রেডরিক ফ্রোবেল শিশুদিগের ঐ গুপ্ত স্বভাবের প্রথম আবিষ্কারক। পিতা মাতা ও শিক্ষকের নিকট যে স্বভাব সমস্যার স্বরূপ ছিল, ফ্রোবেল সর্ব্বপ্রথমে তাহার দ্বার উন্মুক্ত করেন। প্রাচীন কালের গণকেরা যেমন পাখীর গানের দ্বারা ভাল মন্দ ঘটনার নির্ণয় করিত, সেইরূপ ফ্রোবেল নূতন শিশুর ফুটন্ত স্বভাবে তাহার শক্তি ও বুদ্ধির পরিমাণ জানিয়া ঐ প্রশস্ত ও বিশুদ্ধ অবস্থাতেই উহা ভালরূপে বুঝিয়া তাহার পুষ্টিসাধনের উপায় দেখিতে পান। বালকবালিকাদিগের ঐ প্রথম মহাশিক্ষক ফ্রোবেল শিশুদিগকে উন্নত ও মার্জ্জিত শিক্ষা দিয়া বর্ত্তমান কালের উপযুক্ত করিবার প্রণালী স্থির করেন। তিনি তাঁহার "কিণ্ডার গার্টেন" নামক শিক্ষাপদ্ধতির দ্বারা নিজের নাম ইউরোপের সর্ব্বত্র ও আমেরিকায় পর্য্যন্ত সুপরিচিত করিয়াছেন। শিশুকলিগুলি, বাগানের যত্নপ্রাপ্ত সুপুষ্ট ফুলের ন্যায়, ঐ নূতন শিক্ষার প্রভাবে নানা গুণ ও জ্ঞানে পূর্ণ হইয়া সমুন্নত মনুষ্য-পুষ্পে বিকশিত হয় ও নিজেদের আনন্দ ও উজ্জ্বলতার দ্বারা দর্শকদিগের মনোরঞ্জন করে। ঐ



কিণ্ডার গার্টেন শিক্ষা প্রণালী যে কত উপকারী এবং শিশুদিগের মনের ও শরীরের কত পুষ্টি সাধন করে, তাহা আমরা ক্রমে দেখাইবার চেষ্টা করিব। (ক্রমশঃ)

শ্রীমতী কৃষ্ণভাবিনী দাসী।

আদি ও অন্ত।

সৃষ্টির সকল বস্তুরই উৎপত্তি ও লয় দেখিতে পাওয়া যায়। চিরস্থায়ী অবিনাশী কোন বস্তু বা প্রাণী এ পর্য্যন্ত মানবদৃষ্টিতে পতিত হয় নাই। এই উৎপত্তি ও নাশের কত রূপ আছে, কিন্তু সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানবজাতির জন্ম ও মৃত্যু এ জগতের প্রধান অভিনয়, ইহাতেই সকল জ্ঞান বিজ্ঞান নিহিত রহিয়াছে। সকল শিক্ষা ও সাধনা মনুষ্যজীবনের এই দুই পথ দিয়া লাভ করা যায়। ভাবিয়া দেখিলে জন্ম অপেক্ষা মৃত্যুই সুগম জ্ঞান হয়। অদ্য জনৈক কবির মতে মৃত্যুর রূপ বর্ণনা করিব।

এই বিশাল বিশ্বের অধীনতা রক্ষা করিবার নিমিত্ত জগদীশ্বর "মৃত্যু" নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। ইহাতে কালের বৃথা অভিমান স্থিরীকৃত হইয়াছে। উহাতে সারাংশ কিছুই নাই। কেবল "নাশ" মাত্র। বাস্তব বর্ণনায় ইহা স্বভাব ব্যতীত একটি নাম মাত্র।

মৃত্যুকে কেবল চিত্রে দেখা যায়, গল্পে শুনা যায় ও ইহা হৃদয়ে এক প্রকার আশঙ্কা জন্মায়। আর ইহার অনুভূতি তীক্ষ্ণ কণ্টকের ন্যায় চিত্তে বিদ্ধ হয়। দুষ্টাত্মাগণের নিকট ইহা অতি ভীষণরূপী ও নির্ব্বোধদিগের নিকট ভীতিপ্রদর্শক। ইহা জ্ঞানীর পক্ষে শান্তির পথ ও পুণ্যাত্মার জীবনের মুক্তির দ্বারস্বরূপ। এই মৃত্যু ব্যথার উপশম, দুঃখের অবসান, বন্দীর স্বাধীনতা ও বিশ্বাসীর আনন্দ। মৃত্যু পাপীদিগের ক্ষত স্বরূপ ও অধার্ম্মিকদিগের শঙ্কা ও শাস্তি। ইহা ঘাতকের কর স্বরূপ। ইহা ধনীর পক্ষে বিলাপসঙ্গীত, শোকার্ত্তের সুখসোপান। মৃত্যুর কাল অনির্দ্ধারিত ও গতি অনিবার্য্য। মৃত্যু তাপিত ও ক্লান্ত জীবনের প্রিয় অভীপ্সিত বন্ধু। ইহা অসাধ্য রোগে সুচিকিৎসকের কার্য্য করে। ইহা স্বর্গের দুন্দুভি, ও মর্ত্তের ভাণ্ডারী। ব্যাধির পশ্চাদ্গামী ও নরকের পূর্ব্ব সমাচারদাতা।

ইহার ভাবনায় কোন প্রকার সুখ নাই, ইহা সর্ব্বত্র অজেয়। ইহা পাপীর হৃদয়ের শল্য, দুর্ব্বলের আতঙ্ক, ধার্ম্মিকের মুকুট ও প্রীতিলাভের সোপান এবং প্রেতের পক্ষে চাতুরী স্বরূপ।

আমরা মৃত্যুর করাল গ্রাস হইতে কোন মতেই উদ্ধার পাইতে পারি না। কেহ বা আনন্দের সহিত মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতেছেন, কেহ বা শত যাতনায় পীড়িত



হইয়া অপরাধীর বধ্যভূমি-গমনের ন্যায় ইহার দিকে যাইতেছে।

যখন মৃত্যু আসিয়া এই সংসারের প্রেমবন্ধন ছিন্ন ক'রয়া দেয়, তখন মনুষ্যের শোক-তমসায় সম্পূর্ণরূপে বিবেক দৃষ্টি লোপ পাইয়া যায়। সমগ্র জীবনের সংসার-সুখ ও আরামের বিঘ্নসাধকের প্রতি কি যে বীতরাগ আ সয়া পরিবেষ্টন করে, তাহার বিচার তৎকালে অসাধ্য। কিন্তু প্রবল প্রতাপের প্রভাবে এ নশ্বর সুখের অতৃপ্তি ও বৈরাগ্য আপনা আপনি প্রাণে আসিয়া পড়ে। মৃত্যুর ন্যায় সন্ন্যাসী আর নাই। ইহা বিলাস, বাসনা, কামনা, সকলেরই বিলোপ সাধনে তৎপর। মৃত্যু যোগী, মৃত্যু তপস্বী, সেইজন্য ইহা সংহার-মূর্ত্তি শিবের অনুচর। মৃত্যুকে না চিনিলে এই পৃথিবীর ভঙ্গপ্রবণ চাক্‌চিক্যময় বস্তু হইতে কি চিত্তের কখন বিকার জন্মিত? এই ধারাপ্রবাহিনী তটিনীর মৃদুহিল্লোল, কমনীয় কমলদামের সুসৌরভ, প্রেমের সঙ্গীত, মুরলীর মধুর বাদন, মৃত্যুর দর্পণে সকলই অসার, কিছুরই মুগ্ধকরী শক্তি তথায় বলীয়সী নহে। মৃত্যু নিত্য আসিয়া জগতের গুরুস্বরূপ দণ্ডায়মান হইয়া মানবকে পর পারের বার্ত্তা দিতেছে ও পাথেয় সংগ্রহ করিয়া প্রস্তুত হইবার আদেশ করিতেছে। আমরা সকলেই সেই পথের যাত্রী, কেবল অগ্র পশ্চাতের বিভিন্নতা, সেইজন্য আমাদের এত বিষাদ ও এত অশান্তি। যিনি মৃত্যুর আজ্ঞাবাহিনী হইয়া তদীয় রাজ্যে প্রবেশ করেন, তাঁহারই শান্তি ও আরাম। আর যিনি রহিলেন, তাঁহার প্রাণে মৃত্যু কেবল সেই বিদায়চিত্র ও তদীয় অভিনয়ের স্মৃতির ছাপ মারিয়া চলিয়া যায়। তাই হে মৃত্যু! তুমি সংসারে সর্ব্বজয়ী, তোমাকে নমস্কার।

শ্রীমনোজবা-রচয়িত্রী।

সিচত্ত

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

রাত্রিতে জ্বর বাড়িল। সমস্ত রাত্রি নীরজা মোহিতের শিয়রে বসিয়া বাতাস করিতে লাগিল। প্রভাতে ডাক্তার আসিয়া বলিল "পূর্ব্বে কি আপনার মধ্যে মধ্যে জ্বর হ'ত?" মোহিত ভাবিয়া বলিল "মাস আট নয়ের মধ্যে চারি পাঁচ বার জ্বর হ'য়েছে"। "বুকে বেদনা আছে?" "অল্প অল্প"। ডাক্তার একটু চিন্তিত ভাবে বলিলেন "আপনার একটু সাবধান হওয়া উচিত ছিল। যাক্ কোনো চিন্তা নাই, ঔষধ দিয়ে যাচ্চি, জ্বর দুই এক দিনের মধ্যেই সেরে যাবে।"

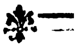
দুই এক দিন হইয়া গেল, ক্রমে সাত আট দিন হইয়া গেল, তথাপি জ্বর সারিল




না। জ্বর ছাড়ে, আবার আসে। উত্তাপ প্রায় একশ চার হয়। নীরজা আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া দিন রাত্রি মোহিতের মাথার কাছে বসিয়া থাকে। তাহার মলিন মুখ দেখিয়া মোহিত বলিল "নিরো ভাব কেন, জ্বর হয়েছে এতে আর বেশী ভাবনার কথা কি?" নীরজাও তাই বুঝিতে চেষ্টা করিত, সে স্বামীকে প্রফুল্ল করিবার জন্য ও নিজে অন্যমনা হইবার জন্য কত পুস্তক পড়িত, সংবাদপত্র পড়িত, কত গল্প করিত। পনের দিন কাটিয়া গেল, তথাপি জ্বর বন্ধ হইল না। নীরজা বলিল "এ ডাক্তার ভাল নয়।" অন্য ডাক্তার আসিল। সাত আট দিনে সেও কিছু করিতে পারিল না। তখন সাহেব ডাক্তার আসিল। এক মাস কয়েক দিন পরে মোহিতের জ্বর ছাড়িল। লীলা পিতার শয্যা পার্শ্ব ছাড়িয়া খেলা করিতে লাগিল। নীরজার ম্লান পাণ্ডু মুখে ক্রমে রক্তের সঞ্চার হইল। মোহিত ক্রমে পথ্য পাইল। পথ্য করিবার পর দিন মোহিত চেয়ারে বসিয়া পুস্তক পাঠ করিতেছিল। লীলা তাহার চিক্কণ কেশগুলি নাচাইতে নাচাইতে আসিয়া বলিল "বাবা এই পত্রখানা পিয়ন দিয়া তোমাকে দিতে বলে গেল।" মোহিত লীলার চিবুক ধরিয়া আদর করিয়া বলিল "লীলা তুই পত্রখানা পড়ে আমায় শোনাতে পারবি না?" লীলা একটু ভাবিয়া বলিল "বল হলে পলে পাল্‌ব"। মোহিত তাহাকে চুম্বন করিতে গেলে সে ছুটিয়া পলাইয়া গেল। নীরজা আসিয়া বলিল "কার পত্র?"

"এখনো পড়িনি।" মোহিত খুলিয়া মনে মনে পড়িতে লাগিল। নীরজা দেখিল মোহিতের হস্ত কাঁপিয়া পত্রখানি পড়িয়া গেল। বিস্মিত হইয়া নীরজা পত্রখানা তুলিয়া পড়িল, কাশী হইতে কেহ লিখিয়াছে যে, নন্দবাবু কল্য রাত্রিতে কলেরায় প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। সহসা নীরজা চাহিয়া দেখিল, মোহিত ক্রমশঃ এলাইয়া আসিতেছে, সভয়ে নীরজা মোহিতকে ধরিয়া ফেলিল। শয্যায় শোয়াইয়া পাখা আনিবার জন্য ছুটিয়া যাইতে নীরজা চেয়ারে পা বাধিয়া পড়িয়া গেল। মস্তকে বিষম আঘাত লাগিল, তাহা গ্রাহ্য না করিয়া সে উঠিয়া পাখা লইয়া ছুটিয়া আসিয়া মোহিতের মস্তকে ও চক্ষে বারি সিঞ্চন করিয়া বাতাস করিতে লাগিল। দাস দাসীরাও আসিয়া জুটিল। নীরজা তখন থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল, তথাপি প্রাণপণে বলসঞ্চয় করিয়া মোহিতের শুশ্রূষা করিতেছিল। কিয়ৎক্ষণ পরে ধীরে ধীরে মোহিত চক্ষু মেলিল, ভগ্ন কণ্ঠে ডাকিল "বাবা"! সে স্বরে নীরজা কাঁদিয়া ফেলিল। মোহিত নীরজার দিকে চাহিল, ধীরে ধীরে তাহার হাত ধরিয়া বলিল "নীরো, বাবা আমার উপর রাগ করিয়াই চলে গেলেন, ক্ষমা চাইতেও সময় পেলাম না।" নীরজা কাঁদিতে কাঁদিতে মোহিতের চক্ষুর জল মুছাইয়া দিতে লাগিল।




সমস্ত দিনটা নীরজা সেইখানে বসিয়া কাটাইল। মোহিত একবার মাত্র বলিয়াছিল "আমাকে যে স্নান করতে হবে, কাছা পরতে হবে, না না, আমার বুঝি তাতেও অধিকার নাই। আমি যে বাবার ত্যাজ্য। সতীশ! সতীশই তাঁর ছেলে, সে সুপুত্র, সেই সব করবে।" নীরজা নীরবে চক্ষুর জল মুছিল। বহুক্ষণ পরে অন্যমনস্কভাবে বুকে হাত দিয়া মোহিত বলিল—"নিরো, বড় কষ্ট হচ্চে! বুকটা বড় ব্যথা করছে"। সভয়ে নীরজা তাহার বক্ষে হাত দিল, তখনি ডাক্তার সাহেবকে ডাকিতে পাঠান হইল। ডাক্তার আসিয়া দেখিয়া চিন্তিত হইল, ঔষধ দিয়া গেল। সন্ধ্যাকালে নীরজা মোহিতের কপাল ও হৃদয় স্পর্শ করিয়া দেখিল অতিশয় উত্তপ্ত। মোহিতের অত্যন্ত জ্বর আসিয়াছে।

দুই তিন জন করিয়া ডাক্তার দেখিতে লাগিল। এক মাসের পর একজ্বরীর বিরাম হইল, কিন্তু রোগের বিরাম হইল না। প্রত্যহ একশ তিন চার ডিগ্রী করিয়া জ্বর হইতে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে বুকে ব্যথা ও কাশী। নীরজা চারি দিক অন্ধকার দেখিতে লাগিল। কোনও কাজে তাহার হাত পা উঠে না, রাত্রি জাগিয়া চোখের কোলে কালী পড়িয়াছে, ম্লান মুখখানি শুষ্ক, তথাপি নীরজা সংসারের সমস্ত কাজ ছাড়িয়া মোহিতের পার্শ্বে ছায়াখানির মত বসিয়া থাকে, ঔষধ খাওয়ায়, বাতাস করে, স্বামী নিদ্রিত হইলে নির্নিমেষ নেত্রে তাহার ম্লান মুখখানির দিকে চাহিয়া বসিয়া থাকে। সময় সময় অজ্ঞাত ভয়ে চক্ষু দিয়া জল বাহির হইয়া আসে। মোহিত দেখিতে পাইলে তাহার হাত দুখানি ধরিয়া স্নেহপূর্ণ কণ্ঠে বলে "নিরো, কাঁদ কেন? অত ভাবনা কিসের? আমিত ভাল হব, অত ভয় কেন?" নীরজা প্রাণপণ চেষ্টায় চক্ষের জল রোধ করিতে চেষ্টা করে। মোহিত সমস্ত রাত্রি তাহাকে মাথার নিকটে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া এক এক বার বলে একটু শোও গিয়া, সমস্ত রাত্রি অমন করে জেগো না।" নীরজা ক্ষীণকণ্ঠে বলে "আমার তো ঘুম পায় না।" মোহিত আদর করিয়া বলে না আসে একটু চেষ্টা করে ঘুমাও, এ সময়ে যদি তোমার অসুখ হয় তো কি বিপদ হবে মনে করে দেখ দেখি।" তখন নীরজা ভূমিতলস্থ শয্যায় গিয়া হতাশভাবে দেহখানি যেন ছাড়িয়া দিয়া শুইয়া পড়ে। কিছুক্ষণ পরে যেই স্বামীকে দু এক বার পার্শ্ব ফিরিতে দেখে, অমনি গিয়া নিকটে বসে।

এক এক দিন করিয়া কত দিন গত হইয়া গেল, সেই রোগতপ্ত বিছানার পার্শ্বে বসিয়া রোগীর মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া এক একটা দিন কত দীর্ঘ বোধ হইত। এইরূপে ধীরে ধীরে চারি মাস কাটিয়া গেল। মোহিত নীরজার সহিত মৃদুকণ্ঠে কত গল্প করে, হাসিয়া কথা কয়। নীরজা সংবাদপত্র পড়ে, মোহিত শুইয়া শুইয়া শুনে ও শীর্ণ হস্ত দিয়া নীরার




চিবুক ধরিয়া কত আদর করে। লীলার ম্লান মুখ দেখিয়া নীরজাকে বলে "তুমি রাত্রি দিন অত বিষণ্ণ থাক বলে লীলাও হাসি ভুলে গেছে। তুমি ওর দিকে একটু মন দাও, একটু প্রফুল্ল রাখ্‌তে চেষ্টা কর, ভাবনায় ওরও অসুখ হবে।" লীলা ছল ছল চোখে যখন বলে "তুমি কবে ভাল হবে বাবা"? তখন মোহিতের চক্ষেও জল আসিয়া পড়ে, স্নেহকণ্ঠে বলে "ঈশ্বর যে দিন ভাল করবেন, সেই দিন ভাল হব মা।" লীলা বলে "আমি তো ভগবান্‌কে তোমাকে ভাল কর্‌তে কত বলি বাবা, তবুও ভগবান্ তোমাকে ভাল করছেন না কেন?" মোহিত নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলে "কি জানি মা।"

ডাক্তার বাবু আশ্বাস দিয়া যান, মোহিতও নীরজাকে কত আশ্বাস দেয়, তথাপি নীরজার ভাবনার শেষ হয় না, চক্ষের জলের শান্তি হয় না। সহসা একদিন মোহিত বলিল "নিরো, ব্যাঙ্কে মোট তিন হাজার টাকা জমা ছিল, তাহা ক্রমে ক্রমে সবই আনা হয়েছে, এত খরচ হচ্ছে, আমি এই ছয় মাস ভুগ্‌ছি, আর কত আছে?"

একটু থামিয়া নত মুখে নীরজা বলিল "হাজার খানেক আছে বোধ হয়।" মোহিত সন্তুষ্ট হইয়া বলিল "তবে এখন অনেক টাকা আছে, ঐ টাকা ফুরুতে ফুরুতে আমিও ভাল হয়ে উঠ্‌ব।"

নীরজা মাথা নাড়িল। সে তিন হাজার টাকার এখন গটা কয়েক টাকা মাত্র বাকী আছে। তারপরে কি করিবে তাহাও সে ভাবিয়া রাখিয়াছিল। তাহার পিতার দত্ত প্রায় হাজার দুই টাকার কয়েক খানা গহনা আছে, মোহিতের দেওয়াও হাজার খানেক টাকার গহনা আছে। নীরজা নত মুখে বসিয়া ভাবিতেছিল তাহার পরে ইহাতেও যদি ব্যারাম না সারে, তাহা হইলে কি হবে?

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

ঔষধের বিরাম নাই, চিকিৎসারও বিরাম নাই, নীরজার যত্নের বিরাম নাই, নীরজার নিজের বিরাম নাই, লীলার ভীত প্রার্থনার বিরাম নাই, তথাপি মোহিত সারিয়া উঠিতে পারিতেছে না। ডাক্তারেরাও আশ্বাস দিতে ত্রুটি করিতেছেন না, তথাপি এক বৎসরেও মোহিত নীরোগ হইতে পারিল না।

বসন্তকালের অপরাহ্ণ, মুক্ত জানালা দিয়া বড় মধুর বাতাস আসিতেছে, সূর্য্য ধীরে ধীরে ডুবিতেছে, মোহিত শুইয়া আছে, নীরজা নিকটে বসিয়া একখানা পুস্তক পড়িতেছে, অদূরে লীলা ঘুমাইয়া আছে। পুস্তক পাঠ শুনিতে শুনিতে সহসা মোহিত বলিল "নীরজা!" নীরজা পুস্তকখানি রাখিয়া বলিল "কি বল্‌ছ?"

"সে হাজার টাকা এত দিন নিশ্চয় ফুরাইয়া গেছে, না?" নীরজা কি বলিবে ভাবিয়া পাইল না, নীরবে তেমনি বসিয়া রহিল।

"তবে এখন কি হবে? ডাক্তার বলেছে ভাল হতে এখনও অন্ততঃ তিন চারি মাস



লাগ্‌বে, এতদিন কি ক'রে চল্‌বে ? আর তো টাকা নাই।"

নীরজা নিঃশ্বাস বন্ধ করিয়া শুনিতেছিল। মোহিত একটু থামিয়া বলিল "তোমার গহনাগুলিতে হাজার তিনেক টাকা হবে, নয় ?" নীরজা ঘাড় নাড়িল। "তবে এখন তাই সম্বল, দীনেশকে ডাক্‌তে বল ও কয়েকখানা বার্‌করে তাহাকে দাও।"

নীরজা তেমনি বসিয়া রহিল, কিয়ৎক্ষণ পরে সহসা মোহিত বলিল "নীরো, যদি আমি ভাল না হই ?" নীরজা সহসা শয্যায় লুটাইয়া পড়িল, আর সে ধৈর্য্য ধরিতে পারিল না। মোহিত কষ্টে বলিল "আর তো কিছু নাই, নীরো গহনা কখানা থাক্‌, আমি ভাল না হলে তুমি কোথায় যাবে ? লীনার কি হবে ?" নীরজা তেমনি পড়িয়া রহিল। মোহিত তাহার গাত্রে হাত দিয়া বলিল "কেঁদো না, যদির কথা বল্‌ছি।" লীলা উঠিয়া বসিয়া শুনিতেছিল। সে পিতার নিকটে আসিয়া বসিয়া বলিল "বাবা, গয়না দিয়ে যে টাকা পাওয়া যাবে, তাতে তুমি ভাল হবে। আমার এই চুড়ীগুলো বেশ ভাল, এ গুলোয় মেলা টাকা হবে, নয় মা ? সেই টাকায় তুমি ভাল হবে। লীলা চুড়ী খুলিতে গেল; মোহিত তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল "লীলা থাম্‌। ভগবান্‌! আমার অদৃষ্টে এত ছিল ?"

নীরজা উঠিয়া বসিয়া কাতর কণ্ঠে বলিল "তুমি আমাদের সাহস দাও, তুমি কেন কাতর হচ্ছ ? তুমি ভাল হয়ে লীলাকে আবার গয়না গড়িয়ে দেবে।"

"নীরো, যদি ভাল না হই ?"

নীরজা আবার লুটাইয়া পড়িল। মোহিতও নীরবে অনেকক্ষণ কাঁদিল, তারপরে বলিল "তোমার গুলো দাও, লীলার চুড়ী দিও না।

নীরজা কি করিয়া বলিবে যে, সে গুলির শেষ টুক্‌রাও কবে ফুরাইয়া গিয়াছে। অধোমুখে সুধু বসিয়া রহিল। মোহিতের অল্প সন্দেহ হইল, "নীরো, সে গুলি নাই বুঝি ?"

নীরজা তথাপি উত্তর দিতে পারিল না। "সে গুলিও গেছে ? নীরো, এই জন্যই কি তোমায় বিবাহ করেছিলাম ? শেষে রাস্তায় দাঁড় করালাম। হা ঈশ্বর !"

নীরজা শান্ত স্থির নেত্রে স্বর্গের পানে চাহিয়া বলিল "গয়না গেছে তাতে দুঃখ কি ? তোমা অপেক্ষা কি গয়নার বেশী প্রয়োজন? টাকা না হলে লোকে বুঝে না, তাই গয়নাগুলি বিক্রী করেছি। এ তুচ্ছ প্রাণটা নিয়ে যদি কেহ তোমায় ভাল করে দিত তো তোমাকে লুকিয়ে এটাও কোন দিন দিয়ে ফেল্‌তাম। তুচ্ছ অলঙ্কার কি প্রাণের চেয়ে বড়, তোমার চেয়ে বড়, তাই তুমি কাতর হচ্ছ ?" মোহিত ক্ষীণ কণ্ঠে বলিল "তা নয় নীরজা! আমার ভয় হচ্ছে যদি আমি না বাঁচি !"

নীরজা প্রাণপণে বল সঞ্চয় করিয়া স্থির স্বরে বলিল "কেন বাঁচবে না ? তুমি ভাল




হবে, যদি না হও, আমার জন্য ভাবছ? তুমি যাবে, হয়ত আমিও না থাকতে পারি। বাকী লীলা?" গলাটা বড় কাঁপল, আপনাকে একটু সামলাইয়া লইয়া তারপরে বলিল "যার কাছে দিয়ে গেলে আর কোনো ভয় নাই, তাঁহারই চরণে লীলার স্থান হবে। ঈশ্বর লীলাকে রাখবেন, তুমি আমি ভেবে কি করব?"

(ক্রমশঃ)

শ্রীনিরুপমা দেবী।

৺উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের আত্মজীবনী।

৫০ বৎসরের সাক্ষ্য দান।

১। ব্রজনাথ বাবুর প্রভাবে ১২ বৎসরে মৎস্য ত্যাগ।

২। শিবকৃষ্ণ বাবুর যোগে তত্ত্ববোধিনী ও রাজনারায়ণ বাবুর বক্তৃতা পাঠ, বিদ্যা-বিলাসিনী সভা।

৩। শিবকৃষ্ণ বাবু ও হরিদাস বাবুর নিকট হইতে ব্রহ্মোপাসনা শিক্ষা, বিদ্যা বিলাসিনী সভার সাম্বৎসরিক, জাতিচ্যুতির গোলযোগ।

৪। ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজ, শ্রীনাথ, নবকৃষ্ণ, উমেশ মিত্র ব্রাহ্মসমাজভুক্ত হওয়া। কালীনাথের সহিত মিলন, সাংবৎসরিক উৎসবে বক্তৃতা, রমেশ বাবুর ব্রাহ্মসমাজের সহিত যোগ।

৫। শিবকৃষ্ণ বাবুর সহিত আদি সমাজ দর্শন, বেদান্তবাগীশের পরামর্শ।

আদি ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা, সত্যেন্দ্র বাবুর সহিত আলাপ।

ব্রহ্ম বিদ্যালয় দর্শন, কেশব বাবু ও সত্যেন্দ্র বাবুর তর্ক বিতর্ক শ্রবণ।

৬। প্রসন্ন বিশ্বাস, রাজা সুরতের সহিত উপাসনাদি।

৭। L. M. S. এ ভরতি হইয়া Entrancs pass.

Missionary Jonhson.

৮। ব্রহ্মবিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হওয়া ও দীন মল্লিকের সহিত বক্তৃতা শ্রবণ, শিক্ষক মহর্ষি ও কেশবচন্দ্র।

৯। মেডিকাল কলেজে ভরতি হওয়া, ব্রাহ্মসমাজে রীতিমত গমন, সঙ্গত সভার সভ্য হওয়া ও Night Schoolএ পড়ান।

সঙ্গী—কালীনাথ বাবু, গোবিন্দ বাবু, নিবারণ বাবু, ক্ষেত্র বাবু, বসন্ত বাবু, কৃষ্ণধন বাবু, চন্দ্রমোহন বাবু, বিহারী ভাদুড়ী, তারক মৈত্র, R. L. Dutt, বিজয় বাবু, রামপ্রসাদ, মহালানবিশ মহাশয়।

১০। রাজনারায়ণ বাবুর সহিত প্রথম সাক্ষাৎ, ব্রাহ্মসমাজের সহিত তত্ত্ববোধিনীর



সম্মিলন উপলক্ষে মহাসভা। সভাপতি কানাইলাল পাইন, বক্তা রাজনারায়ণ বাবু, সত্যেন্দ্র বাবুকে সমাজের কার্য্যে উৎসর্গ।

১১। মেডিকালকলেজ ছাড়িয়া F. A. পরীক্ষা দিবার চেষ্টা। জয়নগর স্কুলের কার্য্য, কালীনাথের সহিত দেশে কার্য্য, ২২এ চৈত্র মজিলপুর ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন ও তাহার উন্নতি।

দক্ষিণ বারাসত ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন ও ব্রজনাথ বাবুর বক্তৃতা। ব্রাহ্ম মতে কালীনাথের পিতৃশ্রাদ্ধ। মহর্ষির পিতৃশ্রাদ্ধের পুথি হরনাথ দ্বারা আনীত। দেশে হুলস্থুল, জাতিচ্যুতি।

পিতামহীর মৃত্যু ও শ্রাদ্ধ। জ্যেষ্ঠ ও তাঁহার পত্নীর যোগ দান। দেশে হুলস্থুল।

জয়নগর স্কুলের কর্ম্মচ্যুতি। হরনাথের দীক্ষা।

১২। পরশুরামের যোগে Training Academyতে কার্য্য। তথা হইতে হিন্দু স্কুলে।

১৩। বামাবোধিনী পত্রিকা—ব্রাহ্ম আত্মীয় সভা—২য় খণ্ড বাঃ বোঃ পাইয়া কেশব বাবুর উৎসাহ দান। লেখক বিজয় বাবু প্রভৃতি।

১৪। নিবধই গমন, উদয় বাবুর সহিত সমাজের আচার্য্যের কার্য্য, নিবধই স্কুলে মহর্ষির সাহায্য দান। পাকুড়ানীর সহিত মহর্ষির আগমন, বক্তৃতা শ্রবণে আনন্দ, তত্ত্ববোধিনীতে ছাপা।

১৫। স্বরূপ দত্তের সহিত আলাপ, ষষ্ঠী দত্তের ব্রাহ্মধর্ম্মে অনুরাগ। দত্ত-পুকুরে ব্রহ্মবিদ্যালয়। রাম, লক্ষ্মণ, সীতা, ও হরি উপদেশের বিষয়, বিবাহ।

১৬। কালীকৃষ্ণ দত্তের পিতৃশ্রাদ্ধ, গৃহ হইতে ব্রাহ্মসমাজ উদ্যানে প্রেরণ।

এফ্ এ পাস।

১৭। ১৮৬৫ সালে রাজপুর স্কুলে আগমন, বিদ্যাভূষণমহাশয় সমাজসংস্কার ও ব্রাহ্মসমাজের পোষক। ভুবন ভট্টাচার্য্যের পৈতা ত্যাগ। হলধর, উমাচরণ, কেদার দে, মহেন্দ্র ঘোষ, সারদা মিত্র প্রভৃতির সহানুভূতি। চিমুকে লইয়া গান ও উপাসনা।

১৮। হরিনাভি স্কুল, তথায় নিয়মিত উপাসনা, জানকী বাবু প্রভৃতির সহানুভূতি। ত্রৈলোক্য নাথ সান্যাল প্রভৃতির আগমনে গোলযোগ।

১৯। কেদার নাথ দেবের সহিত মিলিয়া হরিনাভি সমাজ স্থাপন। প্রতাপ বাবু কর্ত্তৃক সমাজগৃহ উৎসর্গ। অবিনাশ, কালীকৃষ্ণ, চন্দ্র, প্রিয়, কেদার প্রভৃতির উৎসাহ। শনি, রবিবার কলিকাতায় কালীকৃষ্ণ দত্তের বাসায় যাপন।

মিঠুর গাড়ী।

২০। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন, শিবনাথ প্রভৃতির দীক্ষা।

২১। দেশের লোকের কথায় বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের মনোভাব হঠাৎ পরিবর্ত্তন। স্থানীয় ব্রাহ্মসমাজ উঠাইয়া দিবার জন্য লোকের চেষ্টা। ব্রাহ্মসমাজে যাইবার জন্য বালক-দিগের উপর উৎপীড়ন, স্কুলের কার্য্য ত্যাগ।



২২। কলেজ ষ্ট্রীট ৫৪ নং বাটীতে ত্রৈলোক্যের সহিত আগমন। সমাজ সেবার চেষ্টাই ত্যাগের কারণ।

২৩। হরিনাভিতে বিষম পরীক্ষা, তাহার ফল।

২৪। কোন্নগর স্কুলে কার্য্যলাভ, কোন্নগর ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্যের কার্য্য।

শিবচন্দ্র বাবুর সহিত যোগ ও তাঁহার জীবনের আদর্শ ভাব।

২৫। সঙ্গত সভার সম্পাদকের কার্য্য।

কেশব বাবুর বিলাত গমন ও প্রত্যাগমন। কলিকাতা হইতে কোন্নগর যাতায়াত।

২৬। ভারতাশ্রমে স্ত্রীর বাস ও তাঁহার কার্য্যপ্রণালী।

২৭। ভারতাশ্রম কলিকাতায় আসিলে তথায় বাস। স্ত্রীর ভূতলে পতন ও গুরুতর আঘাতপ্রাপ্তি, সকলের সহানুভূতি।

২৮। ইষ্ট ইণ্ডিয়া প্রেস, ভারত সংস্কারক প্রচার। বামাবোধিনী ও ধর্ম্মসাধন।

২৯। কলিকাতায় থাকিবার চেষ্টা। কলিকাতায় Boy's School স্থাপন। তাহার ও শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ের Head Master। (Albert College) স্কুলের স্বত্ব ত্যাগ কলিকাতা ত্যাগের কারণ।

২৯। হরিনাভি হইতে আহ্বান। শিবনাথের হরিনাভি ত্যাগ। হরিনাভি ব্রাহ্মসমাজের পুনরুন্নতি। সূর্য্য বাবুর সহিত যোগ।

৩০। প্রচারকদিগের সহিত পৃথক ভাব। হরনাথের আশ্রম ত্যাগ। প্রভেদের আধিক্য। নগেন্দ্র বাবুর বক্তৃতা। শিবনাথের ক্রমে আকৃষ্ট হওয়া। যদু বাবু, কালীনাথ, কেদার রায় পঞ্চপ্রদীপ। হরনাথের স্কুলে উপাসনা ও মিলন। কেশব বাবুর উভয় দিক রক্ষা।

৩১। কুচবিহার বিবাহ। কেশব বাবুর পদগল্‌ভোক্তি।

৩২। টাউন হল সভা ও আনন্দমোহন বসু।

৩৩। ভারতবর্ষীয় উপাসকমণ্ডলীর বিচ্ছিন্নতা। নূতন উপাসকমণ্ডলী স্থাপন, তাহার আচার্য্যের ভার। ব্রাহ্মসমাজ কমিটী।

৩৪। বেথুন কলেজ ও ছাত্রী সমাজ।

৩৫। সিটী কলেজ স্থাপন—ঐ কলেজে কার্য্যের জন্য হরিনাভি ত্যাগ, প্রেস বিক্রয়। দুর্গামোহন ও আনন্দমোহন বাবুর বদান্যতা।

৩৬। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দির স্থাপনে গোবিন্দ বাবুর সহায়তা।

৩৭। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের কর্ত্তৃপক্ষগণের দংশন করিয়া আত্মহত্যা ও আত্মচ্ছেদ।

৩৮। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে নূতন উৎসাহ। গোস্বামী, শিবনাথ, রামকুমার বাবু, অগ্নিহোত্রী, আনন্দমোহন ও দুর্গামোহন বাবু, দ্বারিক বাবু (গাঙ্গুলী), মহালানবিশ।

৩৯। ব্রাহ্মসমাজে নিয়মতন্ত্র প্রণালী, সমাজের পত্রিকা ও নানা কার্য্যবিভাগ, ছাত্রসমাজ, সঙ্গত, উপাসকমণ্ডলী,



উৎসব। ব্রহ্মসঙ্গীত ও অন্যান্য publication.

৪০। সমাজের ক্রমোন্নতি ও অবনতির কারণ।

৪১। যে নিয়মতন্ত্র প্রণালী হইয়াছে তাহার দোষ গুণ।

৪২। আধ্যাত্মিক ও সামাজিক শৈথিল্য ও দুর্বলতা।

৪৩। সমাজত্রয়ের মিলন চেষ্টা। রামমোহন রায় উৎসব, মহর্ষির গৃহে মাঘোৎসব। প্রতাপবাবুর চেষ্টা।

৪৪। আত্মীয় সঙ্গত ও উপাসনা।

৪৫। সাধনাশ্রম ও সেবাশ্রম।

৪৬। উষাকীর্ত্তন।

৪৭। সেবকমণ্ডলী।

৪৮। বালিকা বিদ্যালয়।

৪৯। Sunday School.

৫০। উদ্যান সম্মিলনী।

৫১। Unitarianদিগের সহানুভূতি ও সাহায্য।

৫২। Theistic Conference.

৫৩। Miss Collet, Miss Cobbe, Newman, Hamergrain.

৫৪। সিটী কলেজ ও ইহা দ্বারা সমাজের সাহায্য।

৫৫। দুর্ভিক্ষাদিতে ব্রাহ্মসমাজ।

৫৬। ব্রহ্মবিদ্যালয় ও Theological class.

৫৭। জাতিভেদ, পৌত্তলিকতা উচ্ছেদে অসবর্ণ বিবাহ, বিধবাবিবাহ প্রচলনে ব্রাহ্মসমাজের সহায়তা।

৫৮। Reform.

৫৯। ব্রাহ্ম দরিদ্র পরিবারের জন্য চেষ্টা।

৬০। বিধবাশ্রম।

৬১। শ্রমজীবী বিদ্যালয়।

৬২। নিম্ন শ্রেণী ও অসভ্যদের মধ্যে ধর্ম্ম প্রচার।

৬৩। সমুদায় ভারতের একীকরণে ব্রাহ্মসমাজের সাহায্য।

৬৪। বিদেশে ব্রাহ্মসমাজের প্রভাব।

৬৫। Brahmo Annual Almanac.

৬৬। স্থানীয় ব্রাহ্মসমাজ সংখ্যা।

৬৭। ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার।

৬৮। ব্রাহ্মসমাজে রামমোহন, দেবেন্দ্র, কেশব, রাজনারায়ণ ও আনন্দমোহন প্রভৃতির স্থান।

৬৯। নববিধান, দেবসমাজ ও গোস্বামী শিষ্য সমাজ।

৭০। Brahmo literature and foreign literature helping the Brahmo samaj.

৭১। পূর্ব্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গ ব্রাহ্মসমাজ।

৭২। বৈষ্ণব ধর্ম্ম, খৃষ্টান ধর্ম্ম, উপনিষদ, দয়ানন্দ, রামকৃষ্ণ ও Theosophyর প্রভাব।






পত্নী।

নবাগত রাজীব, অনাদি চরণের কোলে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। কলিকাতার রাস্তায় গ্যাসের আলো জ্বলিতেছে, ঘোড়ার গাড়ী, মোটর গাড়ী দস্তুর মত চলিতেছে, অগণ্য পথিক রাজ-বাহিয়া গম্য স্থানে যাইতেছে। ফেরিওয়ালা "চাই বরফ, কুল্পি বরফ, চাই বেল ফুল" হাঁকিতেছে। সীতা-রাম ঘোষের ষ্ট্রীটে—নং মেসে, অনাদি চরণের অঙ্কে রোরুদ্যমান রাজীব রাস্তার দিকে কোন লক্ষ্য করিতেছিল না।

রাজীবের প্রিয়তম শ্রেষ্ঠতম বন্ধুবর কমলাকান্ত সহসা আসিয়া এই অভূত-পূর্ব্ব দৃশ্য দেখিয়া চমকিয়া উঠিল। আগ্রহপূর্ণ ও আকুল স্বরে জিজ্ঞাসা করিল "একি রাজীব, কি হয়েছে ভাই ?"

কবিশ্রেষ্ঠ কালিদাসের সময় হইতে যাহা হইয়া আসিতেছে, এ ক্ষেত্রেও তাহার ব্যতিক্রম হইল না, প্রাণ তুল্য বন্ধুর উপস্থিতিতে রাজীবের কান্না আরও বাড়িয়া গেল।

তখন রাজীবের শীঘ্র উত্তর দিবার সম্ভাবনা না দেখিয়া, অনাদি বলিল "বে" করে রাজীবের মনে বড় কষ্ট হয়েছে, বৌকে ওর মোটেই পছন্দ হয় নাই"।

বিস্ময় ও আগ্রহে কমলাকান্ত জিজ্ঞাসা করিল "সে কি রাজীব ?"

তখন রাজীব চক্ষু মুছিয়া, ঢোক গিলিয়া প্লুত ও অনুনাসিক স্বরে বন্ধুকে সবিশেষ বুঝাইতে চেষ্টা করিল।

কমলাকান্ত বুঝিতে লাগিল, রাজীবের নববিবাহিতা স্ত্রী পল্লিগ্রামের অনাথা বিধবার কন্যা, কোনও প্রসিদ্ধ লোকের কন্যা নহে—মেয়েটী শ্যামবর্ণা, অতি মৃদুস্বভাবা অর্থাৎ পাড়াগেঁয়ে হাবা মেয়ে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ, সেক্স-পীয়র-পাঠক রাজীবের হৃদয়ে উপন্যাসের নায়িকাদিগের যে রূপগুণ জাগিতেছিল, তাহার পত্নী সে রকমের কিছুই নহে। রাজীবের পিতা হৃদয়হীনের মত, ভদ্র লোকের জাতি রক্ষা করিতে গিয়া, পুত্রের জীবন এইরূপে ব্যর্থ করিয়া দিয়াছেন ! নির্ম্মম জাগরণের হাতে পড়িয়া তাহার সুখের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে ! আরও দুঃখের কথা এই যে, বাড়ীতে অথবা নিজ গ্রামে রাজীব যাহার নিকটেই এই দুঃখের কথা জানাইত, সেই বলিত "তুমি কি পাগল ? অমন মেয়ে কি সর্ব্বদা মিলে ? ওটী তো লক্ষ্মী" ইত্যাদি। সহানুভূতি দূরে থাকুক, সকলেই সেই অযোগ্যা পত্নীর পক্ষ সমর্থন করে। সুতরাং এ জগতে রাজীবের কাঁদিবারই কথা, রাজীব চিরদিনই কাঁদিবে !

কমলাকান্ত সব বুঝিল। বুঝিয়া



মনে মনে বড়ই খুসী হইল—তা' সে তো রাজীবের প্রাণের বন্ধু, তবে যে কেন খুসী হইল, সে কথা পরে বলিতেছি।

যখন পল্লিগ্রামবাসী রাজীবলোচন এণ্ট্রান্স পাশ করিয়া, পনর টাকা বৃত্তি, গ্রামব্যাপী গৌরব এবং সাধারণের সশ্রদ্ধ মনোযোগ লইয়া, কলিকাতার কলেজে এফ্. এ পড়িতে প্রবৃত্ত হইল, তখন অনেকে তাহাকে "অসাধারণ" করিয়া তুলিল। মধুলোলুপ ভৃঙ্গের মত তাহার ভালবাসা-প্রয়াসী অনেক ব্যক্তি তাহার সহিত বন্ধুত্ব করিতে আসিল। সেই সতর বৎসরবয়স্ক বালক রাজীবের উদ্যমশীলতা, একাগ্রতা, পরার্থপরতা এবং স্বদেশপ্রীতি দর্শনে বন্ধুগণ তাহার প্রতি একান্ত অনুরক্ত হইল। দরিদ্র রাজীবকে কেহ জুলিয়াস্ সিজার, কেহ নেপোলিয়ান বোনাপার্টি, কেহ বা ম্যাট্‌সিনির আসন দিবার কল্পনা করিতে লাগিল।

কমলাকান্ত রাজীবের অন্যতম বন্ধু ছিল, কিন্তু সে ছাড়া রাজীবের আরও বন্ধু থাকিবে, অন্য কেহ রাজীবকে আপনার মনে করিয়া অনেকখানি ভালবাসা দিবে, ইহা তাহার মরণাধিক কষ্টকর হইত। তাই সে রাজীবের সঙ্গে "কায়ার ছায়া" তুল্য হইয়া উঠিল। রাজীব কলেজে যাইবে, তার আগে কমলাকান্ত তাহার পুস্তক, জামা, সমস্তই ঠিক্ করিয়া রাখিত। বৈকালে বেড়াইবার সময় কমলাকান্ত দিঙ্‌নির্ণয় করিয়া তাহার সঙ্গ লইত। সন্ধ্যার পরে তাহার জন্য ভাল ভাল খাবার আনিয়া দিত। শেলি, রঘুবংশ, মেঘনাদবধ কাব্য প্রভৃতি পুস্তক সুন্দররূপে বাঁধাইয়া "প্রাণাধিক রাজীব গ্রহণ কর" লিখিয়া উপহার দিত। রাজীবের একটুকু অসুখ হইলে কমলাকান্ত নিজে কলেজ কামাই করিয়া তাহার অপ্রত্যাশিত শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইত। রাজীব তাহাকে কলেজে যাইতে বলিলে সে বলিত "তোমাকে অসুস্থ দেখিয়া স্বর্গে গিয়াও আমি শান্তি পাই না, তা কলেজে যাব কিরূপে"। গাভী যেমন তাহার নবজাত বৎসকে সকল জীবের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে, কমলাকান্তও সেইরূপ রাজীবকে সকল বন্ধুর ভালবাসার আকর্ষণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিত। বলা বাহুল্য, এতাধিক ভালবাসায় রাজীবের কোমল হৃদয়ও কমলাকান্তের প্রতি একান্ত আকৃষ্ট হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। অন্য সকলকে ছাড়িয়া সে কমলাকান্তকেই আত্মসমর্পণ করিল।

(২)

এইরূপে দুই বৎসর অতীত হইলে রাজীব এফ, এ পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইল। তখন কমলাকান্তের মনে একটা আশঙ্কার এবং রাজীবের মনে একটা বিরক্তির কারণ উপস্থিত হইল।

সহসা রাজীবের পিতা পুত্রের বিবাহের সম্বন্ধ করিয়া—শুধু সম্বন্ধ নহে, একেবারে উহা পাকাপাকি করিয়া পুত্রকে বাটী লইয়া যাইবার জন্য কলিকাতায় উপস্থিত হইলেন।






সুতরাং আধুনিক রীত্যনুসারে, যাহার বিবাহ সে নিজে বিবাহের পূর্ব্বে পাত্রী দেখিবে, একজন প্রিয় বন্ধু তাহার সঙ্গে থাকিবে, বেশভূষাপরিশোভিতা এক সুন্দরী নিতান্ত অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষিণী হইয়া তাহাদের সম্মুখীনা হইবে, তাহার প্রথিতযশা পিতা নিতান্ত দীন হীনের মত ভাবী জামাতার দয়া ভিক্ষা করিতে থাকিবে, পুরবাসিনী-গণের সস্পৃহ চক্ষু জানালা ও দরজার আড়াল হইতে বন্ধুগণের উপরে পড়িতে থাকিবে ইত্যাদি ইত্যাদি মধুমাখা কবিত্ব ইহাতে কিছুই হইল না, তাই এই শুষ্ক নীরস বিবাহ ব্যাপারটী রাজীবের বড়ই বিরক্তি-কর হইল। তবে তাহার তেজস্বী পিতার মতের বিরুদ্ধে সে কোন দিন দাঁড়ায় নাই, এবারেও দাঁড়াইতে সাহসী হইল না। তাহার মনের এই সকল কথা জানিয়াও কমলাকান্তের আশঙ্কা হইতে লাগিল এখন রাজীব যাহাই বলুক, বিবাহ করিয়া তাহার সমস্ত হৃদয়খানি যদি নব বধূকে উৎসর্গ করিয়া দেয়, তাহা হইলে কমলাকান্তের একচেটে ভালবাসার কি দশা হইবে?

তাই নববিবাহিত বন্ধুর পত্নী স্বামীর মোটেই মনোনীতা হয় নাই, বিবাহে রাজীবের কোনও আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয় নাই, অধিকন্তু তাহার হৃদয়মধ্যে একটা দারুণ আঘাত লাগিয়াছে, এই কথা বুঝিয়া কমলাকান্ত কৃতার্থ হইল। আনন্দাকুল সমপ্রহৃদয় বন্ধুকে নিজের বাহুযুগল মধ্যে টানিয়া আনিয়া প্রাণভরা সহানুভূতি দিতে লাগিল।

যখন রাজীব বি, এ, পড়িতে প্রবৃত্ত হইল, তখন একদিন তাহার বাড়ী হইতে এই ভয়ানক দুর্ঘটনার সংবাদ আসিল যে তাহার পিতা হঠাৎ ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। সংবাদ রাজীবের বজ্রাঘাত তুল্য হইল। তাহার পিতৃশোক তো আছেই, তাহার উপরে অবস্থা সচ্ছল নহে, পিতা অনেক রকম বুদ্ধি বিবেচনা করিয়া সংসার চালাইতেন, রাজীব কি করিয়া সেই গুরুভার বহন করিবে? পড়া শুনার খরচই বা কে দিবে? নিষ্ঠুর অবিবেচক মৃত্যু রাজীব বেচারাকে একে-বারে সৌভাগ্যের উচ্চ শিখর হইতে দুর্ভাগ্যের নিম্ন তলে ফেলিয়া দিবার জন্যই তাহার পিতাকে লইয়া গেল! রাজীব এখন কি করিবে?

রাজীবের সমস্ত অবস্থা জানিয়া কমলা-কান্ত অনেক সান্ত্বনা, অনেক ভরসা দিল, শেষে বলিল "ভাই বি, এ, পড়াটী ছাড়িও না, প্রাইভেট্ টিউশন পাইবার চেষ্টা কর, আর আমিও যতদূর পারি তোমার সাহায্য করিব"। রাজীব বাষ্পাকুলনেত্রে তাহাকে ধন্যবাদ দিতে উদ্যত হইলে, কমলাকান্ত তাহার কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া কহিল "আমি কি তোমার পর রাজীব? আমার টাকা, সে তো তোমারি টাকা, আমার এই প্রাণ মন সবই তো তোমারি"। এমন অসময়ে এতখানি সহৃদয়তা পাইয়া রাজীব যেন অকূলে কূল পাইল। শ্রাদ্ধাদি ও বাড়ীর সুবাবস্থা করিবার জন্য সে পল্লিগ্রামের বাড়ীতে চলিল।




যাইবার সময়ে রাজীব কমলাকান্তকে আলিঙ্গন করিয়া বলিয়া গেল "কমল! এ অভাগাকে ভুল না, আমার তোমা বই আর কেহ নাই।"

এই কথাটি শুনিবার জন্যই কমলাকান্ত এতদিন এত সাধনা করিয়াছে!

কমলাকান্তের আর বেশী দিন পড়িতে হইল না। রাজীব চলিয়া যাইবার কয়েক দিন পরেই, তাহার বিধবা মাতা, নগদ চারি হাজার টাকা এবং এক পরম সুন্দরী কন্যা পাইয়া কমলাকান্তের শুভ পরিণয় সম্পন্ন করিলেন। কমলাকান্ত পড়া ছাড়িয়া সেই টাকা মূলধন করিয়া এক পুস্তকের দোকান খুলিল। অদৃষ্টের জোরে এবং ব্যবসায়ের নিপুণতায় অল্প দিনের মধ্যে সে অনেক অর্থোপার্জ্জন করিতে লাগিল। কলিকাতার উত্তরাংশে মাণিকতলায় তাহার একখানি বাড়ী নির্ম্মিত হইল।

আর হতভাগা রাজীব? বাড়ী গিয়া দেখিল, তাহার বিধবা মাতা, বিধবা পিসী ও তাঁহার দুই অবিবাহিতা কন্যা, বিধবা ভ্রাতৃজায়া ও তাঁহার এক অপোগণ্ড সন্তান, বালিকা পত্নী সবই তাহার পোষ্য। জমা-জমি যাহা আছে তাহা পড়িয়া আছে, বিলি ব্যবস্থা করিবার কেহ নাই। অধিকন্তু রাজীবের পিতা মৃত্যুর কিছু দিন পূর্ব্বে অজন্মা আবাদের খাজনা শোধ করিতে এবং ঘর বাড়ী মেরামত করিতে অনেক টাকা ঋণ করিয়া গিয়াছেন।

সুতরাং এই সকল উপায়হীনাদিগের ভরণ পোষণ এবং ঋণের ভার রাজীবের উপরে চাপিয়া পড়াতে সে মাথায় হাত দিয়া মাটীতে বসিয়া পড়িল। তাহার পিতৃশোক, মাতার বৈধব্য, শোকাকুলা আত্মীয়াদিগের করুণ বিলাপ, আর নিজের অসহায় অবস্থা মুহূর্ত্তমধ্যে তাহাকে আকুল করিয়া ফেলিল। বি. এ. পড়ার আশাত রহিল না, এই মুহূর্ত্তে বেশী মাহিনার একটি চাকরি জুটিলে সকলে খাইয়া বাঁচে!

দেখিয়া শুনিয়া, গ্রামের লোকের সহায়তায় রাজীব গ্রামের স্কুলের হেড্ মাষ্টার হইল। সংসার এক রকম চলিতে লাগিল, কিন্তু ঋণশোধের কোন উপায় হইল না। রাজীব কমলাকান্তকে এই সকল কথা সবিশেষ লিখিল।

কমলাকান্ত প্রথমে রাজীবকে সপ্তাহে একখানি, পরে মাসে দুইখানি, শেষে তিন মাস অন্তর একখানি করিয়া পত্র লিখিল। শেষের পত্রে সে স্পষ্ট লিখিয়া দিল আমার অনেক কাজ, পত্র লিখিবার সময় নাই। ইহাতে রাজীবের বুকে বড় ব্যথা লাগিল।

কিন্তু রাজীব স্বপ্নেও বিশ্বাস করিতে পারিল না, তাহার প্রাণের কমল তাহাকে ভুলিয়াছে। কমলের অবস্থার উন্নতি হইয়াছে জানিয়া রাজীব বড়ই আনন্দ লাভ করিল। মনে মনে স্থির করিল, কমলের নিকট হইতে টাকা লইয়া ঋণ পরিশোধ করিব। শেষে প্রাণপণে কমলের টাকা শোধ দিব। কমল অবশ্য টাকা ফিরিয়া লইতে চাহিবে না—কিন্তু আমি যেমন করিয়া হউক তাহার টাকা




তাহাকে ফিরাইয়া দিব। আপাততঃ তাহার নিকট হইতে টাকা লইয়া সুদের দায় হইতে অব্যাহতি লাভ তো করি। আর কমলের সহিত অনেক বড়লোকের বন্ধুত্ব হইয়াছে, হয় তো সে আমাকে বেশী মাহিনার একটি চাকুরী যোগাড় করিয়া দিবে। দূর হউক ছাই, কত দিন তাহাকে দেখি নাই, তাহার মুখখানি দেখিতে পাইলে তো বাঁচি। কমল কখনও বিমুখ হইবে না!

এই সব চিন্তা করিয়া রাজীব অনেক দিন কাটাইল। সে মনের কথা কাহাকেও বলে না, মা, পিসী বোঝেন না বলিয়া তাহার বিশ্বাস, পত্নীকে সে বালিকা বলিয়া—তাহার অযোগ্যা বলিয়া—সে উপেক্ষা করে।

যাহা হউক, অনেক দিন পরে যে দিন রাজীব তাহার চির-শুভাকাঙ্ক্ষী, চির-স্নেহময় প্রাণাধিক সুহৃদ্ কমলাকান্তের বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইল, সে দিন কমলাকান্তের নবজাত পুত্রের ষষ্ঠীপূজার সমারোহ। কর্ম্মচারী তৈল, মৎস্য, সন্দেশ, দধি, ক্ষীর প্রভৃতি ফর্দ্দে লিখিতেছেন, বন্ধু-বান্ধবগণ নাচ গানের ব্যবস্থা করিতেছেন, কানাই স্যাকরা খোকার গহনার সোণা কষিয়া দর দস্তর করিতেছে। খোকার মার জন্য ঘোষ কোম্পানীর দোকান হইতে সদ্য-আনীত জড়োয়া নেক্‌লেসের ঝলকে অনেকে মুগ্ধ হইতেছে। কমলাকান্ত এক-খানি ইজি চেয়ারে বসিয়া সমস্ত দেখা শুনা করিতেছেন। এই আনন্দোৎসব-পূর্ণপুরীর মধ্যে রাজীব নিতান্ত দীনহীনের মত সঙ্কুচিতভাবে গিয়া দাঁড়াইল। এই কি সেই কমল!

উৎসব শেষ হইয়া গেলে, যখন কমলা-কান্তের প্রশ্নের উত্তরে রাজীব তাহার বর্ত্তমান অবস্থা সমস্ত জানাইল, কমলা-কান্ত অনুগ্রহপূর্ব্বক আনুপূর্ব্বিক সমস্ত শুনিলেন। সব শুনিয়া রাজীবের অদৃষ্টকে তিরস্কার করিয়া, তাহার বুদ্ধিকে নিন্দা করিয়া শেষে বলিলেন "তুমি আমার দিকে চাহিয়া দেখ, পুরুষ মানুষ কাহাকে বলে! তুমি কোনও কাজ পার না, কেবল মেয়ে মানুষের মত ঘ্যান ঘ্যান করিতে এসেছ। তোমার মত লোকের যে কি উপায় হইবে, তাহা আমার বুদ্ধির অগোচর।"

রাজীব আর বন্ধুর গৃহে তিলার্দ্ধ দাঁড়াইল না। রাস্তায় গিয়া চক্ষুর জল মুছিল।

রাজীবের পঞ্চদশবর্ষীয়া পত্নী শ্যামা সুন্দরী। যদিও তাহার রঙ্ ফর্‌সা নহে, (উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা) শরীর ক্ষীণ, বিধবা মাতার সন্তান, স্বামীর উপেক্ষিতা, তথাপি তাহার মধ্যে পত্নীর প্রাণ ছিল। স্বামীর অবস্থা বিবেচনা করিয়া কাজ করা, তাঁহার সুখ দুঃখে সহানুভূতি করা, তাঁহার কোনরূপ সহায়তা করিতে পারিলে নিজে বিশেষ তৃপ্তিলাভ করা, এ সবই সে পারিত।

আজি রাত্রিতে কলিকাতা হইতে প্রত্যাগত রাজীব নিজের শয়ন ঘরে তাহার মা'কে ডাকিয়া আনিল। তার






পরে সাশ্রুনেত্রে গোপনে গর্ভধারিণীর কাছে কমলাকান্তের সমস্ত কথাই বলিল। মা বিধাতাকে স্মরণ করিয়া, অদৃষ্টের আলোচনা করিয়া বলিলেন "বাবা! পর কি কখনও আপনার হয়?" হায় রে! আজ যদি রমানাথ বাবু তোমার শ্বশুর হইতেন" ইত্যাদি বলিয়া মনের ক্ষোভ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

অদূরে পালঙ্কেরে উপর শ্যামা সুন্দরী ঘুমাইতেছিল। মাতা পুত্রের কথা বার্ত্তার মধ্যে তাহার ঘুম ভাঙিয়াছিল। সে নিদ্রিতের মত পড়িয়া থাকিয়া সমস্ত কথা শুনিল।

শুনিয়া শ্যামার আর ঘুম হইল না। শ্যামা বড় বুদ্ধিমতী মেয়ে। সে দরিদ্রা মাতার কন্যা, সুতরাং তাহাকে অনেক ঘটনার মধ্য দিয়া বর্দ্ধিত হইতে হইয়াছে, সেই জন্য তাহার সমবয়স্কাদিগের অপেক্ষা তাহার বুদ্ধি বিবেচনা অধিকতর বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল। শ্যামা অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত স্বামীর কর্ত্তব্য বিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিল।

অতি প্রত্যূষে রাজীব তাহার বাটীর অনতিদূরে নদীর কূলে গিয়া বসিল।

ভৈরবী নদী আঁকিয়া বাঁকিয়া ঢেউ খেলাইতে খেলাইতে সাগরাভিমুখে ছুটিয়াছে। তীরে বাঁশের ঝাড় হেলিতেছে দুলিতেছে, তাল, খেজুর, নারিকেল গাছ সকল খাড়া হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। আম, অশ্বত্থ, বটের বিপুল দেহে বিহঙ্গরাজি সুমধুর কাকলী করিতেছে। রাজীব সেই জনশূন্য স্থানে বসিয়া জলের দিকে চাহিয়া তাহার প্রতি কমলাকান্তের ব্যবহারের কথা ভাবিতেছিল। হায়! এই কি সেই কমলাকান্ত?

শ্যামা পল্লিগ্রামের গৃহস্থ ঘরের বধূ। সে ঘড়া লইয়া সেই ঘাটে জল লইতে আসিল। তাহার মাথায় ঘোম্‌টা, পরণে লাল পেড়ে শাড়ী, মুখে প্রফুল্লতা। পূর্ব্বাশার আলোক তাহার সুন্দর মুখখানির উপরে পড়িয়া উহা রঞ্জিত করিয়াছিল। রাজীব অন্যমনে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া সহসা শিহরিয়া উঠিল। শ্যামা কি সুন্দরী নয়? রাজীব সুন্দরী দেখিয়াছে বটে, কিন্তু এমন সুশ্যামা, পুষ্পলতিকা তুল্যা, এমন সুগঠনা, এমন হরিণাক্ষী, এমন সর্ব্বাঙ্গশোভনীয়া লক্ষ্মীপ্রতিমা তো রাজীব আর কোথাও দেখে নাই! এই শ্যামাকে বিবাহ করিয়া কিনা সে আপনাকে "হতভাগা" ভাবিয়াছিল, এই শ্যামাকে সে প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিতে পারে নাই?

বন্ধুর নৃশংসতা, দরিদ্রতার ক্লেশ, ঋণের দারুণ চিন্তা, সেই মুহূর্ত্তে সব ভুলিয়া, অনুতপ্ত রাজীব শ্যামার খুব কাছে গিয়া দাঁড়াইল। বড় আদর করিয়া তাহাকে বলিল, "এত ভোরে ঘাটে এলে কেন শ্যাম?"

সকালবেলায়, নদীর ঘাটে স্বামীকে এত কাছে দাড়াইতে দেখিয়া শ্যামা বড় লজ্জিতা হইতেছিল, কিন্তু "শ্যাম" শুনিয়া তাহার বড় হাসি আসিল। শ্যামা হাসিয়া কুটি কুটি হইল।



রাজীব অপ্রতিভ হইল না। সেই সরলতা মাখা হাসি দেখিয়া তাহার আরো বেশী আদর করিতে ইচ্ছা হইল। কিন্তু নদীর ঘাটে আর বেশী চলে না, মুগ্ধ-নেত্রে রাজীব দাঁড়াইয়া রহিল।

হাসি সংযত করিয়া শ্যামা ঘড়া ভরিয়া কাঁকে তুলিল। শেষে চারি দিকে চাহিয়া, মৃদুস্বরে স্বামীকে বলিল "তোমার সঙ্গে আমার একটা বড় কথা আছে, তুমি বাড়ী চল।"

প্রায় তিন বৎসর ইহাদের বিবাহ হইয়াছে, রাজীব ইহার মধ্যে কোন দিন শ্যামাকে এমন চক্ষে দেখে নাই, শ্যামাও কোন দিন তাহাকে এমন করিয়া ডাকে নাই, বিস্মিতচিত্তে রাজীব বাড়ী গেল।

স্বামীকে নির্জ্জনে পাইয়া শ্যামা কতক সঙ্কোচে, কতক আনন্দে, তাহার দরিদ্র মাতার প্রদত্ত যৌতুক সতরটী টাকা এবং এক যোড়া অনন্ত স্বামীর হাতে দিল, তারপরে মৃদু স্বরে বলিল, "ইহা দিয়া তুমি কৃষি কাজ কর, তোমার সব অভাব ঘুচিবে। আমার মা বলিয়া থাকেন, মা বঙ্গভূমির কাছে ভিক্ষা করিলে তিনি সোণা ভিক্ষা দিয়া থাকেন"। মনের আবেগে কথাগুলি বলিয়া শ্যামা অপ্রতিভ হইল।

বিস্মিত বিমুগ্ধ নেত্রে রাজীব সেই বালিকা পত্নীর মুখ পানে চাহিল। নিজের প্রতি ধিক্কারে এবং অভাবনীয় আনন্দে তাহার হৃদয়ে তুফান উঠিতে লাগিল। চক্ষে জল আসিয়াছিল, কিন্তু লজ্জায় তাহা সবরণ করিল। শেষে সে শ্যামাকে বলিল "তুমিই আমার লক্ষ্মী, তুমিই আমার বন্ধু!"

কয়েক বৎসরের মধ্যে শ্যামার কথা সফল হইল। সুজলা, সুফলা, মলয়জশীতলা, মা, তাঁহার ভিক্ষুক সন্তানকে পুঞ্জীকৃত স্বর্ণরাশি ভিক্ষা দান করিলেন। রাজীবের বাড়ীতে গোলাভরা ধান, গোহাল-ভরা গরু, এবং প্রাণভরা আনন্দ হইল। রাজীব পিতৃকৃত সমস্ত ঋণ পরিশোধ করিল।

সন্ধ্যার পরে শিশুর জননী শ্যামা সুন্দরীর হাত ধরিয়া রাজীব যখন বলিল "অর্দ্ধং ভার্য্যা মনুষ্যস্য ভার্য্যা শ্রেষ্ঠতমঃ সখা," তখন হাসিয়া শ্যামা হাত ছাড়াইয়া লইয়া বলিল, "ও সব মন্ত্র টন্ত্র রাখ, ঐ দেখ মা আসিতেছেন"।

আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে শুনিয়াছি, এখন রাজীব বন্ধু কমলাকান্তের অনেক উপরে তাহার পত্নীর আসন প্রতিষ্ঠা করিয়াছে।

লেখিকা

শ্রী মা—

স্বর্গীয় মহাত্মা রামতনু লাহিড়ী।

আজ তুমি কোন্ স্থানে, কোন পুণ্য শান্তিময় লোকে—
হে সাধকবর!—
বিরাজিছ স্নিগ্ধ শান্ত চিরোজ্জ্বল নির্ম্মল আলোকে
দীপ্তকলেবর।
সেথা কি শুনিছ নিত্য মনোহর মন্দাকিনীগীতি,
শ্রবণরঞ্জন?
নন্দনের গন্ধবহ মন্দ বায়ে উথলিছে নিতি
প্রীতিপ্রস্রবণ?
সেথা কি সকলি চারু নিত্য নব সুষমামণ্ডিত?—
হে চিরনন্দন!—
ধ্বনিছে কি অবিরত কলরব সুখহাস্যোত্থিত?
নাহিক ক্রন্দন?
শষ্পশিরে হিমকণা প্রভাতের অরুণকিরণে
হয় কি বিলীন?
গগনের জ্যোতিবিন্দু লুকায় কি ঊষা সমীরণে
বিষাদমলিন?
হেথায় কুসুমরাজি ঝ'রে যায় অর্দ্ধবিকশিত,—
হে পূর্ণবিকাশ!—
জীবনপয়োধি নিত্য আলোড়িছে ভীম উচ্ছ্বসিত
ও রঙ্গবিলাস।
চঞ্চল সুখের রেখা মাঝে মাঝে আসে পথহারা
অতিথির বেশে,
বসন্তের শান্ত শোভা ঢালে প্রাণে অমৃতের ধারা
শুধু বর্ষশেষে।
তুমি তাজিয়াছ দেহ, দ্বাদশ বরষ তার পরে,—
হে বিনাশাতীত!
কুজ্ঝটিকাসমাচ্ছন্ন অতীতের অনন্ত গহ্বরে
হ'য়েছে সঞ্চিত।

কিন্তু তুমি রে'খে গে'ছ যে আদর্শ উদার মহান্
এ পৃথিবীতলে,
র'বে তাহা সমভাবে নির্ব্বিকার চির দীপ্তিমান্
তব পুণ্যফলে।
শূন্যচারী পুণ্যদেহ পথভ্রষ্ট দেবদূত সম—
হে নাকনিবাসী!—
পাপময় ধরাপরে এসেছিলে তুমি অনুপম
মাধুরী বিকাশি।
তব অভিরাম তনু যে দেখেছে যে শুনেছে বাণী
উপদেশময়ী,
পূজিয়াছে ভক্তিভরে সেই তব চারুমূর্ত্তিখানি
শোকতাপজয়ী।
তোমার মানসশক্তি অবিচল হিমাদ্রির মত—
হে মনস্বী বীর!—
কাঁপেনি টলেনি কভু শোকতাপ ঝঞ্ঝাবাত্যাহত,—
নির্ভীক সুস্থির।
লাঞ্ছনার শক্তিশেল, মর্ম্মদহী তীব্র গঞ্জনার
সায়কনিচয়,
ফিরিয়া এসেছে ব্যর্থ, পারে নাই করিতে তোমার
হৃদি দুর্গ জয়।
উপাখ্যান সম তব লোকাতীত সহিষ্ণুতা গাথা—
হে মহিমাময়!—
জাগায়, বিমুগ্ধ স্তব্ধ হৃদিমাঝে সমসূত্রে গাঁথা
ভকতিবিস্ময়।
আকুল ক্রন্দন মাঝে গতজীব প্রিয় পুত্র যার
ভূতলশয়নে,
ঢালে সে অন্যের কর্ণে উপদেশবাণী সুধাসার
নিরশ্রু নয়নে!
ধন্য তব ঈশপ্রেম, যার শুভ্রজ্যোতিবিনিঃসৃত—
হে ভক্তপ্রধান!—
দেখাইত নিত্য তোমা কর্ত্তব্যের পন্থা সুবিস্তৃত

চির-গরীয়ান্।
বিপদের গাঢ় তমঃ আবরিছে চারিধারে যবে
ঘোর ভয়াবহ,
হৃদয়মন্দির তব তবু বিভুগুণ গানোৎসবে
মগ্ন অহরহ।
সত্যের অক্ষয় ভাতি যার মাঝে উঠিয়াছে ফুটি—
হে সত্যশরণ!—
লঙ্ঘি শত অন্তরায় তার (ই) পানে গে'ছ তুমি ছুটি
করিতে বরণ।
অবজ্ঞার ব্যঙ্গহাসি, ভ্রান্তিময় রূঢ় কলরব
তৃণসম গণি,
ঊর্দ্ধবদ্ধদৃষ্টি তুমি, নি'য়ে গেছ স্থিরগতি তব
জীবন তরণী।
পুরাতন ধর্ম্মমূলে স্বতঃজন্মা আবর্জ্জনারাশি—
হে লোকশিক্ষক!
ম্লান করে বিটপীর আদি সত্য তেজ অবিনাশী
দিগন্তব্যাপক।
তাই আসে মাঝে মাঝে ধরাধামে ধাতার আদেশে
মনীষিনিচয়।
স্বর্গ হ'তে এসেছিলে সেইরূপ শিক্ষকের বেশে
তুমিও নিশ্চয়।
সৌজন্যের প্রতিমূর্ত্তি! নম্রতার সজীব প্রতিমা!
হে উদারপ্রাণ!
অস্ফুট কমল যথা ঢেকে রাখে নিজ মাধুরিমা
পরাগশয়ান,
শালীনতা ঘনচ্ছায়ে তেমতি গরিমা লেখা তব
ছিল আচ্ছাদিত।
তবু বঙ্গদেশময় তব পুণ্য যশোগীতিরব
আজিও ধ্বনিত।
হেথায় মালঞ্চে তব নাহি আর সে পূর্ব্ব সুষমা,
হে উদ্যানপতি!

তোমার সে নবোদ্গতা কমনীয়া লতা প্রিয়তমা
মধুরমূরতি।
একটী মুকুল রাখি শুকাইয়া গে'ছে নিরদয়
কাল বজ্রপাতে,
তাই আজি ম্রিয়মাণ সকলি বিষাদছায়াময়,
প্রচণ্ড আঘাতে।
স্বর্গ সিংহাসন হ'তে একবার এস অবতরি,—
হে মুক্ত অমর!—
অলক্ষ্যে হৃদয়ে নব সঞ্জীবনী শকতি বিতরি—
অমিয়নির্ঝর—
আবার ফুটাও হাসি, পূর্ব্বাশার উষারাগ সম
নিশা অবসানে।
শিখাও সে প্রাণোৎসর্গ, দেয় যাহা শান্তি মনোরম
শোকদগ্ধ প্রাণে।
"কীর্ত্তিমান্ চিরজীবী"—সার্থক এ সারগর্ভ বাণী,
হে কীর্ত্তিভূষণ!
অমর সে, মানবের ভক্তিবারি বিধৌত পরাণি
যাহার আসন।
হে দেব! তোমার কাছে যুক্তকরে উচ্ছ্বসিত মনে
এ আশীষ মাগি।
তোমারি পদাঙ্ক যেন অনুসরি জীবন ভ্রমণে
তব অনুরাগী।

শ্রীঅনুকূল চন্দ্র ভট্টাচার্য্য বি, এ।

নূতন সংবাদ।

১। ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় নিম্ন লিখিত দুইটী ছাত্রী বৃত্তি পাইয়াছে :—

বিভাবতী মিত্র বেথুন কলেজ ২৫৲ ও শান্তা চট্টোপাধ্যায় বেথুন কলেজ ২০৲ টাকা।

২। হাইকোর্টে জুবিলি উপলক্ষে

আগষ্ট মাসের শেষে কলিকাতাবাসীদিগের পক্ষ হইতে টাউন হলে জজদিগকে ভোজ দেওয়া হইবে।

৩। কিছুদিন পূর্ব্বে বিলাতে রেসমী দ্রব্যের একটী প্রদর্শনী হইয়াছিল। মহারাণী মেরী তাহার মধ্যে ভারতোৎপন্ন রেশমী দ্রব্য দর্শন করিয়া অত্যন্ত মুগ্ধ হইয়া কতকগুলি দ্রব্য ক্রয় করিয়াছেন। মৃতপ্রায় ভারতে শিল্প এখনও যাহা আছে তাহা দর্শন করিয়া বিদেশী শিল্পপ্রধান দেশের লোক সকল বিমুগ্ধ হন। কেবল ভারতবাসীরাই তাহাদের নিজের ঘরের অমূল্য রত্নের আদর করিতে এখনও জানিল না।

৪। বর্ম্মিংহাম বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপক মিঃ ই, ই, ফোর্ণিয়ার ডি, এল, বি, আপ্টোফোন নামক এক নূতন যন্ত্রের আবিষ্কার করিয়াছেন, এই যন্ত্র গন্ধক হইতে উৎপন্ন সিলিনিয়াস নামক পদার্থের সাহায্যে প্রস্তুত করা হইয়াছে। ইহার সাহায্যে অন্ধ আলো দেখিতে পায়। এই যন্ত্রের সাহায্যে জিনিষের এক প্রকার শব্দ শুনিতে পাওয়া যায় এবং তাহা দ্বারা এক জিনিষ হইতে অন্য জিনিষের পার্থক্য বুঝিতে পারা যায়। সূর্য্য ও চন্দ্রের আলোর শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। কোন জিনিষের ছায়াপাত হইলে তাহারও শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। অন্ধগণ ইহার সাহায্যে জিনিষ চিনিতে পারিবেন। অধ্যাপক মহাশয় তিন বৎসর পরিশ্রমের পর এই যন্ত্রের আবিষ্কার করিয়াছেন। বিজ্ঞান দ্বারা দিন দিন যে কত আশ্চর্য্য ব্যাপার সাধিত হইতেছে তাহা দেখিয়া অবাক্ হইতে হয়।

৫। ইণ্ডিয়ান স্পেক্টেটর পত্রের সম্পাদক মিঃ মালাবারী গত ১১ই জুলাই বাতরোগে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। ইনি একজন সমাজসংস্কারক ও কর্ত্তব্য-পরায়ণ লোক ছিলেন।

৬। অসিলোগ্রাফ নামক আর একটী যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা দ্বারা হৃদ্-যন্ত্রের ক্রিয়ার ফটোগ্রাফ লইতে পারা যায়। ইহার সাহায্যে নাড়ীর গতি, শ্বাস প্রশ্বাসের অবস্থা, হৃদ্‌যন্ত্রের বৈদ্যুতিক অবস্থা ও স্পন্দনের শব্দ প্রভৃতি সমুদয় অবস্থা ফটোগ্রাফের দ্বারা অবগত হওয়া যায়।

৭। ফেণী মহকুমার অধীন একগ্রামে বাসিরুদ্দিন নামক এক রুগ্ন বৃদ্ধ তাহার শেষ পক্ষের পোঢ়া স্ত্রীকে একদিন ডাকিয়া অতি কাতর স্বরে বলে যে, আমার মৃত্যুর পরে তুমি আমার অসহায় শিশু কয়টীকে পরিত্যাগ করিয়া পত স্বর গ্রহণ করিও না, আমার মৃত্যু সময়ের এই কথাটী পালন করিও। পত্নী এ কথার কোন উত্তর করিল না। সে কেবল বৃদ্ধের মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিল এবং কিয়ৎক্ষণ পরে অবসন্নদেহে তাহার পার্শ্বে ঢলিয়া পড়িল। সকলে দেখিল সাধ্বী সতীর প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া গিয়াছে।

৮। নাভার মহারাজা তাঁহার পর-

লোকগত পিতা মহারাজ হারা সিংএর স্মৃতিরক্ষার্থ প্রজাবর্গকে শিক্ষা দিবার জন্য দেড় লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। এই টাকার সুদ হইতে প্রজাগণ জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে বিদেশে শিক্ষার জন্য গমনের ব্যয় প্রাপ্ত হইবে।

বামারচনা।

প্রার্থনা।

জগদীশ! তব পাশে,
কি আর যাচিব আমি।
সবি তো দিয়েছ মোরে,
হে মোর হৃদয়স্বামী॥
আজিকে যাচি গো শুধু
তোমার চরণতলে।
ওপদ পুজিয়ে যেন
যেতে পারি তব কোলে॥
কে আছে, নয়নে যার
ঝরে নাই অশ্রুজল?
দহে নাই কার হৃদি
দুর্ব্বিষহ শোকানল?
সে সকল দুঃখে যেন
নাহি হই বিচলিত।
তোমার অসীম প্রেমে
পাবে বল মোর চিত॥
দাও প্রাণে নব বল,
হৃদে তব প্রেমালোক।
মোহান্ধতা কেটে যাবে,
ভুলে যাব দুঃখ শোক॥
হৃদয়ে ভকতি দিয়ে
রাখ তব পদছায়।
তোমারই কার্য্যে যেন
(এ) জীবন কাটিয়া যায়॥

পরসুখে সুখী হ'য়ে
পরদুখে দুখী হই।
পরের আনন্দে যেন
আনন্দিত হ'য়ে রই॥
পরতরে যেন সদা
জীবন যাপিতে পারি।
কভু যেন নাহি আসে
দুর্দ্দান্ত ভীষণ অরি॥
তব জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি
জাগুক্ এ হৃদিমাঝ।
নিষ্কাম নিঃস্বার্থ প্রাণে
সাধি যেন তব কাজ॥
যে কার্য্য সাধিতে প্রভো!
পাঠায়েছ এ সংসারে।
সে কার্য্য সাধিয়ে যেন
যেতে পারি পরপারে॥
মাতিয়া অসার সুখে,
ছিনু প্রভো তোমা ভুলে।
তাই কি পতিরে মোর
নিজ কোলে নিলে তুলে!
তাহাতে ব্যথিত কেন
আজিকে হইব প্রভো!
তুমি দিয়াছিলে পতি,
তুমি তো লইলে বিভো!




ধরিয়া রাখিতে মোরা
কাহাকেও পারিব না।
সময় হইলে লবে,
ক্রন্দন তো শুনিবে না!
এখন বুঝেছি প্রভো!
এ সবি স্বপনময়।
খেলা ধূলা সাঙ্গ হ'লে
তোমাতে হইব লয়॥
দুদিনের তরে সবে
খেলিতে তোমার খেলা।
মোহেতে ডুবিয়া থাকি,
দেখি না যে হ'ল বেলা॥
এ যে তব লীলা খেলা,
তাহা তো বুঝি না মোরা।
সংসারে ডুবিয়া থাকি,
হয়ে শ্রান্ত পথহারা॥
স্বরগের পথ প্রভো,
মোদের দেখায়ে দাও।
মোহনিদ্রা ভেঙ্গে দিয়ে
তব কোলে তুলে লও॥
আসিয়া বস হে
শূন্য এ হৃদয়াসনে।
স্বর্গসুখে রব আমি,
লভিয়া পরম ধনে॥

শ্রীমতী প্রিয়বালা চৌধুরাণী,
সিকদারবাগান।

সতী বিদায়।

নব বৈশাখের নবম নিশীথে,
চন্দ্র তারা মিলি ভেটিল দোঁহাতে,
নীরবে হুতাশে পরিম্লান চিতে,
ধরণী আনন মলিনা হেরি।

স্তব্ধ দশ দিশি স্তব্ধ তরু লতা,
তন্দ্রাহীন আঁখি নাহি কহে কথা,
বিটপে বিহগী চমকিছে তথা,
কি যেন তরাসে মরিছে ভরি।

বিরহ সমীর তীব্র জ্বালা সনে,
বিদায়বারতা দিয়ে গেল প্রাণে,
সতর্ক করিল প্রতি মনে কাণে,
বাঁধ হিয়া দৃঢ় পুরুষ নারী।

এত দিন ধরে আদরে যতনে
যে প্রেম রোপিয়া হৃদয় অঙ্গনে
ফল ফুল শোভা দিল প্রাণ মনে
আজি অবসান হলো যে তারি।

নীরবে আকুলে ভাবিতে ভাবিতে,
তাড়িত লহরী সমান চকিতে,
জ্বালাময়ী কাল আসি আচম্বিতে,
তখনি শিয়রে দাঁড়াল ঘেরি!

কোমল শয্যায় আছিলা শয়ানা,
বজ্র ব্যথা বক্ষে ধীরা বরাননা,
বিষম বিকারে চৈতন্যবিহীনা,
শুষ্ক লতা সম লুটায় মরি!

সীমন্তে সিন্দুর অলক্ত চরণে,
শান্ত স্থির আঁখি প্রশান্ত বদনে,
সাধ্বী পতিব্রতা নিমগ্ন ধেয়ানে,
হরিপ্রেমে মজি সে পদ স্মরি।




আরোহি সুভগে পুষ্পক বিমানে,
পতি-পদরেণু সর্ব্বাঙ্গ লেপনে,
যেন সৌরভিত পবিত্র চন্দনে,
সুসজ্জিতা সতী সধবা বেশে।

স্বরগে মরতে দুন্দুভি বাজিল,
দেব নরে মিলি ধন্যবাদ দিল,
পুণ্য তীর্থে পশি পুণ্য প্রকাশিল
পবিত্র জাহ্নবী ডাকিল হেসে?

সঞ্চিত প্রণয় ফুরাইল আজি,
গৃহরাজ্যে ছিল দেবীরূপে সাজি,
ভক্ত সম ছিনু তার প্রেমে মজি
যে দিন প্রথম হেরি নয়নে।

বসিয়ে বিরলে মন্দাকিনী তীরে,
ফেলি অশ্রুরাশি সে নির্ম্মল নীরে,
অতীতের সুখস্মৃতি মর্ম্মরে,
তরঙ্গে তরঙ্গে ঘোর গর্জ্জনে।

বহু বর্ষ ব্যাপি সুখদুখছায়া,
ভালবাসা, স্নেহ, সখ্য, দয়া, মায়া,
নিজ নিজ রূপে সদা প্রকাশিয়া,
হর্ষ বিষাদে রেখে ছিল ঢাকি।

কেটে গেল আজি সেই কুহেলিকা,
কোথা সে সঙ্গিনী কোথা সৌহৃদ্যতা,
কত ব্যবধান কে দেয় বারতা,
ঘুচিল সম্বন্ধ সকলি ফাঁকি।

অসার ক্রন্দন শোকের আগুনে,
পোড়ায় মানবে জীবন্ত জীবনে,
ছিন্ন ভিন্ন করে বিষাদ তুফানে,
বিসম পরীক্ষা বিধির লিপি।

ধৈরজ অঞ্চলে আবরিয়া তনু,
যদি চাহে প্রাণ মুছি শোক রেণু,
প্রেম মূরতি ঝলে অণু অণু
ভুলায়ে দেয় গো চৈতন্যরূপী॥

শ্রীমনোজবা রচয়িত্রী।

"মিহিরের শিশু"।

চারিদিকে শোক তাপ সকরুণ হাহাকার।
কেরে তুই ক্ষুদে ছেলে, কৃপা কণা দেবতার,
তুই কিরে পারিজাত অমরবাঞ্ছিত ফুল?
তুই কি দেবের শিশু এসেছিস্ করে ভুল?
অতি অভাগিনী আমি, শোকদগ্ধ হিয়া,
কি করে রে জুড়াইলি, বল্ কোন্ সুধা দিয়া?
ব্রহ্ম কমণ্ডলে তুই ছিলি কি "স্বরগ সুধা"?
সিঞ্চিলেন বিধি বুঝি হেরি
হেথা মৃত্যুবাথা।
তোর ওই মুখ চেয়ে,
স্নেহ উঠে বক্ষ ছেয়ে,
উথলি উঠেরে চিতে সপ্ত পারাবার,
ভেসে আসে আঁখি-আগে জ্যোতিরাশি তাঁর।
অনন্ত প্রেমের হরি কণা তুই যাঁর,
যত দেখি যায় সাধ আরো দেখিবার,
আয় রে সোণার ছেলে কোলে একবার,
তুই এক মহৌষধি বুক জুড়াবার।
ধর আশীর্ব্বাদ এই "দীনা পিসীমার."
কি আছে রে অনুপম! তব উপমার?
তোমারে দিবার মত,

কিছু মোর নাহি রে ত,
সুধু যাচি তব তরে কৃপা দেবতার!
মা, বাপের গ্লানি হর,
বংশে হও "চিরস্মর,"
চিরজীবী, স্নেহ, প্রীতি, করুণা আধার,
পুরাইও সব সাধ "দাদা, ঠাকুমার!"
যে গৃহে এসেছ তুমি
তুলনায় স্বর্গভূমি
উচ্ছ্বসিত মন্দাকিনী প্রীতি মমতার,
প্রবাহিছে হেথা সদা অতল অপার!
স্বীয় পুণ্যপ্রভাগুণে,
উজলিয়ে এ ভবনে,
ঢালিও রে শান্তিধারা হৃদয়ে সবার,
তব হতে তৃপ্ত হোক্ নিখিল সংসার।
ওরে মিহিরের শিশু, প্রাণাধিক ধন,
কি তোরে বলিব আর।
"বালসূর্য্যরূপী" তুমি প্রভাতকুমার,
হরিপদ শিরে ধরি জীবনের পথে চল
অনিবার।

আশীর্ব্বাদিকা
তোমার পিসীমাতা
সুশীলা।

দর্প হরণ। *

হায়　তখনো হাসিছে তারা!
উছলি পড়িছে কোমল কিরণ
লইয়া মাধুরীধারা!
জ্ঞানের বুদ্ধির জয়ধ্বজা তুলি,
মহা পারাবারে বহে হেলি ঢুলি,
ইন্দ্রপুরী সম "টিটানিক" পোত
গরবে হৃদয়হারা!
হায়　তখনো হাসিছে তারা!
কারো　নাহিক ভাবনা ভয়!
জননীর বুকে যেমতি তনয়
তেমতি পুলকে রয়।
জ্ঞানী গুণী জন ঘোষিল গৌরবে,
শোলা ডুবে যাবে তাও গো সম্ভবে,
তবু "টিটানিক" নিমগন হবে
এ কভু সম্ভব নয়,
কারো　নাহিক ভাবনা ভয়!

অহো!　সহসা একি গো হায়!
হিমগিরিঘাতে চূর্ণ "টিটানিক"
ধরা অচেতনপ্রায়।
না হইতে সুখনিশি অবসান,
কত শত দীপ অকালে নির্ব্বাণ।
কেহ পতিহারা কেহ পুত্রহারা
ওগো!　শোকানল নভঃ-ছায়।
ভবে　মানবশকতি কত!
দর্পে, গর্ব্বে, জ্ঞানে ঘোর অজ্ঞানতা
যেন ছেলেখেলা মত।
রহে একজন ধারণা অতীত,
তাঁর ঠাঁই সব গর্ব্ব পরাজিত,
তাঁর অতুলন শকতির কাছে
বিশাল জগত নত!
ভবে　মানবশকতি কত!

শ্রীহেমন্তবালা দত্ত।

* "টাইটানিক" জাহাজ মগ্ন হওয়া উপলক্ষে রচিত।

মন্দির-পথে।

গগনের ভালে, দিক্ চক্রবালে,
ভেদ করি শুভ্র মেঘরাজি।
প্রসারি কিরণ, নবীন তপন,
উঠিতেছে নব রঙ্গে সাজি॥
পূজার সম্ভার, ভকতি অপার,
পূজিতে আজি বিশ্বজননী।
অতি সমাদরে, ঐ বিশ্বমন্দিরে,
গদ্‌গদচিতে চলিছে রমণী॥
সুদূরে আকাশে, কি আনন্দ ভাসে,
আরতি-প্রদীপ উঠেছে জ্বলি।
আলোকে ঝলক, জাগিছে পুলক,
নিখিল জগতে শোভে সকলি॥
বায়ুভরে বীণা, বাজে বীণা ঝিনা,
কুসুমচয় উঠিতেছে ফুটি।
রমণী যতনে প্রফুল্ল পরাণে,
পূজিতেছে তাঁর চরণ দুটি॥
কর আশীর্ব্বাদ, যাক্ অবসাদ,
হে অভয়া অই কর তুলি।
লহ লহ দান, পূর্ণ মন প্রাণ
দেহ স্থান মোরে ভক্ত বলি॥

কুমারী সুনীতি ভাদুড়ী,
কেশব-ধাম,
বেনারস।

ভ্রমসংশোধন।

বৈশাখ মাসের প্রায়শ্চিত্ত উপন্যাস শ্রীমতী নিরুপমা দেবীর লিখিত। ভ্রমবশতঃ নিরুপমা দেবীর স্থানে অনুরূপা দেবী ছাপ হইয়াছিল।

বামাবোধিনী কার্য্যালয়ের নম্বর পরিবর্ত্তিত হইয়া ৩৯ নং হইয়াছে। গ্রাহক গ্রাহিকা ও লেখক লেখিকাগণ এখন হইতে ৩৯ নং আণ্টনিবাগান লেন, কলিকাতা, এই ঠিকানায় পত্রাদি ও মূল্যাদি প্রেরণ করিবেন।

১৩।৪ মধুরায় লেন, ইণ্ডিয়ান্ প্রেসে শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত
ও
শ্রীসন্তোষ কুমার দত্ত কর্তৃক ৩৯ নং আণ্টনিবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫০ বর্ষ। | ভাদ্র, ১৩১৯ সেপ্টেম্বর, ১৯১২। | ১০ম কল্প। ১ম ভাগ।

৫৮৯ সংখ্যা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২।৵০, অগ্রিম ষাণ্মাসিক ১।৴৹, পশ্চাৎ দেয় বার্ষিক ৩৲ টাকা মাত্র

Cover Printed at the Jayanti Press, 77, Pataldanga Street Calcutta.

সূচীপত্র।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 589. September, 1912.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫০ বর্ষ। ৫৮৯ সংখ্যা। | ভাদ্র, ১৩১৯। | ১০ম কল্প। ১ম ভাগ।

বামাবোধিনীর পঞ্চাশৎ জন্মোৎসব।

যে মঙ্গলময় বিশ্ববিধাতার অশেষ কৃপায় বামাবোধিনী এই সুদীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসর কাল ভারতের রমণীগণের সেবা করিয়া পুনরায় নববর্ষে পদার্পণ করিতে সক্ষম হইয়াছে, আজ বিশেষ ভাবে সেই বিশ্বদেবের চরণে কৃতজ্ঞ হৃদয়ে প্রণত হইয়া তাঁহার কৃপা ও আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করি। মঙ্গলময় প্রভু! তুমি এই সুদীর্ঘ কাল শত বিঘ্নবাধা হইতে রক্ষা করিয়া এই পত্রিকাকে তোমার সেবায় নিয়োজিত রাখিয়াছ ও ইহার উদ্দেশ্য সাধনের সহায় হইয়া রহিয়াছ। তুমি কৃপা করিয়া ইহার ক্ষুদ্র প্রাণকে রক্ষা করিয়াছ, তাই আজও ইহা জীবিত আছে। দয়াময়! তুমি ইহাকে আরও সুচারুরূপে ইহার উদ্দেশ্য সাধনে সক্ষম কর ও ইহাকে দীর্ঘজীবিনী কর, তোমার চরণে এই আমাদের প্রার্থনা।

১২৯৫ সালের ভাদ্র মাসের সংখ্যায় বামাবোধিনীর যে ইতিহাস প্রকাশিত হইয়াছিল আমরা আবার তাহাই প্রকাশ করিতেছি। "১২৭০ সালের ভাদ্র মাসে বামাবোধিনীর জন্ম হয়। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে যখন এদেশের স্ত্রীজাতির অবস্থা অতি হীন ছিল, তাঁহাদিগের শিক্ষার্থ বিদ্যালয় সকল অঙ্গুলির অগ্রে গণনা করা যাইত, তাঁহাদিগের পাঠ্য পুস্তকের সংখ্যা অতি অল্প ছিল, তাঁহাদিগের বিশেষ অভাব পূরণ জন্য একখানিও সাময়িক পত্রিকা বিদ্যমান ছিল না, তাঁহাদিগের উন্নতির জন্য একটীও নারী-সভা স্থাপিত হয় নাই, কেবল কতকগুলি দেশহিতোৎসাহী কৃতবিদ্য পুরুষ "স্ত্রী-জাতির বিদ্যা শিক্ষার আবশ্যকতা" বিষয়ে প্রকাশ্য সভায় বক্তৃতাদি করিতেন,

সেই সময়ে এই বামাবোধিনীর সূচনা হয়। যশোহরনিবাসী আমাদিগের শ্রদ্ধেয় বন্ধু পরলোকগত বাবু বসন্তকুমার ঘোষ কলিকাতাস্থ রঘুনাথ চাটুয্যের লেন ১৬ নং বাটীতে আসিয়া অবস্থিতি করেন। স্ত্রীলোকদিগের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতির সহায়তার জন্য একখানি সাময়িক পত্রিকার নিতান্ত প্রয়োজন, এই বলিয়া তিনি এই কার্য্যে আমাদিগের কয়েকজনকে অগ্রসর হইবার জন্য উৎসাহিত করেন। ইহাঁরই বিশেষ উদ্যোগে বাসার এক ক্ষুদ্র গৃহে আমাদিগের এক বন্ধুসমিতি হয়, তাহাতে পত্রিকার নামকরণ লইয়া অনেক কথা হয়, অবশেষে আমাদিগের প্রিয় "বামাবোধিনী" নামটী কোমল, সরল ও উদ্দেশ্যসাধক বলিয়া সর্ব্বসম্মতিতে গৃহীত হয়। এই সমিতিতে আরও স্থিরীকৃত হয় যে, যশোহরে গিয়া আমাদিগের বন্ধুবর এক ছাপাখানা খুলিয়া এই পত্রিকা সম্পাদনে প্রবৃত্ত হইবেন, এবং লেখা বিষয়ে আমরা তাঁহার সাহায্য করিব। কিছুদিন চলিয়া গেল, পীড়া ও অন্যান্য কারণে বন্ধুবর আপন সঙ্কল্পসিদ্ধি করিতে পারিলেন না। কলিকাতায় যাঁহারা ছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ উদ্দেশ্যসিদ্ধির ব্যাঘাত দেখিয়া শুভ কার্য্যের সূত্রপাতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তখন তাঁহারা অল্পবয়স্ক, তাঁহাদিগের অর্থবল, লোকবল কিছুই ছিল না, কিন্তু 'সাধু ইচ্ছার সহায় ঈশ্বর' এই মহাবাক্যের উপর নির্ভর করিয়া তাঁহারা কর্ত্তব্যসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। বামাবোধিনীর ১ম সংখ্যা এক ব্যক্তি (৺ উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়) দ্বারাই আদ্যন্ত লিখিত হয় এবং সত্বর মুদ্রিত করা হয়। কলিকাতা মৃজাপুর ষ্ট্রীট হলওয়েলস লেন ৺মথুরানাথ তর্করত্নের প্রাকৃত যন্ত্রে বামাবোধিনী প্রথম মুদ্রিত হয়।

পত্রিকাখানি রয়্যাল ১ ফরমা, মূল্য /০ আনা মাত্র ছিল। সহস্র খণ্ড প্রথম মুদ্রিত হয়। আমাদিগের কোন বন্ধুর বিশেষ উৎসাহে অল্পকাল মধ্যে তাহা নানা স্থানে প্রচারিত হয়। আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, ভুবনমোহিনী বসু নাম্নী এক মহিলা সর্ব্বাগ্রে বামাবোধিনীর গ্রাহিকা হইয়া অগ্রিম বার্ষিক মূল্য প্রদান করেন ও ইহাকে উৎসাহ দান করেন। পত্রিকার ১ম সংখ্যা কলিকাতা ও মফস্বলের অনেক স্থানে সমাদরে গৃহীত হওয়াতে এই পত্রিকার ২য় সংখ্যা বর্দ্ধিত আকারে, উৎকৃষ্টতর কাগজে ও উৎকৃষ্টতর যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত করিবার সঙ্কল্প করা হইল। বহুবাজার ষ্টানহোপ যন্ত্রের কার্য্যাধ্যক্ষ গোপালচন্দ্র বসুর সাহায্যে ইহা সেই যন্ত্রে মুদ্রিত হইল। এই সময় আমাদিগের প্রথমোদ্যোগী বন্ধু বসন্তকুমার বাবু আনন্দের সহিত পত্রিকার শ্রীবৃদ্ধিসাধনের জন্য পরামর্শ দিতে লাগিলেন এবং দীননাথ মিত্র নামক একজন যুবক দ্বারা উডকট প্রস্তুত করাইয়া মধ্যে মধ্যে ইহাতে ছবি প্রকাশের সুবিধা করিলেন। যখন বামাবোধিনীর ২য় সংখ্যা মুদ্রিত হইতেছিল, তখন তাহা মাহাত্ম্য



কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের দৃষ্টিগোচর হয়। তিনি যেরূপ সহৃদয়তার সহিত ইহা পাঠ করিলেন এবং বহু প্রশংসাবাদের সহিত ইহা প্রচারে যেরূপ উৎসাহদান করিলেন, তাহা আমরা কখনও বিস্মৃত হইব না। বামাবোধিনী কয়েক মাস নির্বিঘ্নে চলিতে লাগিল এবং ক্রমে ইহার আদর ও গ্রাহকসংখ্যা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। ৺উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় ইহার সম্পাদকীয় ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু এই সময়ে কার্য্যোপলক্ষে তাঁহাকে কলিকাতা ত্যাগ করিয়া মফস্বলে যাইতে বাধ্য হইতে হইল। পত্রিকাখানির জীবন হয়ত এইখানেই শেষ হইত, কিন্তু ব্রাহ্ম আত্মীয় সভা নামে একটী সভা ছিল, তাহার সভাগণ ইহার ভারগ্রহণে প্রস্তুত হইলেন। সম্পাদক তাঁহাদিগের হস্তে ইহার ভারার্পণ করিয়া কার্য্যস্থানে চলিয়া গেলেন এবং যথাসাধ্য লেখার সাহায্য করিতে লাগিলেন। উক্ত সভার দুইজন উৎসাহী সভ্য বাবু ক্ষেত্রমোহন দত্ত ও বাবু বসন্তকুমার দত্ত পর্য্যায়ক্রমে এই পত্রিকার সম্পাদকীয় ভার লইয়া সুদীর্ঘকাল সুচারুরূপে ইহার কার্য্য সম্পাদন করিতে লাগিলেন। ইহার উন্নতি সাধনের জন্য তাঁহারা অর্থ, কায়িক পরিশ্রম ও স্বতঃ পরতঃ চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। পত্রিকাখানির কলেবর ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হওয়াতে ইহার মূল্য /০ আনার স্থলে /১০ ও পরে ৵০ ও ৶০ আনা হইল এবং কার্য্যের সুবিধার জন্য ষ্টানহোপ যন্ত্র হইতে আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে, তথা হইতে সুলভ প্রভৃতি যন্ত্রে ও পরে বাবু যজ্ঞগোপাল চট্টোপাধ্যায়ের যন্ত্রে স্থানান্তরিত হইল। বামাবোধিনীর প্রতি এই সকল যন্ত্রালয়ের অধ্যক্ষগণ বিশেষ অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। বিশেষতঃ সুলভ যন্ত্রের অধ্যক্ষ স্বর্গীয় বাবু প্যারিচরণ সরকার মহাশয় অনেক ত্যাগস্বীকার করিয়া এই পত্রিকা প্রচারে সহায়তা করিয়াছিলেন। বামাবোধিনীর পাঁচ ছয় শত গ্রাহক থাকিলেও অনেকের নিকট মূল্য অনাদায় থাকার জন্য বামাবোধিনীকে মধ্যে মধ্যে অত্যন্ত কষ্টে পড়িতে হইয়াছে, এমন কি সময় সময় ইহা বন্ধ হইয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে। কিন্তু মঙ্গলবিধাতা ঈশ্বরের আশ্চর্য্য কৌশলে অভাবনীয় এক একটী উপায় কোথা হইতে উপস্থিত হইয়া ইহার জীবন রক্ষা ও উন্নতির সহায়তা করিয়াছে। যে দুইটী উৎসাহী বন্ধুর নামোল্লেখ করা গিয়াছে, তাঁহাদিগেরই বিশেষ যত্নে রাজসাহীর করচমাড়িয়া-নিবাসী সহৃদয় বন্ধু বাবু হরকুমার সরকার বামাবোধিনীর জন্য অনেক পরিশ্রম করেন এবং তাঁহার ও তাঁহার পরিবারস্থ দুইটী রমণীর অর্থ সাহায্যে বামাবোধিনীর পুরাতন কতকগুলি সংখ্যা পুনর্মুদ্রিত হয়। পূর্ব্বোক্ত উৎসাহী বন্ধুদ্বয়ের যত্নেই হেয়ার প্রাইজ ফণ্ড হইতে সাহায্য পাইয়া বামাবোধিনীতে লিখিত কতকগুলি প্রবন্ধ সংগ্রহপূর্ব্বক 'নারী শিক্ষা' নামে দুইখানি পুস্তক মুদ্রিত করা হয়। এই সাহায্য



দান বিষয়ে স্বর্গীয় প্যারিচাঁদ মিত্র ও পরমশ্রদ্ধাস্পদ ৺শিবচন্দ্র দেব মহাশয় বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। এই দুই মহাত্মা বামাবোধিনীর প্রতি কৃপা-পরবশ হইয়া হেয়ার প্রাইজ ফণ্ডের সাহায্যে অতঃপর বামারচনাবলী নামক পুস্তক ও মুদ্রিত করাইয়াছিলেন। ইহাদ্বারা বামাবোধিনীর অনেক অভাব মোচন হইয়াছিল। বন্ধুবর বাবু বসন্তকুমার দত্ত ১২৭৬ সালে কার্য্যোপলক্ষে যখন কলিকাতা ত্যাগ করিয়া বাঁকীপুর গমন করেন, তখন বামাবোধিনীর প্রথম সম্পাদক মহাশয় কলিকাতায় থাকাতে পুনরায় তাঁহারই হস্তে ইহার সমুদায় ভার অর্পিত হয়, এবং তদবধি তিনিই এই পত্রিকা সম্পাদন করিয়াছেন। মধ্যে কয়েক বৎসর এই পত্রিকা ভারত সংস্কার সভার অন্তর্গত বামাকুলোন্নতি বিভাগ হইতে প্রচারিত হইত, কিন্তু তাহাতে ইহার উদ্দেশ্য বা সম্পাদনব্যবস্থার কোন রূপ পরিবর্ত্তন হয় নাই।

ইহার সম্পাদক কোন কোন অংশী-দারের সহিত মিলিত হইয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া প্রেস নামে এক যন্ত্র স্থাপন করেন। ৪।৫ বৎসর বামাবোধিনী তাহাতে মুদ্রিত হয়। কিন্তু সম্পাদকের পীড়া ও অন্যান্য কারণে তাঁহার মুদ্রাযন্ত্র অচল হওয়াতে বামাবোধিনীর অত্যন্ত দুরবস্থা হয় এবং বৎসরাধিক কাল ইহার প্রচার বন্ধ হইয়া থাকে। কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করা যাইতেছে, বদান্যা ৺মহারাণী স্বর্ণময়ী এই সময় বামাবোধিনীর সাহায্যার্থে ২০০ দুই শত টাকা দান করাতে ইহার কয়েক খণ্ড প্রচারিত হয়। ভূতপূর্ব্ব ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ৺রামশঙ্কর সেন মহাশয়ের যত্নে এই সাহায্যলাভ করা যায়। কিন্তু বামাবোধিনী তখন এরূপ ব্যাধিগ্রস্ত হইয়াছিলেন যে, মহারাণীর সাহায্যে ইহা জীবনের অল্প পরিচয় দিয়া আবার অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। এক বৎসর কাল বামাবোধিনী লোকচক্ষুর অগোচর হইয়া রহিল এবং ইহা যে পুনর্জীবন লাভ করিবে, সে বিষয়ে বন্ধুগণও নিরাশ হইলেন।

যে দয়াময়ের কৃপার উপর নির্ভর করিয়া বামাবোধিনী জন্ম গ্রহণ করিয়াছে এবং যিনি নানা সঙ্কট হইতে বার বার ইহাকে রক্ষা করিয়াছেন, তিনিই ইহাকে পুন-র্জীবন প্রদান করিলেন। ১২৮৫ সালের কার্ত্তিক মাস হইতে বামাবোধিনী পুনঃ প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইল।

বঙ্গরমণীগণকে সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানে বিভূষিত করা বামাবোধিনীর উদ্দেশ্য, এই জন্য সর্ব্ব প্রকার জ্ঞানগর্ভ প্রস্তাবই ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। (আমা-দিগের ইচ্ছা ছিল এ পর্য্যন্ত যত প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে তাহার একটি তালিকা মুদ্রিত করি, কিন্তু তাহা অত্যন্ত দীর্ঘ হইয়া পড়িবে বলিয়া সে সঙ্কল্প হইতে ক্ষান্ত হইলাম।) জ্ঞানপ্রচার বামাবোধিনীর প্রধান উদ্দেশ্য হইলেও এই জ্ঞান যাহাতে ধর্ম্মভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত




হইয়া নারীজীবনের যথার্থ শোভা সম্পাদন ও কল্যাণ বিধান করে, বামাবোধিনীর ইহা প্রাণগত ইচ্ছা, এই জন্য ইপাঠক-পাঠিকাগণের মনে ধর্ম্মভাব উদ্দীপন ও সংরক্ষণের জন্য ইহা প্রথম হইতে প্রয়াস পাইয়াছেন। কোন সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মমত শিক্ষা দেওয়া বা কোন সম্প্রদায়ের প্রতি অশ্রদ্ধা উৎপাদন করা বামাবোধিনীর লক্ষ্যের বহির্ভূত। ইহাতে উদার ও অসাম্প্রদায়িক ভাবে ধর্ম্মবিষয়ক প্রস্তাব সকলের আলোচনা করিতে চেষ্টা করা হইয়াছে, এ বিষয়ে কতদূর ইহা কৃতকার্য্য হইয়াছে বলিতে পারি না। বামা-বোধিনীর লেখক ও লেখিকাগণও ইহার উদ্দেশ্যের অনুগত হইয়া প্রবন্ধ সকল লিখিয়াছেন।/

বামাবোধিনীর এই ৫০ বৎসরের মধ্যে অনেক ত্রুটি, অনেক অভাব লক্ষিত হইয়াছে এবং গ্রাহকগ্রাহিকাদিগের নিকট ইহার অনেক অপরাধও হইয়াছে। আশা করি তাঁহারা কৃপা-চক্ষে সে সকল মার্জ্জনা করিবেন। বামাবোধিনীর সঙ্কল্প অতি মহৎ, কার্য্যক্ষেত্র অতি প্রশস্ত এবং কর্ত্তব্যভার অতি গুরুতর কিন্তু ইহার শক্তি সামর্থ্য অতি অল্প। সকলে আশীর্ব্বাদ করুন যেন ইহা ঈশ্বরের বিশ্বাসী কন্যা হইয়া সেই সর্ব্বশক্তি-মানের শক্তির উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া সুচারুরূপে ইহার উদ্দেশ্য সাধন করিতে পারে এবং কৃতজ্ঞতার সহিত সকলের সাহায্য গ্রহণ করিয়া ইহার জীবনে বিধাতার অভিপ্রায় সুসম্পন্ন করিতে সক্ষম হয়।

বামাবোধিনী আজ যাঁহার কৃপায় শত সহস্র বিঘ্ন বাধার মধ্য দিয়া ৫০ বৎসরে পদার্পণ করিল, সেই বিশ্বদেবতার শ্রীপাদ-পদ্মে ভক্তিপূর্ণ ও কৃতজ্ঞ হৃদয়ে প্রণত হই, এবং তাঁহারই নিকট ইহার সর্ব্ববিধ কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করি।

হে সর্ব্বজীবের জীবনদাতা, মঙ্গল-বিধাতা, প্রেমময় দেবতা, আজ তোমার অশেষ করুণায় বামাবোধিনী পঞ্চাশৎ বর্ষে পদার্পণ করিল। তুমি ইহার জীবনকে যেরূপ আশ্চর্য্য ভাবে এই সুদীর্ঘ কাল রক্ষা করিয়াছ, তাহা স্মরণ করিলে তোমার ইচ্ছার উপর নির্ভর করিতে কাহারও সংশয় জন্মিতে পারে না। ইহার প্রতি তোমার এই অশেষ করুণা দেখিয়া মনে হয় ইহার কার্য্য এখনও শেষ হয় নাই। তোমার ইচ্ছায় কতিপয় মহাত্মার চেষ্টায় ইহার জন্ম হইয়াছিল এবং তোমারি কৃপায় ইহা এতকাল ভারতের নারীগণের সেবা করিতে সক্ষম হইয়াছে। হে সর্ব্বশক্তিমান্ প্রভু, তুমি ইহাকে সুচারুরূপে ইহার উদ্দেশ্যসাধনের শক্তি দাও ও ইহার সকল বিঘ্ন, বাধা, দোষ দূর করিয়া ইহাকে জগতের হিতসাধনের জন্য দীর্ঘজীবিনী করিয়া রাখ, আমাদিগের এই প্রার্থনা। অতঃপর ইহার জন্মদাতা ও সহৃদয় বন্ধুগণের চরণে কৃতজ্ঞতা অর্পণ করি।




সাময়িক প্রসঙ্গ।

সহকারী ভারতসচিব মিষ্টার মণ্টেগের ভারতে আগমন—আগামী অক্টোবর মাসে সহকারী ভারতসচিব মিঃ মণ্টেগ ভারবর্ষে আগমন করিবেন। দিল্লীর ব্যবস্থাপক সভার প্রথম অধিবেশনে উপস্থিত হইবার জন্য লর্ড হার্ডিঞ্জ তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। আশা করি, তাঁহার আগমনে ভারতের অনেক কল্যাণ সাধিত হইবে।

জাপান সম্রাটের লোকান্তর—জাপান সাম্রাজ্যের প্রজাপ্রিয় সম্রাট্ মিকাডো ২৯শে জুলাই ১২'৪৩ মিনিটের সময় মর্ত্ত্য দেহ পরিত্যাগ করিয়া অনন্তধামে গমন করিয়াছেন। ভগবান্ তাঁহার পরলোকগত আত্মার শান্তি ও রাজ্যের কল্যাণ বিধান করুন।

মিষ্টার র‍্যামজে ম্যাক্‌ডোনাল্ডের ভারতে আগমন—শুনা যাইতেছে, মিঃ র‍্যামজে ম্যাক্‌ডোনাল্ড আগামী ডিসেম্বর মাসে তাঁহার স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য ও রাজনৈতিক বিষয়ে পরামর্শ করিবার নিমিত্ত ভারতবর্ষে আগমন করিবেন।

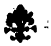
কংগ্রেসের সভাপতি—আগামী কংগ্রেসের অভ্যর্থনা-সমিতি মান্যবর মিঃ গোখেলেকে সভাপতি নির্ব্বাচন করিয়াছেন।

স্মৃতি-উৎসব—১৩ই শ্রাবণ স্বর্গীয় মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্বর্গারোহণ উপলক্ষে তৎপ্রতিষ্ঠিত মেট্রপলিটন বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্রগণের উদ্যোগে তাঁহার একবিংশ স্মৃতি-উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। দুঃখের বিষয়, এই মহাত্মার স্মৃতিপূজা কেবল তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষকগণ দ্বারাই সম্পন্ন হইয়াছে। সমগ্র দেশের যিনি পূজনীয়, তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন সর্ব্বসাধারণেরই কর্ত্তব্য।

ফ্রান্সে যুবরাজ—আমাদের যুবরাজ শিক্ষা লাভের জন্য ফ্রান্সে গিয়াছেন। তথায় ফরাসী রাষ্ট্রনায়ক ফলিয়েরে ও তাঁহার পত্নী যুবরাজের সহিত জলযোগ করিয়াছেন। জলযোগান্তে ফলিয়েরে যুবরাজকে "গ্রাণ্ড ক্রস অব দি লিজন অব অনার" উপঢৌকন প্রদান করিয়াছেন।

বিলাতে রবীন্দ্র নাথ ঠাকুরের সম্বর্দ্ধনা—বিলাতের ইণ্ডিয়ান সোসাইটি "টোর্কেডারো রেস্তরাঁ" নামক হোটেলে কবিবর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের যথোচিত সংবর্দ্ধনা করিয়াছেন। এই সভায় অনেক গণ্যমান্য সাহিত্যিক উপস্থিত হইয়াছিলন। মিঃ ডবলিউ বি ইয়েট্‌স সংবর্দ্ধনা-সভার সভাপতির পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং রবীন্দ্রনাথের রচিত তিনটী কবিতার গদ্যানুবাদ পাঠ করেন। অনুবাদপাঠ শ্রবণে সকলে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। চিত্রকর



মিঃ ডবলিউ রথে নেষ্টিন, মিঃ টি, ডব্লিউ আর্লণ্ড, স্যার কে, জি, গুপ্ত, মিঃ এস, কে, র‍্যাট ক্লিফ ও রবীন্দ্র বাবু নিজেই সভায় বক্তৃতা করেন।

কৃষ্ণদাস পালের স্মৃতিসভা—গত ২৪শে জুলাই ভূতপূর্ব্ব "হিন্দু পেট্রিয়ট" সম্পাদক ৺ কৃষ্ণদাস পাল মহাশয়ের স্মৃতিরক্ষা কল্পে কলিকাতার টাউন হলে এক সভার অধিবেশন হইয়াছিল। বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ বাহাদুর এই সভার সভাপতির পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু, মিঃ ব্রেয়ার, মৌলবী সিরাজউল এস্‌লাম, রায় হরেরাম গোয়েঙ্কা বাহাদুর, স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি সভায় বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

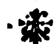
শিশুজীবন ও কিণ্ডার গার্টেন

শরীরের যত্ন।

বিজ্ঞানমতে শিশুদিগকে শিক্ষা দেওয়া ও পালন করার বিষয়ে সাধারণ লোকে একেবারে অজ্ঞ। ঐ সম্বন্ধে যুবক ও প্রবীণ সকলেই একমত হইয়া বলেন যে, মার স্নেহ ও স্বাভাবিক জ্ঞান ছেলের শরীর ও মনের শিক্ষার ও যত্নের পক্ষে যথেষ্ট, উহার নিমিত্ত অন্য কোন বাহ্য শিক্ষার আবশ্যক নাই। আর ঐ সংস্কার আমাদের দেশে এত গভীররূপে বদ্ধমূল হইয়াছে যে, উহার মূল উৎপাটন করিয়া সাধারণ লোকের মনে নূতন ভাব প্রবেশ করান একপ্রকার অসাধ্য। তবে এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধ পাঠ করিয়া দুই একজনও মার্জ্জিত স্নেহময় জননীর মনে সন্তান সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান জন্মিতে পারে, এই আশায় আমি নিম্নলিখিত কয়েকটী কথা লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

তরুণজননীগণ! আপনারা ইহা ভাবিয়া ভয় পাইবেন না যে, এই কর্ত্তব্যের জ্ঞান আপনাদের সন্তানের প্রতি স্নেহের কিছুমাত্র বিকার জন্মাইয়া দিবে। বরং উহা দ্বারা প্রেম অধিকতর পবিত্র ও মহৎ হইয়া উঠিবে, আর জননীর যে গৌরব কবি ও যাহা চিত্রকরগণ বর্ণনা করিতে কখনও ক্লান্ত হন না ও যাহা দ্বারা এই সহস্র সহস্র বৎসর পরেও রোমীয় জননী কর্ণেলিয়ার নাম সর্ব্বদেশে প্রসিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে, সেই গৌরবের জ্যোতি আপনাদের মুখে প্রকাশিত হইবে ও উহা দ্বারা আপনাদের সমস্ত জীবন অলঙ্কৃত হইবে।

হয়ত, শিশুর শরীরের প্রতি যত্নের জন্য অত্যন্ত ব্যগ্র হইলে অনেকে উহা অতিরিক্ত মনে করিবেন, কিন্তু মানবজাতির জ্ঞানচর্চ্চাকালে শরীর ও মনের এরূপ প্রভেদ কে ঠিক করিতে পারে যে, তিনি সচ্ছন্দে বলিতে পারেন,—এইটা কেবল মনের



ও এইটা শুধু শরীরের অপকার বা উপকার করে। সেই জন্য শিশুর নিমিত্ত যে সকল শিক্ষা ও যত্ন আবশ্যক ভাবিয়া যাহাতে ঐ কোমল শরীর ও মন একবারে দৃঢ় ও সবল হয়, তাহা করা আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য।

সাধারণ লোকেরা সন্তানের সকল বিষয়ে মাতার স্বাভাবিক জ্ঞানের উপর যে পরিমাণে নির্ভর করিয়া থাকেন, পুস্তক পড়িয়া জ্ঞানলাভের প্রতি তাঁহারা সেই পরিমাণে খড়্গহস্ত। তাঁহারা হয় ত মনে করেন, বুদ্ধিমতী মাতারাও অতি সামান্য বিষয়ের জন্য পরামর্শ লইতে হইলেও পুস্তকের সাহায্য চান। তাঁহারা বুঝিতে পারেন না যে, জ্ঞানী ব্যক্তিদিগের চিন্তা ও উপদেশ দ্বারা তরুণবয়স্কা মাতাদিগের বুদ্ধি পরিপুষ্ট হয়, আর শিশু সম্বন্ধে অনেক অজ্ঞাত বিষয়ে তাঁহাদের জ্ঞান লাভ হয়। বিশেষতঃ অভিজ্ঞ ও চিন্তাশীল লোকদিগের উপদেশ ও বাক্যের দ্বারা তাঁহাদের অনেক উপকার হইতে পারে।

সেই জন্য, জননীদিগের শিক্ষা এরূপ হওয়া উচিত নহে যাহাতে সামান্য বিষয়েও তাঁহাদিগকে পুস্তকের পাতা উল্টাইতে বাধ্য করে। বরং উহা এরূপ হওয়া উচিত যে, তাহা দ্বারা মনের ভাব সকল উন্নত হইবে, বোধশক্তি তীক্ষ্ণ হইবে, ও একটী কোমল ও সরল মনের পুষ্টি সাধন করিতে সক্ষম হইবে।

সেই কারণে, হে তরুণমাতৃগণ! যে কোন পুস্তক আপনাদের পবিত্র কর্ত্তব্য-জ্ঞানের সাহায্য করিবার উপযুক্ত বোধ হয়, তাহা পড়িয়া নিজ নিজ মনকে প্রশস্ত করুন। সন্তান বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া আপনাদের ঐ পরিশ্রমের জন্য আপনাদের প্রতি অধিকতর ভক্তিমান্ হইবে। প্রত্যেক মাতার, এমন কি প্রত্যেক স্ত্রীলোকেরও সন্তানপালন সম্বন্ধে পুস্তক পাঠ করা উচিত। উহাদ্বারা জননীর সকল দিক সুমার্জ্জিত হয়, মাতার স্বাভাবিক জ্ঞান আরো অধিক তীক্ষ্ণ হইয়া সন্তানের গুপ্ত স্বভাব ভালরূপে বুঝিতে পারিলে সাদরে উহার রক্ষা, যত্ন ও উন্নতির চেষ্টা করে।

সুতরাং শিশুর নূতন জীবন আপনার হস্তে পড়িবার পূর্ব্বে ও জননীর উল্লাসে আপনার সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত হইবার পূর্ব্বে আপনি শিশুর শারীরিক যত্ন সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় পুস্তক পাঠ করিতে অবহেলা করিবেন না। কিরূপে ঐ নূতন জীবনের পালন ও বৃদ্ধি সাধন করিতে হয়, তাহা শ্রম সহকারে শিক্ষা করা প্রয়োজন। ঐ সকল বিষয়ে শিক্ষা লাভের জন্য উৎকৃষ্ট ধাত্রীশিক্ষা, মাতৃশিক্ষা ও শিশুপালন প্রভৃতি পুস্তক অত্যন্ত উপকারী।

গর্ভাবস্থায় যদি ঐ পবিত্র কর্ত্তব্যের বিষয় সকল উত্তমরূপে শিক্ষা করা হয়, তাহা হইলে ঐ উন্নত মানসিক আনন্দে শারীরিক যত অসুবিধা ও কষ্ট দূর করিয়া দিবে, এবং ঐ বাঞ্ছিত সুখের জন্য মনকে দৃঢ় ও প্রফুল্ল করিবে। এই সময় পীড়িতের ন্যায় মনে করা উচিত নয়,

আপনি যে মাঝে মাঝে ক্লেশ পান, তাহা পীড়ার বেদনা নয়। কিন্তু আপনি যত উহাকে স্বাস্থ্যের চিহ্ন স্বরূপ ভাবিবেন ও স্বাভাবিকরূপে চলিবেন, সর্ব্বদা কোন না কোন কাজে যত নিযুক্ত থাকিবেন, তত শারীরিক কষ্ট অনেক কম বোধ হইবে। আপনার মধ্যে যে একটী নূতন প্রাণী গঠিত হইতেছে, তাহা যেন মুহূর্ত্তের জন্য বিস্মৃত হইবেন না। আপনি এখন আর সে স্বাধীন বালিকা নন, এখন আপনার শুধু নিজের আমোদের জন্য ব্যস্ত থাকিলে চলিবে না। লাফালাফি, দৌড়ান, প্রভৃতি অতি কঠিন পরিশ্রমজনক কাজে যোগ দেওয়া আর আপনার উচিত নয়। এক ভাবে অধিকক্ষণ বসিয়া থাকাও আপনার পক্ষে ভাল নয়। এক কথায়, ইহা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, কোন আকস্মিক ভয়, গতি ও পতনের দ্বারা আপনার গর্ভস্থিত ধন বিনাশ পাইতে পারে। আর, সকল প্রকার মানসিক চাঞ্চল্য, উদ্বেগ, ভয় ও ক্রোধ হইতেও ঐ মহা অপকার ঘটিবার সম্ভাবনা। আপনার খাদ্যের প্রতিও মনোযোগী হওয়া আবশ্যক। প্রফুল্ল ও শান্ত ভাবে জীবন অতিবাহিত করাই নিজের ও সন্তানের উভয়ের পক্ষেই মঙ্গলকর। তৎপরে ঐ যে অসহায় ক্ষুদ্র শিশু ভূমিষ্ঠ হইয়া চক্ষু খুলিয়া নিঃশ্বাস ফেলিতেছে, উহার প্রথম কান্না আপনার ক্ষীণ হৃদয়ের উপর প্রতিঘাত করিতেছে, আপনার কাছে সে প্রেম, সাহায্য ও যত্ন পাইবার জন্য ডাকিতেছে। আপনি যদি ইহার মধ্যে কোন ডাক্তার বা পুস্তকের উপদেশ লইয়া থাকেন, তাহা হইলে জ্ঞাত আছেন যে, উহার বিছানা অত্যন্ত নরম তুলার হইবার আবশ্যক নাই, নারিকেল ছোবড়া বা নেকড়ার গদি ও তুলার বালিশই যথেষ্ট হইবে।

সদ্যোজাত শিশুকে গরম জলে স্নান করাইয়া নরম ও পরিষ্কার জামা বা কাপড়ে তাহার শরীর ঢাকিয়া রাখা উচিত। শীতকালে ফ্লানেলই উত্তম আচ্ছাদন। শিশুর মস্তক সর্ব্বদা খুলিয়াই রাখিবেন, কেবল বাহিরে বা ঠাণ্ডা হাওয়ায় লইয়া যাইবার সময় টুপি বা কাপড় দিয়া মাথা ঢাকার আবশ্যক। বিছানার উপর মোমঢাল (অয়েল ক্লথ) দিয়া ঢাকিয়া রাখা উচিত, তাহা হইলে সমস্ত বিছানা ভিজিয়া শিশুর শর্দ্দি হইবার কোন ভয় থাকিবে না। আর শিশু যখন শয্যায় থাকিবে না, তখন ঐ মোমঢালখানা তুলিয়া হাওয়ায় শুকাইতে দেওয়া উচিত। বোধ হয় এখন আপনারা অনেকেই জানেন যে, সূতিকাগৃহ অতি পরিষ্কার, আলোকময় ও মুক্তবায়ু হওয়া অতি আবশ্যক। সর্ব্বদা বিশুদ্ধ বায়ুতে রাখিলে শিশুদিগের কোনরূপ গাত্ররোগ জন্মিতে পারে না, কিন্তু অতিরিক্ত সূর্য্যোত্তাপ বা আলোও শিশুর পক্ষে ভাল নয়। নূতন শিশু এতদিন পর্য্যন্ত অন্ধকারে ছিল, সেই কারণে একটু একটু করিয়া তাহার চক্ষে আলো সহাইতে হইবে, নতুবা চক্ষুর পীড়া হইবার সম্ভাবনা।

অন্যান্য বাসগৃহের ন্যায় সূতিকাগৃহেও বিশুদ্ধ বায়ু, আলোক ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার অত্যন্ত প্রয়োজন। কোন প্রকার আবর্জ্জনা বা অস্বাস্থ্যকর ময়লা কখন গৃহে রাখা উচিত নয়, শিশুর ভিজা নেক্‌ড়াও ঘরের মধ্যে শুকান অনুচিত। সকল প্রকার তীব্র গন্ধ বা তামাকের ধোঁয়া শিশুর পক্ষে অত্যন্ত অনিষ্টকর।

(ক্রমশঃ)

শ্রীকৃষ্ণভাবিনী দাসী।

প্রায়শ্চিত্ত।

"ভগবান্‌কে ভুল্‌ছ কেন?" মোহিত এবার কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল "নীরো! সে কথাও যে মনে কর্‌তে পারছিনা, আমি পাপী, আমার জন্য বাবা কত কষ্ট পেয়েছন! আমার প্রার্থনা তাঁর পায় পৌঁছুবে কি?"

"তুমি পাপী নও, পাপী আমি। আমাকে সুখী কর্‌তে গিয়া তোমার এ মনস্তাপ। ভগবান্ তোমার প্রার্থনা শুন্‌বেন বই কি!" মোহিত অনেকটা শান্তি পাইল, ঊর্দ্ধকরে মনে মনে তাঁহাকে প্রণাম করিল। তার পর সে বলিল "পাপী যদি হই তো আমিই, তুমি নও। তাতেই বা ভাবনা কি নীরো! তিনি তো পাপীরই প্রভু। পতিতপাবন যে তাঁর নাম!"

তার পর মোহিতের ঘড়ি, চেন, দামী বস্ত্রাদিতে আরও দুই মাস চলিল। ইহার পর লীলা চুড়ি কগাছিও খুলিয়া দিয়া পিতার সাক্ষাতে হস্ত ঢাকিয়া বসিল। সেই দিন রাত্রিতে নীরজা ভ্রাতাকে সমস্ত অবস্থা, লিখিয়া, কাতরভাবে তাহার নিকট কিছু সাহায্য চাহিয়া পাঠাইল। আশায় আশায় এক মাস অতিবাহিত হইল, ভ্রাতার কোনও উত্তর আসিল না। নীরজা ভাবিল পত্র বুঝি পৌঁছায় নাই। রেজেষ্ট্রী করিয়া আবার পত্র দিল, পনর দিন কাটিয়া গেল, সুরেন্দ্র কোনও উত্তর দিল না। অমরাবতীতুল্য লণ্ডনের মধ্যে থাকিয়া কোথায় মর্ত্তলোকে কোনও মানব ভগিনী কাঁদিতেছে, তাহা স্বর্গবাসী দেবতার কি মনে হয়? তাই সুরেন্দ্রেরও পত্রের উত্তর দেওয়া বা সাহায্য করার কথা মনে হইল না। এটা আর আশ্চর্য্য কি? কিন্তু দুর্ব্বল মর্ত্তবাসী তাহা বুঝে না, দাবী গিয়াছে, তবু দাওয়া করিতে ছাড়ে না। তাই সেই স্নেহময় ভ্রাতার উপেক্ষা দেখিয়া নীরজা মাতা পিতার স্নেহ মনে করিয়া অন্তরে অন্তরে কাঁদিতে লাগিল।

মোহিত সব বুঝিত, কিন্তু মুখ ফুটিয়া কিছু বলিলে পাছে নীরজা অধিক কাঁদে, তাই কিছু বলিত না। এক দিন ধীরে ধীরে বলিল "নিরো! একটা কাজ করিতে পার?" নীরজা বলিল "কি?" "নিরো।



তোমার জন্য, লীলার জন্য, আমাকে বাঁচিতেই হইবে। এক দিন সতীশের কাছে লীলাকে পাঠাতে পার?" নীরজা সাগ্রহে বলিল "আমিও যাই না কেন?" "মোহিত কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিল, তারপরে রুদ্ধকণ্ঠে বলিল "না, সুধু লীলাকে পাঠাও, সতীশ হাওড়ায় মুন্সেফি করে"। নীরজা বলিল, "আমিও যাইনা, ও কি সব বলিতে পারিবে?" মোহিত নীরব হইয়া রহিল। তাহার প্রাণের মধ্যে তখন কি করিতেছিল কে বুঝিবে? বাঁচিতে ইচ্ছা নাই, তথাপি বাঁচিতে হইবে। নহিলে নীরজার কি হইবে? লীলার কি হইবে?

পরদিন সকালে একটা চাদরে সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া লীলাকে সঙ্গে লইয়া গাড়ী করিয়া নীরজা দেবরের বাসায় গেল। সিঁড়িতে উঠিতে আর পা উঠে না, তবু স্বামীর মুখ স্মরণ করিয়া, লীলার হাত ধরিয়া ধীরে ধীরে উপরে উঠিল। দাসী বলিল "কে গা?" নীরজা কি বলিবে, ভাবিয়া পাইল না, সে আজন্ম সুখের কোলে লালিতা, আজ কি করিয়া বলিবে "ও গো, আমায় কিছু ভিক্ষা দাও"। নীরজাকে নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া দাসী গিয়া গৃহিণীর কাছে বলিল, কে একটী বড় সুন্দরী মেয়ে মানুষ, একটী ফুট্‌ফুটে মেয়ের হাত ধরিয়া আসিয়া দাঁড়াইয়া আছে। কর্ত্তা গৃহিণীতে তখন রহস্যালাপ করিতেছিলেন। কর্ত্তা বিরক্ত হইয়া বলিলেন "কেউ কিছু চাইতে এসেছে, নয়ত আর কি?" তবুও সুন্দরী স্ত্রীলোকের নাম শুনিয়া গৃহিণী বলিলেন "দেখেই আসিনা"।

গৃহিণী আসিয়া দেখিলেন যেন একটী প্রস্ফুটিত পদ্মের কাছে একটী ছোট গোলাপের কলি দাঁড়াইয়া আছে। গৃহিণী তরুণবয়স্কা, মনে মনে রূপেরও গৌরব করেন, তবু তাঁহার মনে হইল এমন রূপ বুঝি আর কোথাও দেখেন নাই। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কে গা? কি জন্য এসেছ?" নীরজা কথা কহিতে চেষ্টা করিল, পারিল না। "মেয়েটী তো দিব্য, তোমারই বুঝি?" নীরজা কথা কহিল। বলিল "হ্যাঁ, আমারও এবং তোমারও, তাই তোমার কাছে আজ কৃপা ভিক্ষা করতে এসেছি।" কৃপা ভিক্ষা কথাটা গৃহিণী বুঝিলেন, কিন্তু অন্য কথা না বুঝিতে পারিয়া বলিলেন "তোমার মেয়ে আমার মেয়ে কিসে?" "তুমি ওর খুড়িমা হও, তা হলে কি তোমার মেয়ে হ'ল না?"

গৃহিণী বড় বিস্মিতা হইলেন। সহসা বলিলেন "তোমাকেই বুঝি বট্‌ঠাকুর বিবাহ করেছেন?" নীরজা নতমুখে রহিল। গৃহিণী বুঝিলেন, মুখে বিস্মিত ভাবের পরিবর্ত্তে বিরক্তি আসিয়া উপস্থিত হইল, ঘৃণায় তাঁহার অধর ওষ্ঠ একটু কুঞ্চিত হইল। তার পরে তিনি বলিলেন "দেখা করতে এসেছ বুঝি"?

"না, ভিক্ষা করতে।"

তখন নীরজা সংক্ষেপে সকল কথা





বলিল। তার পরে সে বলিল "আমার উপর দয়া না কর, তুমি এর উপর একটু দয়া কর।" নীরজা দুই হাতে মুখ ঢাকিল। গৃহিণী কিছুক্ষণ পরে বলিলেন "বাবুর কাছে যাও"। গৃহিণী অন্তরে একটু হাসিয়া লীলার দিকে চাহিয়া বলিলেন "এস"।

লীলা পশ্চাতে পশ্চাতে গেল।

কর্ত্তা সতীশ বাবু শুনিয়া ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন "পাপের ফল তো আছেই, তা মাগীটার এতে ভয় কি? আর একটা বিয়ে কর্‌লেই চল্‌বে।" গৃহিণী একটু লজ্জিত হইয়া মৃদুস্বরে বলিলেন, দেখ্‌ছনা, "এইটী তাঁর মেয়ে।" সতীশ একটু নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন। লীলা তখনি ছুটিয়া মাতার নিকটে গিয়া তাহার কোলের উপর পড়িয়া বলিল "মা বাড়ী চল্‌ মা"। নীরজা বসিয়াছিল, কন্যাকে কোলে লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। কর্ত্তার কথাটা তাহারও কর্ণে প্রবেশ করিয়াছিল।

গৃহিণী আসিয়া লীলাকে বলিলেন "টাকা লও।" লীলা মাতার কণ্ঠ দুই হস্তে বেষ্টন করিয়া মুখ ফিরাইল। গৃহিণী আবার বলিলেন "টাকা লও"। নীরজা হস্ত পাতিল। দশটী টাকা গৃহিণী তাহার হস্তে দিলেন। তার পরে নীরজা নতমুখে নামিয়া গিয়া শকটে আরোহণ করিল। গৃহিণী দাসীর দিকে চাহিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন "এই চোখে কত রকমের মানুষই দেখ্‌লাম। হিন্দুর মেয়ে, ছিঃ ছিঃ ভাব্‌লেও গায়ে জ্বর আসে।"

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

নবকিশোর বাবু এখন মহাভক্ত, তাঁহার বাড়ীতে দোল দুর্গোৎসব অতি সমারোহের সহিত সম্পন্ন হয়। বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া, অতিথিশালা করিয়া দিয়া, জলাশয় খনন করাইয়া দিয়া তাঁহার আর তৃপ্তি কিছুতেই হইতেছে না। বৎসরে বৎসরে নব নব বিগ্রহ স্থাপন হয়। সন্ধ্যার পরে হরিশপুরে জমিদারের বিগ্রহমন্দিরের আরতির বাজনার শব্দে কর্ণ বধির হইয়া যায়। ধূপ ধুনার গন্ধে গ্রামখানি দেবালয়ের মত হইয়া উঠে। ষষ্টিবৎসর বয়স্ক বৃদ্ধ নবকিশোর যৌবনের তেজে দীপ্ত হইয়া গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া বেড়ান, কোনও স্থানে কোনও অনাথ আতুর পড়িয়া থাকিবার যো নাই, কেহ ক্ষুধাতুর, তৃষ্ণাতুর থাকিতে পায় না। নীরজা যে বৎসর বিধবা হয়, সেই বৎসর হইতে দুর্গাপূজা বন্ধ করিয়াছিলেন, তারপরে কলিকাতা হইতে ফিরিয়া আসিয়া সেই বৎসর হইতে মহোৎসাহের সহিত দুর্গাপূজা আবার আরম্ভ করিয়াছেন।

অতি প্রত্যূষে নবকিশোর গঙ্গাস্নানান্তে পট্টবস্ত্র পরিয়া উদ্যানে স্বহস্তে পুষ্প চয়ন করিতে করিতে মৃদুমৃদু গাহিতেছিলেন—"দেখ্‌লি আমার কত বাজী, ওমা আর কি বাজীর বাকি আছে"। তখনও ভাল করিয়া আলোক প্রকাশ হয় নাই, গাছগুলি অন্ধকারে ঝোপ ঝোপ দেখাইতেছিল। পাখীগুলি গাছে গাছে কিচিরমিচির করিতেছিল, মানুষ তখনও জাগে নাই।




ফুল তুলিতে তুলিতে সহসা নবকিশোর চমকিত হইয়া উঠিলেন, নিকটে সহসা একটা মানুষের মত বোধ হইল। পরক্ষণেই তিনি দেখিলেন, তাঁহার পা দুইখানা কিসে জড়াইয়া ধরিয়াছে। নবকিশোর ব্যস্ত হইয়া বলিলেন "কে রে?" কেহ উত্তর দিল না। নবকিশোর ব্যতিবস্ত হইয়া বসিয়া পড়িলেন, শুনিলেন বড় জোরে জোরে নিঃশ্বাস পড়িতেছে; আর পা দুটা যেন কিসে ভিজিয়া যাইতেছে। নবকিশোর বুঝিলেন লোকটা কাঁদিতেছে। তাহার হস্ত ধরিয়া তুলিবার জন্য চেষ্টা করিতে করিতে বলিলেন "কে ভাই তুমি? আমার কাছে কি চাও?" লোকটা তখন উঠিয়া বসিল! নবকিশোর দেখিলেন স্ত্রীলোক, "কে মা তুমি? কি হয়েছে তোমার? কি চাও মা?"

"দাদা বাবু"। বড় করুণকণ্ঠে একটা স্বর বাজিয়া উঠিল। নবকিশোর শিহরিয়া উঠিলেন, সবেগে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। "দাদাবাবু" এ কি কথা, এ কার স্বর!

রমণী আবার নবকিশোরের পা জড়াইয়া ধরিল। ডাকিল "দাদাবাবু"। তখন নবকিশোর তাহাকে টানিয়া পুষ্পবৃক্ষের ছায়াতল হইতে মুক্ত স্থানে আনিলেন। নতমুখে স্থিরনেত্রে চাহিয়া চাহিয়া চিনিলেন! তাই স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। নীরজা ঊর্দ্ধমুখে যুক্তকরে বলিল "দাদাবাবু, আমি তোমার সেই নীরজা, এতকাল পরে তোমার ক্ষমা চাহিতে এসেছি। দাদাবাবু আমায় ক্ষমা করবেন না কি?" নবকিশোর বিদ্যুৎস্পৃষ্টের ন্যায় সরিয়া দাঁড়াইলেন। বজ্রগম্ভীর স্বরে বলিলেন, "হতভাগিনি, এতদিন পরে এখানে এসেছ কেন?" নীরজা আবার তাঁহার পা জড়াইয়া ধরিতে গেল,নবকিশোর বলিলেন "ছুঁসনে"। নীরজা নতমুখে কিয়ৎক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া বলিল "দাদাবাবু, তবে ছোঁবনা। আমি তোমার অস্পৃশ্যা, তবুও তো আমি তোমার সেই নীরজা"।

"আমার নীরজা? আমার নীরোদিদি অনেক দিন মরে গেছে, তুই কে পাপিষ্ঠা তার কায়া নিয়ে আমাকে জ্বালাতে, আমার পুরোণো শোক জাগাতে এসেছিস্?" "দাদাবাবু, দাদাবাবু, তোমার সেই নীরজার আজ সর্ব্বনাশ হচ্চে, তাই কিছু ভিক্ষা চাই, আমাকে বাঁচাও দাদাবাবু, তোমার দয়ায় কতলোক উদ্ধার হচ্চে। আমি তোমার চোখে পাপিষ্ঠাই যদি হই, কত পাপিষ্ঠত তোমার দয়ায় বাঁচ্‌ছে, কত অস্পৃশ্য আতুরকে ত তুমি কোলে করে নাও শুনেছি, তাই মনে করে আমাকে কিছু ভিক্ষা দাও"। "ভিক্ষা চাইতে এসেছ? তোমার স্বামীকে, তোমার কন্যাকে বাঁচাইতে সাহায্য চাহিতেছ?" নীরজা নতমুখে রহিল। "আমার কাছে তুমি দয়ার প্রত্যাশা কচ্ছ? যখন তোমার পিতা ও তুমি আমার বুকে ছুরি মেরেছিলে, আমার প্রাণে আগুন জ্বেলে দিয়েছিলে, তখন কি কিছু দয়া করেছিলে? আমার কথা কি একবারও তোমাদের মনে




হয়েছিল? বৃদ্ধ শোকতাপে জর্জ্জরিত বলে এটুও কি ক্ষমা করেছিলে? দুদিনের সুখের জন্য পিতৃপিতামহের ধর্ম্ম যখন ত্যাগ করেছিলে, তখন এ বুড়োর কথা একবার মনে করেছিলে কি?" নীরজা কাঁদিয়া বলিল "তুমি মহৎ, আমরা পাপিষ্ঠ, তুমি ক্ষমা করবে না ত কে করবে?"

"মহত্ত্ব আমাতে নাই, আমিও মানুষ, নইলে বিমলা যখন পত্র লিখে ক্ষমা চেয়েছিল,সাক্ষাৎ করতে চেয়েছিল জন্মের মত শেষ দেখা দেখ্‌তে চেয়েছিল, মহৎ হ'লে কি তখন চুপ করে থাক্‌তে পার্‌তাম? তুই নীরজা আজ ক্ষমা চাচ্চিস, আমার বিমলাচরণ, যার হতে তুই হয়েছিস, সেই মৃত্যুকালে ক্ষমা চেয়ে পায় নাই, আর তুই পাবি? ধর্ম্ম কি এত দুর্ব্বল? আমি কি এত মোহপরবশ?"

"তবে কি ক্ষমা নাই, সেই স্নেহের কি একটুও অবশিষ্ট নাই, দাদাবাবু?"—

"না" বলিয়া নবকিশোর অট্টালিকা অভিমুখে চলিলেন। "দাদাবাবু, দাদাবাবু ক্ষমা—!" নবকিশোর ছুটিয়া প্রাসাদের মধ্যে গিয়া দ্বার রুদ্ধ করিলেন।

মোহিত নিজ কক্ষে শুইয়া আছে। পার্শ্বে বসিয়া লীলা তাহার ক্ষুদ্র হস্তে পাখা লইয়া বাতাস করিতেছে। সহসা মোহিত বলিল "লীলা,গাড়ীর শব্দ হচ্ছে, দেখ দেখি তোর মা বুঝি এল"। লীলা গবাক্ষ দিয়া নীচে দেখিয়া বলিল "না বাবা, ও অন্য লোকের গাড়ী।"

এখন আর চাকর দাসী কেহই নাই, কেবল পুরাতন চাকর নিতাই কিছুতেই যায় নাই। তাহার এবং লীলার কাছে মোহিতকে রাখিয়া নীরজা নবকিশোর বাবুর নিকটে দয়া ভিক্ষা করিতে হরিশপুরে গিয়াছিল। অর্থ নাই, এখন আর ডাক্তার আসে না, ঔষধ দিনান্তে একবার কি দুইবার খাওয়ান হয়। আজ দুইদিন নীরজা গিয়াছে, তাহাও জুটে নাই। কোথা হইতে ঔষধ আসিবে? মোহিত শরীরের ভাবে বুঝিতেছে আর বেশী দিন বিলম্ব নাই। দেড় বৎসর সমানে ভুগিয়া আসিতেছে, আর পারে না। কোথায় সে অনন্ত শয্যা যেখানে শুইয়া এ শ্রান্ত ক্লান্ত প্রাণখানা ঘুমাইয়া পড়িবে? আর যে সে এ দেহের ভার বহিতে পারে না।

কাঁদিতে কাঁদিতে নিতাই আসিয়া সংবাদ দিল—"বাড়ীওয়ালা চারি মাসের ভাড়া না পাইয়া বাড়ীর উপর নোটীস টাঙ্গাইয়া গেল। এখনি উঠিতে হইবে।" লীলা কাঁদিয়া উঠিল "নিতাই দাদা তবে কি হবে?" নিতাই সান্ত্বনা দিয়া বলিল "কেঁদ না দিদিমণি, আমি একটী বাড়ী ঠিক্ করে আসি।" নিতাই চলিয়া গেল। মোহিত একবার মৃদুকণ্ঠে বলিল "লীলা, নীরজা এলো কি?"

মৃদুপদে ছায়ার মত নীরজা কক্ষে প্রবেশ করিয়া মোহিতের পার্শ্বে বসিল। মোহিত চাহিয়া বলিল "নিরো এসেছ? আঃ"—লীলা এখন সব বুঝে, তাই ভয়ে ভয়ে মৃদুকণ্ঠে বলিল "মা!" মাতা বলিল



"চুপ্ কর্।" লীলা বুঝিল মা নিরাশ হইয়া আসিয়াছে। ক্ষুদ্র বালিকা দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া বসিয়া কাঁদিতে লাগিল, নীরজা ফিরিয়া চাহিল না। স্থিরনেত্রে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল। মোহিত একবার চাহিয়া দেখিল লীলা কাঁদিতেছে, ক্ষীণকণ্ঠে বলিল "লীলা, কেঁদোনা মা। তোমার বাবাকে আর কাঁদাইও না। আর সে সইতে পারে না।"

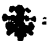
লীলা মুছিয়া মুছিয়া চোক দুটা রাঙ্গা করিল। বাবার কষ্ট হচ্ছে তাই সে কাঁদিল না।

নিতাই বাটী ঠিক করিয়া ফিরিয়া আসিল। পাল্কী আনিয়া মোহিতকে ধরাধরি করিয়া নামাইয়া আনিয়া তাহাতে উঠাইল। লীলাও সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া পাল্কীর মধ্যে বসিয়া পিতাকে বাতাস করিতে লাগিল। পাল্কী চলিয়া গেল। নিতাই কয়েকখানা তৈজসপত্র ও থান কয়েক কাপড়ে একটা পুঁটুলী বাঁধিয়া বলিল "মা গাড়ী আনি ?" নীরজা বলিল "পয়সা কোথায় পাব ?" নিতাই মৃদুকণ্ঠে বলিল "আমার গায়ের আলোয়ান খানা বেচেছি।" "সে পয়সায় দুদিনের দুধ বার্লি হবে, চল নিতাই আমি হেঁটেই যাব।" "এখনি ত ষ্টেশন থেকে হেঁটেই এলাম।" নীরজা অগ্রে অগ্রে চলিল। চক্ষু মুছিতে মুছিতে নিতাইও পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল।

একখানা খোলার ঘরে মৃত্তিকার উপর একটা শষা পাতিয়া মোহিতকে শুয়াইতে গিয়া নীরজা দেখিল মোহিত মূর্চ্ছা গিয়াছে। মোহিতকে ক্রোড়ের উপর টানিয়া লইয়া অচল প্রস্তরমূর্ত্তির মত বসিয়া রহিল। চক্ষে এক ফোঁটা জল নাই, তবে বোধ হইল যেন চারি দিকে ভূমিকম্প হইতেছে, আর আশ্রয় পাইবার জন্য নীরজা মূর্চ্ছিত স্বামীকে ধরিয়া বসিয়া রহিয়াছে। নিতাইয়ের ও লীলার যত্নে কিয়ৎক্ষণ পরে মোহিতের জ্ঞান হইল। সে নীরজাকে মৃদুস্বরে বলিল "তোমরা ভয় পেয়েছ ? বুকে হঠাৎ কেমন একটা ব্যথা লেগেছিল।"

রাত্রি গভীর হইয়াছে। শ্রান্ত নিতাই ঘরের কোণে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, লীলা তাহার কোলের কাছে শুইয়া ঘুমাইতেছে। কক্ষের এক কোণে একটা লণ্ঠন জ্বলিতেছিল। শায়িত লোকগুলার ছায়া মৃৎপ্রাচীরে পড়িয়া মনে অকারণ ভীতির সঞ্চার করিতেছিল। মোহিত ডাকিল "নিরো" নীরজা বলিল, "কি বলছ" ? "একটু সরিয়া এসো, তোমার মুখটা যে ভাল করে দেখতে পাচ্ছি না আর।" নীরজা সরিয়া আসিল। স্বামীর বুকের উপর হাত রাখিয়া স্থির নেত্রে চাহিয়া রহিল। মোহিত মৃদুকণ্ঠে বলিল "নীরো কাঁদছ ?" নীরজা রুদ্ধকণ্ঠে বলিল "না"। "কেঁদো না। পৃথিবী কদিনের জন্য ? আবার তো আমাকে পাবে।"

নীরজার এতক্ষণে কান্না আসিল। তাহার মনের মধ্যে যে কত ভাবের তুমুল ঝড় বহিতেছিল তাহা ক্রমে বৃষ্টির আকারে পরিণত হইয়া মোহিতের বক্ষের উপর




পড়িতে লাগল। হঠাৎ তাহার মু... বাহির হইল "আবার পাব কি ?" মোহিত তাহাকে চুম্বন করিয়া বলিল "এ কথা কেন ?" "আবার পাব কি ? এ বিবাহ সিদ্ধ কি ? আমার এ সন্দেহ কে মিটাবে ? আর পাব কি ?" মোহিত চক্ষু মুদিল। বহুক্ষণ নীরব থাকিয়া ভগ্নকণ্ঠে বলিল "নিরো, কি উত্তর দিব জানি না।" এ আমাদের প্রায়শ্চিত্ত কিনা, — বল্‌বে।"

রাত্রি প্রভাত হইল। ধীরে ধীরে সূর্য্যকিরণ সেই কুটীরের মধ্যে প্রবেশ করিল। মোহিত ডাকিল "লীলা।" লীলা পিতার নিকটে গিয়া বলিল, "বাবা ?" মোহিত বহুকষ্টে শীর্ণহস্ত তাহার মস্তকে রাখিয়া বলিল "এ জীবনে যদি একবারও তাঁহাকে ডেকে থাকি, তাঁহাকে ভক্তি করে থাকি, আশীর্ব্বাদ কর্‌ছি তুই সুখী হবি।" লীলা ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিল

"নিরো, নীরজা, আর যে দেখ্‌তে পাই না। একটু সরে এস।" নীরজা মুখের কাছের ... মৃদুভাবে আপনার মনে বলিল "কাল পাল্কীতে উঠ্‌বার সময় বুকে ব্যথা লেগেছে, এটা বুঝি সাম্‌লাতে পার্‌লাম না।" নীরজা নির্নিমেষ চক্ষে মোহিতের চক্ষের গতি দেখিতেছিল।

"নীরো একটা কথা শোন", নীরজা মস্তক নাড়িল।

তার পরে অতি ক্ষীণকণ্ঠে মোহিত বলিল "তবে যাই নীরো" ? অল্পক্ষণ থামিয়া বলিল "তাঁকে জিজ্ঞাসা কর্‌ব এ কথা ! এ বিবাহ সিদ্ধ কি না। তুমি আমার কি না ! তাঁর চরণেই তোমাদের দিয়া গেলাম। পতিতপাবনই পতিতদের দেখবেন,—আর না, নীরো"।

মুহূর্ত্তমধ্যে সব নীরব হইয়া গেল। এখনি যে এত কথা কহিতেছিল, সেই জিহ্বা আর শব্দ উচ্চারণ করিল না। তখনও তার শব্দগুলি বোধ হয় সেই কুটীরের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল

(ক্রমশঃ)

শ্রীনিরুপমা দেবী।

মারসী মারভিল।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

লর্ড মারভিল বলিলেন, না প্রিয় মারসী, আমি আমার ধন সম্পত্তি এবং জমিদারির অধিকার বা স্বত্বচ্যুত হই নাই। কেবলমাত্র আভিজাত্যের চিহ্নসূচক লর্ড মারসী লর্ড মারভিলের এই কথায় বিস্মিত স্বরে উত্তর করিল—

ষ্টিফেন, কিরূপে এরূপ ঘটিল ? লর্ড মারভিল বলিলেন—আমাদের পারিবারিক

বংশীয়া একজন রমণী আমার অপেক্ষা নিকটতর সম্পর্কসূত্রে মারভিলবংশীয় আভিজাত্য পদ সম্বন্ধীয় উপাধির উত্তরাধিকারিণী হইয়াছেন, কিন্তু সৌভাগ্য বশতঃ লর্ড উপাধি ব্যতীত সমস্ত জমীদারী ও সম্পত্তির আমিই একমাত্র উত্তরাধিকারী স্বরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছি। প্রিয় মারসী, এক্ষণে বল, আমাকে আভিজাত্য সম্বন্ধীয় উপাধিহীন ব্যক্তি জানিয়াও কি তুমি আমাকে বিবাহ করিতে সম্মত আছ ?"

তৎপরে লর্ড মারভিল পুনরায় গম্ভীর স্বরে বলিলেন—

"প্রিয় মারসী, প্রিয় মারসী, একবার তুমি আমাকে একটী অদ্ভুত স্বপ্নের কথা বলিয়াছিলে, সে কথা কি তোমার স্মরণ আছে ?" মারসী বলিল—

"হাঁ, আমার তাহা বেশ স্মরণ আছে। কিন্তু সে স্বপ্নের বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছ কেন, ষ্টিফেন ?"

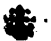
লর্ড মারভিল বলিলেন—"তোমার সে স্বপ্নবৃত্তান্তটি এক্ষণে একটি ভবিষ্যৎ বাণীর ন্যায় মনে হইতেছে। সম্প্রতি একটি অদ্ভুত ঘটনা ঘটিয়াছে। অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে একখানা জাহাজ উত্তর মেরু প্রদেশে নূতন ভূখণ্ড আবিষ্কারার্থ গমন করিয়াছিল। সম্প্রতি সেই তরণীখানি ইংলণ্ডে প্রত্যাগমন করিয়াছে। এই তরণীখানির সহিত আমাদের মারভিলবংশীয় কোন ব্যক্তির কিঞ্চিৎ সম্পর্ক আছে। ইঁহার জীবনের ইতিহাস তোমার নিকট বিবৃত করিলে তুমি বেশ বুঝিতে পারিবে, এই তরণীর সহিত তাঁহার কি সম্পর্ক। আমার মৃত পিতার একজন পিতৃব্য অত্যন্ত উচ্ছৃঙ্খলস্বভাবসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। পর জীবনে বয়োবৃদ্ধির সহিত তাঁহার উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তি এরূপ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল যে, সে সময় সমাজের একটা আবর্জ্জনার ন্যায় তিনি সমাজ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছিলেন। সর্ব্বশেষে তিনি আমার প্রপিতামহ ও আত্মীয় স্বজনগণের মতের বিরুদ্ধে মধ্য শ্রেণীর কুলসম্ভূতা একজন রমণীকে বিবাহ করেন। এই বিবাহই তাঁহাকে আত্মীয় স্বজনগণের সম্পর্ক হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল। আত্মীয় স্বজন ও সমাজ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া তিনি ইংলণ্ডে অধিক দিন অবস্থিতি করেন নাই। তৎকালে উত্তর মেরু সাগরের তীরবর্ত্তী নূতন ভূখণ্ডের আবিষ্কারকগণ তথায় গমন করেন। আমার পিতার উচ্ছৃঙ্খলপ্রকৃতি পিতৃব্য মহাশয়ও তাঁহাদের সমভিব্যাহারে গমন করেন। সেই সময়ে তাঁহার একটি পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল। তাঁহার স্ত্রী ও সেই পুত্রকে তিনি ইংলণ্ডে রাখিয়া যান। যে জাহাজে তিনি আবিষ্কারকগণের সহিত উত্তর মেরু সাগরে গমন করেন, তাহা কয়েক মাস সুদূর উত্তর মেরু প্রদেশে পরিভ্রমণ করিবার পর জমাটবদ্ধ তুষারময় মেরু সাগরে আবদ্ধ হইয়া যায়, এবং জাহাজস্থিত সমস্ত আরোহীও ক্রমে ক্রমে শীতে ও অনাহারে মৃত্যু-




গ্রাসে পতিত হন। সেই মৃত ব্যক্তিদিগের মধ্যে আমার পিতার পিতৃব্যও ছিলেন। ইংলণ্ডে তাঁহার আত্মীয় স্বজনগণ ও তাঁহার বিধবা পত্নী তাঁহার এইরূপ শোচনীয় অকাল মৃত্যুতে অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন। তাঁহার বিধবা পত্নী স্বামীর মৃত্যুতে একেবারে নিরাশ্রয় ও নিঃসম্বল হইয়া পড়েন। তিনি সেই সময়ে একদিন পুত্র সমভিব্যাহারে আসিয়া অনুনয়ের সহিত আমার প্রপিতামহের আশ্রয় ভিক্ষা করেন। কিন্তু আমার পিতার পিতৃব্যের সহিত যে তাঁহার রীতিমত বিবাহ হইয়াছিল, তাহার কোন নিদর্শন তাঁহার নিকট ছিল না ; সেজন্য আমার প্রপিতামহ তাঁহার কথাতে অবিশ্বাসপূর্ব্বক তাঁহাকে পুত্রবধূ বলিয়া গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন। অধিকন্তু ভবিষ্যতে কখন তাঁহার পুত্রবধূ বলিয়া নিজেকে পরিচয় দিতে তিনি কঠোর নিষেধাজ্ঞা প্রচার করেন। তদবধি আমার পিতার পিতৃব্যের বিধবা পত্নীর ও তাঁহার পুত্রের আর কোন সংবাদ কেহই জানিতে পারে নাই। সম্প্রতি শুনিতেছি যে, উত্তর মেরু প্রদেশে আকস্মিক গ্রীষ্ম ঋতুর আবির্ভাবে জমাটবদ্ধ তুষাররাশি গলিত হইয়াছে এবং মেরু সাগরে আবদ্ধ জাহাজখানি ও ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছে। সেই ভগ্ন জাহাজে আমার পিতার পিতৃব্যের বিবাহের সার্টিফিকেট ও তাঁহার বংশাদিসম্বন্ধীয় অন্যান্য কাগজ পত্রও প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। সেই সমস্ত কাগজপত্র ও বিবাহের সার্টিফিকেট হইতে জানা গিয়াছে যে, তাঁহার বিধবা পত্নী যাহা যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা সমস্তই সত্য। তিনি যথার্থই তাঁহার বিবাহিতা পত্নী ছিলেন। আমার পিতার পিতৃব্যের পুত্রের নাম রবার্ট মারভিল। এই রবার্ট মারভিলই আমাদের বংশের লর্ড উপাধি প্রাপ্ত হইবার সাক্ষাৎ সম্বন্ধে একমাত্র অধিকারী। আমাদের পারিবারিক উকিল এই রবার্ট মারভিলের অনুসন্ধান করিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় রবার্ট মারভিল কয়েক মাস পূর্ব্বে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইয়াছেন। তাঁহার একটি মাত্র কন্যা জীবিত আছে। সেই কন্যা কোথায় আছেন, তাহা আমাদের পারিবারিক উকিল অবগত নহেন। তাঁহার সন্ধান পাইবার জন্য তিনি সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়াছেন। রবার্ট মারভিলের এই নিরুদ্দেশ কন্যাই এক্ষণে আমাদের বংশের ভাইকাউণ্টেস উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। এলোইস আমাকে যে বাগ্দান হইতে মুক্তিদান করিয়াছে, এক্ষণে সেজন্য আমি তাহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।"

লর্ড মারভিলের এই কথা শ্রবণ করিয়া মারসী উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিল—"ও! ষ্টিফেন! ষ্টিফেন! তুমি কি সত্যই এলোইসকে এজন্য ধন্যবাদ প্রদান করিতেছ?"

লর্ড মারভিল বলিলেন—"হাঁ প্রিয়তম মারসী, সত্যই আমি এলোইসকে এজন্য ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।" মারসী বলিল







—"ষ্টিফেন, তুমি লর্ড উপাধিচ্যুত হইয়াছ, বোধ হয় সেই জন্য এলোইস তোমাকে বিবাহ করিতে চাহিতেছে না"।

লর্ড মারভিল বলিলেন—"হাঁ, এ কথা সত্য হইতে পারে"। লর্ড মারভিলের এই কথা শেষ হইতে না হইতেই মারসী অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া অধীরকণ্ঠে ক্রন্দন করিতে লাগিল। লর্ড মারভিল মারসীকে এরূপে ক্রন্দন করিতে দেখিয়া বলিলেন —"প্রিয়তম মারসী, কেন তুমি এরূপে ক্রন্দন করিতেছ? আমার কোন কথা কি এক্ষণে তোমার মনে যন্ত্রণা প্রদান করিতেছে?" মারসী দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া উত্তর করিল—

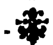
"হায়! আজ আমার চিরদুঃখী মৃত পিতা কোথায় রহিলেন! আমরা তাঁহাকে পাগল ভাবিতাম। চিরদিন তিনি দরিদ্রতা ও দুঃখের পেষণে নিষ্পেষিত হইয়াছেন। তাঁহার চিরপোষিত আশা আজ পূর্ণ হইল। কিন্তু কি বিলম্বেই তাঁহার অসার স্বপ্ন সকল সফল হইল। আজ এই সুখের দিনে তাঁহার স্মৃতি আমাকে অত্যন্ত ব্যথিত করিতেছে। ষ্টিফেন, আমি তোমাকে আমার পিতার চিরপোষিত আশার কথা একদিন বলিয়াছিলাম, বোধ হয় তুমি তাহা ভুলিয়া গিয়াছ।"

লর্ড মারভিল বলিলেন—"আমি তোমার কথা বুঝিতে পারিতেছি না।" মারসী বলিল—"কিরূপেই বা তুমি তাহা বুঝিবে? ষ্টিফেন, সত্যই কি তুমি লর্ড উপাধি হইতে বঞ্চিত হইয়াছ বলিয়া তোমার কোন কষ্টের কারণ উপস্থিত হয় নাই?"

লর্ড মারভিল বলিলেন, "হাঁ, লর্ড উপাধি হইতে বঞ্চিত হইয়াছি, সে জন্য আমি কিছুমাত্র দুঃখিত নই। কারণ লর্ড উপাধিই আমাকে তোমার ন্যায় স্ত্রীলাভে বঞ্চিত করিত।" মারসী বলিল—"কিন্তু এক্ষণে অবস্থা উল্টিয়া যাইল এবং আমাদের পূর্ব্বকার বিদ্রূপবাক্য সত্যে পরিণত হইল। আমরা এক্ষণে পরস্পর পিতৃব্য ভ্রাতা ভগিনী। আমিই সেই কাউণ্টেস্ উপাধির উত্তরাধিকারিণী। ভগ্ন জাহাজে প্রাপ্ত কাগজ পত্র ব্যতীত আমাদের বংশসম্বন্ধীয় পিতার সমস্ত কাগজ পত্র এক্ষণে আমার নিকট রহিয়াছে। ভগ্ন জাহাজে প্রাপ্ত কাগজ পত্র প্রাপ্ত হইবার জন্যই পিতা সময়ে সময়ে উত্তর মেরু প্রদেশে যাইবার জন্য ব্যগ্র হইতেন। কিন্তু ষ্টিফেন, আমি কাউণ্টেস উপাধি প্রাপ্ত হইবার জন্য কিছুমাত্র ব্যস্ত নহি। তোমার 'স্ত্রী' এই উপাধিই পৃথিবীর মধ্যে আমার সর্ব্বাপেক্ষা আকাঙ্ক্ষার বস্তু

লর্ড মারভিল বলিলেন—"প্রিয়তম মারসী, এই সপ্তাহের মধ্যেই সমস্ত ইংলণ্ড জানিতে পারিবে যে, কাউণ্টেস অব মারভিল ষ্টিফেন মারভিলকে বিবাহ করিয়া তাঁহাকে সুখী ও সম্মানিত করিয়াছেন।"

মারসী ব্যগ্রভাবে উত্তর করিল "না।





ষ্টিফেন, সমস্ত ইংলণ্ড জানিবে যে, লর্ড মারভিল দরিদ্রা মারসী মারভিলকে বিবাহ করিয়া তাহাকে উচ্চ গৌরবে গৌরবান্বিত করিয়াছেন।"

লজ্জাবতী বসু।

জাপান সম্রাট্ মিকাডো মুৎসুহিতো।

গত ২৮শে জুলাই মধ্যরাত্রে জাপানের দেবতুল্য সম্রাট্ স্বদেশ ও স্বজাতিকে গভীর শোকসাগরে নিমগ্ন করিয়া ইহ-লোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। ইহাঁর তুল্য প্রভূতশক্তিশালী অশেষগুণসম্পন্ন নৃপতি প্রায় দুর্লভ। জাপানের মৃত দেহে ইনিই প্রাণসঞ্চার করেন, এবং সমুদায় সভ্য জগৎকে স্তম্ভিত করিয়া, আশ্চর্য্যরূপে স্বদেশের গৌরববৃদ্ধি করিয়া সকল সভ্য জাতির মধ্যে নিজের আসন প্রতিষ্ঠিত করেন।

ইনি ১৮৫২ সালের ৩রা নবেম্বর কিওটোতে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার মৃত্যুর পর ইনি ১৮৬৭ সালের জানুয়ারী মাসে জাপানের সিংহাসনে আরোহণ করেন।

১৮৬৮ সালের অক্টোবর মাসে তাঁহার অভিষেকক্রিয়া সম্পন্ন হয়। সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই তিনি ঘোষণা করেন যে, আমি সকল প্রজাকে শান্তিতে রাখিব, অন্যান্য দেশের নৃপতিবৃন্দের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়া আমাদের দেশকে গৌরবে মণ্ডিত করিব এবং আমাদের জাতিকে চিরস্থায়ী সুখ-সম্ভোগের উপযুক্ত সুশিক্ষা প্রদান করিব। পরে ১৮৬৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ইনি জাপানের প্রথম শ্রেণীর অভিজাতবংশীয় প্রিন্স ইচিজোর দুহিতা হারুকোর পাণিগ্রহণ করেন। মৎসুহিতো যখন জাপানের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন, তখন জাপান অন্তর্বিরোধে ক্ষতবিক্ষত হইতে-ছিল। ১৮৫৪ সালে শোগুন ইয়েমোচি বিদেশীদিগকে জাপানে বাণিজ্য করিবার ও বন্দরসমূহে প্রবেশ করিবার অধিকার দেন, ইহাতে রক্ষণশীল সম্প্রদায় বিরোধী হয়। নবীন সম্রাট্ এই রক্ষণশীল দাইমীয়-গণের অনুরোধে শোগুনের প্রাধান্য বিলুপ্ত করিবার সঙ্কল্প করেন। ইহাতে অনেকে তাঁহার বিরোধী হইলেন। কিন্তু মুৎসুহিতোর দৃঢ় সঙ্কল্প অক্ষুণ্ণ রহিল। তিনি অস্ত্রবলে জাপানে নূতন তন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করিলেন।

১৮৬৮ খৃঃ অব্দে মিকাডো স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বৈদেশিক শক্তিপুঞ্জের প্রতিনিধি-বর্গকে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য আমন্ত্রণ করিলেন। ইংলণ্ডের প্রতিনিধি সার হারি পার্কস্ সম্রাটের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যাইতেছিলেন। পথে কয়েক জন সামুরাই অর্থাৎ ক্ষত্রিয়-

সম্প্রদায়ভুক্ত বীর সার হ্যারিকে আক্রমণ করে। সার হ্যারি শরীররক্ষী সৈন্যদিগের সাহায্যে কোনও মতে আত্মরক্ষা করেন। মিকাডো মুৎসুহিতো এই ঘটনায় অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন, এবং প্রত্যক্ষভাবে রাজশক্তি আপনার করায়ত্ত করিবার সংকল্প করিলেন। এই নূতন চেষ্টার প্রথম ফলস্বরূপ সর্ব্বাগ্রে জাপানের রাজধানী কিয়োটো হইতে ইয়োডো নগরে নীত হইল। পরে ইয়োডো নাম পরিবর্ত্তিত ও "টোকিয়ো" অভিধানে অভিহিত হইল। "টোকিয়ো" শব্দের অর্থ—পূর্ব্ব অঞ্চলের রাজধানী।

তাহার পর মিকাডো শাসন-সংস্কারে প্রবৃত্ত হইলেন। শাসন-সংস্কারে তাঁহার প্রথম অনুষ্ঠান, 'Deliberative Assembly' অর্থাৎ আলোচনা সমিতি।—ইহা জাপানের বর্ত্তমান রাজশক্তি-নিয়ন্ত্রিত প্রজাতন্ত্রের প্রথম অঙ্কুর। এই পরিষদের অনুষ্ঠানে দাইমীয়ো সম্প্রদায় মিকাডোর সাহায্য করিয়াছিলেন। ইহার ফলে বহু শতাব্দী হইতে জাপানে যে 'হোকেন সেইজি' অর্থাৎ সামন্ত-তন্ত্র প্রচলিত ছিল, তাহা সমূলে উৎপাটিত হইল। নবীন মিকাডো সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য লাভ করিয়া অপ্রতিহত-প্রভাবে শাসন-দণ্ড পরিচালিত করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার প্রজাবর্গকে নবীন জাতীয় জীবনের পথে প্রবর্ত্তিত করিলেন।

১৮৬২ খৃষ্টাব্দে প্রাচীন জাপানে নবীন যুগের অভ্যুদয় হইল। পুরাতনের উপাদানে সম্রাট মুৎসুহিতো নবীন জাপানের গঠন করিলেন। এই বৎসর জাপানে প্রথম রেলপথ নির্ম্মিত হইল, অপরাধীদিগকে যন্ত্রণা দিবার প্রথা লুপ্ত হইল এবং সাম্রাজ্যে সুবিচার বিতরণ করিবার জন্য নূতন আইন রচিত ও প্রবর্ত্তিত হইল। জাপান সকল বিষয়ে ইউরোপীয় আদর্শের অনুবর্ত্তী হইল, জাপানে যুগান্তর ঘটিল।

বলা বাহুল্য, বিনা বাধায় এই সকল সংস্কার সম্পন্ন হয় নাই। রক্ষণশীল সম্প্রদায় এই সকল সংস্কারের ও পরিবর্ত্তনের অত্যন্ত বিরোধী ছিলেন। ১৮৭৬ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত তিন বার জাপানে বিদ্রোহ হইয়াছিল, কিন্তু মিকাডো দৃঢ়হস্তে তিন বারই এই অভ্যুত্থানের দমন করিয়াছিলেন।

সাম্রাজ্যে শান্তির প্রতিষ্ঠা ও আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলার ব্যবস্থা করিয়া সম্রাট্ ও তাঁহার উপদেষ্টা অমাত্যবর্গ বৈদেশিক শক্তি-পুঞ্জের সহিত বহুবর্ষ পূর্ব্বে জাপানের যে সকল সন্ধি হইয়াছিল, সেই সকল সন্ধি-পত্রের পুনঃসংস্কার করিবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু বহুদিন তাঁহাদের এই চেষ্টা সফল হয় নাই। ১৮৯৪ খৃঃ অব্দে মিকাডো আবার এই বিষয়ে যত্নবান্ হইলেন। সর্ব্বপ্রথমে ইংরেজ পুরাতন সন্ধিপত্রের সংস্কারে সম্মতি দিলেন, এবং জাপানের সহিত নূতন সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইলেন। ক্রমে ক্রমে ইউরোপের অন্যান্য শক্তিপুঞ্জও ইংরেজের আদর্শের অনুসরণ করিলেন। জাপান একচক্ষু সন্ধির



পক্ষপাতপূর্ণ অনুশাসন হইতে মুক্তিলাভ করিয়া পররাষ্ট্রনীতির জটিল পথে আপনার আলোকে স্বেচ্ছায় বিচরণ করিবার অবকাশ লাভ করিলেন। মিকোডোর চেষ্টা ও অভীষ্ট সিদ্ধ হইল।

১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে জাপান চীনের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। ইউরোপীয় শক্তিপুঞ্জের চক্রান্তে জাপান যুদ্ধের ফলভোগে বঞ্চিত হয়। ১৯০৪ ৫ খৃঃ অব্দে জাপান রুসের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। বিজয়লক্ষ্মী মিকাডোর কণ্ঠে বিজয়মাল্য অর্পণ করেন। এই যুদ্ধে জাপানীগণ যেরূপ শৌর্য্য, বীর্য্য, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, রাজভক্তি ও আত্মত্যাগের পরিচয় দিয়াছিল, জগতের ইতিহাসে তাহা অতুলনীয়। মিকাডো মুৎসুহিতো যে এই অদ্ভুত শক্তির উৎস, তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত।

পূর্ব্ব দেশের রাজন্যবর্গের মধ্যে তিনিই প্রথমে ইউরোপীয় শক্তিসমূহের, বিশেষতঃ ইংরেজের সহিত সঙ্কটকালে পরস্পরের সাহায্য করিবার জন্য সন্ধিসূত্রে মৈত্রী-বন্ধনে আবদ্ধ হন।

বিচ্ছিন্ন, বিভিন্ন, বিশৃঙ্খল জাপানের সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া মিকাডো মুৎসুহিতো সমগ্র জাপানীদিগকে মিলিত শক্তিশালী জাতিতে পরিণত করিয়া ইহ-লোক পরিত্যাগ করিলেন।

মিকাডো এক পুত্র ও তিন কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন। ১৮৭৯ খ্রীঃ অব্দে রাজকীয় উত্তরাধিকার বিধানে পুরুষ-শাখায় সম্রাটের উত্তরাধিকার অর্শিবে, এইরূপ ব্যবস্থা হইয়াছিল। তদনুসারে ১৮৭৯ খ্রীঃ অব্দের নভেম্বর মাসে সম্রাটের জীবিতকালেই যুবরাজ ইয়োসুহিতো জাপান-সম্রাটের ভাবী উত্তরাধিকারী বলিয়া ঘোষিত হইয়াছিলেন। ১৮৭৯ খ্রীঃ অব্দের ৩১শে আগষ্ট জাপানের বর্ত্তমান নবীন সম্রাট্ মিকাডো জন্মগ্রহণ করেন। ১৯০০ খৃঃ অব্দে তিনি প্রিন্স্ কুজার দুহিতা প্রিন্সেস্ সাদার পাণিগ্রহণ করেন। তাঁহার তিন পুত্র।

ভগবান্ নবীন মিকাডোর কল্যাণ বিধান করুন।

৺উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের জীবনী

৺ দত্ত মহাশয়ের লিখিত আত্মজীবনী এতদিন প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি যাহা শৃঙ্খলাবদ্ধরূপে লিখিয়া রাখিয়াছিলেন, প্রায় প্রকাশ করা হইয়াছে।

এখন তাঁহার অপ্রকাশিত ও যে সকল লেখা তিনি স্থানে স্থানে লিখিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহাই প্রকাশ করিবার মানসে তাঁহার ১৫ বৎসর বয়সের সময় তিনি যে রোমের ইতিহাস লিখিয়াছিলেন, তাহা এই স্থানে উদ্ধৃত করিলাম এবং পরে অন্যান্য লেখা প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

রোম রাজ্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

উপক্রমণিকা।

ইউরোপের অন্তর্গত ইটালিদেশে "রোম" এক অতি বৃহৎ ও ক্ষমতাশালী রাজ্য ছিল। ইহার নিবাসীদিগকে রোমান বলিত। পূর্ব্বকালে যখন ইংরাজ, ফরাসী, জর্ম্মান্ প্রভৃতি নব্য সুবিখ্যাত জাতিরা অতি অসভ্য ও অজ্ঞান ছিলেন, তখন এই রোমানেরা, টরস্ পর্ব্বত হইতে আটলাণ্টিক মহাসাগর পর্য্যন্ত এবং আফ্রিকার উত্তরাংশ হইতে জার্ম্মেনি ও ইংলণ্ড দেশ পর্য্যন্ত, সমুদায় দেশে আপনাদিগের জয়-পতাকা উড্ডীয়মান করিয়াছিলেন। যদিও ভারতবর্ষ, গ্রীস, মিশর, পারস্য ও চীন এই সকল দেশ রোম অপেক্ষা প্রাচীন, তথাপি কোন রাজ্যই রোমের মত উন্নত হইতে এবং একাধিপতিরূপে শাসন বিস্তার করিতে সমর্থ হয় নাই।

কোন বৃহৎ বৃক্ষের শিরশ্ছেদ করিলে যেমন চতুর্দ্দিক হইতে সতেজে শাখা প্রশাখা সকল বিনির্গত হয়, সেইরূপ সুবিস্তীর্ণ রোম রাজ্যের উচ্ছেদ হইলে অধুনাতন ইউরোপস্থ সমস্ত পরাক্রান্ত জাতি উৎপন্ন হইয়াছে। রোমের উৎপত্তি, স্থিতি ও ধ্বংস কেবল আশ্চর্য্য ঘটনাতেই পরিপূর্ণ এবং ইহার ইতিহাসকে পৃথিবীর এক প্রধান পুরাবৃত্ত বলিয়া গণনা করিতে হয়।

কি শিল্প, কি সাহিত্য, কি বিজ্ঞান, কি রাজ্যশাসন, কি শস্ত্রবিদ্যা, সকল বিষয়েই রোমানেরা এক সময়ে প্রায় অদ্বিতীয় হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের ভাষা লাটিন সংস্কৃত ভাষার ন্যায় অতি চমৎকার ও মনোহর। তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকানেক বিখ্যাত মনুষ্য জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহারা অতি বিখ্যাত কার্য্য সকল করিয়া গিয়াছেন। শিশিরোর মত সদ্বক্তা, বর্জিলের মত কবি, সিপিও, পম্পে, সিজর প্রভৃতির ন্যায় যোদ্ধা এবং রোমান সেনেটরদিগের মত সূক্ষ্মদর্শী রাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তি, অন্যান্য জাতির মধ্যে অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল কারণে রোমরাজ্য অতি বিখ্যাত ও চির-স্মরণীয় হইয়াছে এবং ইহার ইতিহাস পাঠ করা বিদ্যার্থিমাত্রেরই অতীব কর্ত্তব্য।

যেমন সকল দেশের আদিম অবস্থার প্রকৃত ইতিহাস পাওয়া যায় না, রোম রাজ্যেরও সেইরূপ। অনেক প্রামাণিক ইতিহাসবেত্তাদিগের মত এই যে, গ্রীক-দিগের দ্বারা ট্রয়নগর (১) ধ্বংস হইলে, ইনিয়স নামে তথাকার এক রাজপুত্র, বহু সহচর সমভিব্যাহারে ইটালীয় অন্তঃপাতী লাটিন দেশে আসিয়া উপস্থিত হন। ইনিয়সের পিতার নাম আঙ্কাইসিস্; তাঁহার মাতা কে, তাহার

(১) ট্রোজনদিগের সহিত গ্রীকদিগের যুদ্ধ গ্রীশের পুরাবৃত্তে একটী প্রধান ঘটনা। ট্রয়রাজ প্রায়েমের পুত্র পেরিস স্পার্টাধিপতি মেনেলসের পরম সুন্দরী ভার্য্যা হেলেনাকে হরণ করাতে গ্রীশের নৃপতিগণ সকলে একত্র হইয়া ট্রয় নগর ১০ বৎসর কাল অবরোধ করেন এবং অবশেষে ভস্মসাৎ করিয়া দেন।

কিছুই নিশ্চয় নাই। কিন্তু প্রাচীন কালের লোকেরা সুপ্রসিদ্ধ লোকদিগের জন্ম বিষয়ে দেব দেবীর কল্পনা করিতেই ভাল বাসিতেন, সুতরাং ভিনস দেবীকে, তাঁহার জননী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। যাহা-হউক, ইনিয়স লাটিন দেশে সমাগত হইলে তথাকার রাজা লাটিনস অতি সমাদর-পূর্ব্বক তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন, এবং তাঁহার সহিত আপন কন্যা লাভিনিয়ার বিবাহ দিলেন। এই ইনিয়সকে রোমান-দিগের আদি পুরুষ বলিয়া গণনা করা হয়।

বৃদ্ধ লাটিনরাজের মৃত্যু হইলে, জামাতাই লাটিনদিগের উপর রাজত্ব করিতে লাগিলেন। তিনি ৬ বৎসর রাজত্ব করিয়া আপনার পূর্ব্বমহিষী ক্রুশার গর্ভজাত পুত্র আস্কানিয়সকে উত্তরাধিকারী করিয়া যান। রোমান মহাকবি বর্জ্জিল "ইনিএড" নামে এক-খানি অত্যদ্ভুত ও মনোহর কাব্য রচনা করেন, তাহাতে ইনিয়সের ভ্রমণাদির বৃত্তান্ত অতি সুন্দররূপে বর্ণিত আছে। ইনিয়সের পর নিউমিটর পর্য্যন্ত আর ১৫জন রাজা লাটিন দেশে রাজত্ব করেন, তৎপরে রমুলস কর্ত্তৃক রোমনগর সংস্থাপিত হয়।

রমুলস্ ও রিমসের জন্ম।

লাটিনদিগের সপ্তদশ রাজা প্রোকসের দুই সন্তান ছিল, নিউমিটর ও এমুলিয়স। তিনি জ্যেষ্ঠ পুত্র নিউমিটরকে রাজ-সিংহাসন প্রদান করেন, এবং কনিষ্ঠকে আপনার সমস্ত ধন সম্পত্তির অধিকারী করিয়া যান। কিন্তু নিউমিটর রাজা হইতে পারিলেন না, তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা এমুলিয়স, আপনার অপরিমেয় অর্থের সাহায্যে সিংহাসন বলপূর্ব্বক অধি-কার করিলেন। পরে তিনি সমুদায় ভ্রাতু-ষ্পুত্রগণকে বিনষ্ট করিয়া, রিয়া সিল্‌ভিয়া-নাম্নী নিউমিটরের যে কন্যা ছিল, তাহাকে ভেষ্টাদেবীর কুমারী (২) করিয়া রাখিলেন।

রিয়া কৌমারধর্ম্ম চিরকাল রক্ষা করিতে পারেন নাই। তিনি দুইটী যমজ সন্তান প্রসব করেন এবং তাহাদিগকে মার্শনামক রণদেবতার ঔরসজাত বলিয়া প্রচার করিয়া দেন। মহাভারতে সূর্য্যের ঔরসে, কুমারী কুন্তীর গর্ভে, কর্ণের জন্মের সহিত এই ঘটনাটীর আশ্চর্য্য সৌসাদৃশ্য আছে। যমজ সন্তানের প্রসববার্ত্তা শুনিবামাত্র, এমুলিয়স তৎক্ষণাৎ রিয়াকে কারারুদ্ধ করিতে ও ঐ সন্তান দুটীকে নদীতে নিক্ষেপ করিতে আদেশ করিলেন।

ঘটনাক্রমে টাইবর নদীর জল তখন তীরে উত্থিত হইয়াছিল, ভাঁটা পড়িলেই যে পাত্রে নবপ্রসূত শিশু দুটি ভাসিতে-ছিল, তাহা শুষ্ক ভূমিতে সংলগ্ন হইল। অনতিবিলম্বে রাজমেষপালক ফাষ্টুলস কোন কার্য্যবশতঃ সেই স্থান দিয়া যাইতেছিলেন, শিশু দুটীকে তদবস্থ দেখিয়া

(২) ভেষ্টাদেবীর কুমারীগণকে যাবজ্জীবন অবিবাহিত থাকিয়া তাঁহার সেবা-কার্য্যেই নিযুক্ত থাকিতে হইত।

তিনি দয়ার্দ্রচিত্ত হইলেন এবং গৃহে লইয়া গিয়া পালনার্থ আপন পত্নী লরেন্সিয়ার হস্তে তাহাদিগকে সমর্পণ করিলেন। তদবধি তাঁহারা শিশু দুটীকে আপনাদিগের পুত্রনির্ব্বিশেষে লালন পালন করিতে লাগিলেন। (ক্রমশঃ)

"মানুষ কে" ?

যে জন যতনে　　　হৃদয়-ভবনে
ভকতি পূরিয়া রাখে,
জীবন্ত বিশ্বাসে　　　প্রাণের আবেশে
যে জন তাঁহাকে ডাকে।
ভুলি আত্মপর　　　কদর্য্য সুন্দর
যে জন যতন করে,
শশী তারকায়　　　বালুকাকণায়
যে জন তাঁহারে হেরে।
অপরের দুঃখ　　　দেখি যার বুক
বিষাদে ফাটিয়া যায়,
পরের লাগিয়া　　　গিয়াছে ভুলিয়া
যেই জন আপনায়।
ভেদাভেদ ভুলি　　　হয়ে কুতূহলী
সদাই কর্ত্তব্যে রত,
নির্ম্মল চরিত　　　সুপবিত চিত
সরল শিশুর মত।
স্বদেশ বিদেশ,　　　নাহি ভেদলেশ,
মনে করে নিজ গেহ,
মন মুখ কাজে　　　সমতা বিরাজে,
সংযমে গঠিত দেহ।
কৃপা-পারাবার　　　হৃদে শোভে যার
বদনে সরল হাসি,
প্রেম-পাশে যার　　　বাঁধা এ সংসার,
নহে সুখ অভিলাষী।
সন্তোষ-শিখরে　　　সদাই বিহরে
যাঁহার প্রশান্ত মন,
মানুষ বলিতে　　　আছে অবনীতে
শুধু সেই মহাজন !

শ্রীচারুমোহন দে।

গিরিধি মহিলা-সমিতিতে পঠিত।

মানুষ জেগেও যেন ঘুমন্ত, এটা বড়ই চিন্তার বিষয়। নিদ্রায় যেমন দেহটাকে মৃতবৎ করে রাখে, সেইরূপ আত্মার নিদ্রায় মানুষের প্রকৃত মনুষ্যত্ব লুপ্ত হয়। তিনিই ধন্য যাঁহার আত্মা সজাগ।

ঘুমন্ত অবস্থায় আমরা সব ভুলে থাকি। এই বিশাল জগতের সঙ্গে, সুবিস্তৃত কর্ম্মক্ষেত্রের সঙ্গে, যেন তখন কোন সম্পর্কই থাকে না। অন্ধকারের সঙ্গে সঙ্গে জীবচক্ষু বন্ধ হয়ে আসে। আবার আলোকের স্পর্শমাত্র বিশ্ব সজাগ জীবন্ত, কত ছুটোছুটী, কতই ব্যস্ততা, সেই অসাড় মৃতভাব কোথায় অদৃশ্য হয়ে যায়। আত্মা সম্বন্ধেও ঠিক ঐরূপ। যখন পরমাত্মার আহ্বানে মানবাত্মার মোহ ঘুম ভেঙ্গে যায়, তখন জীবনে এক নূতন যুগ উপস্থিত হয়।

তখন কতই আনন্দ, কতই নূতন নূতন মহৎ ভাব সকল দেখা দেয়।

আত্মা এক নূতন বলে বলীয়ান্ হয়ে মানবনাম সার্থক করে। পৃথিবীর আলোয় যেমন পার্থিব চক্ষু খুলে যায়, চিরজাগ্রত সেই মহান্ প্রভুর আবির্ভাবে তেমনি সুপ্ত আত্মা জাগরিত হয়। এই যে জাগরণ, ইহাতে মানুষ ক্ষুদ্র হয়েও মহান্ ও অনন্ত পরমাত্মাকে আপনার মধ্যে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয়। মানব ইতিহাসে চিরকাল পরমাত্মার আহ্বান-ধ্বনি ধ্বনিত হয়ে সকলকে বলচে "ভূমার মধ্যে জাগ্রত হও, আপনাকে বড় বলে জান, উজ্জ্বল সত্যের উন্মুক্ত আলোকের মধ্যে জাগ্রত হও, আর পাপ অন্ধকারে নিজেকে সমাচ্ছন্ন করে রেখো না"। এই যে জাগরণ, যে জাগরণে আমরা আপনাকে সত্যের মধ্যে দেখি, জ্যোতির মধ্যে দেখি, অমৃতের মধ্যে দেখি, যে জাগরণে আমরা প্রতিদিনের স্বরচিত তুচ্ছতার সঙ্কোচ বিদীর্ণ করে আপনাকে পূর্ণতার মধ্যে বিকশিত করে দেখি, সেই জাগরণই আমাদের উৎসব।" ধর্ম্মসমাজে যে সময় সময় উৎসব আসে, তাহার উদ্দেশ্য ঘুম ভাঙান।

আমরা প্রত্যেকে এক দিকে অতি ছোট। আর যে দিকে আমার সঙ্গে সমস্তের যোগ, আমাকে নিয়ে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের পূর্ণতা, পরমাত্মার মিলনে মানবাত্মার দেবভাব, সেখানেই আমি বড়।

যেই হৃদয় জাগিল, সঙ্কীর্ণতা, স্বার্থ, লোভ, মোহ, সব কোথায় অদৃশ্য হইল। আগে সত্য বাঁচিয়ে চলিনি, ধর্ম্ম দেখিনি, আত্মার গৌরব ভাবিনি। এখন দিব্যা-লোকে পথ পরিষ্কার হইল, অবিশ্বাসের অন্ধকার ঘুচিল, ঘৃণা, দ্বেষ, হিংসা সব তিরোহিত হইল। নিরানন্দ প্রাণে আনন্দ আসিল, শত্রুতার স্থানে মিত্রতা প্রেমের বাহুবিস্তার করে সকলকে আলিঙ্গন করিল। পূর্ণ মাত্রায় বিশ্বাস এসে আত্মাকে নব বলে বলী করিয়া দিল। হৃদয়ে এই ভগবৎপ্রেম আসিলেই মানুষ ঈশ্বরচরণে আত্মোৎসর্গ করে, তখন আর সংসারের ভয় ভাবনা, সুখ দুঃখে সে বিচলিত হয় না। জীবন কেবল ভগবানের গৌরব প্রচারের জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়ে। প্রভুর চরণে আত্মবলি দিয়ে তখন মানব বলিতে পারে "প্রভু আমি তোমারই"। তখন বিশ্বাসবলে মানবের এক আশ্চর্য্য স্বর্গীয় বল দেখা দেয়। এই বিশ্বাসের অবস্থা হইতে ভগবৎপ্রেম মানবহৃদয়কে অধিকার করিয়া ফেলে, তখনই প্রেমের সার্থকতা পূর্ণ হয়, তখন সকল বাসনা কর্ত্তব্যের অনুগত হয়, তখন মানব প্রাণ খুলে "তুমি আমার পিতা" এই মহামন্ত্র উচ্চারণ করিতে সমর্থ হয়।

"প্রভু তুমি আমার পিতা" গভীর বিশ্বাস ও প্রেমে মানুষ যখন এ কথা বলিতে সমর্থ হয়, তখনি সে রোগ, শোক, মৃত্যু সব অবস্থার মধ্যেই অটল ও দৃঢ়

থকে। যে জাগরণে মানবের এই সার্থকতা লাভ হয়, সে জাগরণ কি, আমরা যেন স্থির হয়ে নির্জ্জনে চিন্তা করি এবং সেই জাগরণের জন্য ব্যাকুল মনে প্রার্থনা করি। ধন্য সেই পুণ্যাত্মা যিনি ভক্তি-পরিপ্লুত আনন্দ-উচ্ছ্বাসে গাহিতে পারেন—

"তোমাতে যখন, মজে আমার মন,
তখনি ভুবন হয় সুধাময় ;
জীবে হয় কত, স্নেহ সমাগত,
দূরে যায় যত দুঃখ আর ভয়।
দেখি দিবাকরে সুধা ঝরে সুধা করে
সুধাময় হয়ে পবন সঞ্চরে।"

এই ভগবৎ-ভাব হৃদয়ে আসিলেই মানুষ পরমেশ্বরের চরণে আত্মোৎসর্গ করে। তখন আর সংসারের ভাবনা, সুখ, দুঃখ মনে থাকে না। জীবনটা তাঁরই গৌরববৃদ্ধির জন্য ব্যাকুল হয়। প্রভুর বেদিতে আত্মবলি দিয়ে তখনি বলিতে পারে—"প্রভু আমি তোমারই"

যখন বিশ্বাসবলে মানব এই অবস্থায় আসে, তখন আর জগতের কোন অবস্থাই তাঁকে বিচলিত করিতে পারে না। কবি সত্যই বলিয়াছেন—

"তোমার প্রতি নিগূঢ় প্রেম যার,
ফলভরে অবনত শাখারি আকার।
লুপ্ত হয় ভাবনা ভীতি, ক্ষিপ্র যে প্রকার,
মিশে নদী জলধিতে হয় একাকার।"

এই বিশ্বাসের অবস্থা হইতেই ভগবৎ-প্রেম মানব হৃদয়কে অধিকার করিয়া ফেলে, তখনই প্রেমের সার্থকতা পূর্ণ হয়। তখন সকল বাসনা কর্ত্তব্যের অনুগত হয়, তখনই মানব প্রাণ খুলে বলিতে সমর্থ হয় তিনি আমার পিতা। তুমি আমি ছোট বড় সবাই তো আমরা এই গীত গাহিবার অধিকারী। যে জাগরণে অমৃতের সন্তান অমৃতের অধিকারী হয়, সেই মহা অধিকার লাভের জন্য আমরা প্রস্তুত হই। আজ এই উৎসব-ক্ষেত্রে এসো সকলে মিলে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে এই মৃত ভাবকে দূর করিতে সচেষ্ট হই। তাহা হইলেই উৎসব সার্থক, সমিতি সার্থক, মিলন সার্থক।

শ্রীমতী রাধারাণী লাহিড়ী।

নূতন সংবাদ।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রদত্ত পুরস্কারগুলি নিম্নলিখিত ছাত্রীগণ প্রাপ্ত হইয়াছেন :—

ম্যাট্রিকুলেশন।

কেশবচন্দ্র সেন প্রাইজ তটিনী গুপ্ত, বেথুন।

ইংলিস প্রাইজ " "

কীর্ত্তিচন্দ্র ম্যাকেঞ্জি পুরস্কার "

বি, এ।।

পদ্মাবতী মেডেল নির্ম্মলা রায়, বেথুন।

প্রসন্নময়ী দেবী প্রাইজ "

গঙ্গামণি দেবী গোল্ডমেডেল প্রীতিবালা ঘোষাল, বেথুন।

পরলোকগত জাপান সম্রাটের অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ায় ইংলণ্ড হইতে প্রিন্স আর্থার অব

কনট ও প্রুশিয়া হইতে প্রিন্স হেন্‌রি অব প্রুশিয়া যোগদান করিবেন।

সম্প্রতি রুশিয়ার অন্তর্গত এক পল্লি-গ্রামে একজন দরিদ্র কৃষক ১৪১ বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত ছিল।

স্যার জেকব সেসুন বোম্বায়ের দরিদ্র ইহুদিদিগের চিকিৎসার্থ একটী হাঁস্‌পাতাল স্থাপনের জন্য এক লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন।

১৪ই সেপ্টেম্বর হইতে কলিকাতার সঙ্গীতসমাজের সম্মুখে যে পান্তীর মাঠ আছে, তাহাতে স্বদেশী মেলা বসিবে এইরূপ ঠিক হইয়াছে।

কুমারী রেজিনা গুহ বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের প্রাথমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ইনিই বঙ্গ রমণীদিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম আইন পরীক্ষা দিলেন।

১২ই আগষ্ট মহাত্মা ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুনের মৃত্যুদিন উপলক্ষে বেথুন কলেজ-গৃহে একটী সভা হইয়া গিয়াছে। বেথুন কলেজের বর্ত্তমান ও পুরাতন ছাত্রীগণ একত্র মিলিত হইয়া মহাত্মা বেথুনের স্মৃতি-উৎসব সম্পন্ন করিয়াছেন।

বিজ্ঞানাচার্য্য ডাক্তার পি, সি, রায় ১১ই আগষ্ট নির্ব্বিঘ্নে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন।

বামারচনা।

নির্ভর।

আমি স্খলিত চরণে আঁধার গহনে
পড়ে গেছি যতবার,
তুমি প্রসারি তোমার স্নেহ ভরা হাত
তুলিয়াছ ততবার।
তুমি সাথে সাথে মোর ফিরিয়াছ,
চিরদিন মোর কাছে কাছে আছ,
অতুলন স্নেহে অসীম যতনে ঘিরে
আছ মোর চারিধার।
অযুত আঘাত জুড়ায়ে দিয়েছ, বরষি
করুণা অমৃতধার।
আমি হারায়ে ফেলেছি সুপথ আবার
মরীচিকা ঘেরা জীবনে।
কোথা, কত দূরে রহিয়াছ এস, চাহ
সস্নেহ সকরুণ নয়নে।
তব পথ তুমি দেখাও আমায়,
অবশ পতিতে তোল আরবার,
আঁধার এ রাতি আলোকিত করি,
অচপল স্থির কিরণে।
এস আরবার, দেখ শত পাকে
ঘিরিয়াছে মোরে মরণে।

শ্রীচারুহাসিনী দেবী।

মন্ত্রমুগ্ধ।

ওগো অন্তরযামী,
তোমার নামের পতাকা উড়ায়ে
সভয়ে দাঁড়াব আমি
তোমার বিচিত্র বিশ্বসভায়,

কতজন আসে, কত কি যে পায়,
তোমারি এ খেলা ওগো! লীলাময়!
রাজ অধিরাজ তুমি,
তোমার প্রেমের পুণ্য বাজারে
অন্ধ অভাগা আমি।
তুমি পুণ্য মধুর খনি
তোমার চরণে সঁপিবারে চাই
ব্যথিত হৃদয়খানি।
বিফল কর্ম্ম, ভক্তি, সাধনা
নীরব প্রাণের ভগ্ন এ বীণা
তোমার মোহন অঙ্গুলিপরশে
উঠিবে কি রণ রণি?
কে মোরে শুনাবে হে দয়াল পিতা!
তোমার অভয় বাণী?
ওগো স্নেহ-পারাবার!
স্মরণে তোমার পুলকে উচ্ছলে
ভকতি উৎসধার,
তাই আশা মনে শূন্য এ হৃদয়
ব্যাকুল পরাণে যাচিছে অভয়
তোমারি আলোকে ভরি দিবে তুমি
অন্ধ এ হৃদয়াগার।
বিপদে সম্পদে কোলে লবে টানি,
তুমি কল্যাণাধার।

শ্রীপ্রিয়বালা রায়।

"হারানিধি।"

(১)

একদিন বসন্তের সন্ধ্যার সময়
সুদূরে বহিতেছিল মধুর অনিল,
হেলিতে দুলিতেছিল লতিকানিচয়,
নিকুঞ্জে গাইতেছিল ভ্রমর, কোকিল।

(২)

রবি অস্তমিত হেরি নারী একজন
তুলিবারে বনফল বনের ভিতরে
প্রবেশিল, সঙ্গে তাঁর চারুদরশন
চলিল একটি বালা, সরল অন্তরে।

(৩)

উজলি সে বনভূমি, সহসা সেখানে
একটী হরিণশিশু বনগর্ভ হতে
আসিল বালার কাছে, সুকোমল প্রাণে
ছুটিল আনন্দ-উৎস, ক্ষুদ্র নেত্র-পথে।

(৪)

ছুটিল আনন্দস্রোত, ছুটিল বালিকা
ধরিতে সে মৃগশিশু, চলিল ছুটিয়া
চঞ্চল সে চারু মৃগ, শত আঁকা বাঁকা
কাননের গুপ্তপথ ঢাকা কাঁটা দিয়া।

(৫)

ছুটিছে মৃগের পিছে অবোধ বালিকা,
সহসা হারায়ে গেল চঞ্চল হরিণ।
আঁধার কাননভূমি, নানা বিভীষিকা,
ভাসিল নয়নাসারে নয়ননলিন।

(৬)

শিশুমতি বালিকার আতঙ্কে শরীর
উঠিল শিহরি, এস এস ঝি বলিয়া
প্রসারিল হাত, দাসী হইয়া অস্থির
পশ্চাতে ছুটিতেছিল নিশব্দে রহিয়া।



(৭)

এসেছি, এসগো বলি প্রসারিল হাত
ঝি তাহার, ভীতমতি শিশু সুচঞ্চলা
লুকাইল ঝির বক্ষে মুদি নেত্রপাত,
নীরবে কাঁদিল দাসী লুণ্ঠিত-অঞ্চলা।

(৮)

কেমনে লো বাহিরিব, মরি কি আপদ,
চৌদিকে কণ্টকগুল্ম শতপুর হয়ে
উৎপাদিছে মহাভীতি, রোধিয়াছে পথ,
অপমৃত্যু বিনে মুক্তি না পাই খুঁজিয়ে।

(৯)

সহসা কি ভীম নাদ বনগর্ভ ভেদি
পশিল শ্রবণে আসি, অত্যন্ত উথলা
হইল বালিকা, গণ্ড ভিজাইল কাঁদি,
"রক্ষা কর ভগবান্" উচ্চারিল বালা।

(১০)

উভয়ে চাহিল খুঁজি শব্দের কারণ
নীবিড় ঘাসের বনে, এ কি গো সম্মুখে
বাঘ! "রক্ষ ভগবান্" বলিয়া নয়ন
মুদিল বালিকা, দাসী জড়াইয়া বুকে

(১১)

ধরিল স্নেহের ধন। হঠাৎ হইল
বন্দুকের ঘোর রব, পড়িল লুটিয়া
বাঘের বিশাল দেহ, কে ওই আসিল
কাহারে গো ভগবান্ দিলে পাঠাইয়া

(১২)

রক্ষিতে ভকতে তব? বন্দুক ফেলিয়া
জনক লইল তুলি বক্ষের উপর
সন্তান, চলিল ঘরে আজ্ঞা প্রদানিয়া
নিজ অনুচরগণে নিতে নিজ ঘর

(১৩)

বাঘ আর সেবিকারে। মৃগয়া কারণ
এসেছিল এই বীর, হেরিল অদূরে
ছুটিতেছে ঘন বনে হৃদয়ের ধন,
ছুটিছে পশ্চাতে দাসী মলিন আনন।

(১৪)

ছুটেছিল বীর এই দোঁহার পশ্চাতে,
হেরিল বিশাল ব্যাঘ্র বিস্তারি ব্যাদন
হৃদয়ের ধনে তার এসেছে গিলিতে,
অমনি বন্দুক ছুড়ি করিল নিধন

(১৫)

হৃষ্টে, শিশুরে বক্ষে করি আনি তুলিয়া
জননীর বক্ষে দিল, প্রেমের জীবন
বহিল মাতার চক্ষে হৃদয় ফাটিয়া,
নাচিল ঈশ্বরে স্মরি দ্রবিভূত মন।

শ্রীমতী অম্বুজাসুন্দরী দাস গুপ্ত।

শোক-গাথা।

১

আজিলো এখনও কেন শয্যায় শয়ানা?
প্রভাত হইল তবু নিদ্রা ভাঙ্গিল না!
অসাড় নীরব দেহে,
প্রশ্বাস নাহি বহে,
নীরব নিস্পন্দ, তাহে চৈতন্য ছিল না!

২

উঠ উঠ বড় বৌমা উঠ একবার,
হাতে ধরি কথা রাখ মিনতি আমার।
তোমারে এমন হেরি,

প্রাণ যে কেমন করে,
হের, হের করিতেছে সবে হাহাকার ॥

৩

যে দিন হইতে ব্যাধি গ্রাসিল তোমারে।
সেই হতে আশাদীপ ডুবিল আঁধারে।
এই অষ্ট রাতি দিনে,
মোরা সবে প্রাণপণে,
যুঝিলাম কত করি রাখিতে তোমারে।

৪

কিন্তু হায়! কি দুর্ভাগা জানিনাত মোরা,
এ গেহের গৃহলক্ষ্মী হইলাম হারা,
তুমিত পাবার নয়,
তাই বুঝি মনে হয়,
সকলেরে দেখায়ে ফাঁকি চলে গেলে ত্বরা।

৫

কেনগো এমন ভাবে এই অসময়,
শুয়ে রলে, এ নিদ্রা কি ভাঙ্গিবার নয়?
আজি কি ফুরাল সব,
আমাদেরি পরাভব,
হে মরণ, তুমি কিহে করে নিলে জয়?
তোমারে বিদায় করে,
দিদি রবে শূন্য ঘরে,
এও কি সহিবে তাঁর কোমল অন্তরে?

৭

ভাবিলে তোমার কথা ফেটে যায় বুক।
আদরের বড়বৌমা স্নেহভরা মুখ।
আমাদের সবে হেন
ছেড়ে আত্মপরিজন,
কোথায় রহিলে তুমি ভুলি সব সুখ॥

৮

কি ভীষণ ব্যাধি তোমা গ্রাসিল অকালে?
নির্দ্দয় মরণ আজি কেন কেড়ে নিলে।
দুরন্ত বিষম জ্বর,
বেদনায় কলেবর,
জর্জ্জরিত হোল, আহা! কতই সহিলে!

৯

দুঃসহ যাতনা যবে করিল অস্থির,
কাতরে কহিলে মোরে "দাও গঙ্গানীর"।
মুখেতে কপোলে শিরে,
মাখাইয়া অতি ধীরে,
কহিলে "মা শান্তিময়ি করহ সুস্থির॥"

১০

কিন্তু কেন শান্তিময়ি! বিমুখ হইলে
দীনের প্রার্থনা তুমি কাণে না শুনিলে॥
তার পর দিন হায়,
শুখান ফুলের প্রায়,
ঝরে গেল, কি কহিব! বাক্য নাহি মিলে॥

১১

উঠ উঠ বড় বৌমা উঠ একবার।
নয়ন মেলিয়া তুমি তাকাও আবার॥
যেওনা যেওনা তুমি,
হৃদি করে মরুভূমি,
উঠিয়া সান্ত্বনা দাও প্রাণে সবাকার॥

১২

পেয়েছিলে শোক তাপ দাদার কারণে।
নাহি ছিল এক তিল সুখ শান্তি মনে।
তবু বড় মামী সনে,
দুই জনে এক প্রাণে,
সুখে দুখে এক সাথে ছিলে এত দিনে।

১৩

দাদাত গেছেন চলি চিরদিন তরে,
সে দুখ ছিলগো চাপা মরম ভিতরে॥

কিন্তু কি কহিব আর,
জ্বলিয়ে পরাণ তাঁর,
বাড়ায়ে দ্বিগুণ ব্যথা চলে গেলে দূরে॥

১৪

নিতান্ত যাইবে যদি যাও সেই স্থান।
সকলের তরে কি গো কাঁদে না পরাণ?
আসি দেববালাগণ,
করি তোমা আবাহন,
সাদরে লইবে তুলে বিভুসন্নিধান॥

১৫

কি মধুর সরলতা পবিত্র হৃদয়ে।
ছিলে গো মোদের তুমি লক্ষ্মীরূপা হয়ে।
যে তোমারে হেরিয়াছে,
শত মুখে প্রশংসিছে,
তোমারি পবিত্র নাম রহিল হেথায়॥

১৬

না হেরিব আর কিগো তব মুখখানি!
না শুনিব আর কি গো ওই কণ্ঠধ্বনি।
ওই যে মমতা স্ফূর্ত্তি,
ওই যে গো দেবীমূর্ত্তি,
ফুরাল কি জন্ম তরে কিছুই না জানি॥

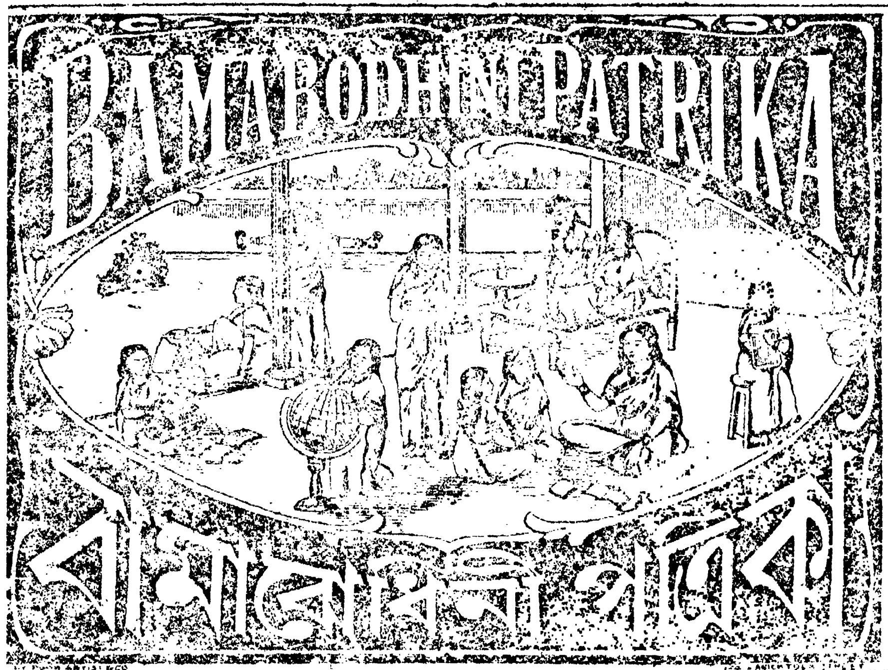
১৭

কেন তুমি চলে গেলে এত শীঘ্রগতি।
তব যোগ্য এই ধরা নয় কিগো সতি!
যাও তবে স্বর্গপুরে,
পবিত্র কুসুমঘরে,
মিলিও "দাদার" সাথে ওগো পুণ্যবতি!

কুমারী সুনীতি ভাদুড়ী,
কেশব-ধাম, বেনারস।

১৩।৪ মথুরায় লেন, ইণ্ডিয়ান্ প্রেসে শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত
ও
শ্রীসন্তোষ কুমার দত্ত কর্ত্তৃক ৩৯ নং আণ্টনিবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

No. 591. Registered No. C. 134. November, 1912.



স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫০ বর্ষ।	কার্ত্তিক, ১৩১৯। নবেম্বর ১৯১২।	১০ম কল্প।
৫৯১ সংখ্যা।		১ম ভাগ।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২।৵৹, অগ্রিম ষাণ্মাসিক ১।/০, পশ্চাদেয় বার্ষিক ৩৲ টাকা মাত্র।

সূচীপত্র।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 519. Oct. & Nov. 1912.

" কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"
কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।
স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি. এ. কর্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫০ বর্ষ। ৫৯১ সংখ্যা। | কার্ত্তিক, ১৩১৯। | ১০ম কল্প। ১ম ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

ঢাকায় মেডিকেল কলেজ—ঢাকায় একটী মেডিকেল কলেজ স্থাপন করিবার প্রস্তাব হইতেছে। শুনা যাইতেছে যে, ঐ কলেজের সঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন সম্বন্ধ থাকিবে না। ইহা অতি উৎকৃষ্ট প্রস্তাব।

কারাগারে বালকদিগের ধর্ম্ম-শিক্ষা—শুনা যাইতেছে, পঞ্জাবের ছোট লাট সার লুইডেন্ বাহাদুর আগামী শীত ঋতুতে লাহোরের সেণ্ট্রাল জেলের বালক অপরাধীদিগের ধর্ম্মশিক্ষার জন্য কতকগুলি শিক্ষিত ধার্ম্মিক লোক নিযুক্ত করিবেন, এইরূপ প্রকাশ করিয়াছেন।

উচ্চ শিক্ষার জন্য দান—অযোধ্যার অন্তর্গত ভিঙ্গার রাজ্যের নরপতি বারাণসীধামে একটী কলেজ প্রতিষ্ঠা করিয়া উহার উন্নতিকল্পে বার লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। কলেজটীর নাম "হিউয়েট ক্ষত্রীয় কলেজ" হইয়াছে। ক্ষত্রীয় ছাত্রগণ বিনা বেতনে এখানে বিদ্যালাভ করিতে পারিবে। দিন দিন সর্ব্বদেশে সর্ব্বজাতির মধ্যে বিদ্যার সমাদর বাড়িতেছে, ইহা অতি আনন্দের বিষয়।

প্রাচীন কীর্ত্তি সংরক্ষণ—বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশের ছোট লাট বাহাদুর নিম্নলিখিত প্রাচীন কীর্ত্তিগুলির রক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছেন। নন্দনগড়ের বৈদিকস্তূপ ও দুর্গের ভগ্নাবশেষ, রামপুরার অশোকস্তম্ভ, লাউখিয়ার অশোকস্তম্ভ ও জানকীগড়ের দুর্গের ভগ্নাবশেষ।

লর্ড কারমাইকেল মহোদয়ের দান—লর্ড কারমাইকেল যখন পাবনা উদ্যান সম্মিলনীতে যোগদান করিবার নিমিত্ত গমন করিতেছিলেন, তখন একটী পিতৃহীন অনাথ বালক তাঁহার নিকট একখানি দরখাস্ত লইয়া উপস্থিত হয়। সদাশয় লর্ড কারমাইকেল দরখাস্ত পাঠ করিয়া অনাথ বালকটীকে ৬০৲ টাকা দান করেন। তথাকার হাঁসপাতাল-পরিদর্শনকালে কুম্ভীর কর্ত্তৃক আক্রান্ত একটী লোকের শোচনীয় অবস্থা অবগত হইয়া তাহাকেও ২৫৲ টাকা প্রদান করেন। দরিদ্র ও নিরাশ্রয়ের দুঃখে যাঁহার হৃদয় ব্যথিত হয়, তিনিই প্রকৃত দাতা ও প্রজাপালক।

কৃত্রিম প্রাণ—ইউরোপের বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ অনেক দিন হইতে কৃত্রিম প্রাণ প্রস্তুত করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। সম্প্রতি প্রফেসার সেফার এ সম্বন্ধে এক বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, এতদিন চেতন ও অচেতনের মধ্যে যত অধিক প্রার্থক্য মনে হইত, গবেষণা দ্বারা জানা গিয়াছে তাহা তত অধিক নহে। সেইজন্য, কিছুদিন পরে যে বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ প্রাণ প্রস্তুত করিতে সক্ষম হইবেন, তিনি সে আশা করেন।

জাহাজের নূতন আইন—বিলাতের বোর্ড অব ট্রেড এই নূতন নিয়ম করিয়াছেন যে, প্রত্যেক আরোহীর জন্য "লাইফবোটের" ব্যবস্থা না করিয়া কোন জাহাজের কর্ত্তৃপক্ষই জাহাজ চালাইতে পারিবেন না।

দারজিলিঙ্গে গবর্ণমেণ্ট প্রাসাদ বৃদ্ধি—শুনা যাইতেছে, দারজিলিঙ্গে গবর্ণমেণ্ট প্রাসাদ বৃদ্ধি করিবার জন্য ৬॥০ সাড়ে ছয় লক্ষ টাকা ব্যয় করিবার প্রস্তাব হইতেছে।

শিশুজীবন ও কিণ্ডারগার্টেন।

মানসিক পুষ্টি সাধন।

জীবনের প্রথম এক বৎসর শরীর ও মন উভয়ই অন্যান্য কালের অপেক্ষা দ্রুত ও সুন্দররূপে পুষ্ট হয়, ইহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে। শিশু আত্মা প্রথম জগতে আসিয়া যে কত প্রকার নূতন দ্রব্য দেখে ও নূতন অভ্যাসে অভ্যস্ত হয়, নূতন শব্দ শ্রবণ করে ও নূতন স্পর্শ অনুভব করে, তাহা আমরা মনেও ধারণা করিতে পারি না। সেই কারণে, প্রকৃতি ঐ শিশুকালের শিক্ষার জন্য অনেক ব্যবস্থা ও উপায় করিয়াছে। শরীর ও মনের ক্ষমতা রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে ঐ প্রথম বৎসরে শরীরেরও তদনুরূপ বৃদ্ধি ও পুষ্টিসাধন হইয়া থাকে। ঐ অসামান্য

ব্যাপার যদি প্রতিদিন অনেক বার দেখিয়া আমরা উহাতে অভ্যস্ত না হইতাম, তাহা হইলে ঐ অসাধারণ ব্যাপার আমাদিগকে যে কত চমকিত করিত তাহা বলা যায় না।

তবে, স্বভাব যখন শিশুকে প্রকৃতরূপে শিক্ষা দিয়া মানুষের মত করিবার জন্য এত উপায় করিয়াছে, তখন যে মানুষের উপর সেই শিশু পালন করিবার সকল ভার অর্পিত হইয়াছে, তাহার কি ঐ স্বাভাবিক উপায়ে শিক্ষা দিবার পথ অধিক প্রশস্ত করা উচিত নয়? আমরা ইহা জানি যে, যদি শিশু নিতান্ত অসভ্যজাতি বা পশুর সঙ্গে বনের মধ্যে পালিত হয়, তাহা হইলে তাহাদের জীবনে মানবজাতিসুলভ জ্ঞান বুদ্ধির পুষ্টিসাধন হয় না। মানুষের সভ্য ও মার্জ্জিত হইবার ইচ্ছা কেবল তাহাদের চারিদিকস্থ লোকের উন্নত অবস্থা দেখিয়াই জন্মিয়া থাকে। আর ইহাও যদি সম্ভব বোধ হয় যে, শিশুর শরীর মানবের যত্ন ব্যতীতও বাড়িতে থাকিবে, তথাপি উহার মন অন্যান্য মানবমনের সংশ্রবে না আসিলে নিঃসন্দেহ যে পশুদিগের ন্যায় হইবে, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আমরা বাঘের দ্বারা পালিত দুই একটী মানবশিশুতে পাইয়াছি। সেই কারণে স্বাভাবিক নিয়ম এই যে, শিশুর পুষ্টিসাধন জন্য পূর্ণবয়স্ক ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ সাধ্যমত যত্ন ও উপায় করিবেন। কিন্তু কি প্রকারে ঐ নিয়ম অনুসারে চলিলে উহা স্বাভাবিক শিশুশিক্ষার প্রতিবন্ধক না হইয়া তাহার সহায় স্বরূপ হইতে পারে, এই সরল প্রশ্নের উত্তর কেবল শিক্ষা ও জ্ঞানচর্চ্চার যত প্রকার বিধান ও উপায় আছে, তাহার আলোচনা দ্বারা পাওয়া যায়।

শারীরিক শিক্ষা দ্বারা নৈতিক ও মানসিক পুষ্টি সাধনেরও সাহায্য হইতে পারে। সেইজন্য আমরা অনুনয় করি যে, তরুণ মাতৃগণ শিশুদিগকে শারীরিক সকল বিষয়ে সুনিয়মিত ও উত্তম অভ্যাসে অভ্যস্ত করিবেন। উহাতে মন ও আত্মার এককালে শিক্ষা হয়। কেবল অভ্যাসের দ্বারাই স্বভাব শিশুর উপর প্রভাব বিস্তার করে। প্রকৃতি চক্ষুকে আলো ও রংএ ও কর্ণকে শব্দে অভ্যস্ত করে। আর আর যত ইন্দ্রিয়, তদ্দ্বারা বাহ্য জগতের শোভাদি ও সর্ব্ববিধ জ্ঞান শিশুদের মনে প্রবেশ করে। সেই কারণে, আমরা যদি যত্নপূর্ব্বক ঐ শিশু আত্মাকে ভাল অভ্যাসের বাধ্য করিতে চেষ্টা করি, তাহা হইলে শিশুজীবনের স্বাভাবিক গতির বিঘ্নের পরিবর্ত্তে আমরা উহার সহায় স্বরূপ হইতে পারি।

এইরূপ করিতে হইলে, জীবনের প্রথম কয়েক বৎসর শিশুকে কিরূপে সদভ্যাসে রত রাখা উচিত? প্রথম, শিশুদিগকে ভাল বাসিতে শিখাও, তাহাদের উপর পিতা মাতার নিঃস্বার্থ প্রেম ঢালিয়া উহা শিখানই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। মাতার নিঃস্বার্থ স্নেহ ও যত্নের ন্যায় পিতার প্রেম ও আদর শিশুদিগকে যথেষ্ট ভাল শিক্ষা দেয়। বালক-




বালিকাদিগকে জগতের উপযোগী করিয়া লালন পালন করিতে এত বুদ্ধি, জ্ঞান ও যত্নের আবশ্যক যে, তাহাতে পিতা মাতা উভয়েরই ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার প্রয়োজন। তাহা না হইলে শিশুদিগকে প্রকৃত শিক্ষা দেওয়া অসম্ভব হইয়া পড়িবে। জীবনের প্রথম কয়েক বৎসর শিশুর স্বতন্ত্রতা কলি অবস্থায় থাকে। ঐ ক্ষুদ্র রত্নটিকে প্রেম ও আনন্দের বাতাসে বর্দ্ধিত হইতে দাও, আন্তরিক সকল শক্তির বিকাশের জন্য উপযুক্ত স্থান ও আহার দিয়া তাহাকে অবাধে খেলিতে দাও, তাহা হইলে উহা আপনা আপনিই পরিপুষ্ট হইবে। শ্রীকৃষ্ণভাবিনী দাস।

গিলিয়ান সিটনের উত্তরাধিকারিত

গিলিয়ানের এই কথায় যুবকের মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তিনি পকেটবই-খানির প্রতি একটি সকৌতুক কটাক্ষ-পাত করিয়া বলিলেন—"বলিতে কি, সত্য সত্যই এই পকেটবইখানির জন্য আমার পিতৃব্য অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়াছেন। এইমাত্র তিনি এই পকেটবইখানি হারাইবার সংবাদ পুলিসে দিবার জন্য গিয়াছেন, সেই জন্যই আপনার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ ঘটিল না। আমি নিশ্চয় জানি যে, আপনার এই অনুগ্রহের জন্য আপনার নিকট তিনি অত্যন্ত বাধিত হইবেন।" গিলিয়ান যুবকের কথার উত্তরে বলিল "আমি তাঁহার এই সামান্য উপকার করিতে পারিয়াছি, ইহাতে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি। এই কথা বলিয়া গিলিয়ান দ্বারের নিকট অগ্রসর হইল, এবং সেখানে কি যেন একটা অনিশ্চিত ভাবে প্রণোদিত হইয়া কিছুক্ষণ দণ্ডায়মান হইয়া রহিল। এই সময়ে সার আরবুথনটের ভ্রাতুষ্পুত্র অগ্র-সর হইয়া আসিয়া গিলিয়ানের বাহিরে যাইবার জন্য দ্বার উদ্ঘাটনপূর্ব্বক বলিলেন—"আপনি পকেটবইখানি আনয়ন করিয়া-ছেন, ইহাতে আপনার যথেষ্ট অনুগ্রহ প্রকাশ পাইতেছে। আমার পিতৃব্য এই পকেটবইখানি যে খুঁজিয়া আনিয়া দিবে, তাহাকে দশ পৌণ্ড পুরস্কার দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন।" এই কথা বলিয়া যুবক কিছুক্ষণ নীরবে অবস্থান করিলেন, পরে ঈষৎ সঙ্কোচভাবে পুনরায় বলিলেন "যদি আপনি ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে আমার পিতৃব্য ঐ দশ পৌণ্ড কোন দাতব্য ফণ্ডে আপনার নামে প্রেরণ করিতে পারেন, অথবা অন্য কোন সাধারণ দাতব্য কার্য্যে আপনার নামে উহা ব্যয় করিতে পারেন।"

যুবকের এই কথায় গিলিয়ান তাহার প্রতি সলজ্জ দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল—

"যদি আপনি কিম্বা সার আরবুথনট





কিছু মনে না করেন—তাহা হইলে আমি নিজে উহা প্রাপ্ত হইলে অত্যন্ত সুখী হইব।” গিলিয়ান আর বলিতে পারিল না। লজ্জা ও সঙ্কোচে তাহার বাক্য রুদ্ধ হইয়া আসিল। তাহার এইরূপ সলজ্জ ও সঙ্কোচভাবসূচক অর্দ্ধ-ব্যক্ত কথায় যুবকের মুখে করুণার ভাব ফুটিয়া উঠিল। তিনি গম্ভীর স্বরে বলিলেন—“আমি নিশ্চয় জানি যে, যদ্যপি আপনি অনুগ্রহ করিয়া এই দশ পৌণ্ড গ্রহণ করেন, তাহা হইলে সার আরবুথনট অত্যন্ত আনন্দিত হইবেন।”

এই কথা বলিয়া যুবক পকেট হইতে কয়েকখানি ব্যাঙ্ক নোট বাহির করিয়া গিলিয়ানের হস্তে অর্পণপূর্ব্বক পুনরায় বলিলেন—“আপনি অনুগ্রহ করিয়া আপনার বাটীর ঠিকানা প্রদান করুন। আমার পিতৃব্য আপনাকে কৃতজ্ঞতাসূচক পত্র লিখিবেন।”

গিলিয়ান অস্পষ্ট স্বরে বলিল—

“আমি আপনাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। কিন্তু—”

গিলিয়ান আর বলিতে পারিল না। সে দ্রুতবেগে সার আরবুথনটের বাটী পরিত্যাগ করিয়া একেবারে রাস্তায় আসিয়া পড়িল। মেরিয়ান তাহার জন্য রাস্তায় অপেক্ষা করিতেছিল। সে গিলিয়ানের উত্তেজিত ও সলজ্জ আনন দর্শনে অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া কৌতূহলপূর্ণ নয়নে তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল—

“এখন রাত্রি হইয়া আসিয়াছে। বাড়ী ফিরিয়া যাওয়া যাউক”। যখন তাহারা বাটীতে পৌঁছিল, তখন রাত্রি হইয়া আসিয়াছিল। গিলিয়ান টেবিলের উপর হইতে ডাকপিয়ন-পরিত্যক্ত কয়েকখানি পত্র হস্তে লইয়া বলিল—

“এই যে আমার নামে একখানা পত্র আসিয়াছে। বোধ হয় কোন ব্যক্তির শিক্ষয়িত্রীর আবশ্যক হইয়াছে, তাই তিনি এই পত্র লিখিয়া থাকিবেন।”

মেরিয়ান বলিল—

“পত্রখানি পাঠ কর, তাহা হইলে বুঝিতে পারিবে কে লিখিয়াছে”।

গিলিয়ান মেরিয়ানের হস্তে পত্রখানি দিয়া বলিল—“তুমিই পড়িয়া আমাকে শুনাও।”

মেরিয়ান পত্রখানি গিলিয়ানের নিকট পাঠ করিল। পত্রখানিতে এইরূপ লিখিত হইয়াছিল—

(পত্র)

“বাউয়ার ষ্ট্রীট, লিন্‌কন ইন্, ডব্লিউ, সি।

মহাশয়া,

আমরা আপনাকে এতদ্দ্বারা জানাইতেছি যে, আমাদের পরলোকগত মক্কেল, মিস্ গিলিয়ান ফ্রান্সিস লেথাম উইল দ্বারা আপনাকে সাসেক্স প্রদেশস্থিত তাঁহার ব্যান্সকম্ব নামক জমীদারীর একমাত্র উত্তরাধিকারিণী করিয়া গিয়াছেন। এতৎ সম্বন্ধে আর আর জ্ঞাতব্য বিষয় সকল যদি আপনি জানিবার ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে আমাদিগকে অনুগ্রহ করিয়া জানাইলে, সে সমস্ত আমরা





অবিলম্বে আপনাকে জানাইব। ব্যাসকম্ব প্রাসাদ ও জমীদারী সম্বন্ধে নূতন মালিকের আদেশের প্রতীক্ষায় রহিলাম।

আপনার একান্ত অনুগত ভৃত্য,

উইলসন ও চেকল্যাণ্ড, সলিসিটার।"

মেরিয়ান এই পত্র পাঠ করিলে গিলিয়ান রুদ্ধকণ্ঠে বলিল—

"ইহা কখন সত্য হইতে পারে না। ইহা সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা।"

মেরিয়ান বলিল—

"প্রিয় গিলিয়ান, ইহা নিশ্চয়ই সত্য। তোমার এই অভাবনীয় সৌভাগ্যোদয়ে আমি অত্যন্ত সুখী হইলাম। কিন্তু গিলিয়ান, গিলিয়ান, তুমি চলিয়া যাইলে আমি কি প্রকারে থাকিব?"

গিলিয়ান মেরিয়ানকে চুম্বন করিয়া বলিল—

"আমার সমস্ত সম্পত্তি তোমার। চিরজীবন আমরা উভয়ে একত্রে থাকিব।"

(ক্রমশঃ)

লজ্জাবতী বসু।

খুদী

(১)

ছেলেবেলায় মেয়ে পুরুষ সকলেই ক্ষুদ্র থাকে, একবারে কেহ বড় হয় না, কিন্তু আকারের সামঞ্জস্য রাখিবার জন্য যদি "ক্ষুদ্র" শব্দের অপভ্রংশে কাহাকেও "ক্ষুদে" বলিয়া ডাকা হয়, তাহা হইলে বড় হইলেও সে নাম পরিবর্ত্তন করা সহজ হয় না। সেই 'ক্ষুদে' নামই থাকিয়া যায়, ভাল নাম রাখিলেও লোকে তাহাকে 'ক্ষুদে' বলিতে ছাড়ে না। ক্ষুদে মেয়েকে 'খুদী' বলে। এক কৃষকের খুদী নামে একটী কন্যা ছিল। কৃষক জীবিত নাই, মারা গিয়াছে। খুদীর বয়স চারি বৎসর—একদিন সে তাহার মার সঙ্গে হাটে যাইবার জন্য জেদ ধরিল—কৃষকবনিতা কিছুতেই তাহাকে ভুলাইতে পারিল না। শেষে খুদী মাতার সঙ্গে হাটে চলিল। খুদীর ছোট ছোট পা দুটী মার পায়ের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারিল না—মধ্যে মধ্যে সে পিছাইয়া পড়িতে লাগিল। খুদীর মা দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিলে সে গিয়া তাহার নাগাল ধরে। এইরূপ করিয়া যাইতে যাইতে হাটের বেলা বহিয়া যায়, খুদীর মা কি করে, কন্যাকে ফেলিয়া যাইতে পারে না, ক্রমে হাট নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিয়াছে দেখিয়া খুদীর মা আর পূর্ব্বের ন্যায় ঘন ঘন ফিরিয়া কন্যাকে দেখিতে চেষ্টা করিল না। সেই সময় মহা ধুমধামে একটা বর যাইতেছিল, এবং ঢোল, শানাই, কাড়া, টিকারা, বাজিতেছিল। খুদী বর দেখিতে দেখিতে এত পিছাইয়া পড়িল যে, বর চলিয়া গেলে সে তাহার মাকে খুঁজিয়া পাইল না, পথে






বসিয়া কাঁদিতে লাগিল। হাটের পথ দিয়া অনেক লোক যায় আসে, খুদীকে কাঁদিতে দেখিয়া কেহ জিজ্ঞাসা করিল—

"কাঁদ্‌চিস কেন ?"

কেহ বলিল,—

"কার সঙ্গে এসেছিলি ?"

কেহ বা বলিল—

"যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল হয়েছে, এখন কাঁদলে চলবে কেন ?"

কেহ আশ্বাস দিল, কেহ ভয় দেখাইল, কেহ বা বিদ্রূপও করিতে ছাড়িল না। কিন্তু খুদীর বিপদ খণ্ডাইবার জন্য কেহ কিছু করিল না। সকলেই আপন আপন পথে চলিয়া গেল। ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া কেহ যে তাহাকে জিজ্ঞসা করিবে, তাহারও সুযোগ হইল না। ছোট মেয়ে খুদী পথে দাঁড়াইয়া কাঁদিতে লাগিল, তাহার দুঃখে কেহ মুখ তুলিয়া চাহিয়াও দেখিল না, ইহাতে খুদীর দুঃখ আরও বাড়িয়া উঠিল। খুদী নিরুপায় হইল, কি করিবে। অনেক প্রবীণ লোক পথ হারাইয়া ব্যাকুল হয়, খুদী ছোট মেয়ে, তাহারত কাতর হইবারই কথা।

(২)

এমন সময় একটী গোয়ালিনী হাটে দুধ, দই বেচিবার জন্য যাইতেছিল। সে তাহাকে দেখিয়া দাঁড়াইয়া, তাহার কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করিল। খুদী তাহার প্রশ্নে প্রাণ পাইয়া, আশ্বস্ত হইয়া, চক্ষু মুছিতে মুছিতে বলিল—"আমার মা কোথায় ?"

গোয়া। তুই কার সঙ্গে আশ্ছিলি ?

খুদী। মার সঙ্গে।

গোয়া। কোথা যাচ্ছিলি ?

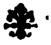
খুদী। হাটে।

গোয়া। আমার সঙ্গে আয়, হাটে তোর মার সঙ্গে দেখা হবে।

এই বলিয়া গোয়ালিনী ধীরে ধীরে খুদীকে সঙ্গে করিয়া লইয়া হাটে গেল। তাহার মাতাও কন্যাকে হারাইয়া পথের দিকে চাহিয়াছিল, খুদীও হাটের দিকে চক্ষু রাখিয়া গোয়ালিনীর সঙ্গে যাইতেছিল। দূর হইতে তাহার মার দিকে দৃষ্টি পড়িবা-মাত্র সে "ঐ আমার মা" বলিয়া ছুটিয়া গিয়া তাহার কাছে দাঁড়াইল। খুদীর মা তাহাকে কোলে লইয়া তাহার মুখ চুম্বন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কার সঙ্গে এলি মা— ?"

খুদী গোয়ালিনীকে দেখাইয়া দিল। খুদীর মা গোয়ালিনীকে কি বলিয়া কৃতজ্ঞতা জানাইবে, তাহার ভাষা পাইল না। সে হাটে একখানি কাপড় কিনিয়া গোয়ালিনীকে পরিতে দিল, আর হাটের ফেরত তাহাকে বাড়ীতে আনিয়া ফলমূল ও মিষ্টান্ন খাইতে দিল সেই দিন হইতে কৃষকবনিতা তাহাকে "ধর্ম্ম মা" বলিয়া সম্বোধন করিত। গোয়ালিনীও যখন দুধ, দই বিক্রয় করিতে বাহির হইত, তখন খুদীদের বাড়ীতে আসিয়া বসিত ও গল্প সল্প করিত। সেই অবধি তাহাদের উভয়ের মধ্যে বেশ আত্মীয়তা জন্মিল। যত দিন তাহারা বাঁচিয়াছিল, তত দিন তাহাদের সেই আত্মীয়তা বিচ্ছিন্ন হয় নাই।





এ সংসারে কথার লোক অনেক দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু কাজের লোক অতি অল্পই মিলে।

শ্রীঅম্বিকাচরণ গুপ্ত।

ভূত না মানুষ?

নবম পরিচ্ছেদ।

প্রতিধ্বনির নিদর্শন ও দেবদত্তের আত্মবিস্মৃতি।

এই ঘটনার পর নন্দক আপনার জননী ও ভগিনীকে আর অন্যত্র যাইতে দিলেন না। সুতরাং তাঁহারা নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও চণ্ডদেবের গৃহে বাস করিতে লাগিলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্যের বিষয় অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই তাঁহারা চণ্ডদেবের চরিত্রের ঘোর পরিবর্ত্তন দেখিতে পাইলেন। চণ্ডদেব এখন আর তাহাদের উপর অত্যাচার করিতে আসে না। সে মনের অসুখ বলিয়া এখন আর ঘন ঘন মফঃস্বলে যায় না, গেলেও যত দিনের জন্য যায়, ঠিক তত দিন পরেই ফিরিয়া আসে এবং মফঃস্বল যাওয়ায় ছলে বাহির হইয়া রজনীতে ফিরিয়া আসে না। এই ভাবে দিন কয়েক অতীত হইল, কিন্তু প্রতিধ্বনি ও ভাবময়ীর কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। এক দিবস নন্দকের মাতা নন্দককে ডাকিয়া কহিলেন—"নন্দক, তুমি চণ্ডদেবকে কি ভাব, আমাকে ভাঙ্গিয়া বল।"

নন্দক—আমি চণ্ডদেবকে নির্দ্দোষ বলিয়া মনে করি।

নন্দকের মাতা উচ্চ হাস্য করিয়া কহিলেন—"বিলক্ষণ নন্দক, তুমি এই দুই বালিকার উদ্ধারের আশা ত্যাগ কর।"

নন্দক অনেক ক্ষণ বসিয়া চিন্তা করিলেন, তৎপরে কহিলেন—"মা, আমি অদ্য রজনীতেই তাহাদের সন্ধানে বাহির হইব।"

মা—হাঁ বাহির হও। রজনীতে কেন? এখনই যাও। যতক্ষণ না উদ্ধার সাধন করিতে পারিবে, ততক্ষণ কাহারও প্রাণে শান্তি নাই।

নন্দক জননীর পদধূলি ও ভগিনীর নিকট বিদায় লইয়া চণ্ডদেবের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

চণ্ডদেব আপন কক্ষে বসিয়া জয়দেবের কবিতা পাঠ করিতেছিলেন। নন্দককে দেখিয়া কহিলেন—"নন্দক, তুমি আমার নিকটে আসিয়া বইস।"

নন্দক—আমি অনুসন্ধানে বাহির হইতে চাই।

চণ্ডদেব—কাহার অনুসন্ধানে? দেবদত্তের স্ত্রী ও ভাবময়ীর?

নন্দক—হাঁ।

চণ্ডদেব—এখনই যাও। ধন চাও লও, জন চাও লও। যে কোন সাহায্য আবশ্যক বোধ কর গ্রহণ কর। আমাকে যদি সঙ্গে যাইতে বল, তাহাতেও প্রস্তুত আছি।



নন্দক—আপনার অনুগ্রহে আমার কোন সামগ্রীরই অভাব নাই, কেবল পদ-ধূলির জন্য আসিয়াছি, তাহাই দান করিয়া বিদায় করুন।

চণ্ডদেব—অনুমতি দিলাম, পদধূলি লইয়া চলিয়া যাও। আশীর্ব্বাদ করি, তোমার মন শান্তিপূর্ণ হউক।

এই কথার পর নন্দক ভাবময়ীর পিতাকে সান্ত্বনা প্রদান করিয়া দেবদত্তকে সঙ্গে লইয়া চলিয়া গেলেন। তখন সন্ধ্যা-কাল, তথাপি তাঁহারা সেই ভূতের বনের দিকে যাইতে লাগিলেন। যাইতে যাইতে তাঁহাদের দু'জনের মধ্যে এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল। তৎকালে তাঁহারা মৃদু গতিতে চলিতেছিলেন।

দেবদত্ত বলিলেন—"নন্দক, চণ্ডদেবের গৃহে থাকিতে তোমার এখনও রুচি হয়?"

নন্দক—রুচি অরুচি কিছুই বুঝি না। যতদিন না প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইব, তত-দিন—তাঁহার কথায় বাধা দিয়া দেবদত্ত বলিলেন—"প্রত্যক্ষ প্রমাণ! প্রত্যক্ষ প্রমাণ আর কাহাকে বলে? চণ্ডদেবের চর আসিয়া প্রতিধ্বনিকে বলিয়া কহিয়া চলিয়া গেল। তোমার মা ও তুমি চণ্ড-দেবের লোকের মুখে চণ্ডদেবের নাম শুনিলে, ইহার চেয়েও প্রত্যক্ষ প্রমাণ আর কি চাও?"

নন্দক ধীর স্বরে কহিলেন "আরও কিছু হইলে ভাল হয়"।

দেবদত্ত—তবে কি তুমি চণ্ডদেবকে নিজহস্তে এই সব কাজ করিতে দেখিতে চাও? সে কি এই সকল কাজ নিজহস্তে করিবে? নিজের মান, সম্ভ্রম, যশঃ, সমস্তই ডুবাইবে? না, সে তাহা কখনও করিবে না। সে তোমার মত বোকা নয়।

নন্দক—সে কথা ঠিক, কিন্তু ইহাও চিন্তার বিষয় যে, যে চণ্ডদেব আপনার মান সম্ভ্রম বজায় রাখিতে সচেষ্ট, সেই চণ্ডদেব আপনার লোকজনকে নিজের নাম প্রকাশ করিতে অনুমতি দিবে কেন? প্রতিধ্বনিকে যাহারা লইতে আসিয়াছিল, তাহারা এক ডাকেই চণ্ড-দেবের নাম করিয়া ফেলিল। আমার সঙ্গে যাহাদের দেখা হইয়াছিল, তাহারা একবারেই চণ্ডদেবের নাম করিল, ইহাতে কি বুঝা যায়?

দেবদত্ত—কিছুই না। কেবল বাহাদুরী! তাহার নাম শুনিলে সকলেই ভীত হইবে, তাহার শরণাপন্ন হইবে, ইহাতে কি ইহাই বুঝা যায় না?

নন্দক—ইহাও কি হইতে পারে না যে, অন্য কেহ চণ্ডদেবের নামে কলঙ্ক ঘোষণা করিয়া স্বয়ং পাপ কর্ম্ম সাধন করিতেছে?

দেবদত্ত—রেখে দাও তোমার গোঁড়ামি। চন্দনী ও তোমার মাতা স্বচক্ষে চণ্ডদেবকে কুকার্য্য করিতে দেখিয়াছেন। ইহাও কি মিথ্যা?

নন্দক—চোখের ভুলও হইতে পারে। দেবদত্ত সক্রোধে বলিলেন, তুমি স্ত্রীলোক দুটীর উদ্ধারের আশা পরিত্যাগ কর। যে চোর তাহাদিগকে চুরি করিয়াছে, দেখিতেছি তুমি তাহারই ভক্ত শিষ্য।





নন্দক কথা কহিলেন না, চিন্তার উচ্ছ্বাসে কয়েক মুহূর্ত্ত নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন।

দেবদত্তও কিছুক্ষণ নীরব হইয়া রহিলেন, পরে কহিলেন—"এখন তুমি কোথায় চলিয়াছ ?"

নন্দক—সেই ভূতের বনে, যে বনের ভিতর আমার অগ্রজার জ্ঞানহীন দেহ প্রাপ্ত হইয়াছিলাম।

দেবদত্ত—তোমার কি বিশ্বাস, চণ্ডদেব তাহাদিগকে এই বনের ভিতর লুকাইয়া রাখিয়াছে ?

নন্দক—হইতেও পারে, দেখিতে ক্ষতি কি ?—তখন দুইজনে অশ্বারোহণে বনাভিমুখে দ্রুত অগ্রসর হইলেন। ক্রমশঃ তাঁহারা বনের নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলেন। দেবদত্ত ও নন্দক উভয়েই নির্ভীক, অসাধারণ সাহসী ছিলেন। ভয় কাহাকে বলে তাহা তাঁহারা জানিতেন না। সেই সন্ধ্যাকালেই তাঁহারা বনাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। ঐ বন এত গভীর ও বিস্তৃত ছিল যে, তাহার সীমা নির্দ্দেশ করা তাঁহাদের পক্ষে তৎকালে একরূপ অসম্ভব বোধ হইল। কিন্তু তাহাতে তাঁহারা ভীত বা বিচলিত না হইয়া অনবরত চলিতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহারা গভীর হইতে গভীরতর বনে প্রবেশ করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোথায়ও মনুষ্যের বাসের কোন চিহ্ন দেখিতে পাইলেন না।

প্রায় এক ক্রোশ পর্য্যন্ত ভূমি সমতল। কিন্তু চতুর্দ্দিকস্থ বৃক্ষ, তরুলতা, কণ্টকাদি অতিক্রম করে কাহার সাধ্য। তাঁহারা সেই স্থানে বিশ্রাম করিয়া যাহা করিতে হইবে স্থির করিলেন। তৎপরে তাঁহারা উঠিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। পদচারণ করিতে করিতে দেবদত্ত নন্দককে কহিলেন—"দেখ ভাই, বনটা কেমন প্রকাণ্ড !"

নন্দক—হাঁ, প্রকাণ্ড না হইলে কি এখানে এরূপ কাজ নির্ব্বাহ হইতে পারে ? সকলেই এটাকে ভূতের বন বলিয়া থাকে, মানুষের যে এ কীর্ত্তি, তাহা অনেকেই বিশ্বাস করিতে চায় না।

দেবদত্ত—চণ্ডদেব কি ইহার একজন নেতা নয় ? তোমার কি বিশ্বাস ?

নন্দক—আপনার স্ত্রী ও ভাবময়ীকে যে চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে, এ বনটী তাহারই কৃত ও তাহারই অধিকারভুক্ত।

দেবদত্ত—"আমি ত এ বনের সঙ্গে তাহাদের কোনও সম্পর্কের কারণ দেখি না।"

নন্দক—অপেক্ষা করুন, পরে দেখিতে পাইবেন। আমি নিজে সব দেখাইব। আপনি কি মনে করেন যে, যে ভাবময়ীকে চুরি করিয়াছে, সে অন্য কাহাকেও চুরি করে নাই অথবা অন্য কোন কুকর্ম্মে রত নহে ? অনেক প্রকার ভয়াবহ অপকর্ম্ম করিতে হইলে একটা নিভৃত স্থান চাই, তজ্জন্যই সে ব্যক্তি এই বনটি নির্ব্বাচন করিয়া ইহাকে ইচ্ছানুরূপ করিয়া প্রস্তুত করিয়া লইয়াছে, আমার এইরূপ বিশ্বাস।

দেবদত্ত—এখন ত ইহা নিস্তব্ধ,




আপাততঃ কাহারও কোন চিহ্নই দেখিতে পাইতেছি না।

নন্দক—হয়ত কোন কারণে তাহাদের কার্য্যস্থান পরিবর্ত্তন করিতে হইয়াছে। হয়ত তাহারা সময় সময় এখানে আসিয়া বাস করে। হয়ত কোন দুষ্কার্য্য সাধন করিবার সময় এখানে আসে, অন্য সময়ে আসে না।

এই বলিয়া নন্দক নিস্তব্ধ হইলেন। তাঁহার এই কথা শুনিবামাত্র দেবদত্ত কহিলেন—"হয়ত শিশুমতি কোমলপ্রাণা ভাবময়ীকে ও আমার প্রাণপ্রতিমা প্রতিধ্বনিকে লইয়া তাহারা এ স্থান পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্য স্থানে চলিয়া গিয়াছে।"

সহসা স্বীয়-মূর্ত্তি-অঙ্কিত ভূমি-পতিত একটী স্বর্ণপদক দেবদত্তের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। তিনি তৎক্ষণাৎ ভূমি হইতে পদকটি তুলিয়া লইলেন। "দেখি" বলিয়া নন্দক পদকটী মনোযোগের সহিত দেখিতে লাগিলেন। তিনি সবিস্ময়ে বলিলেন "একি! ইহাতে যে আপনারই প্রতিমূর্ত্তি দেখিতেছি!"

"হাঁ, আমারই প্রতিমূর্ত্তি বটে। আমার প্রাণপুতলি প্রতিধ্বনির গলায় ইহা রেসম-সূত্রে অল্প লম্বমান ছিল। হায়! সে বলিয়াছিল "আমি প্রাণ থাকিতে ইহা ত্যাগ করিব না।" নিশ্চয়ই তাহাকে হত্যা করিয়া কেহ ইহা উন্মোচন করিয়া ফেলিয়াছে, নতুবা ইহা কিরূপে এখানে আসিল? হায় হায় প্রতিধ্বনি! হায় প্রিয়তমে! এই দেখিবার জন্যই কি আমি এখানে আসিয়াছিলাম? এই কথা বলিতে বলিতে দেবদত্ত অজ্ঞান হইয়া ভূমিতলে নিপতিত হইলেন। নন্দক তাঁহাকে ধরিবার জন্য যাইতেছিলেন, সহসা ঊর্দ্ধ দিকে দৃষ্টি পড়াতে তিনি যাহা দেখিলেন, তাহাতে আর তাঁহার দেবদত্তকে ধরা হইল না। তিনি দেখিলেন, একজন ভীষণাকৃতি লোক গাছের উপর বসিয়া পাতার অন্তরালে আত্মগোপনের চেষ্টা করিতেছে।

নন্দক দেবদত্তকে তদবস্থায় রাখিয়া ঐ দুষ্ট লোকটার সন্ধানে বৃক্ষারোহণে তৎপর হইলেন। কিছুদূর অগ্রসর হইয়াই সেই ভীষণাকৃতি লোকটাকে লক্ষ্য করিয়া নিজ হস্তস্থিত তীক্ষ্ণ তীর ছুড়িলেন এবং অল্প ক্ষণের মধ্যেই পত্রমধ্যে লুক্কায়িত লোকটী নন্দকের তীরে আহত হইয়া সশব্দে ভূমিতলে নিপতিত হইল। যখন নন্দক সেই ভূতাকৃতি লোকটার দিকে ধাবিত হইতেছিলেন, তিনি বামপার্শ্বস্থিত একটী কূপের মধ্যে হঠাৎ একটী মানুষের মস্তক দেখিতে পাইলেন, এবং যতদূর সম্ভব দ্রুত-গতিতে সেই কূপের নিকট উপস্থিত হইলেন। কিন্তু সেখানে কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। কূপের জল সবেগে আন্দোলিত হইতেছিল, বুঝিলেন কোন ব্যক্তি এই মুহূর্ত্তে জলের নীচে প্রবেশ করিয়াছে।

তিনি দেবদত্তের দিকে একবার মাত্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কূপের মধ্যে নামিতে আরম্ভ করিলেন। অর্দ্ধপথ যাইতে না



যাইতে দেখিলেন এক ব্যক্তি জলের মধ্য হইতে মুখ বাহির করিয়া তাহার কার্য্য সকল দেখিতেছে। ভয়ানক ক্রোধে নন্দক দিগ্‌বিদিক্‌জ্ঞানশূন্য হইয়া উঠিলেন। তিনি চক্ষের পলকে কূপের মধ্যে ঝম্প দিয়া পড়িলেন। জলের ভিতর যে লোকটী ছিল, সে নন্দককে ধরিবার জন্য অগ্রসর হইল। নন্দকও তাহার দিকে অগ্রসর হইলেন। তখন দুই জনে মল্ল-যুদ্ধ আরম্ভ হইল। নন্দক দেখিলেন, সহসা প্রতিদ্বন্দ্বী তাঁহাকে ছাড়িয়া দিয়া তাঁহার পা ধরিয়া জলের নীচে টানিয়া লইয়া যাইতেছে। নন্দক বাধা দিতে যাইতেছিলেন, সহসা চন্দ্রালোক-বিধৌত গহন উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল! কি আশ্চর্য্য!! একি ভূতের খেলা, না মানুষের কীর্ত্তি!

নন্দক নিতান্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া জল হইতে তীরে উঠিলেন এবং নীরবে দণ্ডায়মান থাকিয়া চারি দিকে সীমাহীন বনরাজির অনন্ত অদ্ভুত শোভা দেখিতে লাগিলেন। তখন প্রকৃতি সন্ধ্যার সীমা অতিক্রমপূর্ব্বক রাত্রিতে পদার্পণ করিয়াছে ও জ্যোৎস্নালোকে বৃক্ষাবলি উজ্জ্বল দেখাইতেছে।

নন্দক বুঝিলেন, ভয়ানক বিপজ্জনক স্থানে আসিয়া তিনি উপস্থিত হইয়াছেন। কিন্তু তাহাতেও তিনি ভীত হইলেন না। আপনার তরবারির উপর নির্ভর করিয়া বহির্গমনের পথ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন।

এমন সময় কে কোথা হইতে বিকট স্বরে উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিল।

নন্দকের সে স্বর অপরিচিত ছিল না। ক্রোধে দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করিতে করিতে তিনি বলিলেন, নরাধম! সম্মুখে আসিয়া কথা বল্। (ক্রমশঃ)

শ্রীঅম্বুজাসুন্দরী দাস।

বঙ্গমহিলার ব্রতকথা

লোটন ষষ্ঠীপূজা বঙ্গদেশের একটি অভি-নব উৎসব! প্রত্যেক পল্লীর ঘরে ঘরে এই পূজার আয়োজন হইয়া থাকে। কি সধবা, কি বিধবা, কি পুত্রবতী, কি বন্ধ্যা, সকল স্ত্রীলোকেই সন্তানের কল্যাণার্থ (ইহ বা পরজন্মের নিমিত্ত) এই পূজা করিয়া থাকেন। এখনকার 'রাখী বন্ধনোৎসব' যেমন একটি প্রসিদ্ধ এবং আয়োজন-বাহুল্য প্রথা, উহা যেমন যুবকবৃন্দের মধ্যে একটি উৎসাহের উজ্জ্বল রশ্মি ছড়াইয়া দেয়, তেমনি লোটন ষষ্ঠীর পূজাও বঙ্গীয় রমণীদিগের একটী আনন্দদায়ক রীতি। রমণীগণ ষষ্ঠী-দেবীর আবাহন করিয়া ষোড়যোপচারে তাঁহার অর্চ্চনা করেন এবং অর্চ্চনান্তে লোটন ষষ্ঠীর কথা (উপাখ্যান) শুনিয়া শেষে চিড়ে, মুড়কি প্রভৃতির ফলাহার




করিয়া থাকেন। এই দিন বঙ্গরমণী অন্ন ভক্ষণ করেন না। সন্তানের কল্যাণার্থ তাঁহারা যে কিরূপ নিষ্ঠার সহিত দেবদেবীর অর্চ্চনা করেন, কিরূপ শারীরিক ক্লেশ স্বীকার করেন, ধর্ম্মপ্রাণা হিন্দু মহিলা ধর্ম্মের নিমিত্ত কত অধিক ক্লেশ অকাতরে সহ্য করিয়া কিরূপে ধর্ম্মের একাধিপত্য স্থাপন করেন, যিনি এ সকল বিষয়ের সংবদ রাখেন, তিনিই তাহা জানেন। বাঙ্গালী জাতি কি, বঙ্গরমণী কিরূপ, বর্ত্তমান উপাখ্যানটী তাহারই একটি প্রমাণ! পূজান্তে তাঁহারা যে উপাখ্যানটী একত্র হইয়া শ্রবণ করেন, তাহা এই ;—

কোন স্থানে এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। ব্রাহ্মণের সংসারে তাঁহার এক ভার্য্যা ব্যতীত অপর কেহ ছিল না। সুতরাং তাঁহাদের মধ্যে পবিত্র প্রণয় দৃঢ়ীভূত হইয়াছিল। ইহাঁদের এই ক্ষুদ্র পরিবার মধ্যে উভয়ের একমাত্র প্রার্থিত বস্তু—গৃহোজ্জ্বলকারী সন্তানগণও জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ একটীর জন্ম হইলে অপরটীর মৃত্যু ঘটিতে থাকাতে তাঁহারা দুর্ব্বিষহ অপত্যশোকানলে দগ্ধ হইয়া দিনাতিপাত করিতেছিলেন। ব্রাহ্মণ আপনাদের অপত্যশোকাতিশয্য দর্শন করিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়াছিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণী নিদারুণ অপত্যশোকে অভিভূত হইলেও তাঁহার বুদ্ধির কিছুমাত্র বিপর্য্যয় ঘটে নাই। তিনি তাঁহার জীবনা-নাভিনয়ক্ষেত্রে ঈদৃশ দৃশ্য দর্শন করিয়া সন্তানদাত্রী প্রবলপ্রতাপান্বিতা ষষ্ঠী দেবীর মনোহরমূর্ত্তি হৃদয়মধ্যে অঙ্কিত করিয়া তাঁহার ধ্যান করতঃ এই প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, এই বার তাঁহার পুত্র জন্ম গ্রহণ করিলে সুবর্ণময় লোটন (লোড়া) দ্বারা তাঁহার অর্চ্চনা করিবেন। ব্রাহ্মণ-পত্নীর ঈদৃশ ভক্তি ও শ্রদ্ধা দর্শনে ষষ্ঠীদেবী তাঁহার প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া আদেশ করিলেন, 'তুমি আমার (লোটন ষষ্ঠী) পূজার দিন যদি বিশেষ ভক্তি ও শ্রদ্ধা সহ-কারে আমার পূজা কর এবং পূজান্তে গোময়নির্ম্মিত ৬টী লোটন ভক্ষণ কর, তবে তোমার সন্তান হইয়া রক্ষা পাইবে'। ব্রাহ্মণীও অপত্যস্নেহ প্রযুক্ত তাহাতে স্বীকৃতা হইলেন। কিন্তু তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মা! আমি যেন পুত্রকামনায় এবম্বিধ কার্য্য করিব, কিন্তু সকলে'ত এই-রূপ করিতে সক্ষম হইবে না, তাহাদের উপায় কি হইবে?'

ষষ্ঠী দেবী উত্তর করিলেন, 'তাহারা আমার পূজার দিন, চিড়ে ও মুড়কিতে দুধ মাখিয়া সেই ফলাহারের ১২টী লোটন প্রস্তুত করিবে, তন্মধ্যে ৬টী আমার পূজার সময় আমাকে ভোগ দিবে এবং পূজা শেষ হইলে আমার এই কথা শ্রবণ করিয়া আমার প্রসাদি লোটন ৬টী আপনাদের ছেলেদের খাইতে দিবে এবং অস্পৃংসর্গীকৃত ৬টী লোটন জননীগণ ভক্ষণ করিবে।'

অতঃপর লোটন ষষ্ঠী পূজার দিন ব্রাহ্মণী সন্তানকামনায় ষষ্ঠী দেবীর ষোড়শোপচারে পূজা দিয়া পূতচিত্তে ও ভক্তি সহকারে পূর্ব্বোক্ত ৬টী গোময়নির্ম্মিত লোটন ভক্ষণ




করিলেন। যথাকালে ব্রাহ্মণী গর্ভবতী হইয়া, দশ মাস দশ দিনে দেবতুল্য একটি কুমার প্রসব করিলেন। পুত্রের মুখ নিরীক্ষণ করিয়া ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণপত্নীর আনন্দের সীমা রহিল না। পুনরায় লোটন ষষ্ঠীর আগমনে ব্রাহ্মণী আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইয়া ষষ্ঠীদেবীর অর্চ্চনার বাহুল্যে ব্যাপৃত হইলেন। আজ লোটন ষষ্ঠীর দিন, দেবীর মঞ্চে ৬টী সুবর্ণময় লোটন (ক্ষুদ্রাকার লোড়া) শোভা পাইতে লাগিল। তন্নিম্নস্থিত ঘটোপরি আম্রশাখা ও চতুষ্পার্শ্বে পুষ্প, ফল, মূল, নৈবেদ্যাদি থরে থরে সুসজ্জিত হইল, এবং ধূপ ধুনার গন্ধে চতুর্দ্দিক আমোদিত হইতে লাগিল। ব্রাহ্মণী ভক্তিগদ্‌গদ চিত্তে কুমার ক্রোড়ে ধারণ করতঃ পরম করুণাময়ী ষষ্ঠী দেবীর অর্চ্চনা করিলেন। পূজা শেষ হইলে তিনি সহাস্যবদনে ৬টী গোময়নির্ম্মিত লোটন ভক্ষণ করিলেন।

এইরূপে কিছুকাল অতিবাহিত হইল। ব্রাহ্মণী ক্রমে যৌবনাবস্থা অতিক্রম করিয়া প্রৌঢ়াবস্থায় উপস্থিত হইলেন। এখন তাঁহার সুখের সীমা নাই, দুই পুত্র ও এক কন্যা। তাহাদের সকলেরই বিবাহ হইয়াছে, তাঁহার দুঃখের ঘরে আজ সুখের অনন্ত রশ্মি বিরাজ করিতেছে। তাঁহার আর সে পূর্ব্বের অবস্থা নাই, এখন তিনি গৃহের কর্ত্রী হইয়াছেন, ব্রাহ্মণ কর্ত্তা। পুত্র, পুত্রবধূ, কন্যা ও তাহাদের সন্তানাদিতে আজ তাঁহার গৃহ উজ্জ্বল করিয়াছে। ব্রাহ্মণী এবম্বিধ সুখে কালাতিপাত করিলেও ষষ্ঠী দেবীর অনুগ্রহ কখনও বিস্মৃত হন নাই। মানুষ নিজের অবস্থা পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্ব বৃত্তান্ত প্রায় বিস্মৃত হয়, কিন্তু ব্রাহ্মণী সেরূপ প্রকৃতির রমণী ছিলেন না, তিনি এখনও ভক্তি সহকারে লোটন ষষ্ঠীর অর্চ্চনা করিয়া গোময় লোটন ভক্ষণ করেন এবং পুত্রবধূ ও কন্যাদিগকে চিপিটকাদি দ্বারা প্রস্তুত লোটন ভক্ষণের ব্যবস্থা দিয়াছেন।

এইরূপে কিছু কাল সুখ-সচ্ছন্দে অতিবাহিত হইবার পর ব্রাহ্মণী বার্দ্ধক্যদশায় উপনীতা হইলেন। তাঁহার কাল পূর্ণ হইল, তিনি সুবর্ণময় লোটন ৬টীর পরিবর্ত্তে তাঁহার পুত্রবধূদ্বয় ও কন্যাকে ষষ্ঠী দেবীর চরণে প্রণিপাতপূর্ব্বক অর্পণ করিলেন। নিয়তি শিরোভাগে আসিয়া দণ্ডায়মানা হইল। সতী ধীরে ধীরে স্বামীর পদধূলি শিরে গ্রহণ করিয়া, পরব্রহ্ম নাম স্মরণ করিতে করিতে স্বামীর ক্রোড়ে মস্তক স্থাপনপূর্ব্বক, পুত্রকন্যাদিগকে এ পৃথিবীতে রাখিয়া অমরধামে চলিয়া গেলেন। তিনি চলিয়া গেলেন, থাকিল তাঁহার প্রাণশূন্য দেহ!

দেশে তাঁহা কর্ত্তৃক লোটন ষষ্ঠী পূজার প্রচলন হইল। তাঁহার দুঃখের সংসারে সুখের আবির্ভাব দর্শনে সমস্ত বঙ্গরমণী, যে করুণাময়ী দেবীর কৃপায় ব্রাহ্মণীর এমন সুখসৌভাগ্য বিকশিত হইয়াছিল, সেই লোটন ষষ্ঠীর পূজা করিতে আরম্ভ করিল। সেই হইতে আজ পর্য্যন্ত বঙ্গের ঘরে ঘরে, বঙ্গরমণী সন্তানদিগের কল্যাণার্থ,

কি সধবা, কি বিধবা, সকলেই ভক্তি সহকারে লোটন ষষ্ঠীর পূজা করিয়া থাকেন ইহার নাম লোটন ষষ্ঠীর ব্রত।

শ্রীরজনীকান্ত বিদ্যাবিনোদ।

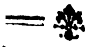
৺উমেশচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজে প্রদত্ত উপদেশ।

উপাস্যং পরমং ব্রহ্ম আত্মা যত্র প্রতিষ্ঠিতঃ।

ঈশ্বরোপাসনা মানব ভিন্ন আর কোনও জীবের মধ্যে দেখা যায় না। ধর্ম্ম বা ঈশ্বরোপাসনা মানুষের একটী বিশেষ লক্ষণ। প্রাচীন শাস্ত্রকারগণ এইজন্য বলিয়াছেন—"ধর্ম্মোহি তেষামধিকো বিশেষঃ ধর্ম্মেণ হীনা পশুভিঃ সমানাঃ।"

ধর্ম্মহীন মনুষ্য মনুষ্যই নয়, পশু শ্রেণীর মধ্যেই গণ্য।

মানুষের আত্মা আত্মজ্ঞান হইতে পরমাত্মার পরিচয় পাইয়াছে। বাইবেলগ্রন্থে আছে, ঈশ্বর মনুষ্যকে আত্মপ্রতিকৃতিতে গঠন করিয়াছেন। মানুষের বাহ্য আকৃতি ঈশ্বরের প্রতিকৃতি নয়, কারণ ঈশ্বর নিরাকার। মানুষের অন্তঃপ্রকৃতি—জ্ঞান, প্রেম ও শুদ্ধভাব—ঈশ্বরের সত্যং শিবং সুন্দরং রূপের অনুরূপ। পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি জীবগণের আত্মজ্ঞান নাই, তাহারা আপনারা আপনাদিগকে জানে না। মানুষেরই আত্মজ্ঞান আছে, তাহাতে সে আপনাকে আপনি জানিতে পারে এবং সেই জ্ঞানের পশ্চাতে যিনি অনন্ত জ্ঞানবান্ ও জ্ঞানদাতা হইয়া আছেন, মানুষ আত্মজ্ঞানে তাঁহাকেও দেখিতে পায়। এইরূপে মানুষ আপনার মধ্যে মঙ্গল ভাব দেখিতে পায় এবং তাহার পশ্চাতে পূর্ণ মঙ্গল প্রেমময় দেবতা মঙ্গলবিধাতারূপে বর্ত্তমান আছেন তাহা অনুভব করে। আবার মানব আপনার মধ্যেই পুণ্যকর্ম্মসাধনের স্বাধীন ইচ্ছা দেখিতে পায় এবং তাহার পশ্চাতে অনন্ত শক্তিসম্পন্ন শুদ্ধ-বুদ্ধ মুক্ত স্বরূপ পুণ্যময় দেবতার অধিষ্ঠান অনুভব করে। এইরূপ জ্ঞান, প্রেম, ও পুণ্যে আত্মা পরমাত্মার সমধর্ম্মী, পরমাত্মাতে পূর্ণ ও অসীম ভাবে যে গুণ সকল রহিয়াছে, আত্মাতে সূক্ষ্ম ও পরিমিত ভাবে তাহাই নিহিত। ইহারই বিকাশে মানব ক্রমে ঐশ্বরিকভাবাপন্ন হইয়া পূর্ণত্ব ও অনন্তত্বের দিকে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছে। এই যে জ্ঞান প্রেম-পুণ্য-স্ফুলিঙ্গস্বরূপ অনন্ত উন্নতিশীল আত্মা, তাহার আশ্রয় কে? আমরা সূক্ষ্ম জ্ঞানে মনে করি, আত্মা দেহে আছে. দেহ ইহার আশ্রয়, এবং যাহার সম্বন্ধে জড় জগতের সহিত ইহার সম্বন্ধ হইল

তাহকেই ইহার আশ্রয়স্থান মনে করি। কিন্তু দেহ ত ক্ষণস্থায়ী, মৃত্যুর স্পর্শে বিনষ্ট হইয়া যাইবে, আত্মা তাহাকে আশ্রয় করিয়া কিরূপে নির্ভয় ও নিরাপদ হইবে। দেহের মধ্যে যে জীবনী শক্তি বা প্রাণ আছে তাহাও ত মরণশীল, তাহাও আত্মার অবলম্বন হইতে পারে না। এই প্রাণ হইতে সূক্ষ্মতর যে মন তাহা সঙ্কল্প ও বিকল্পাত্মক, প্রবৃত্তির অধীন এবং সুখ দুঃখের স্রোতে ভাসমান, তাহাও আত্মার নিরাপদ সহায় হইতে পারে না। এই মন হইতেও শ্রেষ্ঠতর যে বিবেক বা ন্যায়বুদ্ধি তাহাও পরিমিত এবং চঞ্চল, কখনও আলোকিত কখন অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়, তাহাও আত্মার চির নির্ভরস্থল হইতে পারে না।

আত্মার সকল গুণের অন্তরালে যাঁহার অনন্ত গুণ, আত্মার ক্ষুদ্র সত্তার অন্তরালে যাঁহার অনন্ত সত্তা, সেই অজর, অমর, অভয়, অশোক, আনন্দপূর্ণ পুরুষ আত্মার আশ্রয়, নির্ভরস্থল ও প্রতিষ্ঠাভূমি। যখন আত্মা এই নিগূঢ় সত্য অনুভব করে, তখন সে স্বস্থান অর্থাৎ সুস্থির হইয়া বসিবার স্থান পায় ও তাহাকে উপাস্য দেবতা বলিয়া বরণ করে। পরমাত্মাকে প্রীতির সহিত উপাসনা করিতে হয়। ব্রহ্মসাধকেরা ইহা বুঝিয়া বলিয়াছিলেন, আত্মানমেব প্রিয়মুপাসীত। তদেতৎ প্রেয়ো পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়ো নান্যাৎ সর্ব্বস্মাৎ অন্তরতরং যদয়মাত্মা।

পরমাত্মা আত্মার সারের সার, ইনি চক্ষুর চক্ষু, শ্রোত্রের শ্রোত্র, মনের মন ও প্রাণের প্রাণ এবং আত্মার অন্তরাত্মা। ইহাঁর অপেক্ষা প্রিয়তর আর কে হইতে পারে? পরমাত্মার জ্ঞান হইতে তাঁহার সহিত বিশেষ পরিচয় হয়, পরিচয় হইতে তাঁহার সহিত সম্বন্ধ বন্ধন হয়। পিতা পুত্র, গুরু শিষ্য, প্রভু ভৃত্য, স্বামী স্ত্রী, এইরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ অনুভূত হয়। এই সম্বন্ধ অনুসারে আত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে যত গাঢ়তর যোগ হয়, ততই সেবানন্দ, জ্ঞানানন্দ, প্রেমানন্দ ও পুণ্যানন্দ সম্ভোগ হয়। এই যোগই উপাসনা এবং উপাসনা দ্বারা আত্মার সকল কামনা পূর্ণ হয় এবং উপাসক কৃতকৃতার্থ হয়।

প্রাচীন কালের ঋষিরা বলিয়াছেন, ব্রহ্মজিজ্ঞাসু হইতে হইলে শান্ত দান্ত তিতিক্ষু ও সমাহিত হইতে হয়। এইজন্য সংযম অভ্যাস চাই। বাক্যসংযম, ইন্দ্রিয়-সংযম ও মনঃসংযম, ধ্যান, ধারণা, সমাধি, সকলই ইহার উত্তরোত্তর পরিণাম। উপাসনার জন্য আবার ভক্তি চাই। বৈষ্ণবেরা ইহার তত্ত্ব বুঝিয়াছিলেন, তাই তাঁহারা নব ভক্তি লক্ষণ করিয়া বলিয়াছেন "শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণো" ইত্যাদি।

ঈশ্বরের নাম শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিতে করিতে নীরস কঠিন হৃদয়েও ভাবোদ্রেক হয়। তখন যত তাঁহার নাম স্মরণ ও তাঁহার প্রতি আনুগত্য ভাব হইবে, ততই তাঁহার অর্চ্চনা, বন্দনা করিতে, তাঁহার প্রতি সক্ষাৎ ভাব হইয়া মধুর প্রেমে হৃদয়



পূর্ণ হইবে। ভক্ত তখন তাঁহাতে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিয়া তাঁহাতেই ডুবিয়া যান, তাঁহার আর নিজের কিছুই থাকে না।

আমাদিগের ব্রাহ্মধর্ম্মমতে তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তস্য উপাসনমেব। যখন পরমাত্মাতে আত্ম-সমর্পণ হয়, তখন জীবনের সকল কার্য্যই ভগবৎপ্রেমের সহিত মিশ্রিত হইয়া তাঁহার উপাসনার আকার ধারণ করে। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন "যদ্দদাসি যদশ্নাসি" ইত্যাদি।

এইরূপ উপাসনাময় জীবনই ঈশ্বরের লীলাভূমি। ইহাই প্রকৃত ধর্ম্মজীবন ও ব্রাহ্মের আদর্শ জীবন।

চুট্‌কি গল্প।

বৈয়াকরণ সাহেব।

কোন একটি সাহেব বেশ বাঙ্গালা শিখিয়াছিলেন। বাঙ্গালা ব্যাকরণে তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি জন্মিয়াছিল বলিয়া তাঁহার মনে বিলক্ষণ অভিমানেরও উদয় হইয়াছিল। বাঙ্গালী দাসদাসী ও কর্ম্মচারিগণের সহিত তিনি প্রায়ই বাঙ্গালা ভাষায় কথোপকথন করিতেন।। কোন সময়ে তাঁহার একটি শিশু পুত্রের পীড়া হয়। শিশুর পীড়া হইলে চিকিৎসক তাহাকে মাতৃস্তন্যের পরিবর্ত্তে গাধার দুগ্ধ পান করিতে আদেশ করেন। সাহেব আপনার চাপরাসিকে ডাকিয়া বলিলেন,—

"দেখ! চাপরাসি, একটো গাধা লেয়াও।" চাপরাসি হিন্দুস্থানী, সুতরাং তাহার সহিত হিন্দীতে কথা কহিতে হইল। চাপরাসি সাহেবের আদেশ প্রাপ্তি-মাত্র গাধার অনুসন্ধানে বহির্গত হইল। ইতিমধ্যে সাহেব মনে করিলেন, চাপরাসিকে গাধা আনিতে বলা হইয়াছে, কিন্তু গাধার লিঙ্গ নির্দ্দেশ করা হয় নাই, যদি সে পুংগর্দ্দভ আনয়ন করে, তবে ত দুগ্ধ মিলিবে না। তিনি চাপরাসিকে পুনরায় ডাকিয়া কহিলেন, "দেখ চাপরাসি, হামারা মাফিক্ গাধা মৎ লে আও, মেম্ সাহেব্‌কা মাফিক একটা গাধা জলদি লে আও।" বৈয়াকরণ সাহেবের এইরূপ বিচিত্র লিঙ্গভেদের কথা শ্রবণ করিয়া চাপরাসি হাসিতে হাসিতে প্রস্থান করিল।

উদার সাহেব।

শুনা যায়, ইংরাজ রাজত্বের প্রথমাবস্থায় কোম্পানির আমলে যেমন বড় বড় সাহেব এদেশে আসিতেন, এখন সে শ্রেণীর সাহেব প্রায়ই আসেন না। তৎকালে কোন বড় সাহেবের আফিসে দুই চারিটি বাঙ্গালী শিক্ষানবিস ছিল। এখন শিক্ষানবিসগণ এপ্রেণ্টিস্ (Apprentice) শব্দে অভি-হিত হইয়া থাকে। শিক্ষানবিস্ দ্বিবিধ, বেতনভোগী ও অবৈতনিক। উপরোক্ত অফিসের শিক্ষানবিসগণ সকলেই অবৈতনিক



ছিল। তন্মধ্যে একজন স্বীয় উপরিস্থ কর্ম্মচারীর আদেশে একটি হিসাব প্রস্তুত করিয়াছিল। ঐ হিসাব সাহেবের সমীপে উপস্থিত হইলে, সাহেব তাহাতে একটি গুরুতর ভ্রম দেখিয়া সাতিশয় রুষ্ট হইলেন এবং ভুল হিসাব প্রস্তুত করিয়াছিল বলিয়া তাহার ৫৲ পাঁচ টাকা অর্থ দণ্ড করিবার আদেশ লিপিবদ্ধ করিলেন। সেই আদেশ দেখিয়া কোন কর্ম্মচারী সাহেবকে জানাইলেন যে, যে ব্যক্তি হিসাব প্রস্তুত করিয়াছে, সে এপ্রেণ্টিস্. কিছুই বেতন পায় না, তাহার নিকট হইতে জরিমানা আদায় হওয়া অসম্ভব। এই কথা শুনিয়া সাহেব বলিলেন, "ঐ ব্যক্তি কতদিন বিনা বেতনে আমার আফিসে কর্ম্ম করিতেছে?" কর্ম্মচারী বলিলেন, "তিন মাস কাল ঐ ব্যক্তি বিনা বেতনে এই আফিসে কার্য্য করিতেছে।" তখন সাহেব, ঐ শিক্ষানবিসের মাসিক ৩০৲ টাকা হিসাবে ৯০৲ টাকার বিল করিয়া তাহা হইতে ৫৲ পাঁচ টাকা জরিমানা আদায় করিবার আদেশ করিলেন। শিক্ষানবিস এককালে ৯০৲ টাকা পাইয়া তাহা হইতে পরমানন্দে ৫৲ পাঁচ টাকা অর্থদণ্ড প্রদানপূর্ব্বক সাহেবকে অনেক ধন্যবাদ দিল ও আশীর্ব্বাদ করিল। এইরূপ প্রকৃতির সাহেব এখন প্রায় দেখা যায় না?

ঠাণ্ডা কফ্।

কোন গোস্বামী প্রভু প্রবাসে শিষ্যালয়ে গমন করিতেছেন। একটি প্রকাণ্ড তলপী মস্তকে লইয়া ভৃত্য পশ্চাতে চলিয়াছে। গোস্বামী ও অধ্যাপক ভট্টাচার্য্য মহাশয়দিগের সংসারের সামগ্রীপূর্ণ প্রকাণ্ড তলপি-বাহক ভৃত্য দুষ্প্রাপ্য বলিয়া তাহারা যেমন আবদারে, তেমনি "বে-আদব"। গোস্বামী ও অধ্যাপকগণ প্রায়ই নিরীহ, সুতরাং ভৃত্যগণের প্রতি তাঁহাদিগের প্রভাব ও কর্তৃত্ব বড়ই অল্প। গোস্বামী প্রভু ভৃত্যসহ মধ্যাহ্নকালে কোন শিষ্যালয়ে উপস্থিত হইলেন। যথাকালে দরিদ্র শিষ্য সাধ্যানুরূপ মাধ্যাহ্নিক সেবা সম্পন্ন করিল। প্রভু ও ভৃত্যের শয়নশয্যা এক গৃহেই রচিত হইল। ভৃত্য নিদ্রাভিভূত হইয়াছে। প্রভু জাগিয়া আছেন। ভৃত্য ঘুমের ঘোরে কাশিতে কাশিতে প্রভুর শ্রী অঙ্গে নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিল। তজ্জন্য কিছু বলিয়া ভৃত্যের নিদ্রাভঙ্গ করিতে প্রভুর সাহস হইল না। অথচ শূদ্রজাতীয় চাকর তাঁহার গায়ে গয়ার নিক্ষেপ করিয়াছে, তাহাকে এ কথাটা একবার জানাইবার নিতান্তই ইচ্ছা হইল। ইতিমধ্যে ভৃত্যের নিদ্রাভঙ্গ হইল। ভৃত্যের নাম হরিদাস। প্রভু মিষ্ট ও মৃদু ভাষায় কহিলেন,—

"হরিদাস, তোমার কি জ্বর হইয়াছে।" ভৃত্য সক্রোধ কর্কশ স্বরে বলিল,—

"কেন? আমার জ্বর হবে কেন? যদি হয়েই থাকে, সে খবর তোমাকে কে দিল?" প্রভু আস্তে আস্তে বলিলেন,—

"তোমার কফ্‌টা আমার গায়ে লাগিয়াছে, তাহা বড়ই গরম বোধ হইল,





তজ্জন্য অনুমান করিতেছি যে, তোমার জ্বর হইয়াছে।”

ভৃত্য বলিল,—

“বটে! আমার কফ্ তোমার গরম বোধ হয়েছে! তবে ‘ঠাণ্ডা কফের’ চাকর খুঁজিয়া লইও। তোমার মোট ও গাঁটুরি থাকিল, আমি চলিলাম।” তখন প্রভু অনেক অনুনয় করিয়া ভৃত্যকে ক্ষান্ত করিলেন।

গ্রীস-কাহিনী

আণ্টিগনি।

গ্রীসের রাজপরিবারের মধ্যে থিব্‌সের ক্যাড্‌মাসের বংশ সমধিক প্রসিদ্ধ। ক্যাড্‌মাসের পৌত্র লাইয়াস্ যখন রাজ-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত, সেই সময় দৈববাণী হইয়াছিল—“তুমি আপন পুত্রের হস্তে প্রাণ হারাইবে।” পুত্র জন্মিবামাত্র রাজা নির্জ্জন পর্ব্বতগাত্রে ফেলিয়া আসিবার জন্য তাহাকে আপন পশুপালকের হস্তে সমর্পণ করিলেন। পরিত্যাগের পূর্ব্বে তিনি শিশুর জানুদেশ ভগ্ন করিয়া দিয়াছিলেন। মনে করিয়াছিলেন, তাহা হইলে কেহ দেখিতে পাইলেও এই বিকলাঙ্গ শিশুকে আপন সন্তানের ন্যায় পালন করিতে ইচ্ছা করিবে না। পিতৃ-ত্যক্ত শিশুকে লইয়া যাইবার পথে পশু-পালকের এক ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ হইল। সে কোরিন্থরাজের পশুপালক। কোরিন্থরাজ পলিবাস নিঃসন্তান ছিলেন। তাঁহার জন্য সে এই রাজ-শিশুকে চাহিয়া লইয়া গেল।

রাজরাণী এই শিশুকে আপন সন্তানের ন্যায় প্রতিপালন করিতে লাগিলেন এবং তাহার নাম ইডিপাস রাখিলেন। ইডিপাস বড় হইয়াও আপনার ইতিহাস কিছুই জানিল না। একদিন রাজরাণীর কোন অসতর্ক বাক্যে তাহার মনে সন্দেহ জন্মে। তাঁহাদের নিকট হইতে সদুত্তর না পাইয়া আপন জন্মরহস্য জানিবার জন্য তিনি ডেল্‌ফি নগরে যাত্রা করিলেন। সেখানেও কিন্তু কোন ফল হইল না। ডেল্‌ফির জাগ্রত দেবতা ইডিপাসের প্রশ্নের উত্তর দিলেন না, শুধু বলিলেন—“তুমি আপন পিতাকে হত্যা করিবে এবং তোমার সন্ততিগণের মস্তকে অভিশাপ পতিত হইবে।”

কোরিন্থরাজ পলিবাসকেই ইডিপাস আপন পিতা বলিয়া মনে করিতেছিলেন। দেবোক্ত পিতৃহত্যা হইতে আপনাকে রক্ষা করিবার জন্য তিনি আর, পিতার নিকটে মুখ দেখাইবেন না এবং কখনও কোরিন্থে পদার্পণ করিবেন না মনে করিলেন। অতঃপর নূতন স্থানে নূতন



আশ্রয় খুঁজিয়া লইবার জন্য এই নবীন যুবক ভিন্ন পথে যাত্রা করিলেন।

একটি সঙ্কীর্ণ পথ দিয়া যাইবার সময় এক-জন শকটারোহী বৃদ্ধের সহিত ইডিপাসের সাক্ষাৎ হইল। বৃদ্ধ পরুষকণ্ঠে তাঁহাকে পথ ছাড়িয়া দিতে বলিলেন। রূঢ়বাক্যে ইডিপাস ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন এবং ক্রমে উভয় পক্ষে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। অল্পক্ষণের মধ্যে অনুচরবর্গ সহ বৃদ্ধ যুবকহস্তে নিহত হইয়া ভূতলে শয়ন করিলেন। একটিমাত্র অনুচর জীবিত রহিল। এই বৃদ্ধ থিবস্-রাজ লাইয়াস্ ইডিপাসের জন্মদাতা পিতা।

কিছুই না জানিয়া ইডিপাস সচ্ছন্দ-চিত্তে থিব্স্ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। থিব্স নগরী তখন স্ফিঙ্কস্ নামক এক ভয়ঙ্কর রাক্ষসের উপদ্রবে বিপর্য্যস্ত হইতেছিল। এই রাক্ষসের নারীর ন্যায় মুখ, পক্ষীর ন্যায় পক্ষ এবং সিংহের ন্যায় শরীর। নগরের এক উচ্চ স্থানে বসিয়া প্রত্যেক আগন্তুককে সে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিত। উত্তরদানে অসমর্থ হইলেই রাক্ষস তাহাকে বধ করিত। ইডিপাসকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে তিনি তাহার মীমাংসা করিয়া দিলেন। পরা-জয়ের অপমানে স্ফিঙ্কস্ তখন পর্ব্বতের উপর হইতে পড়িয়া আত্মহত্যা করিল।

থিব্সবাসী কৃতজ্ঞহৃদয়ে ইডিপাসকে তাহাদের শূন্য রাজসিংহাসনে স্থাপন করিল। যথাসময়ে তিনি বিবাহ করিলেন এবং তাঁহার দুই পুত্র ও দুই কন্যা জন্ম-গ্রহণ করিল। ইডিপাসের অনেক দিন সুখসচ্ছন্দে কাটিয়া গেল। তাঁহার যশ দূর দূরান্তে বিস্তৃত হইল।

অবশেষে দীর্ঘকাল রাজত্বের পর তাঁহার রাজ্যে মহামারী দেখা দিল। কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া ইডিপাসের পরিচয় ও সকল সত্য প্রকাশ হইয়া পড়িল। আপন পরিচয় জানিয়া ইডিপাস ক্ষোভে ও লজ্জায় নিজের চক্ষুদ্বয় অন্ধ করিয়া ফেলিলেন। ইটিওক্লিস্ ও পলাইনিসাস্ নামক রাজপুত্রদ্বয় ক্রুদ্ধ হইয়া পিতাকে রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করিলেন। তখন ইডিপাস এথেন্স্ যাত্রা করিলেন। যাত্রাকালে পুত্রদ্বয়ের প্রতি এই অভিশাপ দিয়া গেলেন—"তোমাদের ভ্রাতৃবিরোধ হউক।"

অচিরে অভিশাপ পূর্ণ হইল। রাজপুত্র-দ্বয়ের মধ্যে পরস্পর বিবাদ আরম্ভ হইল। বিবাদের ফলে পলাইনিসাস্ রাজ্য হইতে বিতাড়িত হইলেন, ইটিওক্লিস্ থিবস্ নগরের সিংহাসনে পূর্ণ অধিকার বিস্তার করিয়া বসিলেন।

অপমানিত পলাইনিসাস্ আর্গস্ হইতে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া আনিয়া পিতৃনগরী থিব্স অবরোধ করিলেন। যুদ্ধে তাঁহার সৈন্যগণ পরাজিত হইয়া বিতাড়িত হইল এবং উভয় ভ্রাতা সম্মুখ-যুদ্ধে পরস্পরের হস্তে প্রাণ হারাইয়া ভূতলশায়ী হইলেন। পিতৃ-অভিশাপ পূর্ণ হইল এবং দেবতার বাক্য সফল হইল। থিব্সের রাজশূন্য সিংহাসন তখন ইটিওক্লিস ও

পলাইনিসাসের মাতুল ক্রেওন অধিকার করিয়া বসিলেন। এই স্থানে আমাদের গল্পের আরম্ভ।

দীর্ঘ অবরোধের পরে থিব্‌স্‌ নগরে শান্তির দিন আসিয়াছে। রাত্রিকালে শত্রুগণ নগর ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছে। সকল বিপদের অবসান হইয়াছে। সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে নগরের গৃহে গৃহে এই আনন্দের বাণী প্রচার হইয়া গেল। বালবৃদ্ধ সকলেই কৃতজ্ঞহৃদয়ে দেবতার মন্দিরের দিকে ছুটিল। রাজ্যময় পূজা, সঙ্গীত, নৃত্য ও আনন্দের উৎস উৎসারিত হইয়া উঠিল।

এই উৎসবময়ী নগরীর মধ্যে একখানি মুখ বিষাদে ম্লান। চারিদিকের আনন্দ উৎসবের সহিত তাহার কোন যোগ নাই। সকল উৎসব হইতে আপনাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া সে ব্যথিতহৃদয়ে এক পার্শ্বে সরিয়া দাঁড়াইয়াছে। এই শোকার্ত্তা রাজা ইডিপাসের কন্যা এবং ইটিওক্লিস্‌ ও পলাইনিসাসের ভগিনী আন্টিগনি।

রাজকুমারী আন্টিগনি আপন কনিষ্ঠা ভগিনী স্মিনির অপেক্ষায় রাজপ্রাসাদের এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছিলেন। দুঃখে এবং ক্রোধে তাঁহার অন্তর অভিভূত। পশ্চাতে লঘু পদক্ষেপের শব্দে ফিরিয়া তিনি ভগিনীকে দেখিতে পাইলেন। সস্নেহে তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া আবেগকম্পিত-কণ্ঠে কহিলেন—"আমাদের দুঃখের অবসান কবে যে হইবে, তাহা জানি না। কোন সংবাদ শুনিয়াছ কি?"

স্মিনি বলিলেন, "কি সংবাদ? আমাদের দুই ভ্রাতা পরস্পরের তরবারির আঘাতে ভূতলে শয়ন করিয়াছে এবং আর্গসবাসী অবরোধ ছাড়িয়া পলায়ন করিয়াছে, ইহা ব্যতীত আর কিছুই তো শুনি নাই!"

আন্টিগনি বলিলেন,—"তবে ক্রেওনের আজ্ঞা শুন নাই? তিনি আদেশ প্রচার করিয়াছেন যে, পলাইনিসাসের মৃতদেহের সংকার হইবে না। ইটিওক্লিসের দেহ তাহার পিতৃপিতামহের সমাধিস্থানে সসম্মানে সমাধিস্থ হইয়াছে, আর পলাই-নিসাসের দেহ শৃগাল কুক্কুরের আহারের জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে পড়িয়া আছে। কেহ তাহার প্রতি শেষ সম্মান প্রদর্শন করিবে না, একবিন্দু অশ্রু তাহার যুদ্ধের ক্ষত ধৌত করিয়া দিবে না, ইহাই রাজার আদেশ। এ আদেশ অগ্রাহ্য করিতে যে সাহস করিবে, তাহাকে প্রকাশ্যে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা হইবে। স্মিনি! তুমি প্রকৃত রাজনন্দিনী কিনা তাহা দেখাইবার সময় আসিয়াছে।"

বিস্মিতা স্মিনি বলিল—"কিন্তু আমি কি করিতে পারি? আমার কি শক্তি আছে?"

"আমার কাজে তুমি সাহায্য করিতে পার।"

"কোন্ কাজে?"

"ভ্রাতার দেহের সংকার করিতে।"

"তাহার সংকার করিতে!—ক্রেওনের নিষেধ সত্ত্বেও?"

"হাঁ, তাহার সংকার করিতে—আমার




ভ্রাতা—তোমার ভ্রাতা—তাহারই দেহের সংকার করিতে! তুমি সাহায্য না কর, আমি একাই এ কাণ্ড করিব।”

ভীতিবিহ্বল স্মিনি বিস্ময়বিবর্ণ মুখে ভগিনীকে এই বিষম কার্য্য হইতে বিরত হইতে অনুরোধ করিতে লাগিল। পিতার অন্তিমকালের কথা মনে করিয়া দেখ, মাতার কথা মনে কর, দুঃখে লজ্জায় আপন হস্তে তিনি প্রাণ বিনাশ করিয়াছেন। তাহার পর গত কল্য আমাদের ভ্রাতারা আত্মহত্যা ও ভ্রাতৃহত্যার পাপে কলঙ্কিত হইয়া চিরনিদ্রায় শয়ন করিয়াছে। আমরা দুই ভগিনী—এখন আমরাও কি আত্মহত্যা করিয়া কুলের কলঙ্ককালিমা গাঢ়তর করিব? রাজশক্তির বিরুদ্ধে দুইটী দুর্ব্বল নারী কি করিতে পারে? পরলোক হইতে তাঁহারা আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন, কারণ তাঁহারা দেখিতেছেন, আমরা নিরুপায়।

কঠোরকণ্ঠে আন্টিগনি বলিলেন, “আর তোমাকে অনুরোধ করিব না। অনিচ্ছাকৃত সাহায্য আমি চাই না। মনুষ্যকৃত নিয়মকে ভগবানের চিরন্তন নিয়মের উপরে আসন দিতে চাও তো দাও—আমি পলাইনিসাসের সংকার করিবই করিব। সম্মানের সহিত আমি মৃত্যুকে অভ্যর্থনা করিয়া লইব। ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ এই জীবনের অবসানে আমি আমার প্রিয়জনের নিকটে চিরবিশ্রাম প্রাপ্ত হইব, আর আমার অপরাধ যাহা তাহা দেবতা ধৌত করিয়া দিবেন।”

ক্ষুদ্র দুর্ব্বল স্মিনির নিরীহ প্রকৃতি স্নেহপ্রবণ হইলেও ভগিনীর উচ্চ চিন্তার সঙ্গিনী হইতে সে অক্ষম, তাঁহার মহৎ কঠোর আদর্শ সে বুঝিতেই পারিল না। সে বলিল—“গুরুজনের আদেশ তুচ্ছ করিতে আমি পারি না।”

আন্টিগনি বলিলেন—“তবে যাও, যে উপায়ে আপন বিবেকের সহিত সন্ধি স্থাপন করিতে পার, কর। আমি আমার মৃত ভ্রাতার সংকার করিতে চলিলাম।”

কাতরভাবে স্মিনি বলিল,—“অন্ততঃ এ কাজ গুপ্তভাবে করিও—এ কাজ গোপন রাখিতে আমি সাহায্য করিব।” আন্টিগনি বলিলেন,—“না, তুমি গিয়া এ কথা প্রচার করিয়া দাও। তোমার নীরব থাকায় শুধু তোমার প্রতি আমার ঘৃণা বাড়িয়া যাইবে!”

দুই ভগিনী পরস্পরের নিকট বিদায় লইল—একজন কর্ত্তব্যের কঠিন পথে চলিতে, আর একজন চকিতচিত্তে অপেক্ষা করিতে, ও অসহায় হইয়া অশ্রুপাত করিতে।

নূতন রাজা ক্রেওনের আহ্বানে সভাগৃহে পাত্রমিত্রগণ সমবেত হইয়া রাজার প্রতীক্ষায় দণ্ডায়মান রহিলেন। অবশেষে রাজা সভাগৃহে প্রবেশ করিলেন। তিনি কর্ত্তব্যপালন সম্বন্ধে বক্তৃতা আরম্ভ করিয়া কহিলেন—“ইটিওক্লিস্ দেশের কল্যাণসাধনার্থ যুদ্ধ করিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহার মৃতদেহের যোগ্য সংকার আমি করিয়াছি, কিন্তু পলাইনিসাস্ আপন দেশের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়া-






ছিল, অতএব তাহার দেহ শৃগাল কুকুরে ভক্ষণ করিবে। এই বিশ্বাসহন্তার জন্য এক বিন্দু অশ্রুজলও কোথাও যেন বর্ষিত না হয়, তাহার উদ্দেশে শোকবাক্যও যেন উচ্চারিত না হয়। আমার এই আদেশ যে অগ্রাহ্য করিবে, তাহার মৃত্যুদণ্ড হইবে।"

বৃদ্ধ সভাসদ্গণের মধ্যে একটা ঘোর অসন্তোষের চাপল্য দেখা গেল। অন্তরে অন্তরে তাঁহাদের হৃদয় রাজার এই বর্ব্বর আদেশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া উঠিল, কিন্তু মুখে কেহই কিছু বলিলেন না।

এই সময়ে ত্রস্তভাবে এক প্রহরী আসিয়া উত্তেজিতকণ্ঠে সংবাদ দিল যে, পলাইনিসাসের মৃতদেহের উপরে কে ধূলিমুষ্টি বর্ষণ করিয়া গিয়াছে এবং সংকারের অন্যান্য সমস্ত অনুষ্ঠানও সযত্নে পালিত হইয়াছে। (প্রয়োজনের সময় মৃতদেহের উপরে একমুষ্টি ধূলিনিক্ষেপ করিলে সৎকারের ফল হয় বলিয়া তৎকালে মনে করা হইত।)

এই সংবাদশ্রবণে রাজা সৎকার-কারীকে খুঁজিয়া বাহির করিবার নিমিত্ত আদেশ প্রদান করিলেন। এক বৃদ্ধ সভাসদ্ বলিয়া উঠিলেন—"মহারাজ, ইহাতে দেবতার হস্ত দেখা যাইতেছে না কি?" ক্রুদ্ধ ক্রেওন বলিলেন—"চুপ্ করুন! আপনারা কি বলিতে চাহেন যে, এরূপ হতভাগ্যের উপরে দেবাশীর্ব্বাদ বর্ষিত হয়? এ কোন গুপ্ত ষড়যন্ত্রের ফল। এই প্রহরীরা উৎকোচের বশীভূত হইয়া এরূপ কার্য্য সম্পন্ন হইতে দিয়াছে।"

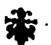
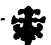
দ্বিতীয় বার আণ্টিগনি ভ্রাতার মৃতদেহের পার্শ্বে উপনীত হইয়া প্রহরীর হাতে ধরা পড়িলেন। অবিলম্বে প্রহরিবেষ্টিতা রাজকুমারী সভাগৃহে নীত হইলেন। সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া রাজা কোপকটাক্ষে আণ্টিগনির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া তাহার অপরাধ সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রশান্তভাবে আণ্টিগনি বলিলেন—"আমিই এ কাজ করিয়াছি।"

রাজা—তুমি কি আমার নিষেধাজ্ঞা জানিতে?

"জানিতাম।"

"তথাপি আদেশ অমান্য করিতে সাহস করিয়াছ?"

গ্রীকজাতিসুলভ গর্ব্ব কুমারীর হৃদয়ে গর্জ্জিয়া উঠিল। স্পষ্টস্বরে উচ্চ কণ্ঠে তিনি কহিলেন—"এ আদেশ দেবতার নিকট হইতে আসে নাই! যে নিয়ম অভ্রান্ত, যাহা কোন মানুষের রচনা নহে, সেই সনাতন নিয়ম অনুসরণ করিয়া আমি কার্য্য করিয়াছি। সে আইন এক দিনের নহে, দুই দিনের নহে—তাহা চিরন্তন। আমার জীবন লইতে ইচ্ছা করেন, গ্রহণ করুন। এ জীবন আমার নিকটে ভারস্বরূপ হইয়াছে, আনন্দে আমি ইহা দান করিব। পবিত্র কর্ত্তব্য অসম্পন্ন রাখাই আমি ভয় ও ঘৃণা করি। আমাকে যদি আপনি নির্ব্বোধ মনে করেন, তাহা হইলে বলিতেছি, আপনার এইরূপ বিজ্ঞতা



অপেক্ষা আমার নির্বুদ্ধিতাই আমার অধিকতর বাঞ্ছনীয়।"

সভাগৃহে মৃদু গুঞ্জনধ্বনি উঠিল—"পিতার যোগ্য সন্তান।" কেহ কহিল—"ইডিপাসের প্রতিমূর্ত্তি! সেই কণ্ঠস্বর—সেই আকৃতি!" ক্রোধোন্মত্ত ক্রেওন কনিষ্ঠা রাজকুমারী স্মিনিকেও সেই স্থানে উপস্থিত করিতে আদেশ করিলেন।

আন্টিগনি বলিলেন—"হত্যার চেয়ে বেশী আর কি আপনি করিতে পারেন?"

রাজা—"আর কিছুই না। আমি কেবল তোমার জীবনই চাহি।

আ—তবে তাহা শীঘ্রই শেষ করিয়া ফেলুন। বৃথা বিলম্ব কেন? আপনার এবং আমার পথ বিভিন্ন দিকে। আর আমি জানি মহত্তর পথটি আমি বাছিয়া লইয়াছি।

"বিশ্বাসহন্তাকে স্বদেশহিতৈষীর সমান করা কি মহৎ কার্য্য?"

"মৃত্যু সকল দোষ, সকল ঋণ মুক্ত করিয়া দিয়া যায়।" "মহৎ-হৃদয় মৃতের সহিত বিরোধ করে না।"

"শত্রু চিরদিনই শত্রু—মৃতই হউক বা জীবিতই থাকুক।"

আন্টিগনি বলিলেন—"আমার হৃদয় প্রেম-পূর্ণ। সেখানে ঘৃণার স্থান নাই।"

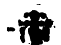
রাজা—তবে তোমার প্রেম লইয়া সমাধিগর্ভে গমন কর এবং মৃত ব্যক্তিদিগের উপর এই প্রেম ঢালিয়া দাও।

মৃদু ক্রন্দনধ্বনি সভাস্থলে শ্রুত হইতে লাগিল। ক্রন্দনরতা প্রহরিপরিবেষ্টিত স্মিনিকে আসিতে দেখিয়া ক্রেওন বলিয়া উঠিলেন—"এই যে আর একটি কালসর্প গোপনে আমার জীবনশোণিত শোষণ করিতেছে! এখন বল দেখি, এই ষড়যন্ত্রের মধ্যে তুমিও ছিলে কি না?"

মৃদুস্বরে স্মিনি বলিলেন—"অর্দ্ধেক দোষ আমার—যদি—," তাহার পর একবার আন্টিগনির মুখের দিকে তাকাইয়া বলিলেন—"যদি আন্টিগনি আমাকে অংশগ্রহণ করিতে দেন!"

আন্টিগনি কঠোরকণ্ঠে বলিলেন—"তোমার এ দাবী মিথ্যা। তোমার অংশ এ বিষয়ে কিছুই নাই।"

নিরীহ স্মিনি আহত প্রেমের দুর্জ্জয় শক্তিতে এখন নির্ভয় হইয়া উঠিয়াছিলেন। কাতর স্বরে তিনি বলিলেন, "তোমার দুঃখের অংশ হইতে আমাকে বঞ্চিত করিও না। আমাকে তোমার সহিত মরিতে দাও।" আন্টিগনি বলিলেন, "তোমার পথ তুমি নিজে বাছিয়া লইয়াছ—ঐ তোমার বন্ধু দাঁড়াইয়া আছেন (সিংহাসনের দিকে দেখাইয়া)—যাও, তাঁহার সহিত জীবন উপভোগ কর।" অশ্রুজলে প্লাবিত হইয়া স্মিনি ভগিনীর চরণতলে পড়িয়া অনুনয় করিতে লাগিলেন। আন্টিগনি তাহার হস্ত হইতে আপনার চরণ মুক্ত করিয়া লইলেন। ক্রেওন নীরবে দাঁড়াইয়া এই দৃশ্য দেখিতেছিলেন। অবশেষে তাঁহার আদেশে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত দুই ভগিনী কারাবন্দিনী হইলেন।

রাজকুমারীরা কারারুদ্ধ হইবার অল্পক্ষণ পরেই রাজোচিতপরিচ্ছদধারী একটি যুবাপুরুষ ত্রস্তপদে রাজসভায় প্রবেশ করিলেন। ইনি ক্রেওনের পুত্র হীমন। ক্রেয়নের সন্তানদের মধ্যে এখন এই একমাত্র পুত্র জীবিত। আন্টিগনি যুবরাজ হীমনের বাগ্দত্তা পত্নী।

পুত্রকে অভ্যর্থনা করিয়া ক্রেওন বলিলেন, "বৎস, আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিবার জন্য কি তুমি এখানে আগমন করিয়াছ? না, কর্ত্তব্যপরায়ণ পুত্রের ন্যায় পিতার ইচ্ছাই তুমি শিরোধার্য্য করিয়া লইবে?"

হীমন স্বেচ্ছাচারী পিতার স্বভাব ভাল করিয়া জানিতেন। তিনি নম্র স্বরে বলিলেন "পিতঃ, সর্ব্ব বিষয়ে আমি গুরুজনের বাক্য মানিয়া চলিব—লঙ্ঘন করিব না।"

পুত্রের বাক্যশ্রবণে ঈষৎ হাস্য করিয়া ক্রেওন বাধ্যতা সম্বন্ধে সুদীর্ঘ উপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন। অবশেষে বলিলেন, একজন রমণী আমার অবমাননা করিবে! আমি কখনই তাহা সহ্য করিব না।

(ক্রমশঃ)

শিশুগণের অকাল মৃত্যু ও জননীর কর্ত্তব্য

(১৯১০ সালের 'ব্রজমোহন দত্ত' পুরস্কার-প্রাপ্ত রচনা)।

আজকাল আমাদের দেশে শিশুর অকাল মৃত্যু দিন দিন বড়ই বৃদ্ধি পাইতেছে। বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপে শিশুর মৃত্যুসংখ্যা কমিয়াছে, কিন্তু হতভাগ্য ভারতবর্ষে এখনও পূর্ব্ববৎ রহিয়া গেল।

কাগজে দেখিয়াছি, লাহোরে ১৯১০ সালে হাজার করা ২১৯ জন শিশু মারা গিয়াছে। সমস্ত পঞ্জাবে ১৯০৮ সালে হাজার করা ৩৩৫ জন শিশুর মৃত্যু হইয়াছে। সমগ্র ভারতে শিশুর মৃত্যুসংখ্যা হাজারে ৪৪৫। ইংলণ্ডে ও ওয়েল্‌সে শিশুর মৃত্যুসংখ্যা হাজারে ১১৭ মাত্র। কলিকাতায় শিশুর মৃত্যুসংখ্যা ১৯০৯ সালে হাজারে ৩৬৮ জন এবং বোম্বাইতে শিশুর মৃত্যুসংখ্যা হাজার করা ৩০০, কিন্তু লণ্ডনে শিশুর মৃত্যুসংখ্যা ১৪০। রুষিয়ায় গত বৎসর গড়ে হাজার করা ২২৩ জন শিশু মারা গিয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, ভারতবর্ষে শিশুর মৃত্যুসংখ্যা ইংলণ্ডের প্রায় দ্বিগুণ। এই মৃত্যুসংখ্যার হ্রাস করিবার জন্য স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই স্বাস্থ্যের নিয়ম সকল পালন করা উচিত। লাহোর মিউনিসিপালিটি এ বিষয়ে একটি অনুসন্ধান কমিটি গঠন করিয়াছিলেন। সেই কমিটি কতকগুলি উপায়

অবলম্বনের পরামর্শ দিয়াছেন। সেগুলি এই। প্রথম—স্থানীয় স্বাস্থ্যের উন্নতি। দ্বিতীয়—গৃহে স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মপালনে উৎসাহ দান। তৃতীয়—শুশ্রূষাকারিণী নিয়োগ। চতুর্থ—স্বাস্থ্যের নিয়ম সকল গৃহে গৃহে প্রচারের জন্য কমিটি নিয়োগ।

উপযুক্ত ধাত্রীর অভাবে অনেক শিশুর অকাল মৃত্যু হয়। এখন আর শুধু সেকালের মত অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে চলিবে না, সর্ব্বত্র স্বাস্থ্যের উন্নতিকল্পে চেষ্টা করিতে হইবে। কিন্তু যে পর্য্যন্ত স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি না হইবে, সে পর্য্যন্ত স্বাস্থ্যের নিয়ম প্রতিপালিত হওয়া অসম্ভব। দুঃখের বিষয়, অনেক শিক্ষিত লোকও শিশুর জন্মকালে প্রসূতি ও শিশুকে এমন অবস্থায় রাখেন যে, তাহাতে তাহাদের স্বাস্থ্য কোন প্রকারেই ভাল থাকা সম্ভবপর নহে, উভয়েরই জীবন সঙ্কটাপন্ন হইয়া থাকে। এই বিষয়ে সকলেরই মনোযোগ আকৃষ্ট হওয়া আবশ্যক। বঙ্গদেশে শিশুর অকাল মৃত্যুর সংখ্যা এত অধিক দেখিয়া মনে হয়, ইহার প্রধান কারণ উপযুক্ত জলবায়ু ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার অভাব এবং বালিকা মাতার সন্তানপালনে অনভিজ্ঞতা।

জননীপদ লাভ করা সহজ কথা নহে, জননীর বড়ই কঠিন দায়িত্ব। বঙ্গললনা বালিকা বয়সেই জননীর পদ প্রাপ্ত হন। কোন শিক্ষা সম্পূর্ণ না হইতেই কঠিন দায়িত্ব তাঁহার মস্তকে পড়ে। অথচ এ বিষয়ে তাঁহার কোন শিক্ষাই নাই (বালিকা বয়সে থাকাও অসম্ভব)। নিজের শরীর কিরূপে রক্ষা করা উচিত, কিরূপে থাকিলে স্বাস্থ্য ভাল থাকে, জননীর সে জ্ঞানই আদৌ হয় নাই, হয়ত সে বিষয়ে তিনি কোন শিক্ষাও পান নাই, এমন কি পুতুলখেলার বয়সে তাঁহাকে জীবন্ত পুতুল লইয়া খেলিতে হয়। ইহাও বঙ্গ দেশের শিশুর অকাল মৃত্যুর একটি প্রধান কারণ শতকরা ৫০টি শিশু অতি কষ্টে বাঁচিলেও তাহারা বল ও বুদ্ধিহীন এবং মেধাশক্তির অভাবে অধিকাংশই নির্ব্বোধ ও মূর্খ হইয়া দিন যাপন করে। তাহারা দীর্ঘজীবী হইতে পারে না। কেননা অল্পবুদ্ধিই হউক, আর অধিকবুদ্ধিই হউক, বিদ্যা না শিখিলে জগতে কেহই গণ্য মান্য হইতে পারে না, সুতরাং দেহের শক্তি অপেক্ষা মানসিক পরিশ্রমের অধিক আবশ্যক হয়, কিন্তু মানসিক শক্তির অভাব যাহাদের, তাহাদের পক্ষে অধিক পরিমাণে মানসিক পরিশ্রম আরও অনিষ্টকর এবং আয়ুঃক্ষয়কারক। বালিকা-বয়সে সন্তানের জননী হওয়া যেমন অকাল মৃত্যুর একটি কারণ, সেইরূপ পুরুষেরও অপরিণত বয়সে বিবাহ হওয়া তাহার অন্যতম কারণ। যেমন ২৫ বৎসরের পূর্ব্বে পুরুষের সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না, সেইরূপ স্ত্রীজাতিরও ১৮ বৎসরের পূর্ব্বে সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গের পূর্ণতা হয় না। তৎপূর্ব্বে সন্তান জন্মিলে যে সে সন্তান অল্পায়ু হইবে, তাহার আর বিচিত্র কি? তাহার পর মাতা নিতান্ত বালিকা, যে কালে




তিনি জননী আখ্যা পাইলেন, সেই হইতেই তাঁহার বালিকাভাব ঘুচিয়া গাম্ভীর্য্য আসিল এবং আত্মত্যাগেরও আরম্ভ হইল। তাঁহার নিজের সুখ সচ্ছন্দতা বিসর্জ্জন দিয়া, নিজের সকল স্বার্থ ত্যাগ করিয়া, দেহ ও মনের শক্তি সন্তানের কার্য্যে নিয়োগ করা উচিত। জননী রাজ-রাজেশ্বরী হইলেও এবং বহু দাসদাসীপরিবৃতা থাকিলেও সন্তানের সুখ সচ্ছন্দতার প্রতি দৃষ্টি রাখা একমাত্র তাঁহারই কর্ত্তব্য।

এখন দেখিতে হইবে, কি কি কারণে আমাদের শিশুর অকাল মৃত্যু হইয়া থাকে। প্রথম, সূতিকা-গৃহ অতি উত্তম স্থানে হওয়া আবশ্যক, কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে উহা বাড়ীর অতি কদর্য্য স্থানে ভিজা মাটীর উপর হইয়া থাকে। গৃহটি এতই ক্ষুদ্র হয় যে, বিশুদ্ধ বায়ু তাহার মধ্যে কোন মতেই প্রবেশ করিতে পারে না। তাহার উপর কাঁচা কাঠের ধূম এবং শিক্ষিতা ধাত্রীর অভাব।

বালিকা মাতা শারীরিক সকল যন্ত্রণা উপেক্ষা করিয়া সন্তানের জননী হইলেন বটে, কিন্তু তিনি সকল বিষয়েই অজ্ঞ। অনেক বয়স্কা মাতাও ৩।৪ সন্তানের জননী হইয়া পরমুখাপেক্ষিতা এবং নিজের অজ্ঞতা বশতঃ সন্তানকে উপযুক্ত যত্নাভাবে অকাল মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করিতে পারেন না।

আমাদের দেশের মাতার নিজের কোন ক্ষমতাই নাই, সুতরাং সূতিকাগারে সন্তানের যেরূপ যত্ন হওয়া উচিত, তাহার কিছুই হয় না। প্রসূতির শরীররক্ষার জন্য উপযুক্ত সহজপাক ও পুষ্টিকর আহার এবং পরিষ্কার বস্ত্রাদি (যাহা তখন নিতান্ত আবশ্যক) তাঁহারা পান না। কুসংস্কারাচ্ছন্ন গৃহিণীদের জন্যই অনেক স্থলে এইরূপ ঘটিয়া থাকে। বলশক্তিহীন প্রসূতির উপযুক্ত শুশ্রূষা ও আহারের অভাবে স্তনে যথেষ্ট দুগ্ধ হয় না, সূতিকাগার হইতেই গোয়ালার জল (অবশ্য অনেকেই গাভী রাখিতে সক্ষম হন না) খাওয়াইতে আরম্ভ করেন, তাহাতে শিশুর যে কি ভয়ানক অনিষ্ট হয়, তাহা তাঁহাদের ধারণাতেই আসে না।

প্রত্যেক প্রসূতির জানিয়া রাখা উচিত যে, যতদিন পর্য্যন্ত শিশুর আট নয়টি দাঁত না উঠে, সে পর্য্যন্ত স্তনের দুগ্ধেই তাহার পুষ্টি সাধন হওয়া উচিত। এই জন্য প্রচুর পরিমাণে দুগ্ধ, ঝোল, প্রভৃতি পান ও পুষ্টিকর খাদ্য আহার করিয়া যাহাতে স্তনে প্রচুর দুগ্ধ হয় ও থাকে সে ব্যবস্থা করা আবশ্যক। এখনকার গোয়ালার দুধ ছেলেদের পক্ষে 'বিষ' বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, তাহাদের যতকিছু রোগ ইহা হইতেই উৎপন্ন হয়। যদি নিতান্তই অন্য দুগ্ধ দিতে হয়, তাহা হইলে সদ্যজাত শিশুর পক্ষে সহজপাক ছাগ-দুগ্ধই উত্তম। তদভাবে ১ ভাগ গো দুগ্ধে ৩ ভাগ জল (অবশ্য বয়স বৃদ্ধির সহিত জলের পরিমাণ কমিবে) মিশাইয়া ফুটাইয়া খুব অল্প পরিমাণে মিশ্রী, তদভাবে পরিষ্কার চিনি দিয়া খাওয়ান উচিত। কিন্তু সাবধান,



ফিডিং বোতল ব্যবহার করিবেন না। ফিডিং বোতল যাঁহারা ভালরূপে পরিষ্কার করিতে পারেন (আলস্য ত্যাগ করিয়া স্বহস্তে) এবং উহা অপরিষ্কার থাকার কি ভয়ানক ফল হয়, সে বিষয় যাঁহারা বুঝেন, তাঁহাদের জন্যই ফিডিং বোতল।

চিরপ্রচলিত চকচকে মাজা ঝিনুক বা চামচ দিয়া অল্প অল্প করিয়া দুধ খাওয়ানই সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম।

সূতিকা-গৃহে শিক্ষিতা ধাত্রী রাখিতে হইলেই ব্যয়বাহুল্য, সেই ব্যয়বাহুল্যের আশঙ্কায় অনেক অবস্থাপন্ন ব্যক্তিকেও এ দেশের অশিক্ষিতা অজ্ঞ নীচজাতীয় রমণীদিগের দ্বারা ধাত্রীর কার্য্য নির্ব্বাহ করাইতে দেখা যায়। কিন্তু বড়ই অনুতাপের বিষয় যে, তাঁহারা বুঝেন না যে, দুইটি জীবনের সঙ্গে তুলনায় সামান্য অর্থ অতি তুচ্ছ। বিশেষতঃ সকলেরই বা সকল বারেই নির্ব্বিঘ্নে ও সহজে সন্তানপ্রসব হয় না। সে কালের গৃহিণীরা বলিয়া থাকেন, "আমাদের কি কখন সন্তান হয় নাই? না বাঁচিয়া নাই?" সে কথা সত্য হইতে পারে, কিন্তু এ পরিবর্ত্তনশীল জগতে সকলই যে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে এবং সে কালের জল,বায়ু, স্বাস্থ্য সবেরই যে অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে, সেটা তাঁহারা মানিতে চাহেন না। সে কালের সহিত আধুনিক কালের কিছুতেই তুলনা হয় না। সে কালে এরূপ বালিকা বিবাহ-প্রথা কখনই প্রচলিত ছিল না, আর থাকিলেও স্ত্রীর উপযুক্ত বয়স না হইলে স্বামীর সহিত তাঁহার কোন সংশ্রব থাকিত না। এ বিষয়ে উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে অতি সুন্দর প্রথা আছে। প্রথাটী ইতর, ভদ্র উভয় সমাজেই সমভাবে প্রচলিত। তাহারা প্রথমতঃ, অন্ততঃ ভদ্র পরিবারে অল্প বয়সে বিবাহ দেয় না, আর দিলেও ১৭।১৮ বৎসরের কম "গউনা" অর্থাৎ দ্বিরাগমন করে না। দ্বিরাগমনের পূর্ব্বে কন্যা জামাতা বা পুত্র পুত্রবধূর দেখা শুনা রহিত থাকে।

পুরাকালেও সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, প্রভৃতি এদেশের প্রাতঃস্মরণীয়া মহিলাগণ সকলেই উপযুক্ত বয়সে স্বয়ম্বরা হইয়াছিলেন, এ কথা সকলেই জানেন। এখন গৃহস্থগণ সে সব উল্টাইয়া গৌরীদানের ফল লইতে গিয়া যে দেশের সর্ব্বনাশ করিতেছেন, তাহা একবারও ভাবিয়া দেখেন না।

(ক্রমশঃ)

চারুমতি দেবী

কে মোর আপন ?

মাতা পিতা গুরুজন, প্রাণের পুতলী,
পুত্র কন্যা, পরিবার, আছে ত সকলি !
সখা, সখী, প্রতিবাসী আরো কত জন,
তাহাদের মাঝে বল "কে মোর আপন"?




(২)

পরিবারবর্গে করি লালন পালন,
কিসে তারা হবে সুখী ভাবি অনুক্ষণ।
অবশ্য তাহারা করে 'শুভ আরাধন',
বিচারিয়া বলে দাও, "কে মোর আপন"?

(৩)

আমি যদি পাই কভু অন্তরে বেদন,
তারাও কি মোর সাথে করে না ক্রন্দন?
বুঝিতে না পারি কিছু তাহাদের মন,
তাই বলি বার বার, "কে মোর আপন"?

(৪)

আমি যদি ছুটে যাই, প্রাণের জ্বালায়
গভীর সাগরজলে মিশাইতে কায়,
অমনি সকলে ছুটে সিন্ধুর সদন,
তবুও বুঝিতে নারি, "কে মোর আপন"?

(৫)

সুখে সুখী, দুখে দুখী, সকলে আমার,
বিপদে পড়িলে সবে করে হাহাকার।
একগাছি স্নেহসূত্রে করেছে বন্ধন,
তবুও সঘনে বলি "কে মোর আপন"?

(৬)

সেই ছবি মনে মোর জাগে অনুক্ষণ,
"নিয়তির স্যন্দনের চক্র আবর্ত্তন,
কালদণ্ড লয়ে করে আসিছে শমন"।
এখন বুঝায়ে দাও, "কে মোর আপন"?

(৭)

যতদিন আছে প্রাণ সবাই আপন,
নয়ন মুদিলে হবে সন্দেহ ভঞ্জন!
শ্মশানে অগ্নির কোলে, চিতায় শয়ন,
জীবনের শেষ খেলা হবে সমাপন!
ফোঁটা দুই তপ্ত অশ্রু দিয়ে বিসর্জ্জন
ফিরে যাবে গৃহে, তবে "কে মোর আপন"?

শ্রীসতোন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

নূতন সংবাদ।

১। আগামী ডিসেম্বর মাসে রাজপ্রতিনিধি লর্ড হার্ডিঞ্জ নূতন রাজধানী দিল্লীতে প্রবেশ করিবেন। এই উপলক্ষে সেখানে মহাসমারোহ হইবে, এইরূপ শুনা যাইতেছে।

২। জনরব উঠিয়াছে যে, ইন্দোরের মহারাজা হোল্‌কার পুনরায় বিবাহ করিবেন। মহারাজার স্ত্রী বর্ত্তমান এবং তাঁহার দুইটী উপযুক্ত পুত্র সন্তানও আছে।

৩। কুমারী লিলি স্মিথ নাম্নী কোন পাশ্চাত্য মহিলা ৬ ঘণ্টা ১৫ মিনিটে সন্তরণ দ্বারা ২০ মাইল পথ অতিক্রম করিয়াছেন।

৪। পৃথিবীর সকল স্থানের প্রচলিত ধর্ম্মসমূহের মর্ম্ম অবগত হইবার নিমিত্ত জর্ম্মনীর অন্তর্গত লিপ্‌জিগ নগর হইতে দ্বাদশ জন জর্ম্মণ সপরিবারে নগ্নপদে ভ্রমণে বহির্গত হইয়াছেন। ইঁহারা নাকি নিরামিষভোজী।

৫। বিগত তিন বৎসরে ভারতবর্ষে



অনুমান ৪৯৫ লক্ষ টাকার স্বর্ণ আমদানী হইয়াছে। সমগ্র পৃথিবীতে যে পরিমাণ স্বর্ণ উৎপন্ন হয়, উহা প্রায় তাহার এক-তৃতীয়াংশ হইবে।

৬। শুনা যাইতেছে, দিল্লীতে এই বৎসর ১৩টী ব্যাঙ্ক খোলা হইবে।

৭। শুনা যাইতেছে যে, সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ স্বহস্তে লর্ড ক্লাইবের প্রতিমূর্ত্তি বিলাতের সেণ্টজেমস্‌পার্কের সোপানচত্বরে প্রতিষ্ঠিত করিবেন।

৮। কুচবিহারের মহারাজা শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুর রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষদের আজীবন সভ্যপদ গ্রহণ করিয়াছেন।

৯। পরলোকগত জেনারেল বুথের স্মৃতি-সংরক্ষণের জন্য ইংলণ্ডের সার কম্পর্ডউন রিকেট ৭৫ হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

১০। কলিকাতা মহানগরীতে যে স্বদেশী মেলা হইয়াছিল, তাহাতে ভারত-জাত দ্রব্যাদি পরিদর্শন করিয়া সকলেই আনন্দিত হইয়াছেন। এত অল্প সময়ের মধ্যে যে নিত্য ব্যবহার্য্য অনেক দ্রব্যই ভারতে প্রস্তুত হইয়াছে, ইহা অতি আনন্দের বিষয়।

১১। গত ২৭শে সেপ্টেম্বর মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের স্বর্গারোহণের ৭৯ বাৎসরিক উৎসব উপলক্ষে নানা স্থানে স্মৃতিসভা হইয়া গিয়াছে। ঐ দিন বৈকালে কলিকাতার সিটিকলেজে স্যার প্রতুল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ত্রিতলে ও পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় নিম্নতলে সভা-পতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রায় যতীন্দ্র নাথ চৌধুরী, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, কুমারী কুমুদিনী মিত্র, বি, এ, বাবু হেরম্বচন্দ্র মৈত্র, বাবু ভবসিন্ধু দত্ত প্রভৃতি রাজার সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

১২। শুনা যাইতেছে যে, গত ১৩ই সেপ্টেম্বর, জাপানসম্রাট মুৎসুহিতোর দেহসমাধির দিন, রাজভক্তি দেখাইবার নিমিত্ত জাপানের সেনাপতি জেনারল নগি ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী আত্মহত্যা করিয়াছেন।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

আমরা নিম্নলিখিত কয়েকখানি পুস্তক প্রাপ্ত হইয়াছি।

আয়ুর্ব্বেদ হিতৈষিণী—২য় বর্ষ, শ্রাবণ. বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা। ঢাকা আয়ুর্ব্বেদ হিতৈষিণী সভা হইতে প্রকাশিত মাসিক পত্রিকা। ইহাতে আয়ুর্ব্বেদ, চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ সকল প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা আশা করি এইরূপ পত্রিকার সর্ব্বত্র সমাদর হইবে।

কাজের লোক—ষষ্ঠ বর্ষ, জুলাই মাস,



বার্ষিক মূল্য ২॥০ আড়াই টাকা। অক্রুর দত্তের লেন, বহুবাজার হইতে প্রকাশিত গার্হস্থ্যবিষয়ক মাসিক পত্রিকা। ইহাতে শিল্প, বণিজ্য, ব্যবসায় সম্বন্ধীয় নানাবিধ নিত্য প্রয়োজনীয় প্রবন্ধ সকল প্রকাশিত হইতেছে। ইহাতে দেশের ব্যবসায়ের অনেক উপকার সাধিত হইবে, সন্দেহ নাই।

বামারচনা।

আকুল প্রার্থনা

তব চরণপ্রান্তে মম দুঃখের রাগিণী
উঠিছে মরম দহিয়া,
আজি আকুল চিত্তে তব করুণা-ধারা
ঢালগো হৃদয় ব্যাপিয়া।
মম দীন বাসনা যত জাগিয়া উঠিছে
দিবস রাত্রি বাধা না মানি,
তব অমর, অক্ষয়, নিভৃত ভবনে
রাখগো অন্তরযামিনি।
মম করুণকাহিনী, মর্ম্মের বাণী
নিবেদিনু তব দুয়ারে,
যত অপরাধ মম ক্ষমা কর দেব!
নিরাশ করো না আমারে।
আমি তৃষিত নয়নে কৃপা চাহি দেব!
নাহি মোর কোন সাধনা,
শুধু আছে অশ্রুজল, শত অপরাধ,
আমারে নিরাশ করো না।
মম সংসারতাপে তাপিত পরাণ
তোমারি করুণা যাচে,
আজি হৃদয়ের যত বেদনা ভুলিয়া
দাঁড়াইনু তব কাছে।
আজি চাহ মোর পানে করুণা নয়নে
আমারে নিরাশ করো না,
যদি আরো দিতে চাও বেদনা, যাতনা,
দিও, তবু মোরে ভুলো না।

অশ্রুজল

(বাল্য-সখীর শিশু পুত্রের মৃত্যুসংবাদে রচিত)।

কেন হরে নিলে!
তোমার তো কত আছে, এই মহা বিশ্বমাঝে,
সবিতো তোমারি প্রভু চরণের তলে,
তবে ক্ষুদ্র শিশুটুক্, চূর্ণ করি মার বুক
কেন কেড়ে নিলে সিক্ত করি অশ্রুজলে?
ওরে না হরিলে
কি তোমার হত ক্ষতি, বল ওগো বিশ্বপতি!
এরি তরে লোকে কি গো দয়াময় বলে?
এরি তরে বিশ্ববাসী, ঢালে পদে প্রেমরাশি?
যতনে অর্চ্চনা করে ফুল, গঙ্গাজলে?

যদি—না হরিতে তারে
থাকিত মায়ের হৃদি মগ্ন শান্তি-নীরে,
হরি সেই শান্তিটুক্, কি তুমি পাইলে সুখ,
মার সব সুখ শান্তি সরাইলে দূরে।
ভাসি নয়নের জলে, দিনগুলি যাবে চ'লে,
তোমা প্রতি অবিশ্বাস হ'ল চির তরে।
ফুল্ল কুসুমনিচয়
আগে কত সুখে ওর হাসাত হৃদয়
আকাশে চন্দ্রমা হেরি, তোমার মহিমা স্মরি,
ঝরিত নয়নে অশ্রু প্রেমসুধাময়,
এখন সে সব দেখে, দারুণ বাজিবে বুকে,
হয়ে গেছে হৃদি রাজ্যে ঝটিকা প্রলয়।
শুনি বিহগের গীতি, ফেটে যাবে তার হৃদি,
ঊষার মোহন রূপে নীরবে কাঁদিবে,
রজনীতে কার তরে, কার স্মৃতি মনে করে,
শূন্য সেই কোলে পুনঃ ফিরিয়া চাহিবে।
কারো ছোট শিশু দেখে, কত না বাজিবে বুকে,
একটি সুন্দর মুখ হৃদয় দহিবে,
তার সে কোমল বুক, কভু যে পায়নি দুঃখ,
এমন কঠোর ব্যথা কেমনে সহিবে।
হায় নির্ম্মাল্য কুসুম,
অকালে তোমার চোখে এল একি ঘুম!
শুধু দুদিনের লাগি, এসেছিলি 'দিতে ফাঁকি,
অকালে ঝরিয়ে গেলি অস্ফুট কুসুম।

সুরুচি বালা সেন।

১৬।৪ মধুরায় লেন, ইণ্ডিয়ান্ প্রেসে শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত
ও
শ্রীসন্তোষ কুমার দত্ত কর্ত্তৃক ৩৯ নং আণ্টনিবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

No. 593. Registered No. C. 134. January, 1913.



স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫০ বর্ষ।	পৌষ, ১৩১৯। জানুয়ারী, ১৯১৩।	১০ম কল্প।
৫৯৩ সংখ্যা।		১ম ভাগ।

[illegible] অগ্রিম ডাক মাশুল সহ ১।৵০ পশ্চাদ্দেয় বার্ষিক ৩৲ টাকা মাত্র।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 593. January, 1913.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫০ বর্ষ। ৫৯৩ সংখ্যা। | পৌষ, ১৩১৯। | ১০ম কল্প। ২য় ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা—বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার নির্ব্বাচন কার্য্য সম্ভবতঃ আগামী জানুয়ারী মাসের পূর্ব্বেই শেষ হইবে।

তুরস্কের যুদ্ধে ভারতীয় মুসলমান রমণীগণের সাহায্য—লাহোরের মুসলমান রমণীগণ বিপন্ন তুরস্কের সাহায্যের নিমিত্ত এক সভা করিয়াছিলেন। সভাস্থলে বিপন্নদিগের সাহায্যকল্পে ১৫০০ (পনের শত) টাকা সংগৃহীত হইয়াছে এবং অনেকে সাহায্য দানে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।

দিল্লীতে সর্ব্বোচ্চ বিচারালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব—হাইকোর্টের বিচারফলের বিরুদ্ধে আপিল করিতে হইলে বিচারপ্রার্থীদিগকে বিলাতের প্রিভি-কাউন্সিলের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। ইহাতে অত্যধিক ব্যয় হয়, এজন্য অতি অল্প লোকেই প্রিভি-কাউন্সিলের সাহায্য গ্রহণ করিতে পারেন। শুনা যাইতেছে সম্প্রতি এই অসুবিধা দূর করিবার নিমিত্ত দিল্লীতে একটী সর্ব্বোচ্চ বিচারালয়ের প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব হইয়াছে।

সিবিল সার্ব্বিস পরীক্ষা—এ বৎসর ভারতীয় সিবিল সার্ব্বিসের শেষ পরীক্ষায় দুইজন ভারতবাসী ছাত্র উত্তীর্ণ হইয়াছেন। তন্মধ্যে মিঃ এস, বি, রামমূর্ত্তি দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া "ভবনগর" স্বর্ণপদক পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছেন। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ইহার পূর্ব্বে আর কোন ভারতবাসী সিবিল সার্ব্বিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন নাই। অপর জনের নাম মিঃ ক্ষিতীশ চন্দ্র সেন। ইনি ইংরাজী রচনায় একটী বিশেষ পুরস্কার লাভ করিয়াছেন।

তুরস্ক যুদ্ধ—বুলগেরিয়া, মণ্টেনিগ্রো, গ্রীস প্রভৃতি তুরস্কের চতুষ্পার্শ্বস্থ প্রদেশসমূহ এক সঙ্গে তুরস্ক আক্রমণ করিয়াছে। তুরস্কের বিপক্ষদলই এতদিন জয়লাভ করিতেছিল। সম্প্রতি সংবাদ আসিয়াছে যে, বুলগেরিয়ার বহু সৈন্য হত হইয়াছে, এজন্য বুলগেরিয়া আর অগ্রসর হইতে সাহস করিতেছে না।

বিমান আরোহণের পুরস্কার—এইরূপ শুনা যাইতেছে যে, যে কোন ব্যক্তি বিমান যানে লণ্ডন হইতে ভারত পর্য্যন্ত আসিতে পারিবেন, ভারতবর্ষের কতিপয় মহারাজা ও ভূপালের বেগম সাহেবা তাঁহাকে চারি সহস্র টাকা পুরস্কার দিবেন বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

ধর্ম্মার্থে দান—সম্প্রতি গোয়ালিয়রের সর্দ্দার বলবন্ত রাও ভাইয়া সাহেব গবর্ণমেণ্টের হস্তে দুই লক্ষ টাকা অর্পণ করিয়াছেন। বৈষ্ণবদিগের মধ্যে যাঁহারা সংসার পরিত্যাগপূর্ব্বক সন্ন্যাস অবলম্বন করিবেন, তাঁহাদিগকে এই অর্থের আয় হইতে মাসিক ১২৫ টাকা বৃত্তি প্রদান করা হইবে।

শোকসংবাদ—আমরা গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, গত ২৮শে আশ্বিন, সোমবার, রাত্রি বারটার সময় শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র বসু মহাশয় ঊনসত্তর বৎসর বয়সে নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিয়া অমরধামে গমন করিয়াছেন। এই সংবাদে আমরা যারপর নাই ব্যথিত হইলাম। ঈশান বাবু একজন উৎসাহী সাহিত্যসেবী ছিলেন। তাঁহার রচিত অনেক পুস্তক সাহিত্য ভাণ্ডারে ও ধর্ম্মসমাজে সাদরে গৃহীত হইয়াছে। ইনি স্ত্রী-শিক্ষার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন ও নারীগণের জন্য অনেক পরিশ্রম করিয়া স্ত্রীশিক্ষার উপযোগী কয়েকখানি উৎকৃষ্ট নীতি-গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। ইনি বামাবোধিনীর একজন লেখক ছিলেন, এবং রাজা রামমোহন রায় ও মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুরের বড়ই ভক্ত ছিলেন। ঈশান বাবুই উৎসাহী হইয়া সর্ব্বপ্রথম রাজা রামমোহন রায়ের লুপ্তপ্রায় পুস্তকাবলী বহুকষ্টে সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করেন। বৃদ্ধ বয়সেও তাঁহার উৎসাহ কমে নাই। তিনি কিছুকাল পূর্ব্বে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জন্মস্থান দেখিবার জন্য অনেক কষ্ট স্বীকার করিয়া তথায় গিয়াছিলেন ও সেই স্থানে তাঁহার স্মৃতি-স্থাপনের জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুরের একখানি সংক্ষিপ্ত জীবনীও লিখিয়া গিয়াছেন। ঈশানবাবু ব্যাহাড়ম্বর-শূন্য, শান্ত-প্রকৃতি সাধক ছিলেন। ভগবান্ তাঁহার ভক্ত সন্তানকে আপন শান্তিময় ক্রোড়ে গ্রহণ করিয়া তাঁহার পুণ্যের পুরস্কার দান করুন।

হিন্দুধর্ম্মের উদারতা।

আমাদের হিন্দুধর্ম্মের মত এমন উদার ধর্ম্ম আর নাই। ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত ধর্ম্মের বন্ধনে আবদ্ধ এবং তাঁহার জীবনের সামান্য সামান্য কার্য্যগুলিও ধর্ম্মের সহিত জড়িত। যাহাতে আমরা প্রতি পাদক্ষেপে ধর্ম্মের অনুসরণ করিয়া চলি, আমাদের শাস্ত্রকারেরা তাহারই ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। আমাদের হৃদয় যাহাতে সংকীর্ণ না হয়, তাহার জন্য তাঁহারা মহৎ ও উচ্চ উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন "স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ"। কি সুন্দর উচ্চ ভাব! এইরূপ সুন্দর মহামূল্য রত্ন সকল আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রে আছে, তাহার উপদেশ —সর্ব্বত্রই ব্রহ্মদর্শন করা ও আপনাকে জানিয়া নিষ্কাম কর্ম্মের দ্বারা সর্ব্বশেষে মুক্তি লাভ করা। আত্মজ্ঞান লাভ করিবার ইচ্ছা সকলেরই আছে, কেবল মায়া ও বাসনার বশে চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইয়া লক্ষ্য-ভ্রষ্ট হইয়া পড়ে। একমাত্র ধর্ম্মই আমাদের লক্ষ্য স্মরণ করাইয়া দেয়। আমরা যদি স্ব স্ব সাম্প্রদায়িক ভাব ভুলিয়া সাধনার দ্বারা আপনাদিগকে মুক্তির দিকে অগ্রসর করিতে পারি, তাহা হইলে আমরা নিশ্চয়ই শুভ ফল পাইব। অন্তরের সদ্‌বৃত্তি-গুলির অনুশীলনে হৃদয়কে প্রসারিত করিয়া সসীম হইতে অসীমে আপনা-দিগকে মিশাইয়া দেওয়া মানবজীবনের চরম উৎকর্ষ। স্ব স্ব ধর্ম্মের আশ্রয়ে থাকিয়া আত্মজ্ঞান লাভ করাই মানব-জীবনের সফলতা। সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিতে হইলে আমাদের হিন্দু ধর্ম্মের মহৎ উচ্চ ভাব সকল হৃদয়ে ধারণ করিতে হইবে। ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুর মুখ হইতেই "বসুধৈব কুটুম্বকম্" এই সার কথা বাহির হইয়াছে মঙ্গলময় ঈশ্বর আমাদের পিতামাতা, এজন্য সমস্ত পৃথিবীর লোককে আমাদের আপনার বলিয়া ভাবিতে হইবে।

নিষ্কাম কর্ম্ম আমাদের সাধনা ও চিত্তশুদ্ধির জন্য। শাস্ত্রের উপদেশ সকল মানিয়া হৃদয়ের সদ্‌বৃত্তিসমূহের অনুশীলন করিলে আমাদের হৃদয়ের মলিনতা দূর হয়। তখন সাধক সর্ব্বত্রই ব্রহ্মদর্শন করিয়া যোগের চরম ফল লাভ করিয়া থাকেন। মানবমাত্রেরই মনুষ্যপদবাচ্য হইতে হইলে আত্মজ্ঞান লাভ করা উচিত। সাধনার পথে বিঘ্ন অনেক। আমাদের ইন্দ্রিয় সকল বিষয়ের প্রতি প্রতিনিয়ত ধাবিত হইতেছে। কঠোর সাধনার কশাঘাতে দুষ্ট অশ্বের ন্যায় মনকে বিষয় হইতে ফিরাইতে হইবে। যে সাধক সাধনার পথে অগ্রসর হইয়াছেন, তিনিই জানেন সাধনার পথ কত বিঘ্নসঙ্কুল। পাপপথ আপাতমনোরম, সুতরাং মনুষ্যের মন সহজেই তাহাতে পতিত হইয়া থাকে।

সেই জন্য আর্য্য ঋষিরা ধর্ম্মের পথকে শাণিতক্ষুরধারের ন্যায় বলিয়া গিয়াছেন। যদিও প্রতিপদক্ষেপে ভূমিতে পতিত হইতে হয়, তথাপি নিরাশ না হইয়া সাবধানে জীবনের শেষ অবধি চলিলে কিছু না কিছু ফল অবশ্যই হইবে। কোনও প্রসিদ্ধ কবি বলিয়াছেন :—

""এক বার না হইলে, হইতে পারে পরে।
বারেক নিরাশ হয়ে কে কোথায় মরে॥"

অতএব, আশায় হৃদয় বাঁধিয়া আমাদের এই জীবন সংগ্রামে অগ্রসর হইতে হইবে নীতি ও সদাচারসম্পন্ন হইয়া অসদ্‌বৃত্তি সকলের মূলোৎপাটনপূর্ব্বক হৃদয়কে পবিত্র করিলে তবে সাধনায় অধিকারী হওয়া যায়। নিজের জীবনের ভুল ভ্রান্তি দূর করাই মনুষ্যজীবনের কাজ। তাহা না করিয়া অন্যের দোষ দর্শন করিয়া বিদ্রূপের বাক্যবাণে তাহাকে বিদ্ধ করিয়া আমরা বড়ই পৌরুষ জ্ঞান করিয়া থাকি। মনুষ্যহৃদয়ে যদি উচ্চ ভাব থাকে, তবে সেই মহৎ ভাবের দ্বারা সে ক্ষুদ্রকেও বড় করিয়া দেখে। উদার হিন্দুর হৃদয়ে কখনও মক্ষিকাবৃত্তি স্থান পায় না। "মক্ষিকা ব্রণমিচ্ছন্তি মধুমিচ্ছন্তি ষট্‌পদাঃ।" মনুষ্যমাত্রেই মন্দ হইতে ভাল গ্রহণ করিবে ও নিজের জীবনকে সংযত করিয়া সাধনার দিকে অগ্রসর হইবে।

ধর্ম্ম অতি পুরাতন জিনিষ। ইহার সম্বন্ধে নূতন কথা কিছুই বলিবার নাই। ধর্ম্মালাপ ও ধর্ম্মালোচনা সর্ব্বদাই করিবে। সর্ব্বদা শ্রুত কথা কার হৃদয়ে, কোন্ শুভ মুহূর্ত্তে, কি ভাবে প্রবেশ করে, তাহা বলা যায় না। সর্ব্বদা সৎ-চিন্তা ও সদ্বিষয় আলোচনা করিলে নিশ্চয়ই তাহার শুভ ফল পাওয়া যায়। সৎসঙ্গ আমাদিগকে স্বর্গসুখ আনিয়া দেয় :—শ্রীমৎ জয়দেব বলিয়াছেন, "ক্ষণমিহ সজ্জনসঙ্গতিরেকা। ভবতি ভবার্ণবতরণে নৌকা।" ক্ষণকাল যদি সজ্জন সহবাস লাভ হয়, তবে তাহা এই ভবার্ণবের পরপারে উত্তীর্ণ হইবার নৌকাস্বরূপ হইয়া থাকে। শাস্ত্রবাক্য ও সৎসঙ্গ আমাদের জীবনকে মধুময় করে। এই দুঃখময় সংসারে সুখ অন্বেষণ না করিয়া সুখ দুঃখের অতীত যে জিনিষ তাহাকে জানিতে চাও। আত্মজ্ঞান কিসে হয় তাহার উপায় কর। জীবনকে জীবনদাতার হাতে দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া আপনার কাজ করিয়া যাও। মহাত্মাগণের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া চলিলে নিঃসন্দেহ মুক্তি লাভ হইবে।

শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী।




পাগল নয় কে ?

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

যাঁহারা সাহিত্যচর্চ্চায় পাগল, তাঁহাদিগের পাগলামি অবশ্য উচ্চ অঙ্গের। কিন্তু তাহা ধর্ম্মের নিম্নস্তরে। ধর্ম্মের সমান উচ্চ আসন কাহারও নাই। সাহিত্য-সেবিগণ জগতে যে সাহিত্য রত্ন দান করিয়া যান, তাহা ভুলিবার নহে, তাহাতে জগতের বিলক্ষণ হিতসাধন হইয়া থাকে, এবং জগৎ তজ্জন্য তাহাদিগকে হৃদয়-মন্দিরে স্থাপন করিয়া ভক্তি ও শ্রদ্ধার অঞ্জলি প্রদান করে। সাহিত্যিকগণও কিসে জগতের মঙ্গল সাধিত হইবে, তজ্জন্য নিয়ত চেষ্টা করেন। তাঁহারা বাণীর কমল-বনে প্রবেশ করিয়া কোথায় সুন্দর ভাব, কোথায় সুন্দর সুশ্রাব্য ললিত মধুর বাক্য, খুঁজিয়া খুঁজিয়া আহরণ করেন। তাঁহারা ভারতীর কমলবনের মধু আহরণ করিয়া আপনারা আকণ্ঠ পান করেন ও জগৎকে পান করান, আপনারা পাগল হন ও জগতকেও পাগল করেন। সাহিত্যিক পাগলগণ ভারতীর আরাধনায় জীবন যাপন করিয়া বিপুল সুখ অনুভব করেন, সে সুখের তুলনা কোথাও নাই, সে সুখ স্বর্গ-সুখের অপেক্ষা কোন অংশে হীন নহে। রাজার সিংহাসন, সমরজিৎ বীরেন্দ্রের বিজয়মুকুট, ধনকুবেরের অগাধ ধনরাশি, তাহার নিকট তুচ্ছ বোধ হয়। সাহিত্যিক-গণ দিবারাত্রি ভারতীর সেবায় রত, তাঁহার ধ্যানে নিমগ্ন, তাঁহার চিন্তায় বিভোর। সাহিত্যচর্চ্চা একপ্রকার যোগ-সাধনা।—সাহিত্য অনায়াসলভ্য বস্তু নহে। যেমন ধর্ম্ম-সাধনা কঠিন, সাহিত্যসেবাও তদ্রূপ, পদে পদে বিঘ্নপূর্ণ ও বিপদসঙ্কুল। মনে করিলেই সাহিত্যে সিদ্ধি লাভ করা যায় না। উহার প্রাপ্তি বহু আয়াস ও শ্রমসাধ্য।

যখন ভক্ত সাহিত্যিকের তপস্যায় প্রসন্ন হইয়া সাহিত্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা নৃত্য করিতে করিতে তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূতা হয়েন, তখন সেই ভক্তের আনন্দ উছলিয়া উঠে, তাঁহার হৃদয় নৃত্য করিতে থাকে, তিনি বাগ্‌দেবীর বীণাধ্বনিতে মুগ্ধ হইয়া পাগল হইয়া পড়েন। পাগল সাহিত্যিকগণ ভাবের দাস, ভাব তাঁহাদিগকে যে দিকে লইয়া যায়, তাঁহারা সেই দিকে না যাইয়া থাকিতে পারেন না। ভাবই তাঁহাদিগের সর্ব্বস্ব, তাঁহারা ভাবের পাগল।

সেক্ষপীর মানবচরিত্র অঙ্কনে পাগল। মিল্‌টন পুণ্য ও পাপ বর্ণনায় পাগল। কালিদাস স্বভাবচিত্রণে পাগল। পাগল না হইলে, তাঁহাদিগের উদ্দেশ্য এত উৎকর্ষ লাভ করিত না, তাঁহারা ভাবের স্রোত বহাইয়া সকলকে মাতাইতে পারিতেন না, তাঁহারা আজ জগতের পূজ্য, আরাধ্য ও নমস্য হইতে পারিতেন না। আমাদের

মাইকেল মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র, দীনবন্ধু প্রভৃতি সাহিত্যসেবিগণ সাহিত্য-জগতে কি সুধা পান করিতেন, সাহিত্যচর্চ্চায় কি বিমল আনন্দ উপভোগ করিতেন, তাহা তাঁহারা ভিন্ন সাধারণে কি বুঝিতে পারিবে? তাঁহারা সাহিত্যের রস বুঝিয়াছিলেন বলিয়াই তাহাতে উন্মত্ত ছিলেন। কবি, ঔপন্যাসিক, ঐতিহাসিক প্রভৃতি সাহিত্যিকগণ সকলেই স্ব স্ব ইষ্ট দেবতার আরাধনায় পাগল।

সঙ্গীতচর্চ্চায় যাঁহারা পাগল, তাঁহারা নানাবিধ রাগরাগিণীর অবতারণা করিয়া আপনারাও উন্মত্ত হয়েন, অপরকেও উন্মত্ত করেন। তাঁহাদিগের সজীব সঙ্গীত শ্রোতাদিগের হৃদয়ের সহিত কথা কহিয়া তাহাদিগকে পাগল করে। গায়ক ও শ্রোতা উভয়েই বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া পড়েন। সঙ্গীতরসজ্ঞ সাধক গায়কগণ মধুর সঙ্গীতবিদ্যার আলাপনে জীবন অতিবাহিত করেন। সংসারে সঙ্গীত-বিদ্যাই তাঁহাদিগের সর্ব্বস্ব, তাহারই অনুশীলনে তাঁহারা আর সব ভুলিয়া যান, তাঁহারা তাহাতেই পাগল। দেবাদিদেব মহাদেব ভূতভাবন ভবানীপতি পাগল পঞ্চানন যখন পঞ্চমুখে গান করিতেন, তখন গোলকপতি ষড়ৈশ্বর্য্যশালী স্বয়ং ভগবান্ বিষ্ণু সেই গানে মোহিত হইয়া দ্রবময়ী গঙ্গারূপে প্রবাহিত হইয়াছিলেন। নারদের বীণাযন্ত্রের কত না গুণ ছিল! তিনি হরিনাম সংকীর্ত্তনে দেবতাদিগকেও মোহিত করিয়া পাগল করিতেন ও আপনি পাগল হইতেন। মিঞা তানসেন দীপকরাগ আলাপনে আত্মপ্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন। সঙ্গীতে পাগল হইয়া কত সংসার-দগ্ধ মানব সংসারের জ্বালা যন্ত্রণা ভুলিয়া গিয়াছেন!

কেহ কেহ বক্তৃতায় পাগল। যাঁহারা বক্তা, তাঁহারা শ্রোতৃবৃন্দকে কি করিয়া মুগ্ধ করিবেন, কি করিয়া তাঁহাদিগের হৃদয় অধিকার করিবেন, এই চিন্তায় অস্থির ও ব্যস্ত। ডিমস্থিনিস্, সিসিরো প্রভৃতি বক্তাগণ লোক রঞ্জন, লোক শিক্ষা ও লোক প্রশংসার জন্য পাগল ছিলেন।

দাতাকর্ণ, বলিরাজা, রাজা হরিশ্চন্দ্র প্রভৃতি দানশীল মহাত্মাগণ দান-ব্রত-পালনে উন্মত্ত ছিলেন। হাউয়ার্ড দি-ফিলানথ্রপিষ্ট, এবং বঙ্গের উজ্জ্বল রত্ন সেই দয়ার সাগর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া কত শত দরিদ্রের দুঃখ বিমোচন করিয়াছেন। তাঁহারা পর-দুঃখে কাতর ও পরদুঃখমোচনে পাগল ছিলেন।

স্বদেশের রীতি নীতি পরিমার্জ্জিত করিতে, দেশাচার সুসংস্কৃত ও সমুন্নত করিতে যাঁহারা সদাই যত্নশীল থাকেন, তাঁহারাও কি কম পাগল? ধর্ম্ম-সংস্কারক ও সমাজসংস্কারক রামমোহন, দেবেন্দ্র, কেশবচন্দ্র, রাজনারায়ণ প্রভৃতি মহাত্মাগণ কি কম পাগল ছিলেন?

জগদ্বিখ্যাত নিউটন মাধ্যাকর্ষণ-তত্ত্ব

নিরূপণে পাগল, গ্যালিলিও সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে পৃথিবীর আবর্ত্তন লইয়া পাগল, ডারবিন সাহেব ক্রমোন্নতি বা বিবর্ত্তন বাদ লইয়া পাগল। সক্রেটীস, প্লেটো, প্লিনী, পাইথাগোরস প্রভৃতি প্রাচীন পণ্ডিতগণ স্ব স্ব মন্তব্য ও অভিমত প্রচারে পাগল—পাগল কে নয়? ভল্টেয়ার, রুসো, কম্‌ট, চার্ব্বাক, মিল প্রভৃতি মনীষিগণ পাগল নয় ত পাগল কে?

নূতন মহাদ্বীপ (আমেরিকা) আবিষ্কার করিবার জন্য কলম্বস পাগল। বাষ্পের তত্ত্বানুসন্ধানে ওয়াট্‌স ও ষ্টিফেন্‌স পাগল। এডিসন স্বরতত্ত্বালোচনায় পাগল। পাগল কে নয়? পাগল না হইলে কি জগতের কাজ চলে? তবে পাগল ছোট আর বড়, এইমাত্র প্রভেদ। যাহারা সংসারে দৈনিক উদরপূরণ কার্য্যে বিব্রত, তাহারাও কি পাগল নহে? অবশ্যই পাগল। যতক্ষণ তাহাদিগের দাল, চাউল, ঘৃত, লবণ প্রভৃতি আহারীয় সামগ্রী সমুদয় সংগ্রহ না হয়, ততক্ষণ কি তাহারা নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিতে পারে? না—কখনই না। তাহারা সেই সকল বস্তুর জন্য পাগল হইয়া বেড়ায়। তবেই দেখা গেল জগতে পাগল সকলে।

শ্রীভুবনমোহন ঘোষ।

৺উমেশ চন্দ্র দত্ত মহাশয়ের জীবনী

১৫ বৎসর বয়সে লিখিত রোমরাজ্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

প্রথম অধ্যায়।

রমুলসের রাজত্ব।

১। রমুলস্ মহা বীরপুরুষ, এবং সূক্ষ্মদর্শী ও রাজনীতিজ্ঞ ভূপতি ছিলেন। তিনি ইটালীর সেনিনীয়, আটানমটিক এবং ক্রষ্টুমেনীয় প্রভৃতি জাতির সহিত বারংবার সংগ্রাম করিয়া জয়ী হইয়াছিলেন।

২। এক সময়ে রোমের স্ত্রীলোক-সংগ্রহের জন্য, সেবাইনজাতির কন্যাদিগকে হরণ করাতে, তাহারা ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া টেটিয়স রাজার সমভিব্যাহারে, রোম নগর আক্রমণ করিয়াছিল।

৩। তৎকালে এই যুদ্ধ রোমের পক্ষে মহা বিপজ্জনক বলিতে হইবে। এই যুদ্ধে রোমানদিগের ক্ষমতা প্রায় সমূলে বিনষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছিল, কারণ রোমানদিগের দুর্গদ্বার-রক্ষিকা টার্পিয়া-নাম্নী এক স্ত্রীলোকের বিশ্বাসঘাতকতায় সেবাইনেরা দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। এই সময়ে যদি সেই অপহৃত স্ত্রীলোকগণ ঐ বিবাদী দলদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী না হইতেন এবং অনেক শোক তাপ ও রোদন করিয়া, সন্ধি স্থাপন না করিতেন, তাহা হইলে ঐ সংগ্রামেই রোমানদিগের সমূলোচ্ছেদ হইত।

৪। ঐ অবলাগণের রোদন ও আর্ত্তনাদে সেবাইনেরা এরূপ করুণার্দ্র হইল যে, তাহারা তৎক্ষণাৎ অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া অঙ্গীকার করিল যে, অদ্যাবধি আর আমরা কখন পরস্পরের বিরুদ্ধে অস্ত্র চালনা করিব না।

৫। এইরূপে উভয় জাতি একমত হইয়া স্থির করিল যে, রমুলস ও টেটিয়স্ একত্রে রাজত্ব করিবেন এবং রোম নগর উভয় রাজ্যের রাজধানী থাকিবে।

৬। রমুলস ও টেটিয়স ছয় বৎসর পর্য্যন্ত একমত হইয়া রাজ্য শাসন করিলেন। তৎপরে টেটিয়স, লরেন্টিনী নামক লাটিনদিগের প্রেরিত দূতের প্রতি নির্দ্দয় ব্যবহার করাতে, ৭৪২ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে লামুভিয়স নামক স্থানে হত হয়েন। কোন কোন গ্রন্থকার বলেন যে, উভয় রাজার মধ্যে আন্তরিক দ্বেষানল প্রচ্ছন্ন ছিল, এক্ষণে রমুলসের আজ্ঞাতেই এই কার্য্যটী সম্পন্ন হইয়াছিল।

৭। রমুলসের কিপ্রকারে মৃত্যু হয়, তাহার নিশ্চয় বিবরণ পাওয়া যায় না। কিন্তু ইহাই অধিক সম্ভব যে, সেনেটরদিগের (ক) উপর তিনি অন্যায় প্রভুত্ব প্রদর্শন করাতে, তাঁহারা সেনেট সভা মধ্যে তাঁহাকে সংহার করেন, এবং সাধারণ লোক মধ্যে এই ঘোষণা করিয়া দেন যে, তিনি স্বর্গারোহণ করিয়াছেন।

৮। রমুলসের মৃত্যু হইলে, শাসনেরও পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। তখন রোমান ও সেবাইনেরা সেনেটের সভাসদ ছিলেন। তাঁহারা স্থির করিলেন যে, উভয় জাতির মধ্য হইতে পাঁচ জন করিয়া প্রধান লোক নিযুক্ত করা হইবে, এবং যদবধি রাজা হইবার উপযুক্ত কোন ব্যক্তি না পাওয়া যায়, তদবধি তাঁহারাই পর্য্যায়ক্রমে পাঁচদিন করিয়া রাজত্ব করিবেন।

৯। এইরূপে রোমের সিংহাসন প্রায় এক বৎসর কাল শূন্য ছিল।

১০। রমুলসের স্মৃতিরক্ষার্থে কুইরিনাল পর্ব্বতে তাঁহার এক কীর্ত্তিমন্দির নির্ম্মিত হয়। সেখানে কুইরিনস বা মার্সদেব বলিয়া তাঁহার পূজা হইত।

১১। ৩৭ বৎসর রাজত্বের পর রমুলসের মৃত্যু হয়, এবং এক বৎসর পরে নিউমা পম্পিলিয়স তাঁহার উত্তরাধিকারী হয়েন।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

রোমের দ্বিতীয় রাজা নিউমা পম্পিলিয়স।

১। সেবাইনদিগের রাজধানী কিউরিয়স নগরে নিউমা বাস করিতেন। তিনি অতি ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন, এজন্যই রোমানেরা তাঁহাকে রাজা বলিয়া মনোনীত করেন।

২। তিনি সিংহাসনারোহণ করিয়াই রমুলস যে সকল দেহরক্ষক নিযুক্ত

(ক) রোমানদিগের মধ্যে যাঁহারা বয়সে, জ্ঞানে, ক্ষমতা ও বিজ্ঞতায় প্রধান ছিলেন, এমত ১০০ লোক মনোনীত করিয়া রমুলস সেনেট নামে এক মহাসভা সংস্থাপন করেন। ইহার সভাসদদিগকে সেনেটর বলা হইত। তাঁহারা, রাজমন্ত্রীর ন্যায় ছিলেন এবং রাজার অভাবে সমুদায় কার্য্য সম্পন্ন করিতেন।



করিয়াছিলেন তাহাদিগকে বিদায় করিয়া দিলেন। কারণ, তিনি বলিতেন, রাজা প্রজাদিগের ভয়ের বিষয় হইবেন না।

৩। নিউমা বেষ্টালকুমারীদিগের (ক) নিমিত্ত বিদ্যালয় স্থাপন করেন, রোমানদিগের নিষ্ঠুর ভাব অনেক প্রশান্ত ও কোমল করিয়া আনেন, প্রতিবেশী রাজাদিগের সহিত সন্ধি স্থাপন করেন এবং জেনস দেবীর (খ) এক মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। রমুলস যেমন রাজ্য-স্থাপন-কর্ত্তা, নিউমা সেইরূপ রোমের ধর্ম্মসংস্থাপক বলিয়া বিখ্যাত।

৪। রমুলস বৎসরকে ১০ মাসে বিভক্ত করিয়াছিলেন, নিউমা ১২ মাসে বৎসর প্রচলিত করেন। তাঁহার আরও কয়েকটী প্রসিদ্ধ কর্ম্ম আছে। তিনি ব্যক্তিগত ধর্ম্মকার্য্য সকল সম্পাদন জন্য পুরোহিত নিযুক্ত করেন, লক্ষণ দ্বারা শুভাশুভ অবগত করাইবার জন্য দৈবজ্ঞের উপর ভার দেন ও পবিত্র ধর্ম্ম (গ) রক্ষার্থে কতকগুলি ধর্ম্মযাজক নিযুক্ত করেন।

(ক) যে সকল কুমারী বেষ্টা দেবীর পরিচারিকা।

(খ) জেনস দেবীর সম্মানার্থ এই মন্দির স্থাপিত হয়। ইহার দ্বার সন্ধিকালে রুদ্ধ ও যুদ্ধের সময়ে উদ্ঘাটিত থাকিত।

(গ) নিউমা সাধারণ লোকের মধ্যে জানাইতেন যে, ইজিরিয়া নাম্নী এক স্বর্গস্থ পরীর সহিত সর্ব্বদা তাঁহার কথোপকথন, হয় এবং স্বর্গ হইতে কতকগুলি পবিত্র ধর্ম্ম তাঁহাকে প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা যতদিন থাকিবে ততদিন রোমের পরাজয় বা ধ্বংসের শঙ্কা নাই।

৫। নিউমার চারি পুত্র ছিল, তন্মধ্যে কেহই রাজমুকুট প্রাপ্ত হন নাই। কিন্তু তাঁহারা রোমের চারিটী বিখ্যাত ভদ্র বংশ স্থাপন করেন। পম্পিলিয়া-নাম্নী তাঁহার এক দুহিতা ছিল, মার্সস্-নামক সেবাইনজাতীয় এক ভদ্র যুবার সহিত তাঁহার পরিণয় হয়।

৬। ৪৩ বৎসর রাজত্বের পর নিউমার মৃত্যু হইলে টলস্ হষ্টিলিয়স্ তাঁহার উত্তরাধিকারী হয়েন।

তৃতীয় অধ্যায়।

রোমের তৃতীয় রাজা টলস হষ্টিলিয়স্।

টলস হষ্টিলিয়স নিজে বীরপ্রকৃতি ছিলেন, সুতরাং রোমানদিগকে যুদ্ধবিদ্যায় অশিক্ষিত দেখিয়া সুপ্রণালী অনুসারে তাহাদিগকে যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা দিতে লাগিলেন।

২। তাঁহার রাজত্বকালে আল্বানদিগের সহিত রোমানদিগের একটী সংগ্রাম উপস্থিত হয়, এবং হোরেটাই ও কিউরেটাইদিগের বিখ্যাত মল্ল যুদ্ধে তাহার মীমাংসা হইয়া যায়।

৩। এই যুদ্ধটি প্রথমতঃ অনেক দিন পর্য্যন্ত চলিয়াছিল, কিন্তু কোনক্রমে তাহার শেষ হয় না দেখিয়া উভয় দলে একমত হইয়া ত্বরায় তাহার সমাধা করিতে ইচ্ছুক হইলেন। তাঁহারা স্থির করিলেন যে, উভয় দল হইতে তিন জন করিয়া যোদ্ধা নিযুক্ত হইবে এবং তাহাদিগের জয় পরাজয়ে যুদ্ধের মীমাংসা হইবে। আরও তাঁহারা অঙ্গীকার করিলেন যে, যে জাতি







জয়ী হইবে, পরাজিত জাতি তাহার সম্পূর্ণ অধীনস্থ হইবে।

৪। অনন্তর রোমানেরা হোরেটাই নামে তিনটী যমজ ভ্রাতা এবং আলবানেরাও কিউরেটাই নামে ঐরূপ তিনটী ভ্রাতাকে যুদ্ধার্থ মনোনীত করেন।

৫। দুই দিকে দুই দল রহিল এবং উক্ত ছয় জন বীরপুরুষ মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। প্রথমতঃ দুই জন রোমান হত এবং কিউরেটাইদিগের তিন ভ্রাতাই আহত হইল। অবশিষ্ট যে রোমান অনাহত ছিল, সে কিউরেটাইদিগের হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িতে লাগিল। আলবানেরাও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইল। কিন্তু তাহারা পরস্পরে পরস্পর হইতে দূরবর্ত্তী থাকাতে হোরেষিও এক এক করিয়া তিন জনকেই নিপাত করিলেন।

৬। তদবধি আল্বানেরা পরাজয় স্বীকার করিয়া রোমের অধীন হইল।

৭। জয়ী হোরেষিও এই বিষয়ে মহা যশস্বী হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু অনতিবিলম্বে আপনার ভগিনীকে হত্যা করিয়া এই মহাযশকে কলঙ্কিত করিলেন।

৮। যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া যখন তিনি সহর্ষে গৃহে প্রত্যাগমন করিতেছিলেন, তখন দেখিলেন যে, একজন কিউরেটিওর মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া তাঁহার ভগিনী সাশ্রু নয়নে শোক ও বিলাপ করিতেছে এবং শুনিলেন যে, ঐ ব্যক্তি তাঁহার সহোদরার পাণি গ্রহণ করিতে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। ইহাতে ক্রোধান্ধ হইয়া করস্থিত তরবারি দ্বারা ঐ অবলার শিরশ্ছেদন করিলেন।

৯। রোমান বিচারকেরা তাঁহাকে ইহার সমুচিত দণ্ড দিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার পিতার অনুরোধে ও তাহার পূর্ব্ব কীর্ত্তি স্মরণ করিয়া তাঁহাকে ক্ষমা করিলেন।

১০। রোমানেরা জয়ী হইলে টলস্ আলবান নগর সমভূমি করিতে আজ্ঞা দিলেন এবং আলবানদিগকে তাহাদের রাজা মার্কস সফার্মাসের সহিত রোমে বাস করিতে অনুমতি প্রদান করিলেন। আলবানরাজ কিছুদিন পরে রোমাধিপতি হইবার চেষ্টা করাতে টলস্ ইষ্টিলিয়স্ অশ্বের লাঙ্গুলে বদ্ধ করিয়া অশ্বক্ষুরাঘাতে তাঁহাকে হত্যা করেন।

১১। টলস ৩২ বৎসর রাজত্ব করিয়া সপরিবারে বজ্রাঘাতে হত হন এবং তাহাতে তাঁহার রাজপ্রাসাদও ভস্মসাৎ হয়। অকস মার্সাস তাঁহার উত্তরাধিকারী হইলেন।

(ক্রমশঃ)




একান্নবর্ত্তী পরিবারের বিষয়।

আমি অন্য একান্নবর্ত্তী পরিবার সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি এবং আশা করি আমার এ ইচ্ছা পূর্ণ করিতে গিয়া যে ত্রুটি হইবে, পাঠিকাগণ তাহা ক্ষমা করিবেন। নিকটসম্পর্কীয় আত্মীয় স্বজনদিগের সহিত এক পরিবারভুক্ত হইয়া যাহারা জীবন যাপন করে, তাহাদিগকেই আমরা একান্নবর্ত্তী পরিবার বলিয়া জানি।

পরিবার সম্বন্ধে পৃথিবীর নানাজাতীয় জীবের মধ্য হইতে আমরা কি জ্ঞান লাভ করিয়া থাকি, তাহা আলোচনার বিষয়। প্রাণিজগৎ ছাড়িয়া দিয়া উদ্ভিদজগতে দেখিতে গেলে আমরা দেখিতে পাই যে, কোন বিশেষজাতীয় উদ্ভিদ প্রথমতঃ অনেক বীজ উৎপাদন করে, সেই বীজ পরিপুষ্ট হইলে উহা চারি দিকে ছড়াইয়া পড়ে, এবং পরে তাহা বৃক্ষে পরিণত হইতে থাকে। ইহাদের মধ্যে অনেকগুলি বীজ বিশেষ অনুকূল অবস্থা প্রাপ্ত হওয়াতে ভালরূপে পুষ্টিলাভ করে এবং আমরা দেখিতে পাই যে, ইহারাই বিশেষ সতেজ হয়, এবং যথাসময়েই অঙ্কুরিত হইয়া বর্দ্ধিত হইতে থাকে। একবার ভালরূপে জমিয়া বসিলেই অনায়াসে নিজের শিকড়ের দ্বারা ভূমি হইতে অনুরূপ পুষ্টিকর রস শোষণ করিয়া শীঘ্রই সুপ্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া থাকে।

অপরদিকে প্রতিকূল অবস্থায় যে বীজগুলির উৎপত্তি হইয়াছে, তাহাদের ক্ষীণ ও দুর্ব্বল ভাইবোনগুলির প্রথমতঃ উৎপন্ন হইতে অনেক সময় লাগে। তাহার পর সেই অসহায় অবস্থায় প্রয়োজনীয় পুষ্টিকর রস প্রাপ্ত না হওয়াতে তাহারা অল্প কালের মধ্যে মারা যায়। ইহাদের মৃত্যুর মূলে আমরা তাহাদের সেই সবল ভাইবোনদিগকে দেখিতে পাই। কারণ যদি ভাইবোনদের প্রতিষ্ঠালাভ করিবার পূর্ব্বেই তাহারা পৃথিবীর যে অংশে সকলে একত্র হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল, সেই স্থানের অধিকাংশ পুষ্টিকর রস না শুষিয়া লইত, তাহা হইলে এরূপ ঘটিত না। এই সকল ভাল করিয়া দেখিলে আমরা তাহাদের মধ্যে একটা বাঁচিয়া থাকিবার জন্য সংগ্রাম দেখিতে পাই।

এই সংগ্রাম একজাতীয় ও একবংশীয় উদ্ভিদের মধ্যে বিশেষ প্রবল। কারণ তাহাদের আহার ও থাকিবার স্থান এবং তাহাদের প্রয়োজনীয় উপাদান সকলেরই এক। আবার সুপ্রতিষ্ঠিত উদ্ভিদ্‌গুলির মধ্যে দেখা যায় যে, জীবজন্তুদের দৌরাত্ম্যে, অথবা অন্যান্য কারণে তাহাদের অনেকগুলির মৃত্যু ঘটে। এই জন্য উহাদের মধ্যে কতকগুলি আত্মরক্ষার জন্য নানা উপায় উদ্ভাবন করিয়া থাকে। কতকগুলি নিজের সমস্ত শরীরে বা ডাল পাতা প্রভৃতি শরীরের বিশেষ বিশেষ ভাগে কাঁটা




ও নানা প্রকার বিষাক্ত ও বিস্বাদ দ্রব্যাদি উৎপন্ন করিয়া থাকে। ইহাতে জীবন সংগ্রামের কঠোরতা ও প্রকৃতির নির্ব্বাচন-শক্তির বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়।

সেইরূপ প্রাণিজগতেও আমরা এক-জাতীয় বা একপরিবারভুক্ত জীবদের মধ্যে এইরূপ প্রবল সংগ্রাম দেখিতে পাই। যাহারা ভাল অবস্থা লইয়া এই জীবন সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়, তাহারা শীঘ্রই আত্মরক্ষার উপায় করিয়া লইতে পারে ও নানারূপ পরিবর্ত্তনের অনুযায়ী করিয়া আপনাদিগকে চালাইতে পারে এবং তাহারাই বাঁচিয়া থাকে ও প্রতিষ্ঠালাভ করে। ইহাতে আমরা দেখিতে পাই যে, প্রাণিজগতে বা উদ্ভিদ্‌জগতে একান্নবর্ত্তী পরিবার গঠন হওয়া সম্ভব নহে। কিন্তু মনুষ্যের মধ্যে যে সকল ভাব আছে, তন্মধ্যে একটি প্রকৃতির নিয়মবিরুদ্ধ। এক দিকে দেখি প্রকৃতি কখন দোষ ক্ষমা না করিয়া অযোগ্য ও দুর্ব্বলদিগকে নির্ম্মূল করিয়া সবল এবং যোগ্যতমদিগকে প্রতিষ্ঠিত করে। অপর দিকে দেখি যে, মনুষ্য ক্ষমাশীল, দয়াবান্, ক্ষীণ ও দুর্ব্বলের সাহায্যকারী ও প্রতিপালক। এই জন্যই মানবসমাজে অনেক স্থানে আমরা একান্নবর্ত্তী পরিবার দেখিতে পাই। আমরা আরও দেখিতে পাই যে, মনুষ্যত্ব সাধনা করিতে গিয়া মানুষ এমন অবস্থায় উপনীত হয় যে, সে নিজের সমস্ত সুখ, স্বার্থ এবং বাঁচিবার সুযোগ ক্ষীণ দুর্ব্বল-দিগকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত হয়। এই উচ্চ ভাবটী আমরা জ্ঞানী, ধার্ম্মিক এবং সমাজের হিতকারী লোক ব্যতীত আর কাহারও মধ্যে সম্যক্‌রূপে দেখিতে পাই না। অত-এব এরূপ ভাবাপন্ন লোক যতই পৃথিবীতে বাঁচিয়া থাকিতে পারেন, ততই মনুষ্য-সমাজের কল্যাণ। অপর দিকে দেখিতে পাওয়া যায় যে, যে সকল অযোগ্য লোক-দিগের জন্য একটী মূল্যবান্ জীবন নষ্ট হইতেছে, তাহারা বাঁচিয়া থাকাতে সমাজের কোন বিশেষ লাভ নাই। বরং তাহারা মূল্যবান্ জীবনগুলি নষ্ট করিয়া সমাজকে হীন করিয়া ফেলে।

দুঃখ, কষ্ট এবং সংগ্রাম মনুষ্যকে বুদ্ধিমান্, সুবিবেচক ও সহিষ্ণু করে এবং তাহার নানাবিধ সদ্‌বৃত্তিগুলি ফুটাইয়া তোলে। আবার সুখ সচ্ছন্দতা ও আরাম মনুষ্যকে অলস, অসংযমী ও দুর্ব্বল করিয়া ফেলে।

এখন দেখিতে হইবে যে, মনুষ্যের হিতের জন্য কোন্‌টা বিশেষ আবশ্যক। সুজীবন গঠন সংগ্রামও কষ্ট সাপেক্ষ। এখনও যে সকল একান্নবর্ত্তী পরিবার দেখা যায় বা শুনা যায়, তাহাদের অধিকাংশই একজন উপার্জ্জনশীল ও অবশিষ্ট পরিবারবর্গ তাঁহার উপার্জ্জনের উপর নির্ভর করে। ইহাতে আমরা দেখিতে পাই যে, তাঁহাদের বংশজাতেরা অতি হীন অবস্থা লইয়া জীবন-সংগ্রাম আরম্ভ করে, এবং তাহার ফলে অনেক স্থলে অকৃতকার্য্য হইয়া তাহাদিগকে লোপ



পাইতে হয়। আমরা দেখিতে পাই যে, এই একান্নবর্ত্তী পরিবারের ভাব আমাদের দেশের হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে বিশেষ প্রচলিত এবং ইহা রাখিতে গিয়া তাঁহারা অনেক প্রকার ক্ষতি সহ্য করিয়াছেন ও বিজ্ঞান সাহিত্য প্রভৃতি নানাবিধ বিষয়ে উন্নতিলাভে বঞ্চিত হইয়াছেন। কিন্তু ইউরোপ ও আমেরিকা প্রভৃতি পাশ্চাত্য সভ্য জগতে ইহার বিপরীত ভাব প্রচলিত আছে। এই সব দেশে এই পথ অবলম্বন করিবার জন্য নানা বিষয়ে বিশেষ উন্নতি ও দেখিতে পাওয়া যায়। একান্নবর্ত্তী পরিবারে পারিবারিক স্নেহবন্ধন ও মধুর সম্বন্ধগুলি সুদৃঢ় হইয়া থাকে এবং মানুষকে অনেক পরিমাণে ত্যাগ শিক্ষা দেয়। এই ত্যাগই ভালবাসার একমাত্র পরীক্ষা। বিপরীত ভাবটিতে অর্থাৎ একান্নবর্ত্তিতার অভাবে নানারূপে পার্থিব উন্নতি হয় বটে, মনও সুদৃঢ় ও প্রশান্ত হয় বটে, কিন্তু ইহাতে পারিবারিক সম্বন্ধ সকল ক্রমশঃ শিথিল হইয়া যায় এবং মানুষকে ঘোর স্বার্থপর, আত্ম-সর্ব্বস্ব ও সংকীর্ণ করিয়া তোলে।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, একটী রাখিতে গেলে অপরটী থাকে না। যদি ভালবাসা ও পারিবারিক সম্বন্ধে মানুষ দৃঢ়তা চায়, তাহা হইলে তাহার উন্নতির পথে অনেক পরিমাণে বাধা পড়িয়া থাকে। আবার উন্নতির পশ্চাতে ছুটিতে হইলেও এইগুলি শিথিল হইয়া যায়। কিন্তু বর্ত্তমান যুগের নব আলোকের সাহায্যে এই দুই ভাবই একত্র পোষণ করা সম্ভব বোধ হয়।

যখন পারিবারিক লোক সকল একান্নবর্ত্তী থাকিয়াও, উন্নতির ও সংগ্রামের পথে নিজেকে পৃথক ও অসহায় মনে করিয়া এবং আত্মনির্ভরশীল হইয়া ছুটিতে পারেন, তখনই কেবল ইহা সম্ভব হইতে পারে। এরূপ ভাবে গঠিত একান্নবর্ত্তী পরিবারের প্রত্যেক লোক স্বভাবতঃই কর্ম্মপটু এবং তাহার পারিবারিক বন্ধন সুদৃঢ়। এই দুই ভাবেরই সমন্বয় বর্ত্তমান যুগের আদর্শ বলিয়া মনে হয়।

প্রার্থনা।

হৃদে বিরাজ, হে হৃদিরাজ!
জুড়িয়া হৃদয়খানি।
ব্যর্থ জীবন হউক ধন্য
সফল জনম মানি।

পূত পরশে হৃদয়তন্ত্রী
উঠুক মধুর বাজি,
প্রসাদে তব নব চেতনা
লভুক পরাণ আজি



হৃদে বিরাজ, হে হৃদিরাজ!
জুড়িয়া হৃদয়খানি,
বিমল হোক হৃদয় মম,
ঘুচুক অভাব গ্লানি।

জীবন-তরী তোমারি পানে
চালাও দিবস রাতি।
সকল অমা করুক নাশ
তোমার উজ্জ্বল ভাতি।

শ্রীহেমন্তবালা দত্ত।

মনুষ্যেতর প্রাণীর জ্ঞানবুদ্ধি।

চোরাগরু।—কতকগুলি গরুর স্বভাব বিচিত্র। এই শ্রেণীস্থ গোগণের মধ্যে স্ত্রী পুরুষ উভয়ই আছে। তাহারা গৃহস্থের গৃহে কি দিবা, কি রাত্রি, খৈল ও বিচালির জাবনা খায় না, অন্যান্য গরুর সহিত দলবদ্ধ হইয়া দিবাভাগে মাঠের কাঁচা ঘাস খায় না। প্রভাত হইতে বেলা পর্য্যন্ত গোশালায় বা গৃহপ্রাঙ্গণে, কিম্বা বাসভবনের নিকটস্থ তরুতলে শয়ন করিয়া অনবরত রোমন্থন করে। এই জাতীয় কোন কোন গরু দুষ্টতা দোষ নিবন্ধন গোশালায় বা গৃহীর দৃষ্টিগোচর স্থলে আবদ্ধ থাকে। ঐ গরু সন্ধ্যা হইবামাত্র বাহির হয় এবং লোকের উদ্যান, শষ্যক্ষেত্র প্রভৃতিতে প্রবেশ করিয়া তাহাদের প্রচুর ক্ষতি সাধনপূর্ব্বক উদর পূর্ণ করিয়া ভ্রমণ করে। ইহা ৩।৪ হাত উচ্চ প্রাচীর বা ৩।৪ হাত প্রশস্ত খানা অনায়াসে উল্লঙ্ঘন করিতে পারে, কোন প্রকার বেড়া করে না, যে কোন স্থান দিয়া ইচ্ছামত গমনাগমন করিয়া থাকে। এই জাতীয় গোগণ অসাধারণবলশালী ও তীক্ষ্ণশ্রবণশীল হইয়া থাকে। যখন ইহারা চুরি করিয়া লোকের শস্যাদি ভক্ষণ করে, তখন যদি কোন ব্যক্তি সেই উদ্যান বা শস্যক্ষেত্রে প্রবেশ করে, চোরা গোরু মানুষের প্রথম পদক্ষেপ শুনিয়াই সতর্ক হয় এবং নিঃশব্দ পদসঞ্চারে সেখান হইতে পলায়ন করে। অন্ধকারে তাহাদিগের চক্ষু জ্বলে। কৃষ্ণপক্ষীয় তামসী নিশিতে তাহারা মহানন্দে বিচরণ করিয়া থাকে। অন্ধকারে গায়ের রঙ্গ মিশাইবে বলিয়া চোরা গোরু সকল প্রায়ই কৃষ্ণবর্ণ হয়। পরমেশ্বর চোরা গোরুদিগকে জীবিকাসাধনোপযোগী বাহ্যোপাদান প্রদান করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, তাহাদের অন্তরেও ঐ উপাদানের কিয়দংশ রাখিয়া দিয়াছেন। কি শুক্ল, কি কৃষ্ণ, উভয় পক্ষীয় রজনীতে তাহারা আকাশ দর্শন করিয়া রজনীর পরিমাণ বুঝিতে সমর্থ হয়।

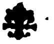
কোন গৃহস্থের কয়েকটা চোরা গরু ছিল। সেই গোরুগুলি সমস্ত দিবস বাঁধা থাকিত। সন্ধ্যার পর তাহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হইত, তাহারা সারারাত্রি চরিয়া ফিরিয়া নিশিশেষে বাড়ীতে আসিত।




একদিন গৃহস্থের গৃহে কোন' প্রকার গোলযোগ থাকায় সন্ধ্যার পর চোরা গোরুগুলিকে ছাড়া হয় নাই। অনেক রাত্রিতে গৃহস্থের স্মরণ হওয়ায় তখনই গোরু ছাড়িয়া দেওয়া হইল। গোরুগুলি বাটীর বাহির হইয়াই আকাশের প্রতি দৃষ্টিপাত করিল। প্রতিদিন যে দিকে চরিতে যায়, সে দিকে না গিয়া বাড়ী ফিরিল এবং স্ব স্ব স্থানে শয়ন করিয়া রোমন্থন করিতে লাগিল। ঐ গোরুগুলি বাড়ী ছাড়িয়া অনেক দূরে চরিতে যাইত। আকাশ দেখিয়া বুঝিল, রাত্রি অধিক নাই, সে সময়ের মধ্যে তত দূর গিয়া ফিরিয়া আসিতে প্রভাত হইবে এবং প্রতি রাত্রিতে যাহাদিগের ক্ষতি করে, তাহাদিগের নিকট ধরা পড়িবে। এই সকল প্রাকৃতিক বিষয় আলোচনা করিলে, আমরা জ্ঞানবুদ্ধিশীল মানুষ বলিয়া যে অহঙ্কার পোষণ করি, তাহার তেজ একটু মন্দ হইতে পারে।

পোষা মর্কট।—বৃন্দাবনে যে অসংখ্য মর্কটজাতীয় বানর বাস করে, তাহারা যাত্রিগণের নিকট হইতে আহার্য্য দ্রব্য লইবার জন্য কত প্রকার দুষ্টতা, চতুরতা ও বুদ্ধিকৌশল প্রকাশ করে, তাহা অনেকেই অবগত আছেন। সম্প্রতি বানরের বুদ্ধিচাতুর্য্য বিষয়ে আমরা একটি আশ্চর্য্য গল্প শুনিয়াছি। বামাবোধিনীর পাঠক ও পাঠিকাদিগকেও সে গল্পটি শুনাইয়া দিই। কোন সাহেবের পাচক-ভৃত্যের একটা পোষা বানর ছিল। পাচক সেই বানরটীকে মাংসভোজনে অভ্যস্ত করিয়াছিল। এক দিন পাচক সাহেবের জন্য মুরগী পাকে চড়াইয়া বানরকে নিকটে রাখিয়া কার্য্যান্তরে যায়। বোধ হয় বানরের অতিশয় ক্ষুধা হইয়াছিল, ক্ষুধার বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া সে অবিশ্বাসী হইল এবং উনান হইতে মাংস নামাইয়া ভোজন করিল। অনন্তর প্রভুর নিকট হইতে প্রহারপ্রাপ্তির শঙ্কা বলবতী হওয়ায় বাহিরে গিয়া পশ্চাৎ ভাগ উর্দ্ধে রাখিয়া মৃতের ন্যায় নিঃস্পন্দ-ভাবে পড়িয়া রহিল। মর্কটজাতীয় বানরের পশ্চাৎ ভাগ এত রাঙ্গা যে, তাহাকে চর্ম্মহীন মাংসপিণ্ড বলিয়াই ভ্রম হয়। একটা চীল সেই মাংসলোলুপ হইয়া মৃতবৎ বানরের উপর আসিয়া উপবেশন করিল। বানর তৎক্ষণাৎ তাহাকে ধরিয়া বধ করিল এবং তাহার পালকগুলি ছিঁড়িয়া তাহা ঝোলে চড়াইয়া দিল এবং আপনি পূর্ব্ববৎ তাহার প্রহরী হইয়া অবস্থান করিতে লাগিল। পাচক প্রত্যাগত হইয়া পাকপাত্রে মুরগীর পরিবর্ত্তে চীল দেখিয়া বিস্মিত হইল। অন্য এক ব্যক্তি বানরের এই কীর্ত্তিকলাপ পরিদর্শন করিয়াছিল। সেই ব্যক্তিই পূর্ব্বাপর ঘটনা বর্ণন করিয়া পাচকের বিস্ময় দূর করিয়া দিল। আমরা জ্ঞান-বুদ্ধি ও বিদ্যাদর্শনাদি গুণগ্রামশালী মানব-জাতি বলিয়া মনে মনে কত অহঙ্কার করি এবং উহাদিগকে নিকৃষ্ট বানর জাতি বলিয়া কত ঘৃণা করি!




বানরের ঠাকুর পূজা।—আমরা অনেক দিন পূর্ব্বে কোন সত্যনিষ্ঠ, ধার্ম্মিক ও প্রাচীন ভক্তের মুখে একটী গল্প শুনিয়াছিলাম। পূর্ব্বলিখিত বিবরণের বিবৃতি প্রসঙ্গে সে গল্পটিও মনে পড়িল। বরিসাল জিলার দক্ষিণ ভাগে বহুদূরবিস্তৃত একটি নিবিড় অরণ্য আছে। ঐ অরণ্য সিন্ধুতীরবর্ত্তী, এজন্য উহার মধ্যে অনেক শাখা নদী দৃষ্ট হইয়া থাকে। নিজ বরিসাল নগরবাসী লোকেরা বহুদিন হইতে ঐ অরণ্য হইতে উত্থিত "জয়রাম" শব্দ অতি প্রত্যূষে পরিস্ফুট রূপে একবার মাত্র শুনিতে পাইত। কিন্তু কি কারণে কাহার কণ্ঠ হইতে অতি গম্ভীর স্বরে ঐ "জয়রাম" শব্দ নির্গত হইত, অনেক দিন ধরিয়া তাহা তাহারা অনুভব করিতে পারে নাই। বরিসাল জিলার মুসলমানজাতীয় অনেক শিকারী আছে। তাহারা অতি দীর্ঘ চোঙ্গবিশিষ্ট বন্দুক সহ ঐ অরণ্যে শিকার করিতে যায়। কোন সময়ে আমাদিগের একদল শিকারী ঐ অরণ্যস্থ কোন নদীতীরে উপস্থিত হইয়া দেখিল যে, একদল হনুমান্‌জাতীয় বানর বিবিধ ফুল, ফলমূলাদি রাশি রাশি খাদ্য সামগ্রী ঐ নদীর জলে নিক্ষেপ করিল। অনেকগুলি কলার বাইলও ঐ জলে ফেলিল, ফলমূলপত্রাদি জলে নিক্ষেপ করা হইলে শতাধিক বানর শ্রেণীবদ্ধ হইয়া নদীতীরে উপবেশন করিল। অনন্তর কয়েকটি দলপতি প্রাচীন বানর জলে নিক্ষিপ্ত পত্রগুলি ধৌত করিয়া সৈকতপুলিনে পাতিত করিল। পরে ফলমূলাদি দ্রব্যগুলি ধৌত করিয়া সেই পত্রোপরি স্তূপাকারে সজ্জিত করিল। ইহার পর সকলে একস্বরে গগনভেদী চীৎকার শব্দ করিয়া উঠিল। কিয়ৎকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া প্রাচীন বানরগণ ভোজন আরম্ভ করিল। অনন্তর সকলে মিলিত হইয়া অল্পক্ষণের মধ্যে সমস্ত ভোজন করিয়া ফেলিল। শিকারিগণ একটু অনুসন্ধানে অবগত হইল, ঐ বানরেরা প্রতিদিন প্রাতে এইরূপে প্রথম ভোজন সম্পন্ন করে। পরে যে যেখানে যাহা পায়, ইচ্ছামতে ভোজন করিয়া বেড়ায়। যখন শিকারিগণ নগরমধ্যে এই কথা প্রচার করিল, নগরবাসী হিন্দুগণ তদবধি সিদ্ধান্ত করিলেন যে, বানরেরা রামভক্ত, প্রাতে রামচন্দ্রের ভোগ দেয় এবং তাহাদিগের তৎকালীন আনন্দচীৎকারই দূরে "জয়রাম" শব্দে ধ্বনিত হইয়া থাকে। এই বিবরণ যদি গাঁজাখোরের প্রলাপ না হয়, তাহা হইলে ব্যাপারটা ভাবিবার বিষয় বটে।






বর্ত্তমান সমাজের উপযোগী স্ত্রীশিক্ষার বিষয়সমূহ

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

এই সকল শিক্ষার কোনটীই মহিলাগণের পক্ষে অনুপযোগী নহে এবং এই সকল শিক্ষা লাভ করিবার যোগ্যতাও অনেক স্ত্রীলোকের আছে। তবে সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় এইরূপ উচ্চ শিক্ষা প্রদান করা এবং সেই শিক্ষাকে কার্য্যকরী করিয়া তাহাতে সার্থকতা লাভ করা একরূপ অসম্ভব।

বর্ত্তমান সমাজের উপযোগী স্ত্রীশিক্ষার বিষয়সমূহ নির্ব্বাচন করা এক দুরূহ সমস্যা, বিশেষতঃ তাহা বালিকাদিগের জন্য হইলে। সাধারণতঃ আমাদের দেশের বালিকারা সপ্তম অষ্টম হইতে দ্বাদশ বা ত্রয়োদশ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত বিদ্যালয়ে গিয়া শিক্ষালাভ করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হয়। পাঁচ বা ছয় বৎসর কাল বিদ্যালয়ের নিম্নতম শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিয়া যে শিক্ষা লাভ হয়, তাহাতে শিক্ষার উদ্দেশ্য আদৌ সিদ্ধ হয় না। এই সকল বালিকা বাঙ্গালা ভাষাও ভালরূপ শিখিতে পারে না। এইরূপ প্রাথমিক শিক্ষার ফলে বালিকারা কোনরূপ জ্ঞানের আস্বাদ প্রাপ্ত হয় না, সুতরাং তাহাদের হৃদয়ে জ্ঞানের স্পৃহা, এবং অধ্যয়নের বাসনাও অঙ্কুরিত হইতে পায় না। যাহারা পাঁচ বা ছয় বৎসর কালের মধ্যে শিক্ষা শেষ করিয়া সংসারে প্রবিষ্ট হইবে, তাহাদের প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও জ্ঞান যাহাতে তাহাদের জীবন যাপনের অনুকূল ও সহায় হয়, এমন ভাবে আরব্ধ হওয়া উচিত। যাহাদিগকে অল্প দিন পরেই অন্তঃপুরের অন্ধকারে সম্পূর্ণ বিপরীত সামাজিক রীতি নীতি ও ধর্ম্মানুশাসনের মধ্যে জীবন যাপন করিতে হইবে, তাহাদের পক্ষে উচ্চ আদর্শ লক্ষ্য করিয়া উচ্চ শিক্ষার জন্য যাহারা প্রস্তুত হইতেছে, তাহাদের প্রণালীতে প্রদত্ত শিক্ষা কিরূপে সর্ব্বাংশে উপযুক্ত হইতে পারে? (ক্রমশঃ)

শ্রীমতী উষাপ্রভা দেবী।

শিশুজীবন ও কিণ্ডারগার্টেন।

সচরাচর শিশুদিগের ক্রন্দনের কারণ—কোন দ্রব্য হারাণ, নৈরাশ্য, রাগ, পীড়া ও ভয়। অন্য কোন বিষয়ে শিশুকে মন দেওয়াইলেই কোন দ্রব্য হারাণ ও নৈরাশ্যের দুঃখ সে শীঘ্রই ভুলিয়া যাইবে। সকলেই জানেন, ছেলেদের "এক চক্ষে কান্না, এক চক্ষে হাসি," সেই কারণে তাহাকে যদি কোন খেলাতে নিবিষ্ট কর বা একটি গল্প বল, তাহা হইলে কাঁদুনে ছেলে শীঘ্রই প্রফুল্ল ও সন্তুষ্ট




হইবে। সর্ব্বদা মিছ্‌রি বা সন্দেশ দিয়া ছেলেদের কান্না থামান উচিত নহে, এরূপ করিলে যতক্ষণ তাহাদিগের হাতে মিছ্‌রি বা সন্দেশ থাকিবে, ততক্ষণ চুপ করিয়া থাকিবে, কিন্তু তাহা ফুরাইলেই আবার কান্না আরম্ভ করিবে। এই নিমিত্ত শিশুকে অন্যমনস্ক করিয়া তাহার ক্রন্দন থামানই সর্ব্বাপেক্ষা ভাল উপায়। শিশু যদি রাগ বা খুঁৎখুঁতে স্বভাবের জন্য কাঁদে কিংবা শারীরিক অসুখ বশতঃ ঐ মন্দ স্বভাব জন্মে, তাহা হইলে তাহাকে ভালরূপে পরীক্ষা করিয়া উহার কারণ সম্পূর্ণ রূপে বুঝিতে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। বয়ঃপ্রাপ্ত লোকেরাই যখন কত সময় রাগান্বিত হয় বা অসুখে অস্থির হয়, তখন কোমল শিশুরা যে অল্পেতে চঞ্চল হইবে তাহার আশ্চর্য্য কি? সাজা দিবার পরিবর্ত্তে তাহাকে আমোদ দিয়া ভুলান ও কোন কাজে নিযুক্ত রাখা ভাল।

ভয়ে কাঁদা শিশুর স্বভাববিরুদ্ধ। অন্যের দ্বারা শিক্ষিত না হইলে ভয় কাহাকে বলে শিশুরা তাহা কখন জানে না। অন্যের ভয় দেখিয়া ভয় না শিখিলে কোন ভয়ঙ্কর জন্তু বা বীভৎস আকার দর্শনে তাহারা কখন ভীত হইবে না। সুবিধা পাইলেই সাপ, বেঙ, মাকড়সা, আর্সুলা হইতে গরু, ভেড়া ও বাঘ পর্য্যন্ত সকল প্রকার পশু ও প্রাণীর সঙ্গে শিশু নির্ভয়ে খেলা করে। কিন্তু যদি তাহার সম্মুখে ঐ সকল দেখিয়া ভয় করা যায়, তাহা হইলে সেও অবিলম্বে উহাতে ভয় পাইবে। মা কিম্বা দাসীর ভয় বা ঘৃণা সংক্রামক রোগের ন্যায় শিশুর মনের ভিতর নিঃশব্দে প্রবেশ করে।

অনেকে জিজ্ঞাসা করিবেন, আচ্ছা, ভয় দেখাইয়া কি শিশুকে শিক্ষা দেওয়া ভাল নয়? যদি মাতার মিষ্ট কথা বা ধমকে কোন ফল না হয়, তাহা হইলে "বুড়ো" বা "জুজু বুড়ী" প্রভৃতির ভয় শিশুকে একদিন দেখাইলে উহার আশঙ্কায় সে প্রত্যহ হয়ত কোলের ভিতর মাথা লুকাইবে, আর কথাও শুনিবে, কিন্তু ওরূপ ভাবে শিশুকে শাসন করা ধর্ম্মবিরুদ্ধ। ঐ সকল নির্দ্দোষ, নির্ভয় স্বভাবকে ঐরূপে প্রতারিত করিয়া ক্রমে একটী ভীত, সন্দিগ্ধচিত্ত কাপুরুষ মনুষ্য গঠন করা কি মহাপাপ নয়? ঐরূপ করিলে পিতামাতার প্রতি সন্তানের ভক্তি ও তাঁহাদিগকে সে যে ভয় করে তাহা ঐ ভয়ঙ্কর রূপধারী "বুড়ো বা জুজু বুড়ীর" উপর যাইবে।

উহাদ্বারা পিতামাতার ও শিশুর উভয়েরই মহাক্ষতি ভিন্ন কোন লাভ হয় না। এইরূপ করিলে শিশু একেলা থাকিতে ভয় পাইবে, আর একবার যখন তাহাকে ভয় দেখাইয়া বশীভূত করিবার চেষ্টা করা হইবে, তখন সে আর ভয় দেখান ছাড়া কিছুতে কথা শুনিবে না। সুতরাং প্রতিদিন ও প্রতি ঘণ্টায় তাহাকে নূতন নূতন নানা প্রকার ভয় দেখাইতে হইবে। ক্রমে শিশু পিতামাতাকে অতি অকর্ম্মণ্য ভাবিতে শিখিবে, আর ঐ কু অভ্যাস বশতঃ সে পিতামাতার প্রতি ভালবাসা হারাইয়া অন্যে




ক্রমে একটী ভীরু, ক্রূর ও সন্দিগ্ধমনা মনুষ্যে পরিণত হইবে। তখন সে উপদেশ বা ভাল বাক্য হাসিয়া উড়াইয়া দিবে। শিশুর হৃদয়ে আর পূর্ব্বের ন্যায় পিতা মাতার প্রতি উচ্চ ও পবিত্র ভাব থাকিবে না, আর ক্রমে ঐ নির্ম্মল শিশু সরলতা হারাইয়া মিথ্যা কথা বলিতেও ভয় পাইবে না। সে তাহার ক্ষুদ্র মনে ভাবিবে, "মা ও বাবা ত আর 'বুড়ো' নয়, তবে তাঁহাদিগকে ফাঁকি দিতে ভয় কি ?" এইরূপে এক দিনের দৃঢ়তা ও বিবেচনার অভাব হইতে স্নেহের রত্নের চরিত্রে কত বিষময় ফল ফলিবে, আর পিতামাতার সমস্ত জীবন দুঃখময় হইবে। প্রথম প্রথম শিশু দুই একটা মিথ্যা কথা বলিতে শিখিবে, কিন্তু ঐ অভ্যাস না শুধরাইলে সে পরজীবনে একজন ভয়ানক মিথ্যাবাদী হইয়া দাঁড়াইবে।

শিশুকে মিথ্যা আশ্বাস দিয়া ভুলাইলে, ঐ প্রতারণা দেখিয়া সে শঠ হইতে শিখিবে। শিশুর একবার ঐরূপ মন্দ স্বভাব জন্মিয়া গেলে তাহাকে হাজার বকিয়া বা মারিয়া আর সৎপথে আনা যাইবে না। নির্ম্মল শিশুর স্বভাব কাঁচের মত স্বচ্ছ, উহাতে একটু দাগ বসিলে সে দাগ তোলা সহজ নহে। শিশুর সম্মুখে কখন পরনিন্দা বা অন্যের দোষ বর্ণনা করা কিম্বা তাহার নিজের প্রশংসা করা উচিত নহে, উহাতে শিশু গুরুজনদিগের প্রতি শ্রদ্ধাহীন হয় ও অল্প বয়সে তাহার মন বিকৃত হইয়া যায়।

শিশুকে ভয় দেখাইয়া বশ বা শান্ত করার প্রথা সর্ব্বত্র এত অধিক প্রচলিত যে, উহার বিরুদ্ধে একখানা বড় বই লিখিলেও তাহা সংশোধনের উপযুক্ত উপদেশ দেওয়া যায় না। আমাদের দেশের যুবকেরা কি এত বলিষ্ঠ, সাহসী ও দৃঢ়চরিত্র যে আমরা শৈশবে তাহাদিগের ঈশ্বরদত্ত সরলতা ও সাহস চাপিয়া রাখিয়া দিনরাত তাহাদিগকে দুর্ব্বল করিবার প্রয়াস পাইব ? এ জগতে ভীরুতা ও অপৌরুষের কি এত অভাব যে প্রতি গৃহে আমরা সাধ করিয়া তাহার পুষ্টিসাধন করিব ? জননীগণ কি একবারও ভাবিয়া দেখেন না যে, ছেলেদিগকে 'বুড়ো'র ভয় দেখান হইতেই সকল দেশের যত চরিত্রহীন কাপুরুষদিগের সৃষ্টি হয় ? প্রথম প্রথম শিশুকে 'বুড়ো' বলিলে সে মনে করে উহা একটি কথা মাত্র, কিন্তু উহাকে একবার কোন ভয়ঙ্কর আকৃতি দেখাইয়া ভয় দেখাইলে তাহার কোমল মনে ঐ আশঙ্কা এত দৃঢ়রূপে বসিয়া যায় যে, সকল বিষয়েই সে যেন সেই 'বুড়োর' মূর্ত্তি দেখে। এই ঘটনা যে কত দূর সত্য, তাহা বোধ হয় সকল মাতাই নিজ চক্ষে দেখিয়া থাকিবেন। অথচ তাঁহারা এত দুর্ব্বল যে, শিশুকে নিজেদের প্রেম ও সদাচার দ্বারা শিষ্ট করিতে না পারিলেই ঐ 'বুড়োর' আশ্রয় গ্রহণ করেন ও চিরজীবনের মত নির্ম্মল শিশুকে হীন করিয়া তুলেন। একদিন একটী ছোট মেয়ের কাছে তাহার ঝি কম্বল গায়ে দিয়া আসিবামাত্র সে তাহাকে




চিনিতে পারিয়া তাহার নাম ধরিয়া ডাকিতে লাগিল, অথচ পূর্ব্ববর্ণিত ভয়ের দ্বারা তাহার মন এরূপ ভীত হইয়াছিল যে, "ঝি! ঝি!" বলিয়া ডাকিলেই সে কাঁপিয়া বিছানার ভিতর মাথা লুকাইত।

একটী তিন বৎসরের শিশুকে তাহার মাতা কখন মিথ্যা ভয় দেখাইতেন না, আর ঝিকেও উহা করিতে বারণ করিয়া দিয়াছিলেন, ভয় দেখানর পরিবর্ত্তে ছেলেদের ছবির বই কিনিয়া শিশুকে নানাবিধ জন্তুর নাম, আকার ও গল্প শিখাইতেন। একদিন সকালে সে যখন বিছানায় শুইয়াছিল, তাহাদের একজন দীর্ঘাকার দাসী তখন নারিকেল ছোব্‌ড়া দিয়ে ঘরের দোরের কাছে মেঝে ঘসিতেছিল। শিশু আশ্চর্য্য হইয়া ঐ নূতন প্রকার শব্দ শুনিতে লাগিল, পরে হঠাৎ তার ঝি দরজা খুলিলে বালক ঐ ঝিয়ের বেনে-খোপা বাঁধা প্রকাণ্ড মাথা দেখিয়া ঝিকে জিজ্ঞাসা করিল ওটা কি? ঝি ক্ষণেকের জন্য তার বাপমার নিষেধ ভুলিয়া গিয়া বলিল, "ওটা লম্বা অসুর, তুমি যদি দুষ্টামি কর তা হলে ও তোমাকে পাতকুয়ায় ফেলিয়া দিবে"। ছেলে তৎক্ষণাৎ ভয় পাইয়া লেপের নীচে মুখ লুকাইল। আর ঐ ঝি তখন হইতে নিজের চতুরতায় যারপরনাই সন্তুষ্ট হইয়া অবসর পাইবামাত্র শিশুকে প্রতিদিন ঐরূপ ভয় দেখাইতে আরম্ভ করিল। তার মা এ পর্য্যন্ত তাহার বিন্দুবিসর্গও জানিতেন না, কিন্তু তাঁহার নির্ভয় ছেলেকে এখন মাঝে মাঝে ভয় করিতে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। একদিন রাত্রিতে প্রদীপের ছায়া দেখিয়া শিশু ভয় পাইয়া মাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'ওটা কি মা?' জননী আলো ধরিয়া তখনি ছেলেকে বুঝাইয়া দিলেন যে, ওটা ছায়া মাত্র। তাহা দেখিয়া শিশুর সে ভয় দূর হইল, কিন্তু ঝি ছেলের সঙ্গে লুকা-চুরী খেলিতে লাগিল। আর একদিন মার সঙ্গে পুকুরের কাছে গিয়া কড়া চাঁচার শব্দ শুনিয়া শিশু ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে মাকে জিজ্ঞাসা করিল, "ও কি মা? ও কিসের ডাক মা?" মা তখনি ঘাটের ধারে লইয়া গিয়া শিশুকে শব্দের কারণ দেখাইলেন ও তাহার হাতে একখানা ঝামা দিয়া ঐরূপ শব্দ করিতে বলিলেন। শিশু তৎক্ষণাৎ ভয়ের পরিবর্ত্তে উহাতে প্রফুল্ল হইয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিল। কিন্তু মা ছেলের ঐরূপ ভয় দেখিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া ঝিকে তন্ন তন্ন করিয়া সব জিজ্ঞাসা করিয়া উহার কারণ জানিলেন। কিন্তু ঝিয়ের অবিবেচনায় ঐ অল্প কালের মধ্যে শিশুর এতদূর অপকার হইয়াছিল যে, শিশু আর স্থির ভাবে ঘুমাইতে পারিত না। সে সর্ব্বদা ভয়ানক স্বপ্ন দেখিয়া কাঁদিয়া উঠিত। পরে অনেক চেষ্টা ও যত্নে তাহার মনের সেই ভয় দূর হয় ও শিশু পুনরায় সুস্থ ও প্রফুল্ল হইয়া উঠে।



বঙ্গমহিলার ব্রতকথা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

৫৯১ সংখ্যার বামাবোধিনীতে আমরা লুণ্ঠনষষ্ঠীর বিষয় পাঠিকাগণকে বলিয়াছি। এক্ষণে চর্পটাষষ্ঠী বা মন্থানষষ্ঠীর বিষয় তাহাদিগকে জ্ঞাত করাইব। চর্পটা শব্দের অর্থ চাপড়া, যদি উহার সহিত ষষ্ঠী কথাটী সংযোগ করা যায়, তাহা হইলে চর্পটষষ্ঠী বা চর্পটা ষষ্ঠী এই কথাটী দাঁড়ায়। এই চর্পটাষষ্ঠী কোন্ সময় হয় তাহা জানা আবশ্যক। ভাদ্র মাসের শুক্লষষ্ঠীকে এই ষষ্ঠী বলে। ঐ দিন পুষ্করিণী কিংবা জলাশয়ের নিকট ষষ্ঠী-দেবীর আরাধনা করা হয়। ঐ আরাধনার সময় হিন্দু মহিলাবৃন্দ ষষ্ঠী দেবীকে ক্ষীরের চাপড়া ও পিটুলীর চাপড়া প্রদান করেন, এই নিমিত্ত উক্ত ভাদ্রমাসের শুক্লষষ্ঠীকে চর্পটষষ্ঠী বলে এবং ঐ সময় মন্থনদণ্ডই ষষ্ঠীদেবীর প্রতিমাস্বরূপ মৃত্তিকার উপর প্রোথিত হয় ও উহারই পূজা করা হয় বলিয়া উহার আর একটী নাম মন্থানষষ্ঠী। ঐ দিবস ষোড়শোপচারে ষষ্ঠীদেবীর পূজা করা হয় এবং কাঁটালপাতার উপর পিটুলীর গোলগোল চাপড়া ও ক্ষীরের লাড়ু প্রদান করা হয়। পুত্রবতী মহিলাগণ সন্তানসন্ততি সহ ঐ স্থানে আগমন করিয়া ভক্তি সহকারে ষষ্ঠীদেবীর পূজা দেন। এই পূজার সঙ্গে সঙ্গে দেবীর আবাহন এবং পূজান্তে রমণীগণ সকলে একত্র হইয়া ঐ মন্থনদণ্ডাদি উক্ত জলাশয়ে বিসর্জ্জন করেন। তৎপরে উক্ত মহিলাগণ যে ব্রতকথাটী শ্রবণ করেন, নিম্নে তাহা দেওয়া গেল। উহা লইয়াই বর্ত্তমান আলোচ্য বিষয়ের অবতারণা।

কোন ব্রাহ্মণ দেশবাসীর জলকষ্ট নিবারণার্থ একটী পুষ্করিণী খনন করিতে আরম্ভ করেন। পুষ্করিণী খনন করা যতদূর সঙ্গত তদধিক মাত্রায় খনন করা হইল, তথাপি জলের লেশমাত্রও দেখা গেল না। ব্রাহ্মণ সেকালের লোক ছিলেন, প্রাচীন রীতিনীতির উপর তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি ও শ্রদ্ধা ছিল, সুতরাং তিনি জলের নিমিত্ত যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিলেন। যজ্ঞে জলা-ধিষ্ঠাত্রী দেবী প্রীত হইয়া তাঁহাকে স্বপ্নে আদেশ করিলেন, "যদি তুমি তোমার জ্যেষ্ঠ পুত্রের জ্যেষ্ঠ পুত্রটীকে অদ্য নিশীথে আমার সরোবরতীরে আমার প্রীত্যর্থে বলি দিতে পার, তাহা হইলে এই পুষ্করিণীতে জল হইতে পারে, নতুবা নহে।

ব্রাহ্মণ আপন পৌত্র ও দেশের বিষয় চিন্তা করিলেন, কোন্টী বিধিসঙ্গত তাহা দেখিলেন, এ জীবন ত নষ্ট হইবেই, মৃত্যু আজ না হয় কাল শিরোদেশে আসিয়া আশ্রয় লইবে, তবে তাহার জন্য চিন্তা কি? আজ না হয় কাল মরিতেই ত হইবে, সুতরাং এ জীবনের এত মায়া মমতা কিসের? আবার সূক্ষ্ম বিচার করিতে গেলে দেখা যায় আত্মা অবিনশ্বর, উহার ধ্বংস নাই, সুতরাং কে কাহাকে বিনাশ




করিবে? যখন সবই সেই এক ব্রহ্ম হইতে উদ্ভূত এবং অন্তেও তাঁহাতেই লয় হইবে অথবা যখন সকলেই সেই ব্রহ্মস্বরূপ, তখন মায়াপাশ ছেদন করিয়া সেই সচ্চিদানন্দকে লাভ করিবার চেষ্টা করা কি উচিত নয়? আমরা কি জন্ম জন্মগ্রহণ করিয়াছি? আমাদের এ নরদেহ ধারণের উদ্দেশ্য কি? কেবল কি ভোগ বিলাস বাসনা চরিতার্থ করিবার জন্যই এ দেহ? না—সেই পরম পিতার উপদেশ সকল হৃষ্টমনে পালন করিয়া তাহাতেই লয় হইব এই বাসনার জন্য? যদি তাহাই হয়, তবে মায়া মমতা কাহার জন্য? কে পুত্র, কে স্বামী, কে ভ্রাতা, কে পৌত্র? সবইত তিনি বা তাঁহার স্বরূপ। অতএব যদি তাঁহাকে তুষ্টি করাই আমার একমাত্র অভিলষিত প্রার্থনা হয়, তবে সেই দেবতার তুষ্টার্থে আজ আমার জ্যেষ্ঠ পৌত্রকেই ঐ পুষ্করিণীর তীরে বলিদান করিয়া তাঁহার তুষ্টিসাধন করিব। এইরূপ দৃঢ় সংকল্প করিয়া ব্রাহ্মণ সেই রাত্রিতেই সেই পৌত্রকে গোপনে উক্ত স্থানে আনয়ন করিলেন এবং তাহাকে সমুদায় জ্ঞাত করাইয়া খড়্গাঘাতে তাহার নিধনার্থ প্রস্তুত হইলেন। ব্রাহ্মণপৌত্রও ব্রাহ্মণের উপযুক্ত, সেও সেই সময় পরম পিতার ধ্যানে মগ্ন হইল, দেখিতে দেখিতে বালকের নবদুর্ব্বাদলসদৃশ কায় দ্বিখণ্ডিত হইয়া ধরাতলে নৃত্য করিতে লাগিল। নিধনান্তে ব্রাহ্মণ সেই রক্তাক্ত দ্বিখণ্ডিত কলেবর দেখিয়া আত্মহারা হইলেন—মোহ প্রবলভাবে তাঁহাকে আক্রমণ করিল। হাজার হউক সংসারাচ্ছন্ন জীব যতই মায়াপাশ হইতে মুক্ত হইতে চেষ্টা করুক না কেন, উহার পূর্ণাধিকারের হ্রাস করা বড় সহজ ব্যাপার নহে। এক মনে রাম রাম অন্য মনে পুত্র কলত্রাদি চিন্তা যাহাদের ধ্যান ধারণা হইয়াছে, তাহাদের পক্ষে এটা যে কত কঠিন তাহা সকলেই জানেন। অতঃপর বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ পৌত্রশোকভারে নিপীড়িত হইয়া ধীরে ধীরে স্বগৃহে গমন করিয়া আপনার শয়নপ্রকোষ্ঠে আশ্রয় লইলেন, মানবজীবনের পরীক্ষা হইয়া গেল। ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিয়া পাগল হইলেও মোহ যে বাঁধনে তাহাকে বাঁধিয়াছে, তাহা ছিন্ন করে কে? যে করিতে পারে সেই প্রকৃত মনুষ্য, আর তাহারই কর্ম্ম প্রকৃত কর্ম্ম, নতুবা মুখে ধর্ম্ম ধর্ম্ম করা আর না করা সমান। এইরূপ মোহ একটী নহে, মানবজীবনে এমন ঘটনা শত শত সংঘটিত হইতেছে। যদি তুমি প্রকৃত মনুষ্য হইতে চাও, তবে এই মোহকে পরাজয় করিতে হইবে। এই সকল কার্য্য তোমারই, তোমাকে পরীক্ষাস্থলে দাঁড় করাইয়া ভগবান্ তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন 'জীব! তুমি এই মোহময় জগৎ চাও, না আমাকে চাও? যদি আমাকে চাও তবে তোমাকে এ সকল পরাস্ত করিতে হইবে, কেন না শত কার্য্যের বাধা ত পদে পদেই—তোমার উহাতে অভিরুচি আছে কি না? যদি থাকে, তবে তাহা তোমার পক্ষে তৃণতুল্য, নতুবা কণ্টক, যাহা হয় বল'।

এ ক্ষেত্রেও তাহাই হইল, ব্রাহ্মণ মোহে আচ্ছন্ন হইয়া রহিল। কিন্তু নিধন ক্রিয়া সমাধানের পর হইতে প্রবল বৃষ্টি আরম্ভ হইল। বৃষ্টির শেষ নাই, অবিরলধারে বৃষ্টি হইতে লাগিল। নিহত জ্যেষ্ঠ পৌত্রটীর কেহ সন্ধান করিতে পারিল না, যে বৃষ্টি—কে কাহার খোঁজ করে? তবে সকলে মনে মনে স্থির করিল যে, হয়ত: সে কোন লোকের গৃহে আশ্রয় লইয়া আছে, প্রভাতে নিশ্চয়ই গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে।

বৃদ্ধের গৃহিণীও পর দিবস চর্পটাষষ্ঠীর দধি ক্ষীরাদি প্রস্তুত করিয়া ব্রাহ্মণের নিকট আনিলেন। ব্রাহ্মণকে আহারের জন্য অনুরোধ করিলেন, কিন্তু ব্রাহ্মণ অসুখের ভাণ করিয়া সে আদেশ প্রতিপালনে অসম্মত হইলেন। কার্য্যগতিকেই সে প্রস্তাব ব্যর্থ হইল। ব্রাহ্মণীও যৎকিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া নিদ্রাদেবীর ক্রোড়ে আশ্রয় লইলেন।

প্রভাত হইল, পাখীর প্রভাত সঙ্গীত বৃদ্ধ ব্রাহ্মণীর কর্ণে প্রবেশ করিল। ব্রাহ্মণী ব্যস্ততা সহকারে শয্যা ত্যাগ করিলেন। তাহার পর বেলা হইল। বেলা হইলে ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণকে জাগ্রত করাইয়া পুষ্করিণীর জল দেখিতে যাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। তিনি বলিলেন যে, গত রাত্রিতে খুব বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে, সম্ভবতঃ আমাদের পুকুরে জল হইয়াছে। কিন্তু সে অনুরোধ সংরক্ষণে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ অসামর্থ্যভাব প্রকাশ করিল। অগত্যা ব্রাহ্মণী পরিজনবর্গ সহ পুষ্করিণীর জল দেখিবার জন্য গমন করিলেন। সকলে পুষ্করিণীর নিকট যাইয়া দেখিলেন, পুষ্করিণীর ধারে প্রবল বারিধারা যেন আনন্দোৎফুল্ল লোচনে হাস্য করিতেছে। সেই মনোমুগ্ধকর হাস্য তরঙ্গের উপর পতিত হইয়া যেন তমসাচ্ছন্ন রজনীতে সৌদামিনী দেবীর পূর্ণ পরাক্রম প্রকাশ করিতেছে। ব্রাহ্মণী ও তাঁহার সহচরসহচরীগণ সে দৃশ্য দর্শন করিয়া আনন্দে বিভোর হইয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

ক্রমে ষষ্ঠীপূজার সময় উপস্থিত হইল। ব্রাহ্মণী পাঁচ পুত্রবধূ সহ পূজার দ্রব্যাদি লইয়া হৃষ্ট মনে নাতিনাতিনীদের সঙ্গে লইয়া পূর্ব্বোক্ত পুষ্করিণীর তটাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। সঙ্গে সকল পৌত্র পৌত্রীই রহিল, কিন্তু তিনি জ্যেষ্ঠ পৌত্রকে খুঁজিয়া পাইলেন না, এজন্য সে আনন্দের কিছু বিঘ্ন রহিয়া গেল। নিহত পুত্রের জননীও স্বীয় পুত্রের অদর্শনে নিদারুণ ক্ষোভ ও উদ্বেগ সহকারে ষ নিমিত্ত সহচরীগণ সহ গমনে যোগদান করিলেন।

সে দিন ভাদ্রমাস, শুক্লা ষষ্ঠী। পুষ্করিণীর তীর মন্থানষষ্ঠীর মহাপূজার দ্রব্যাদিতে যেন কি এক অনির্ব্বচনীয় শোভা ধারণ করিয়াছে, আর বিধাতা যেন সেই সৌন্দর্য্যের মধ্যে উপস্থিত রমণীগণের প্রাণে ভক্তি ও অন্তরে বিমল আনন্দ প্রদান করিতেছেন; আর তাহারা

যাচিতেছে যেন—'ফিরিয়া আসুক পুনঃ এদিন আবার'। দেখিতে দেখিতে আমাদের পুরোহিত মহাশয় পূজার কার্য্য সমাধা করিলেন, সমস্ত মহিলারা ষষ্ঠীর কথা শ্রবণ ও পুষ্পাঞ্জলি প্রদান শেষ করিয়া মন্থনদণ্ড ও পুষ্পাদি লইয়া উক্ত পুষ্করিণীতে বিসর্জ্জন করিতে অগ্রসর হইলেন। ব্রাহ্মণীই সর্ব্বপ্রথম মন্থনদণ্ডটী জলের উপর ধরিলেন, আর পুত্রবধূ ও কন্যারা যে যাহা পাইল ছুঁইয়া রহিল। কেহ বা সেই দণ্ডটী, কেহবা তাহা ছুঁইতে না পাইয়া ব্রাহ্মণীর গাত্র স্পর্শ করিয়া রহিল, আর কেহ বা তাঁহার গাত্র স্পর্শ করিতে না পারিয়া অপর যে তাঁহাকে ছুঁইয়াছে তাহার অঞ্চল ধরিয়া জলে দাঁড়াইয়া রহিল। তাঁহারা এক এক বার সেই দণ্ডটীকে জলে ডুবাইতে লাগিলেন ও নিম্নলিখিত মন্ত্রটী বলিতে লাগিলেন :—

'চাপড়া যায় ভেসে,
ছেলে আসে হেঁসে।
চাপড়া যায় ভেসে,
ভাই বন্ধু আসে হেঁসে,
চাপড়া যায় ভেসে,
আপন অন্তরঙ্গ আসে হেঁসে ॥

এই মন্ত্রটী পাঠ শেষ হইলে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণীর জ্যেষ্ঠ পৌত্র তাহার মাতার অঞ্চলদেশ ধারণপূর্ব্বক জল হইতে উত্থিত হইল। সকলে তাহাকে জল হইতে উত্থিত হইতে দেখিয়া এই আশ্চর্য্যজনক সংবাদ জ্ঞাত হইবার জন্য তাহাকে পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন করিতে লাগিল। কিন্তু সে তাহার কিছুই উত্তর দিতে পারিল না। এখানে বলা আবশ্যক যে, উক্ত পুত্রের মাতার অঞ্চলদেশ পূজার সময় দৈবক্রমে সকলের অজ্ঞাতসারে জলে পতিত হইয়াছিল এবং বর্ত্তমান সময়ে সেই অঞ্চলদেশ এখনও পর্য্যন্ত জলে পতিত থাকাতে পুত্রটী উহা ধারণ করিয়া জল হইতে উত্থিত হইল। তখন আবার সকলে আনন্দসাগরে ভাসমান হইল। হর্ষের প্রবল বাতাস মধ্যে যে একটু ধূমাচ্ছন্ন বাতা ছিল, তাহাও দূরীভূত হইল। হর্ষের স্রোত উপস্থিত নরনারীবৃন্দের হৃদয়ে প্রবাহিত হইতে লাগিল!!

অতঃপর বৃদ্ধ ব্রাহ্মণী সদলবলে অমর-প্রার্থিত দিব্য বস্তু লাভ করিয়া গৃহে ফিরিলেন। গৃহে আসিয়া ব্রাহ্মণকে ডাকিয়া আহারের জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন। "ব্রাহ্মণ তখন গলদশ্রু লোচনে বলিলেন, যদি আমার জ্যেষ্ঠ পৌত্রকে পাই, তবেই এ জীবন রাখিব এবং আহারও করিব, নতুবা এ জীবন ত্যাগ করিব।" ব্রাহ্মণী, স্বামীর ঈদৃশ বিষম বাক্য শ্রবণ করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত ভাবে বলিলেন, 'কেন তাহার কি হইয়াছে?'

ব্রাহ্মণ তখন গতরাত্রির সমস্ত ব্যাপার আদ্যোপান্ত বর্ণন করিলেন। ব্রাহ্মণী প্রথমতঃ কম্পিত হইয়া উঠিলেন। কিন্তু পরিশেষে সে কম্প গোপন করিয়া এবং ষষ্ঠী দেবীর ঈদৃশ করুণার কার্য্য দেখিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইলেন ও গলদশ্রু লোচনে বলিলেন, 'না, না, ষাট্




সে আমার ষষ্ঠীর দাস, তাহার কি অমঙ্গল হইতে পারে, এই দেখনা সে বাটীতেই রহিয়াছে, এখন তুমি এস, আহারাদি কর।'

ব্রাহ্মণ কিন্তু কিছুতেই তাহা বিশ্বাস করিলেন না। অগত্যা ব্রাহ্মণী পৌত্রকে তাঁহার সম্মুখে আনয়ন করিলেন এবং ষষ্ঠী দেবীর করুণার কথা এবং কিসে সে জীবন পাইল ইত্যাদি সমুদায় বৃদ্ধকে জ্ঞাত করাইলেন। তখন ব্রাহ্মণ পৌত্রমুখ নিরীক্ষণ করিয়া তাহাকে সাদরে ক্রোড়ে ধারণ করিলেন, তাঁহার চক্ষুতে অশ্রু দেখা দিল, কিন্তু সে অশ্রু পূর্ব্বের অশ্রু নহে, মলিনত্বনাশক অশ্রু! সুধার অমিয়-ধারা আজ ব্রাহ্মণের কলুষিত কালিমাকে দূরীভূত করিয়া ষষ্ঠীর একাধিপত্য স্থাপন করিল! ধর্ম্মের জয় হইল।

কোন এক দৈবশক্তিপ্রভাবে এ সংবাদ গ্রামময় রাষ্ট্র হইয়া গেল। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আনন্দসাগরে ভাসমান হইয়া পুত্র ও পুত্রবধূদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া আহারে প্রবৃত্ত হইলেন। পুত্র পাইয়া জননীরও আনন্দের সীমা রহিল না। তখন ব্রাহ্মণী পুত্রবধূ, কন্যা ও অন্যান্য মহিলাদিগকে লইয়া ষষ্ঠীদেবীর জয় ঘোষণা করিয়া ফলাহারে প্রবৃত্ত হইলেন। তদবধি দেশে মন্থান ষষ্ঠী বা চর্পটা ষষ্ঠীর পূজা প্রচার হইয়া জনসমাজে হিন্দু রমণীর পুণ্য কর্ম্মের একটী অঙ্গ বলিয়া গণ্য হইল!

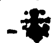
শ্রীরজনীকান্ত বিদ্যাবিনোদ।

ভূত না মানুষ?

দশম পরিচ্ছেদ।

এ কার প্রতারণা? চণ্ডদেবের, না চৈতন্যদেবের?

নন্দককে বিদায় দিয়া চণ্ডদেব বড় অশান্তি অনুভব করিতে লাগিলেন। তিনি ভাবিলেন "কেন নন্দককে যাইতে দিলাম। এ পৃথিবীর সমস্ত লোকই আমাকে অবিশ্বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছে। কিন্তু আমার বোধ হয় নন্দক আমাকে অবিশ্বাস করে না। হায়, আমি আজন্ম উপার্জ্জিত ধর্ম, মান, সমস্তই বিসর্জ্জন দিতে বসিয়াছি, উপরন্তু আমার প্রাণও যাইবে দেখিতেছি।" এমন সময় একটি ভদ্রলোক চণ্ডদেবকে অভিবাদন করিয়া আসিয়া দাঁড়াইল। চণ্ডদেব তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন না। ভদ্র লোকটি কহিলেন "মহাশয়, দেখিতেছি আপনি আমাকে চিনিতে পারিতেছেন না, আমি আপনারই গ্রামের লোক। আমার পিতাকে আপনি চেনেন, আমাকেও আপনি দেখিয়াছেন,





কিন্তু তখন আমি অত্যন্ত ছোট ছিলাম।"

চণ্ডদেব কহিলেন "আপনার পিতার নাম আমাকে বলুন।"

ভদ্রলোকটি কহিলেন "চৈতন্যদেব, যাঁহাকে দিয়া আপনি পুর্ব্বাপর দালান প্রস্তুত করিয়া থাকেন।"

চণ্ডদেব কহিলেন "ওঃ! তুমি তাঁহার ছেলে, বস বাপু, বস। তিনি কেমন আছেন? কণ্ট্রাক্টার বাবু বড় ভাল মানুষ। আমি তাঁহাকে খুব জানি। বাবা চৈতন্য বাবু ব্যতীত অন্য কাহাকেও দিয়া দালান প্রস্তুত করাইতেন না।

কতদিন তাঁহাকে দেখি নাই, তিনি যে সব দালান নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন তাহাও এত দিনে শোভাহীন ও ধ্বংস হইয়া গিয়াছে, যাইতেছে ও যাইবে। হায় মালদেব! তোর জন্যই পিতা দেশান্তরী হইয়াছিলেন। ভদ্রলোকটি চণ্ডদেবের নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবিষ্ট হইয়া কহিলেন "মহাশয়! আমাদের টাকাটা চুকাইয়া দিন, বাবার হাতের চিঠি আছে, এই দেখুন।"

চণ্ডদেব যেন দমিয়া গেলেন। তৎকালে এইরূপ ভাব তাঁহার মুখে প্রকাশ পাইয়াছিল। কিন্তু তিনি চৈতন্য বাবুর চিঠি পড়িলেন।

"মাননীয় চণ্ডদেব বাবাজী, আপনি আমার দ্বারা আপনার রাজপুতানার বাড়ীর দালান মেরামত করাইয়াছিলেন, সেই হিসাবে আপনার নিকট আমার হাজার টাকা পাওনা রহিয়াছে। সেই জন্য আমার পুত্র চিতানন্দকে আপনার নিকট পাঠাইলাম, উক্ত টাকা উহার নিকট দিয়া বাধিত করিবেন। আপনার কর্ম্মচারিগণ বলিয়াছিল আপনি শীঘ্রই দেশে ফিরিয়া আসিবেন, কিন্তু সে বিষয়ে আপনাকে উদাসীন দেখিয়া বড়ই দুঃখিত হইলাম। আপনার কনিষ্ঠ মালদেব জীবিত থাকিলে তিনি কখন দেশ ছাড়িয়া এরূপ ভাবে থাকিতে পারিতেন না।

আপনাদের শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীচৈতন্যদেব দে।"

চণ্ডদেব ধীর স্বরে "কহিলেন আমি কি চৈতন্য খুড়াকে দিয়া সে বাড়ী মেরামত করিয়াছিলাম?" চিতানন্দ কোন কথা কহিলেন না

চণ্ডদেব আবার কহিলেন "কবে মেরামত করিয়াছি?"

চিতানন্দ। এই মাস দুইয়ের কথা।

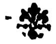
চণ্ডদেব। আমি যদি অস্বীকার করি?

চিতানন্দ। তাহা আপনি পারেন, কারণ আপনার যেরূপ সব দুর্নাম শুনিতে পাইতেছি তাহাতে ইহা অসম্ভব নহে। এই জন্যই বাবা এত তাড়াতাড়ী আমাকে বিদেশ হইতে আনাইয়া আপনার নিকট পাঠাইয়াছেন, তিনি স্বয়ং এখন অতি বৃদ্ধ হইয়াছেন।

চণ্ডদেব। আমি কি নিজে উপস্থিত থাকিয়া এই কাজ করাইয়াছিলাম?

চিতানন্দ। না, আপনার কর্ম্মচারিগণ এ কার্য্য করাইয়াছিল, কিন্তু তখন পর্য্যন্ত



পিতাঠাকুর বুঝিতে পারেন নাই যে, আপনার এতটা—বলিয়াই চিতানন্দ থামিয়া গেলেন। তাঁহার কথা যেন বাধিয়া গেল।

চণ্ডদেব। তাহার মুখের কথা ধরিয়া লইয়া কহিলেন "যে আপনার পিতাঠাকুর বুঝিতে পারেন নাই যে, চণ্ডদেবের এতটা অধঃপতন ঘটিয়াছে, এই তো কথা?"

চিতানন্দ। সে কথার কোন উত্তর না দিয়া কহিলেন "আপনি আমার পিতাঠাকুরকে দিয়া হাজার টাকার কাজ করাইয়াছিলেন, তৎপরে বিদেশ হইতে আর এক কণ্ট্রাক্টার আনিয়া বাড়ীর ভিতরে আর কি কি করাইয়াছেন, তাহা আমরা জানি না, তাহা আমাদের জানিয়াও কোন ফল নাই। আমাদের প্রাপ্য টাকা আমরা পাইলেই বাঁচি।"

চণ্ডদেব। যদি টাকা না দিই?

চিতানন্দ—না দিলে আর কি হইবে? শুনিতে পাইতেছি আপনি নন্দকের পিতাকে খুন করিয়াছিলেন ও নন্দকের মাতার সর্ব্বস্ব হরণ করিয়াছিলেন, তাহাতেই বা আপনার কি হইয়াছিল, (যদিও তখন নন্দক বালক ছিল এবং তখন দেশে সেরূপ সুশাসন ছিল না) আপনাকে আর কে কি করিতে পারে? শুনিতেছি আপনি পৈচাশিক মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছেন। যে চণ্ডদেবের অসাধ্য কর্ম্ম পৃথিবীতে নাই, আপনি সেই চণ্ডদেব। কাজ করার সময় আপনার কর্ম্মচারিগণ বলিয়াছিল যে, আপনার দক্ষিণ হস্তে একটি ক্ষত হওয়ায় আপনি পীড়িত হইয়া পড়িয়াছিলেন ও সেই জন্যই কর্ম্মস্থলে উপস্থিত হইতে পারিতেছিলেন না। উপস্থিত আপনার দক্ষিণ হস্তের উপর একটি ক্ষতের দাগ দেখিয়া আমি আপনার কর্ম্মচারীদিগকে সত্যবাদী বলিয়াই বিশ্বাস করিলাম।

চণ্ডদেব সে কথার কোন উত্তর না দিয়া মৌন হইয়া রহিলেন এবং ভাবিতে লাগিলেন "আজ যদি নন্দক থাকিত, তবে এই অপমানকারীকে সে কখনই ক্ষমা করিত না। আমি চণ্ডদেব, একটা বালক আমাকে এমন অপমান করিল?"

চিতানন্দ কহিলেন, আপনার দক্ষিণ হস্তের ক্ষতটি কি সম্পূর্ণ শুষ্ক হইয়াছে? চণ্ডদেব সে কথার উত্তর না দিয়া ভাবিলেন "হায়! কেন অনাবৃত দেহে বসিয়াছিলাম? হায়! কেন নন্দককে যাইতে দিয়াছিলাম?"

চিতানন্দ জোরের সহিত কহিলেন, মহাশয়, আমার প্রাপ্য টাকা আমাকে দিন, নচেৎ আমি আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিব।

চণ্ডদেব ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে টাকা আনিয়া চিতানন্দের প্রাপ্য মিটাইয়া দিলেন।

চিতানন্দ টাকা হস্তগত করিয়া চলিয়া গেলেন, কিন্তু যাওয়ার সময় চণ্ডদেবকে কোন অভিবাদন করিলেন না। তিনি যাওয়ার সময় বলিয়া গেলেন "শুনিয়াছি আপনার কনিষ্ঠ মালদেব দেখিতে ঠিক আপনার মত ছিলেন, কিন্তু চরিত্রে তিনি



আপনা হইতে অনেক উচ্চ ছিলেন। তাঁহার পিতা তাঁহাকে বিনা অপরাধে ত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলেন। আপনিও তাঁহার তত্বাবধান করিতেন না। তিনি স্বর্গে গিয়াছেন। যে ভাল হয়, মৃত্যু অগ্রে তাহাকে গ্রহণ করেন।"

চিতানন্দ এই কথা বলিয়া চলিয়া গেলেন।

চণ্ডদেব উচ্চকণ্ঠে গাইতে লাগিলেন—

আমার সমান পাপী কে আছেরে ভবে,
তোমরা বল আমার উপায় কি হবে ?
জানি আমি আছেন তিনি পাপীর বন্ধু
তথাপি আমার এ প্রাণ
কখনো প্রাবোধ না মানে।
ভাবি কিসে হব পার এ ভবসিন্ধু,
জানি তাঁর ক্ষমা-সিন্ধুর তুলনায়,
আমার পাপ হয় গোষ্পদের প্রায়,
কভু পাপীকেও তিনি করেন না ঘৃণা
তাঁর রাজ্যে গেলে, কত শান্তি মিলে
ঘুচে যায় ভবযন্ত্রণা ভবভাবনা,
হায় হায় সে দিন পাপীর কবে হবে ?

অম্বুজাসুন্দরী দাস গুপ্ত, ঢাকা।

নূতন সংবাদ

বরদারাজ্যের যাদুঘর হইতে ১০১ খানি চিত্র, বিলাতের ভিক্টোরিয়া ও এলবার্ট যাদুঘরে প্রদর্শনের নিমিত্ত প্রেরিত হইয়াছে। চিত্রগুলি ভারতীয় রাজপুত চিত্রকরের গৌরবের পরিচায়ক। সে গুলির সমস্ত অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে অঙ্কিত হইয়াছিল। তিন মাস কাল পর্য্যন্ত এই চিত্রগুলি সাধারণের দর্শনের জন্য বিলাতে রক্ষা করা হইবে।

২। রোমের নিকটবর্ত্তী কোনও গ্রামে এক ভিক্ষুকের মৃত্যুর পর তাহার গৃহ অনুসন্ধান করিয়া প্রায় ১২ লক্ষ টাকা পাওয়া গিয়াছে।

৩। সুপ্রসিদ্ধ নাটককার সেক্সপিয়রের জন্মস্থান দেখিবার নিমিত্ত গত বৎসর ৪০ হাজার লোক তথায় গিয়াছিল; গুণিগণের সম্মান ইহাঁরাই প্রদর্শন করিতে জানেন।

৪। আমরা গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, শোভাবাজারের জনহিতৈষী মহারাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর গত ১৫ই অগ্রহায়ণ আত্মীয় স্বজনদিগকে শোকসাগরে নিমগ্ন করিয়া ইহলোক হইতে চলিয়া গিয়াছেন। শান্তিদাতা পরমেশ্বর তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে সান্ত্বনা দান করুন।

৫। স্কটলণ্ডে ও ইংলণ্ডের উত্তর ও মধ্য ভাগে এত শীত পড়িয়াছে যে, থার্ম্মমিটার একেবারে শেষ চিহ্নে নামিয়া গিয়াছে। গত ২ ডিসেম্বর ওয়েলবেক নামক স্থানে সম্রাট্ ও সম্রাজ্ঞী অবস্থান করিতেছিলেন। তথায় এত বরফ



পড়ে যে, লাঙ্গল দিয়া পথ করিয়া তবে তাঁহাদিগকে ষ্টেশনে আনা হয়।

৬। সম্প্রতি এই সংবাদ আসিয়াছে যে, বুলগেরিয়া, সার্ব্বিয়া ও মণ্টিনিগ্রো তুরস্কের সহিত যুদ্ধ বন্ধের সর্ত্ত স্বাক্ষর করিয়াছেন। কিন্তু গ্রীস স্বাক্ষর করেন নাই। বুলগেরিয়া বলিয়াছেন, 'গ্রীকগণ একাকী যুদ্ধ করুক, আমরা যুদ্ধ হইতে ক্ষান্ত হইলাম।'

৭। সম্প্রতি শিবপুর কলেজঘাটে নৌকা ডুবি হইয়া অনেকগুলি লোক মারা গিয়াছেন। এই নৌকায় অনেক-গুলি ছাত্র, দুই তিন জন ইংরাজ মহিলা ও অন্যান্য লোক ছিলেন।

৮। সর্পদষ্ট ব্যক্তিকে কেঁচর রস দুই চারি ফোঁটা খাওয়াইলে সর্পবিষ কাটিয়া যায়। ইহা কেহ কেহ পরীক্ষা করিয়া সুফল লাভ করিয়াছেন।

৯। সম্প্রতি ভগবতীচরণ হালদার নামক বিক্রমপুরের নিকটবর্ত্তী কোন এক গ্রাম-বাসী ৫৫ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। তাঁহার স্ত্রী শ্রীমতী শরৎসুন্দরী দেবী স্বামীর মৃত্যুর দুই ঘণ্টা পূর্ব্বে স্বামীর পদযুগল ধরিয়া শয়ন করেন। এ দিকে ভগবতীচরণের লোকান্তরের পর তাঁহাকে গৃহ হইতে বাহির করিবার যখন সময় হইল, তখন সকলে দেখিলেন যে, শরৎসুন্দরী অজ্ঞান অবস্থায় পড়িয়া আছেন। তখন তাঁহাকে স্থানান্তরিত করিয়া ভগবতীচরণকে বাহির করা হয়। পরে শরৎসুন্দরীর জ্ঞান সঞ্চার করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করা হয়, কিন্তু কিছুতেই তাহার আর চৈতন্য হইল না। পরদিন প্রাতে তাঁহার আত্মা মানবদেহ পরিত্যাগ করিয়া স্বামীর অনু-গমন করে।

১০। মেডিকেল কলেজের ভূতপূর্ব্ব প্রধান অধ্যাপক ডিরেক্টর জেনারল ডাক্তার লিউকিস আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে তথাকার কয়েদিদিগের অবস্থা পরিদর্শন করিবার নিমিত্ত গমন করিতেছেন।

বামারচনা।

প্রেম-ভিক্ষা।

চাহি না নশ্বর প্রেম ;
　যে প্রেমের প্রতিদানে
জীবন সঁপিয়া নারী
　মর্ম্মাহত নিশিদিনে ॥

সে প্রেমে না আছে সুখ
　প্রাণভরা ভাল বেসে,
সদা ভয় হই পাছে
　প্রতারিত অবশেষে ॥

চাহি না সে প্রেম হরি,
যাহে দাবানল জ্বালি
পোড়ায় মানবে সদা
হৃদে হলাহল ঢালি ॥

৪

বিষম বিষাক্ত ব্যথা
ঢালিয়া হৃদয়পরে
হাসি উপেক্ষিয়া যায়
ফেলি একা ভব ঘোরে ॥

৫

সে প্রেমের প্রতিদানে
হৃদয় হয়েছে ছাই,
আসিয়া তোমার কাছে
তাই আজি ভিক্ষা চাই।

৬

যেই প্রেম লভিবারে
বসুধা অনন্তে ধায়,
ঘূর্ণমান গতি লয়ে
বর্ষে বর্ষে আসে যায়।

৭

যাঁর প্রেম লাভ তরে
মহাযোগী মহাধ্যানে
অনাহারে অনিদ্রায়
সাধে যোগ একমনে ॥

৮

যাঁর প্রেমে ফুটে ফুল
পর্ব্বত পাষাণ ভেদি
বিশ্বশ্রষ্টৃ পদতলে
সদাই পড়িছে লুটি ॥

যাঁর প্রেমে ধায় নদী
অনন্ত সাগর পানে,
যমুনা, জাহ্নবী আদি
গাহি কুল কুল তানে ॥

১০

যে প্রেমেতে শশধর
হাসে গগনের কোলে,
ছড়ায় কৌমুদীরাশি
রজত কিরণ ঢেলে ॥

১১

প্রতিদিন উষাকালে
তরুণ অরুণ রবি
কারে দেন উপহার
আপনার প্রেমছবি ॥

১২

প্রভাত না হতে পাখী
কার প্রেমগান গেয়ে
দেশ দেশান্তরে ফেরে
কাহার করুণা পেয়ে ॥

১৩

আমার হৃদয় চাহে
যে প্রেম সুস্নিগ্ধ অতি,
পেলে তার এক বিন্দু,
পেলে তার এক রতি,

১৪

নির্ম্মল হইবে হৃদি
ঘুচে যাবে ভেদজ্ঞান।
ঢাল সেই প্রেমামৃত
শীতল করহ প্রাণ ॥

শ্রীমতী ইন্দুমতী দেবী।

পিতৃপূজা।

হে জনক, হে দেবতা, হে স্নেহাংসল,
হে পবিত্র স্নেহময় প্রশান্ত নির্ম্মল।
কোথা আছ কত দূরে কোন্ স্বর্গলোকে,
শুধু জানি যেথা থাক আছ তুমি সুখে।
সবে কয় আছ তুমি দেব অমরায়,
ত্রিদিববাঞ্ছিত লোকে চিরশান্তিছায়।
জানি তব আর কভু পাবনা দর্শন,
সেই পূত-পদ-রজঃ মধুর স্পর্শন।
তৃষিত মোহান্ধ আঁখি তবু নিশি দিনে,
খুঁজিয়া বেড়ায় তোমা অতৃপ্ত ক্রন্দনে।
পূজিতে চরণ সেই আকুল হৃদয়
অশ্রুসিক্ত পুষ্পদলে আর কিছু নয়।
গোপনে এনেছি তাই এই পুষ্পভার,
ধূলিলিপ্ত অশ্রুস্নাত পূজার সম্ভার।
শীতল শীকরস্পর্শ শান্তবাপীতীরে,
আর্দ্র দেহে সিক্ত বস্ত্রে কম্পিত দু-করে,
হেমন্ত কুহেলি ঢাকা এই নিশাশেষে,
আজি রাখিলাম পিতঃ তোমারি উদ্দেশে।
লবে কিনা লবে ইহা যদিও না জানি,
(তবুও) অজ্ঞাত তৃপ্তির ভারে পূর্ণ হিয়াখানি।

বঙ্গবিধবা-রচয়িত্রী।

পতি ধর্ম্ম।

রমণীর পতি ধর্ম্ম জানি এই সার।
অন্য ধর্ম্ম রমণীর কিবা আছে আর।
পতির যুগল পদ,
রমণীর মোক্ষপদ,
সুখমোক্ষদাতা পতি সর্ব্ব শাস্ত্রে গায়।
পতিপদপূজা বিনা কোন ধর্ম্ম নাই।
ব্রত পূজা যাগ যজ্ঞ,
নারীর ত নয় মোক্ষ,
সাক্ষাৎ দেবতা হ'ন মোক্ষদাতা পতি,
অন্য ধর্ম্মাশ্রয়ে নারী নাহি পায় গতি।
প্রাণপূর্ণ ভালবাসা,
অনন্ত বিশ্বাস আশা,
একমনে ঢালে নারী পতির চরণে।
পতি ধর্ম্ম, পতি মোক্ষ রমণী জীবনে।
সহস্র উপেক্ষা সহে,
পতি যদি মন্দ কহে,
রমণীর হয় তাহা অমৃত আদর।
পতিপদপূজা নারী যাচে নিরন্তর।
হৃদয় ঢালিয়া দেয়,
সঁপে সে যে আপনায়,
পতিপদে করে নারী আত্মবলিদান।
পতিকে পূজিতে শিখে দেবতা সমান।
থাকে না যে কোন আশা,
নিষ্কাম সে ভাল বাসা,
কেবল পূজিতে চায় পতির চরণ।
পতিপদপূজা বিনা নাহি কামাধন।
তুচ্ছ সুখলালসায়,
পতিরে যে মন্দ কয়,
শিখেছে সে পতি ধর্ম্ম কে বলিতে পারে?
রমণী সে নহে বলি পিশাচিনী তারে।
তন্ত্র মন্ত্র বেদ বিধি,
নারীর কেবল পতি,

পতি বিনা রমণীর আছে কিবা ধন।
চিরারাধ্য হয় তার পতির চরণ।
যাগ যজ্ঞ নাহি জপ,
পতিই পরম তপ,
পতির চরণ হয় চির স্বর্গ তার।
পতি বিনা রমণীর কিবা আছে আর।

এ জীবনে শুধু নয়,
জন্মান্তরে (ও) বাঁধা রয়,
নারীর দেবতা হ'ন একমাত্র পতি।
জীবনে মরণে আর নাই অন্য গতি।

যোগেশবালা সেন।

সমালোচনা।

"আমার খাতা"। রচয়িত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী। ইহা পঞ্চ পরিচ্ছেদে বিভক্ত। গ্রন্থকর্ত্রী পুস্তকখানি তাঁহার স্বর্গগত পিতা ও মাতার চরণে অর্পণ ও উৎসর্গ করিয়াছেন। তাহাতে তাঁহার পিতৃমাতৃভক্তির সুন্দর পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে। এই গ্রন্থখানি অধিকাংশ গদ্যে, কিয়দংশ পদ্যে এবং পরিশেষে ১৩টী হৃদয়গ্রাহী সঙ্গীত সহিত ১৬৭ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত করা হইয়াছে। সরল ভাষায় রচিত এই পুস্তকখানি বেশ সুপাঠ্য হইয়াছে। নমুনা স্বরূপে নিম্নে তাহার কতক কতক অংশ নির্দ্দিষ্ট হইল।

প্রকৃতি।

(See Page 35—Please read the entire Poetry—only 6 lines.)

দয়া।

(See Page 92—(৯২ পৃষ্ঠা)—up to "কণ্ঠাগত প্রাণ" only; and *omit* the last 10 lines from "ধর্ম্ম to করিব".)

গীত।

(See Page 163—No. 10 সঙ্গীত)

আজকালকার অনেক অসার পুস্তক ও নবেল পড়া অপেক্ষা এইরূপ অভাস্ত ও বহুদর্শী গৃহিণীগণের প্রণীত পুস্তক পাঠে পাঠক ও পাঠিকাগণ যে অধিকতর প্রীতি লাভ করিতে সক্ষম হইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। "গৃহিণীপনা" নামে একটী সুন্দর প্রবন্ধ উহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, তাহাতে গৃহিণীদিগের জানিবার অনেক জিনিষ আছে। মনোহর ও উপকারী বোধ হওয়ায় তাহা হইতে কিছু কিছু উদ্ধৃত করিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু স্থানাভাবে সে ইচ্ছা পূর্ণ হইল না বলিয়া আমরা দুঃখিত হইলাম। পুস্তকখানি কলিকাতা ৫৫নং আপার চিৎপুর রোড, আদি ব্রাহ্মসমাজ প্রেসে শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট প্রাপ্তব্য। মূল্য ৸০ আনা মাত্র।

১৬।৪ নং মধুরায় লেন, ইণ্ডিয়ান্ প্রেসে শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত
ও
শ্রীসন্তোষকুমার দত্ত কর্ত্তৃক ৩৯ নং আণ্টনিবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

বামাবোধিনী কার্য্যালয়ের নম্বর পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। অতঃপর গ্রাহকগ্রাহিকাগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক ৩৯ নং এণ্টনী বাগান লেন, কলিকাতা, এই ঠিকানায় পত্রাদি প্রেরণ করিবেন। অন্যত্র পাঠাইলে গোলমাল হইতে পারে এবং আমরা তজ্জন্য দায়ী হইব না।

মূল্যপ্রাপ্তি।

অগ্রিম।

শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী, বালীগঞ্জ, কলিকাতা ১৸৹
শ্রীযুক্ত হরিপদ ঘোষ, মান্দা, এলাহাবাদ ২৷৶৹
কুমার মন্মথনাথ মিত্র, বাহাদুর, কলিকাতা ২৸৶৹
শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য, কলিকাতা ১৲
„ গোপেন্দ্রনাথ বসু, Hony. Secy., Shyamsunder Library, Baharu. ৩৲
„ ডাক্তার আনন্দ লাল বসু, Asst. Surgeon, মালদহ ১৸৶৹
Hon'ble Justice প্রামোদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কাটরা, এলাহাবাদ ২৸৶৹
শ্রীমতী জীবনমোহিনী ঘোষ, ভবানীপুর, কলিকাতা ২৸৶৹
শ্রীযুক্ত হরেন্দ্র নাথ সেন, প্লিডার, বর্দ্ধমান ১৲

সাবেক।

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সাহা, কুচ্‌বিহার ৬৲
শ্রীমতী সরসীবালা দত্ত খুলনা ৩৸৶৹
শ্রীযুক্ত হরিপদ ঘোষ, মান্দা, এলাহাবাদ ২৸৶৹
„ মুকুন্দ লাল কুণ্ড, কলিকাতা ৪৲
শ্রীমতী হেমাঙ্গিনী ঘোষ, বারুইপাড়া, খুলনা ২৸৶৹
শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ, চড়কডাঙ্গা রোড, সুঁড়া, কলিকাতা ১৲
ডাক্তার আনন্দলাল বসু, Asst Surgeon, মালদহ ।৶৹
শ্রীযুক্ত যদুনাথ মিত্র, প্লিডার, ছাপরা ২৲
শ্রীমতী কিরণশশী দাসী, কলিকাতা ৸৹
শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র কুমার কুণ্ড, Hony. Secy. Kundu's Family Library, হাওড়া ৩৲
„ নগেন্দ্রনাথ মিত্র, বি, এ হাজারিবাগ ২৸৶৹
„ সুরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, প্লিডার, মাগুরা, যশোহর ৬৲
„ হরেন্দ্রনাথ সেন, প্লিডার, বর্দ্ধমান ১৲

(ক্রমশঃ)

সূচীপত্র।

"বামাবোধিনী"র নিয়মাবলী

১। বামাবোধিনীর অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৷৵০, অগ্রিম ষাণ্মাসিক মূল্য ১।৵০, পশ্চাদ্দেয় বার্ষিক মূল্য ৩৲; প্রত্যেক সংখ্যার মূল্য চারি আনা। ডাকমাশুল স্বতন্ত্র লাগে না। মূল্য অগ্রিম না পাঠাইলে "বামাবোধিনী" পাঠান হইবে না। নমুনা দেখিতে চাহিলে ।০ আনা মূল্য বা ঐ মূল্যের টিকট পাঠাইতে হইবে।

২। বামাবোধিনী কার্য্যালয়ে কিম্বা সরকারদিগের নিকট "বামাবোধিনী"র মূল্য দিলে গ্রাহকগণ ছাপা রসিদ পাইবেন।

৩। কেহ যদি উপযুক্ত সময়ে "বামাবোধিনী" না পান, তবে ইংরাজী মাসের শেষ তারিখের মধ্যে আমাদিগকে জানাইবেন।

৪। কাহার কোন বিষয় জ্ঞাতব্য থাকিলে তিনি যেন অনুগ্রহপূর্ব্বক রিপ্লাই পোষ্টকার্ডে পত্র লিখেন। নতুবা উত্তর না পাইবার সম্ভাবনা।

৫। গ্রাহকগণের মধ্যে কেহ স্থানান্তরিত হইলে অনুগ্রহপূর্ব্বক জানাইবেন, নতুবা পত্রিকা না পাইলে আমরা তাহার জন্য দায়ী হইব না।

৬। আপাততঃ বামাবোধিনীর কোন বিশেষ এজেণ্ট নাই। অতএব পুনরায় নাম বিজ্ঞাপন না করিলে অথবা ক্ষমতাপত্র প্রদর্শন না করিলে এজেণ্টের নিকট কেহ মূল্যাদি দিবেন না, দিলে আমরা দায়ী হইব না।

৭। মফঃস্বল হইতে মণি অর্ডার, রেজেষ্টারি চিটি বা অন্য উপায়ে যাঁহারা বামাবোধিনীর মূল্যাদি পাঠাইবেন, তাঁহারা অন্য নামে না পাঠাইয়া কার্য্যাধ্যক্ষের নামে, ৩৯ নং আণ্টনি বাগান লেন, কলিকাতা, এই ঠিকানায় পাঠাইবেন।

৮। আমরা নিয়মমত বামাবোধিনীতে মূল্যপ্রাপ্তি স্বীকার করিয়া থাকি। যদি কাহারও নাম প্রকাশিত না হয়, অবিলম্বে আমাদিগকে জানাইবেন।

৯। বামাবোধিনীর জন্য প্রবন্ধ ও বামারচনা প্রভৃতি কার্য্যাধ্যক্ষের নামে উপরি-উক্ত ঠিকানায় পাঠাইবেন। পরিচিতা ভিন্ন অপর স্ত্রীলোকের লেখার বিশ্বাসযোগ্য সার্টিফিকেট চাই। কোন প্রবন্ধ মনোনীত না হইলে ফেরত দেওয়া হয় না।

বামাবোধিনী কার্য্যালয়,
৩৯ নং আণ্টনিবাগান লেন,
কলিকাতা।
১লা পৌষ, ১৩১৯।

নিবেদক
শ্রীসন্তোষকুমার দত্ত,
কার্য্যাধ্যক্ষ।

ঘরের কথা।

শ্রীভুবনমোহন ঘোষ প্রণীত। মূল্য বার আনা মাত্র। ইহা একখানি বাঙ্গালীর সুন্দর গৃহচিত্র। পড়িলে অনেক উপকার ও লাভ আছে। পুস্তকখানি কলিকাতা হাইকোর্টের মাননীয় জজ শ্রীযুক্ত সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র, শ্রীযুক্ত দিগম্বর চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় এবং অবসর-প্রাপ্ত সব জজ শ্রীযুক্ত হরিলাল মুখোপাধ্যায় মহাশয়দিগের দ্বারা এবং বেঙ্গলী, অমৃতবাজার প্রভৃতি সংবাদপত্রে বিশেষ প্রশংসিত। পুস্তকখানি বঙ্গমহিলাদিগের বিশেষ উপদেশপ্রদ ও পাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—কলিকাতা, ২০১নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পুস্তকালয় ও চিনাবাজার শ্রীগণেশচন্দ্র নাথের দোকান।

নূতন পুস্তক

বীরকুমার-বধ-কাব্য।

কাব্যকুসুমাঞ্জলি-রচয়িত্রী শ্রীমতী মানকুমারী প্রণীত। বঙ্গভাষায় অমিত্রাক্ষরে ইহা অভিনব, অতুলনীয় মহাকাব্য। অতি সুন্দররূপে ছাপা ও বাঁধা। মূল্য ১॥০ টাকা, ডাকমাশুল ৵০ আনা। কলিকাতা ২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

কেশবজ্যোতি বিতরণ।

যদি দুঃখের করুণগাথা দেখিতে চাহেন, তবে এই কবিতারূপী প্রাণের উচ্ছ্বাস পড়িয়া দেখুন। সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বলিয়াছেন—

"এ দুঃখের ভূমণ্ডলে, শোক পরিপূর্ণ ছলে,
মধুর সঙ্গীত আরো মধুর শুনায়"।

কাগজে বাঁধা মূল্য ॥০ আনা ও কাপড়ে বাঁধা সুন্দর মসৃণ পুরু কাগজে ছাপা, রূপার জলে নাম লেখা ও একটী মনোহর বালারুণসম চিত্র সম্বলিত, মূল্য ১৲ টাকা। যিনি মনোজবা একখণ্ড ৷৹ আনা, আর সতীলীলা ॥০ আনা ও রেণুকণা একখণ্ড ॥০ আনা, এই তিনখানি পুস্তক একত্রে লইবেন, তাঁহাকে বিনামূল্যে উপরিলিখিত কাগজে বাঁধা পুস্তক একখানি দেওয়া যাইবে, আর যিনি দুই সেট পুস্তক একত্রে লইবেন, তাঁহাকে কাপড়ে বাঁধা একখানি পুস্তক দেওয়া হইবে।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীমতী নিস্তারিণী দেবী,
কেশবধাম, শিবালা, বেনারস সিটী।

No. 594. Registered No. C. 134 February, 191..



স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত বি. এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫০ বর্ষ।	মাঘ, ১৩১৯। ফেব্রুয়ারী, ১৯১৩।	১০ম কল্প
১৮ সংখ্যা।		১ম ভাগ।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২।৵০, অগ্রিম ষাণ্মাসিক ১।/০, পশ্চাদ্দেয়...

সূচীপত্র।

বামাবোধিনী কার্য্যালয়ে বিক্রেয় পুস্তক।

নারীশিক্ষা ১ম ভাগ (৪র্থ সংস্করণ)	॥০
ঐ ২য় *	৸০
কারা কুসুমিকা (নীতিগর্ভ ঐতিহাসিক উপন্যাস)	।৴০
বেদিয়া বালিকা (২য় সংস্করণ) ঐ	৶০
কৃষকবালা (পদ্য)	॥০
বামাবোধিনী পত্রিকা (বাঁধান) ১৩০০ হইতে প্রত্যেক বর্ষের	২॥০
ধর্ম্মসাধন ১ম ভাগ	।০
ঐ ২য় ভাগ	।৶০
বনবাসিনী	⁄১০
স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যাশিক্ষার আবশ্যকতা	৴১০
Christ's Sermon on the Mount (বাঙ্গালা অনুবাদ সহ)	⁄০
Theistic Compilations	।০
বামারচনাবলী (কাপড়ে বাঁধা)	৸০
ঐ (কাগজে বাঁধা)	॥০
নিত্যকৃত্য ১ম ভাগ	৴১০
ঐ ২য় ভাগ	⁄০
সুকন্যা বিন্দুবালা	৶০
সরলা (কয়েকখানি অবশিষ্ট বিনামূল্যে)	

** ৫৲ বা তদধিক টাকার পুস্তক লইলে শতকরা ২৫৲ টাকা হিসাবে কমিসন দেওয়া যাইবে।

বিজ্ঞাপনের হার।

১। কভার, কভারের সম্মুখস্থ পেজ, বামাবোধিনীর মূল্যপ্রাপ্তি স্বীকারের পেজের ও নিয়মাবলীর সম্মুখস্থ পেজ, এবং পত্রিকার প্রথম ও শেষ পেজের (Reading Matter এর) সম্মুখস্থ পেজের প্রত্যেক পেজ মাসিক „ „ „ „ „ „ ৫৲

২। তদ্ভিন্ন প্রত্যেক পেজ „ „ „ „ „ „ „ ৩৲

অর্দ্ধ পেজ „ „ „ „ „ „ „ ২৲

পেজের চতুর্থাংশ „ „ „ „ „ „ „ ১॥০

বিজ্ঞাপন এক বৎসরের অধিক কালের জন্য স্থায়ী হইলে মূল্য নিরূপণ জন্য নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট আবেদন করিতে হইবে। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম ও নগদ দেয়।

কার্য্যাধ্যক্ষ,
৩৯ নং আণ্টনীবাগান লেন, কলিকাতা।

"বামাবোধিনী"র নিয়মাবলী।

১। বামাবোধিনীর অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৷৵০, অগ্রিম ষাণ্মাসিক মূল্য ১।৵০, পশ্চাদ্দেয় বার্ষিক মূল্য ৩৲; প্রত্যেক সংখ্যার মূল্য চারি আনা। ডাকমাশুল স্বতন্ত্র লাগে না। মূল্য অগ্রিম না পাঠাইলে "বামাবোধিনী" পাঠান হইবে না। নমুনা দেখিতে চাহিলে।০ আনা মূল্য বা ঐ মূল্যের টিকিট পাঠাইতে হইবে।

২। বামাবোধিনী কার্য্যালয়ে কিম্বা সরকারদিগের নিকট "বামাবোধিনী"র মূল্য দিলে গ্রাহকগণ ছাপা রসিদ পাইবেন।

৩। কেহ যদি উপযুক্ত সময়ে "বামাবোধিনী" না পান, তবে ইংরাজী মাসের শেষ তারিখের মধ্যে আমাদিগকে জানাইবেন।

৪। কাহার কোন বিষয় জ্ঞাতব্য থাকিলে তিনি যেন অনুগ্রহপূর্ব্বক রিপ্লাই পোষ্টকার্ডে পত্র লিখেন। নতুবা উত্তর না পাইবার সম্ভাবনা।

৫। গ্রাহকগণের মধ্যে কেহ স্থানান্তরিত হইলে অনুগ্রহপূর্ব্বক জানাইবেন, নতুবা পত্রিকা না পাইলে আমরা তাহার জন্য দায়ী হইব না।

৬। আপাততঃ বামাবোধিনীর কোন বিশেষ এজেণ্ট নাই। অতএব পুনরায় নাম বিজ্ঞাপন না করিলে অথবা ক্ষমতাপত্র প্রদর্শন না করিলে এজেণ্টের নিকট কেহ মূল্যাদি দিবেন না, দিলে আমরা দায়ী হইব না।

৭। মফঃস্বল হইতে মণি অর্ডার, রেজেষ্টারি চিটি বা অন্য উপায়ে যাঁহারা বামাবোধিনীর মূল্যাদি পাঠাইবেন, তাঁহারা অন্য নামে না পাঠাইয়া কার্য্যাধ্যক্ষের নামে, ৩৯ নং আণ্টনি বাগান লেন, কলিকাতা, এই ঠিকানায় পাঠাইবেন।

৮। আমরা নিয়মমত বামাবোধিনীতে মূল্য প্রাপ্তি স্বীকার করিয়া থাকি। যদি কাহারও নাম প্রকাশিত না হয়, অবিলম্বে আমাদিগকে জানাইবেন।

৯। বামাবোধিনীর জন্য প্রবন্ধ ও বামারচনা প্রভৃতি কার্য্যাধ্যক্ষের নামে উপরি-উক্ত ঠিকানায় পাঠাইবেন। পরিচিতা ভিন্ন অপর স্ত্রীলোকের লেখার বিশ্বাসযোগ্য সার্টিফিকেট চাই। কোন প্রবন্ধ মনোনীত না হইলে ফেরত দেওয়া হয় না।

বামাবোধিনী কার্য্যালয়,
৩৯ নং আণ্টনিবাগান লেন,
কলিকাতা।
১লা মাঘ, ১৩১৯।

নিবেদক
শ্রীসন্তোষকুমার দত্ত,
কার্য্যাধ্যক্ষ।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 594. February, 1913.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫০ বর্ষ। ৫৯৪ সংখ্যা।	মাঘ, ১৩১৯।	১০ম কল্প। ১ম ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

লর্ড হার্ডিঞ্জকে হত্যা করিবার প্রয়াস—"বিনামেঘে বজ্রাঘাত" বলিয়া যে কথা প্রচলিত আছে ইহা তাহাই। বড় লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ বাহাদুর মিছিল করিয়া যখন নূতন রাজধানী দিল্লী নগরীতে প্রবেশ করিতে ছিলেন সেই সময় এক বোমা আসিয়া তাঁহার হস্তীর উপর পতিত হওয়ায় ছত্রধারীর মৃত্যু হয় এবং তাঁহারও অত্যন্ত আঘাত লাগাতে তিনি অজ্ঞান হইয়া পড়েন। ভগবানের অশেষ করুণায় তাঁহার আঘাত সাংঘাতিক হয় নাই। তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে হাঁসপাতালে লইয়া যাইয়া অস্ত্র দ্বারা আহত স্থান সমূহ পরিষ্কার করিয়া দেওয়া হয়। এক্ষণে তিনি অনেকটা ভাল আছেন। লেডী হার্ডিঞ্জ তাঁহার শয্যা পার্শ্বে থাকিয়া তাঁহার তত্ত্বাবধান করিতেছেন। আমরা ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি তিনি বড় লাট বাহাদুরকে সুস্থ ও নিরাময় করুণ।

মেট্রিকুলেশন পাঠ্য পুস্তক—আমাদের সুপ্রসিদ্ধ লেখিকা শ্রীমতী মানকুমারী বসু প্রণীত 'শুভসাধনা' নামক পুস্তকখানি ১৯১৪ সালের মেট্রিকুলেশন পরীক্ষায় স্ত্রীলোকদের পাঠ্য রূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে কোন স্ত্রীলোকের রচিত গ্রন্থ মেট্রিকুলেশন পরীক্ষায় পাঠ্য হয় নাই।

মিঃ মণ্টেগুর ভারত আগমন—ভারতের সহকারী সচিব মিঃ মণ্টেগু ভারতে আগমন করিয়া নানা স্থান পরি-

ভ্রমণ ও দর্শন করিতেছেন। জাতীয় মহাসমিতির পক্ষ হইতে তাঁহাকে কংগ্রেসে যোগদান করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করা হইয়াছিল। কিন্তু তিনি সময়াভাববশতঃ যোগ দিতে না পারায় দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন।

ভারত মহিলার সাহায্য ভাণ্ডার— তুরক্কের বিপন্ন সৈন্যদিগের সাহায্যকল্পে লেডি হার্ডিঞ্জ একটী সাহায্য ভাণ্ডার খুলিয়াছেন। ইহাতে জাতি ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে ভারতের মহিলাগণ সাহায্য প্রদান করিতে পারিবেন। ভূপালের বেগম সাহেবা একাই তুরক্কের বিপন্ন সৈন্যগণের সাহায্যার্থ ৯ হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

ভারতবর্ষে ফরাসী অধিকৃত স্থান —ভারতবর্ষের যে সকল স্থান ফরাসী দিগের অধিকারে রহিয়াছে, ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট সেই সকল স্থানের পরিবর্ত্তে ফরাসীদিগের সুবিধামত অন্যান্যস্থান দিতে চাহিতেছেন। ফরাসীমন্ত্রীসভা এ সম্বন্ধে বিবেচনা করিতেছেন।

লেডী কারমাইকেলের প্রস্তাবিত ধাত্রী বিদ্যা শিক্ষা—বাঙ্গালার হিন্দু ও মুসলমান রমণীগণ যাহাতে ধাত্রী বিদ্যা শিক্ষা করিতে পারেন, লেডী কারমাইকেল কিছু দিন পূর্ব্বে এইরূপ একটী প্রস্তাব করিয়াছিলেন। সম্প্রতি শুনা যাইতেছে এ সম্বন্ধে কার্য্যারম্ভের সূচনা হইয়াছে।

মিউনিসিপ্যালিটির দান—কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটীর লোকান্তরিত এসেসার ও সার্ভেয়ার মিঃ সি, সি কুপারের পত্নী ও সন্তানবর্গকে মিউনিসিপ্যাল কর্ত্তৃপক্ষ ১২ হাজার টাকা প্রদান করিয়াছেন।

রাজধানী নির্ম্মাণ—সম্প্রতি লণ্ডনের "রয়েল সোসাইটী অব আর্টস" নামক সভার এক অধিবেশনে স্যার ব্রাডফোর্ড লেস্‌লি ভারতের রাজধানী নির্ম্মাণ সম্বন্ধে এক নূতন প্রস্তাব করিয়াছেন। বর্ত্তমানে যে স্থানে রাজধানী নির্ম্মাণের প্রস্তাব চলিতেছে, ঐ স্থান ততদূর স্বাস্থ্যকর নহে। এজন্য তিনি বলিয়াছেন, যে প্রাচীন দিল্লীর যে স্থানে বিচারালয় প্রভৃতি আছে, ঐ স্থানে রাজধানীর অট্টালিকা প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিয়া যমুনা নদীতে বাঁধ দিয়া নদী গর্ভ জলপূর্ণ করিয়া রাখিলে দিল্লী স্বাস্থ্যকর হইবে।

নির্ভয়।

নিখিল বিশ্বেরপতি শুনি তুমি ভগবান্!!
তোমারে ব্যাকুলভাবে চাহে মম মনপ্রাণ,
লোকমুখে কত শুনিয়াছি শুনিতেছি আর
কেহ বা সাকার বলে কেহ বলে]
নিরাকার।
সঠিক করিয়া কেহ বলিবারে নাহি পারে

তাই ভাবিতেছি তোমায় ডাকিব কি
নাম ধরে ?
নদীর স্রোতের মত কালস্রোত বহে যায়
আমি যে কিনারে বসি করিতেছি
হায় হায়।
এখনও মিটেনি দ্বন্দ আজও হলনা দেখা
শূন্য প্রাণে শূন্য মনে তাই কাঁদি একা
একা।
তোমারই মহিমা সব চৌদিকে ছড়ান
প্রভু !
আমি দৃষ্টিহীন অন্ধ দেখেও দেখিনে কভু,
দেখা দাও কাছে এসো প্রাণে এস
প্রাণারাম !
ঘোষুক জগৎ জুড়ে তোমার দয়াল নাম।
দেখিব আমিও তোমায় ওগো মোর
প্রাণসখা !
কোথায় লুকায়ে রবে কেমনে না দিবে
দেখা ?
তুমিইত পাঠায়েছ তোমাতেই হব লয়
তবে বল কেমনে মোরে তেজিবে দয়াময় !

শ্রীসরসীবালা দেবী।

রাজা ও রাণী।

বৈষ্ণবদিগের ভক্তমাল গ্রন্থে এক রমণীর আশ্চর্য্য ভক্তির কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে, উহা পাঠ করিলে অন্তরে ভক্তি-রস উচ্ছসিত হইয়া উঠে। যাঁহারা "বামাবোধিনী" পাঠ করেন, তাঁহারা অনেকেই হয় ত উক্ত কাহিনী পাঠ করেন নাই। সেই জন্য সেই ভক্তিমতী রাণীর আখ্যায়িকা এই পত্রিকাতে প্রকাশ করিলাম।

জয়পুরে মাধব সিংহ নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার রাণী পরমাসুন্দরী। তাঁহার উজ্জ্বল বর্ণ ও অনুপম মুখশ্রী নিরীক্ষণ করিলে তাঁহাকে মূর্ত্তিমতী দেবী বলিয়া মনে হইত। রাজা রাণীকে অতিশয় ভাল বাসিতেন। রাণী রত্নালঙ্কারে ও মূল্যবান বস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া নিরন্তর আমোদপমোদে দিন অতিবাহিত করিতেন। তাঁহার সুখের কিছুমাত্র অভাব ছিল না।

সর্ব্বদা রাজান্তঃপুরে সুখের মধ্যে বাস করায় রাণীর অন্তরে যে ধর্ম্মভাব পরিস্ফুট হইয়াছিল, তাহা মনে হয় না। তবে তিনি সতীসাধ্বী রমণী ছিলেন। তাঁহার সুকুমার হৃদয় মধুর প্রীতি ও করুণায় পূর্ণ ছিল।

রাণী একদিন গৃহে পালঙ্কে শয়ন করিয়া আছেন, একজন পরিচারিকা তাঁহার সুন্দর পা দুখানিতে হাত বুলাইতেছে। এই সময় পরিচারিকার দুই চক্ষু হইতে ঝর ঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল, তাহার শরীর রোমাঞ্চিত হইল, মুখশ্রীতে দিব্য জ্যোতিঃ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

পরিচারিকা প্রেমে ও পুলকে আকুল হইয়া মধুরকণ্ঠে হরিনাম উচ্চারণ করিতে লাগিল।

পরিচারিকা যৎকিঞ্চিৎ অর্থের জন্য রাণীর দাসীর কাজ করিতেছে বটে, কিন্তু সে সামান্যা নারী নহে। তাহার অন্তরে ভক্তির স্ফুরণ হইয়াছে। সে শ্রীহরির প্রেমে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার পাদপদ্মে জীবন যৌবন সমর্পণ করিয়াছে। শ্রীহরিই তাঁহার জীবনের স্বামী। শ্রীহরি ভিন্ন এই রমণী আর কিছুই জানে না। এতক্ষণ তাহার দু খানি হাত রাণীর চরণ সেবায় নিযুক্ত ছিল বটে, কিন্তু তাহার চিত্ত হরির চিন্তা করিতে করিতে হরিপ্রেমে মগ্ন হইয়া গিয়াছিল, তাই অন্তরের প্রেম বাহিরেও অশ্রু ও পুলকের ভিতর দিয়া প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। রাণী সহসা পরিচারিকার অভিনব ভাব নিরীক্ষণ করিয়া অবাক্ হইয়া গেলেন। তিনি পরিচারিকাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"পরিচারিকা ! তোমার কি হইয়াছে ?"

পরিচারিকা প্রেমে পূর্ণ হইয়া বলিতে লাগিল—"রাণী, আমার প্রাণের দেবতা শ্রীহরি অন্তরে প্রকাশিত হইয়াছেন, তাঁহার অনুপম মূর্ত্তি দর্শন করিয়া আমার হৃদয়ে প্রেম উচ্ছসিত হইয়া উঠিয়াছে। তাই আকুল চিত্তে শ্রীহরির মধুমাখা নাম ঘন ঘন উচ্চারণ করিতেছি।"

রাণী কহিলেন—"পরিচারিকা ! তুমি শ্রীহরির প্রেম লাভ করিয়া জীবনকে ধন্য করিয়াছ ? তবে আর আমার চরণ স্পর্শ করিও না। এস, আমাকে মধুরকণ্ঠে শ্রীহরির প্রেমের কথা শুনাও।"

পরিচারিকা রাণীকে ভক্তির জন্য ব্যাকুল দেখিয়া কহিতে লাগিল—"রাণী, শুধুই বিষয়তৃষ্ণায় আকুল হইয়া সংসারের অনিত্য সুখই ভোগ করিতে। হরির প্রেমামৃত রসের যে কি মধুর আস্বাদ, তাহা ত কখনও বুঝিতে পার নাই, একবার যদি তাঁহার অনুপম রূপমাধুরী দর্শন করিতে পার, একবার যদি তাঁহার প্রেমের অমৃতরসের আস্বাদ প্রাপ্ত হও, একবার যদি তাঁহার চরণে হৃদয় সমর্পণ করিতে পার, তাহা হইলে তোমার নারী-প্রকৃতি চরিতার্থ হইবে, তোমার জীবন ধন্য হইয়া যাইবে।"

কে বলিবে আজ এই পরিচারিকার কথা শুনিতে শুনিতে রাণীর অন্তরে কি অপূর্ব্ব ভাব বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল ! তাঁহার নিকট ধনৈশ্বর্য্য ও সংসারের সুখ নিতান্তই অসার বলিয়া মনে হইল। তিনি শ্রীহরির প্রেমের জন্য আকুল হইয়া উঠিলেন। পরিচারিকাকে কহিলেন—

"আজি হইতে গুরু করি তোমারে
মানিনু।
আজি হৈতে বিষয়ের সুখ তেয়াগিনু॥
কৃষ্ণ প্রেমধন লাগি জীবন সঁপিনু।"

রাণীর নিভৃত মর্ম্মস্থান যেন প্রেমের একটি উৎস ছিল। এতদিন বিষয়ের পাষাণ চাপা ছিল বলিয়া উৎস হইতে প্রেমধারা উৎসারিত হইতে পারে নাই। আজ পরিচারিকার মায়ামন্ত্রে এই বিষয়ের

পাথরখানি সরিয়া গেল। রাণীর হৃদয়ের প্রেম বাহিরে প্রকাশিত হইয়া পড়িল। তিনি হরিগুণ গান করিতে করিতে প্রেমে আকুল হইয়া উঠিলেন। ইহার পর রাণী প্রেমের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া, শ্রীহরির মনোমোহন মূর্ত্তি দর্শন করিলেন। তাঁহার হৃদয়ের প্রীতি উচ্ছসিত হইয়া উঠিল। তিনি শ্রীহরির পাদপদ্মে আত্ম-সমর্পণ করিলেন।

অতঃপর রাজা মাধব সিংহ রাজকার্য্যো-পলক্ষে কাবুলে গমন করিলেন। বিশ্বাসী দেওয়ান রাজার প্রতিনিধি হইয়া রাজ্যের সকল কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। এখন আর রাণীর হাতে কোনও কাজ নাই, তাঁহার সাধন ভজনে বাধা দিবারও কেহ নাই। রাণী নিরন্তর অসীম সুন্দর হরির সৌন্দর্য্যে ডুবিয়া প্রেমানন্দ সম্ভোগ করিতে লাগিলেন।

অবশেষে রাণী শ্রীহরির প্রেমে একেবারে আত্মহারা হইয়া গেলেন। আপনার স্বর্ণখচিত বসন ও রত্নাভরণ দূরে রাখিয়া সামান্য বেশ পরিধান করিলেন। তিনি জাতির বন্ধন ছিন্ন করিলেন। অন্তঃপুরের অবরোধের মধ্যেও আর বদ্ধ থাকিতে পারিলেন না। রাণী রাজমহিষী হইয়াও সকল শ্রেণীর ভক্ত বৈষ্ণবদিগের সঙ্গে মিলিত হইয়া হরিগুণগান ও হরিনামামৃত পান করিতে লাগিলেন। এই সমস্ত ব্যাপার দেখিয়া দেওয়ান অতিশয় বিরক্ত হইলেন। তিনি রাণীকে বলিয়া পাঠাইলেন—"আপনি রাজরাণী হইয়া একি করিতেছেন? কেন অন্তঃপুরের পর্দ্দা দূর করিয়াছেন? আপনি রাজরাজেশ্বরী, আপনার পক্ষে কি এ সকল শোভা পায়?"

দেওয়ানের কথার উত্তরে রাণী কহিলেন—"এখন আর আমি রাণী নহি, আমি শ্রীহরির দাসী। তাঁহার খাতায় দাসী বলিয়া নাম লিখাইয়াছি। হরির প্রেমে আমার জাতি মান সকলই চলিয়া গিয়াছে। একমাত্র হরিকে পাওয়া ভিন্ন আমার আর কোন অভিলাষ নাই।"

আমরা এ স্থানে "ভক্তমাল" গ্রন্থ হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি :—

"দেওয়ান রাণীর স্থানে কহে দাসী
পাঠাইয়া।
পরদা ঘুচালে কেন রাজরাণী হৈয়া॥
রাণী কহে রাণী আর না কহিও মোরে।
দাসী নাম লিখে দিনু নগরকিশোরে॥
জাতি পাতি তেয়াগিনু বৈষ্ণব সমাজে।
চতুর্ব্বর্গ তেয়াগিনু হরিপ্রেম মাঝে॥
জীবনের আশা তেয়াগিনু তাঁরে
পাইবারে।"

দেওয়ান সমস্ত কথা রাজার নিকট লিখিয়া পাঠাইলেন। রাজা পত্র পাঠ করিয়া ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিলেন। তাঁহার পুত্র প্রেমসিংহ সঙ্গে ছিল, তাহাকে কহিলেন—"তুমি ত্বরায় তোমার জননীর নিকট গমন কর। তাঁহার এমন দুর্ম্মতি কেন হইল? কেন তিনি অন্যায় কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন? তিনি যে পথে চলিয়াছেন, তুমি জয়পুরে গমন করিয়া




তাঁহাকে সে পথ হইতে ফিরাও। নচেৎ তিনি রাজরাণী হইলেও তাঁহাকে কঠিন শাস্তি ভোগ করিতে হইবে।"

প্রেমসিংহ জানিতেন, তাঁহার জননী এখন আর মর্ত্তের মানবী নহেন, তিনি ভগবানকে লাভ করিয়া এবং তাঁহার প্রেমে আত্মহারা হইয়া স্বর্গের দেবী হইয়াছেন। তাঁহার পক্ষে অন্তঃপুরে রুদ্ধ থাকার আর কোন প্রয়োজন নাই. তাঁহার ন্যায় প্রেমময়ী দেবীর জাতি পাতির বিচার করিবারই বা আবশ্যক কি? প্রেমসিংহ—

"পিতারে কহয়ে এত বুঝিলাম ভাল।
মাতা মোর তিনকুল উদ্ধার করিল॥
কৃষ্ণ বৈষ্ণবের সেবা ব্রত ধরিয়াছে।
ইহা বিনা জগতে কি অন্য আর আছে॥
প্রেমসিংহ কৃষ্ণভক্ত সাধুর মত কহে।
রাজা বিপর্য্যয় বুঝি ক্রোধানলে দহে॥"

প্রেমসিংহের কথা শুনিয়া রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন এবং পুত্রকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন। তাহার পর তিনি স্বয়ং রাণীকে হত্যা করিবার জন্য স্বরাজ্যে গমন করিলেন এবং—

"গৃহে যাইয়া মন্ত্রীসহ পরামর্শ কৈল।
হঠাৎ স্ত্রীহত্যা করা উচিত নহিল॥
বৃহৎ যে ব্যাঘ্র আছে পালা পেঞ্জরাতে।
তাহা লৈয়া ছাড়িদিল রাণীর গৃহেতে॥"

কিন্তু রাণী শ্রীহরির চরণে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। তাঁহার জীবন এখন ত আর নিজের নয়। শুধু জীবন কেন? এখন তাঁহার সমস্তই ভগবানের, ভগবানই তাহার সর্ব্বস্ব। ভগবান্ যদি তাঁহাকে রাখেন ত রাখিবেন, মারেন ত মারিবেন। সেজন্য তাঁহার কোন চিন্তাই নাই। তাই তিনি বাঘ দেখিয়া ভীত বা সঙ্কুচিত হইলেন না। রাজার ভয়েও তিনি শ্রীহরির প্রেম ত্যাগ করিতে পারিলেন না, বরং সেই ভয়হারী হরির স্বরূপের মধ্যে ডুবিয়া গিয়া মধুরকণ্ঠে হরিগুণগান করিতে লাগিলেন। ভক্তমাল গ্রন্থের লেখক লিখিয়াছেন, ব্যাঘ্র রাণীর কোনই অনিষ্ট করিল না, বরং সেই বনের বাঘও "কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি উঠি নাচিতে লাগিল।"

এ রকম অসম্ভব কথা কে বিশ্বাস করিবে? রাণীকে বাড়াইবার জন্য এটুকু যে লেখক কল্পনা করিয়া লিখিয়াছেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। যাহা হউক, রাজা এই ঘটনায় স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। তিনি এখন রাণীর ভক্তির মাহাত্ম্য বুঝিতে পারিলেন।

রাণীকে দেবী বলিয়া তাঁহার মনে হইল। তিনি রাণীর গুণগান করিতে লাগিলেন। এইবার সময় বুঝিয়া সাধ্বী নারী স্বামীকে কহিতে লাগিলেন—

"মহারাজ, আমি তোমার নিকট কি অপরাধ করিয়াছি? কেন আমাকে ত্যাগ করিয়াছ? কেন আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছ? সংসারে শ্রীহরির প্রেমের তুল্য আর কোন্ সামগ্রী আছে? আমি সেই প্রেম লাভ করিয়াছি, ইহাই কি আমার অপরাধ? না মহারাজ! এজন্য আমি




অপরাধিনী নই। আমার বড় সাধ, তুমিও আমার মত হরির প্রেম লাভ করিয়া কৃতার্থ হও।"

অতঃপর আরও একটি আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিল। তখন রাজা স্বামী হইয়াও পত্নীর চরণতলে পতিত হইয়া বলিতে লাগিলেন —"রাণী, তুমি ভগবানের প্রেমলাভ করিয়া দেবী হইয়াছ। আমি তোমারই শরণাপন্ন হইতেছি। তুমি আমার প্রতি সদয় হও।"

ঈশ্বরের প্রেমলাভ করিলে নারী যে যথার্থই দেবী হয়, তাহা এই রাণীর কাহিনী পাঠ করিয়া বুঝিতে পারিতেছি। ভগবং প্রেমের স্থানই নারীর সুকোমল ও সুপবিত্র হৃদয়। সেই জন্য নারী যখন প্রেমের তৃষ্ণায় আকুল হইয়া সাধন আরম্ভ করেন, তখন সহজেই নারীর অন্তরে প্রেম উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। দুঃখের বিষয় যে এ দেশের নারীদিগকে এখন আর ঈশ্বরের প্রেমলাভ করিবার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল দেখিতে পাই না। এজন্য প্রাচীন কালের ভক্তিমতী ও প্রেমময়ী নারীদিগের জীবন-কাহিনী আলোচনা করা প্রয়োজন। তাই আজ একটী ধর্ম্মশীলা নারীর আখ্যায়িকা বামাবোধিনীতে প্রকাশ করিলাম।

শ্রীঅমৃতলাল গুপ্ত।

আদান-প্রদান।

সেদিন রবিবার। স্কুলের ছুটি। গাড়ী-বারাণ্ডায় মিত্রবাড়ীর জুড়িগাড়ী—দরজার নিকট হাতে সোণার তাগা, গলায় হার, তসরের সাড়ীপরা দাসী অপেক্ষা করিতেছিল। গৃহকর্ত্রী বেশভূষা করিতে ছিলেন। রায়দের বাড়ী তাঁহার নিমন্ত্রণ।

গাড়ীবারাণ্ডার সম্মুখের দালানে দাঁড়াইয়া গৃহস্বামীর বিনয় ও বিপিন নামে পুত্রদ্বয় ঘোড়ার মস্তক হইতে পুচ্ছ পর্য্যন্ত সর্ব্বাঙ্গের সমালোচনা সমাপ্ত করিয়া সবে মাত্র তকমা আঁটা সহিস কোচম্যানের প্রতি মনোযোগী হইয়াছে—এমন সময়ে মায়ের পরিচিত চাবী ও চুড়ীর শব্দে সোৎ-সুক নেত্রে ফিরিয়া চাহিল। মা কাছে আসিয়া ছেলেদের আদর করিয়া বলিলেন —"আজ তিনটার সময় তোমাদের মামার বাড়ী নিমন্ত্রণ আছে—মনে আছে ত? বিকেলবেলা সেখানে যেও, ফিরো তোমাদের নিয়ে যাবে।"

গাড়ী চলিয়া গেল। বিনয় ও বিপিন একদৃষ্টে সেইদিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। যখন অশ্ব খুরোত্থিত ধূলিরকণাটি পর্য্যন্ত শূন্যে বিলীন হইয়া গেল তখন বিনয় বিপিনের দিকে চাহিয়া বলিল "মা বেশ! —না ভাই?" বিপিন ঘাড় নাড়িয়া দাদার কথায় সম্মতি জানাইয়া পায়ের কাছে যে কাশ্মীরি লোমশ বিড়ালটি ছিল সেইটির সহিত খেলা আরম্ভ করিয়া দিল।




বিনয় বলিল "আচ্ছা ভাই কি করলে মাকে খুব খুসী করা যায় বল দেখি? এই দেখ আমাদের আজ ছুটির দিন বলে মা নরেন দাদাদের বাড়ী যেতে চাইছিলেন না,—নরেনদাদা কত রাগ করলেন, তাই ত গেলেন,—আচ্ছা ভাই মা আমাদের খুব ভাল বাসেন, না?" বিপিন হাসিয়া মাথা হেলাইয়া সম্মতি জানাইল। মাকে খুসী করিবার জন্য বিনয়ের মনে একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিল, সে বলিল "দেখ বিপিন মেনিটার লোমগুলো বড় বড় হয়ে গেছে, ওর লোমগুলো ছাঁটিয়ে দিতে হবে। কই বাবাত কোন বন্দোবস্ত কল্লেন না—তো'র মনে আছে সাহেবদের ছেলেরা সব তাদের কুকুর গুলার ঘাড়ের চুল ছোট করে সাম্‌নের দিকের চুল একটু খানি বড় রেখে কেটে, ফিতের 'বো' দিয়ে সঙ্গে আনে, তাদের কেমন সুন্দর দেখায়? আচ্ছা—ঘোড়ার চুলকাটা কাঁচিটা এনে আমরা যদি ওর চুল কেটে দিই তা হলে কি হয়? আমার বোধ হয়—মা তাহলে খুব খুসী হন, নয় ভাই? এই প্রস্তাবই বিপিনের অত্যন্ত মনোমত হইয়াছিল।

শূন্য আস্তাবল অন্বেষণ করিয়া কাঁচি মিলিল। নিজেদের প্রাতরাশের দুধটুকু দ্বারা উদরপরায়ণ মেনুকে সহজেই বশীভূত করা হইল, বাকি এখন 'ফ্যাসান' নির্ব্বাচন করা। আস্তাবলের একটি নিভৃত কোনে মেনিকে বসাইয়া দুই 'পাকা' নাপিতে এ বিষয়ে পরামর্শ চলিতে লাগিল।

বিপিন বলিল ও বছর পাশের বাড়ীর সাহেবের কুকুরের লেজের দিকে থেকে গলারদিক পর্য্যন্ত ছোট ছোট করে চুল কাটা হয়েছিল—মাথাটা বেশ ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া ছিল, এর কিন্তু দাদা তা'হবে না, —সকলকারই একরকম হওয়া ভাল নয়।" বিনয় বলিল "তা সত্য—মা বলেন ফ্যাসান রোজ বদ্‌লান ভাল. দেখ না কেন, আমাদের পোষাক, জুতা, জামা, সবই ত বছর বছর বদলান হয়। ফেরিওয়ালারা যে সব জিনিষ বেচ্‌তে আসে, বলে দেখনি 'এ আপনার দেখ্‌লেই পছন্দ হবে—একেবারে নূতন ফ্যাসান'। আমার বোধ হয় নূতন রকম করে মেনুর চুল কেটে দিলে মা খুব বেশী খুসীই হবেন।" বিপিন হাতের মারবেলটা তাড়াতাড়ি পকেটে ফেলিয়া আনন্দে করতালি দিতে দিতে বলিল—"ঠিক্ ঠিক্—এবার মাথার দিক থেকে পিঠের নিচে পর্য্যন্ত খুব ছোট ছোট কোরে কেটে দেওয়া যাক্ এসো—আর লেজটা খুব ফুলো থাক্‌বে মাথার চুল যা—বড়—তা কাট্‌তে খুব কষ্ট হবে—তা'হো'ক মেনুকে তো ভাল দেখান চাই?"

দুইজনে পর্য্যায় ক্রমে মেনুর চুল কাটিয়া দিতে আরম্ভ করিল। আহার লোলুপ মেনি সৌন্দর্য্য বোধে একেবারেই অজ্ঞ। সে কোন আপত্তই জানাইল না। কাঁচিখানি বেশ ভারী, পরিশ্রম বড় অল্প হইল না। তবুও কার্য্যে উৎসাহের অন্ত ছিল না। অর্দ্ধেক চুল ছাঁটা হইয়াছে এমন সময় বাড়ীর ভিতর হইতে ক্ষীরোর



ডাক শুনিতে পাওয়া গেল। বিপিন কার্য্য ছাড়িয়া এক মুহূর্ত্তে লাফাইতে লাফাইতে আস্তাবল হইতে বাহির হইয়া গেল, কিন্তু বিনয় উঠিল না—অত্যন্ত গম্ভীর মুখে বাহিরের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

ফিরিয়া আসিয়া বিপিন বলিল "চল দাদা! ক্ষীরো আমাদের পোষাক পর্‌তে ডাক্‌চে। বড় মামা একটা কাঙ্গারু কিনে এনেছেন—সেটাকে দেখ্‌তে যেতে হবে। আর সেজ মামার সেই হরিণবাচ্ছাটির গায়ে আজ আমি হাত বুলিয়ে দেব আজ কখনও ভয় করব না—ওঠো দেরি হয়ে যাচ্চে যে?"

ঘৃণাপূর্ণ অবজ্ঞার দৃষ্টিতে বিনয় কনিষ্ঠের দিকে চাহিয়া বলিল—"তা'ত সব বুঝলুম। কিন্তু আমরা যদি এখন চলে যাই তাহলে মেনির চেহারাতো এই রকমই থেকে যাবে—মা দেখে কি বলবেন সেটা একবার ভাবা হয়েচে কি?" বিপিন বলিল—"বড়মামা আমাদের আজ মাদ্রাজি আমসত্ত্ব খেতে দেবেন—আর নূতন রকম লজেঞ্জুস দেবেন বলেছেন—কমলামধুরও নয়, পিপারমেণ্টেরও নয়, একেবারে নূতন—স্বদেশী!"

প্রলোভিত দ্রব্যের মিষ্টতার কল্পনা মাত্র বিনয়ের রসনাও একটুখানি সরস হইয়া আসিয়া'ছল. তবুও সে অবিচলিত কণ্ঠে বলিল "তাহলে তুমি মার জন্যে তোমার আমসত্ত্ব আর লজেঞ্জুসের লোভ ছাড়তে পারবে না? বেশ, তুমি যাও!

বিপিন ফিরিয়া আসিয়া মেনিকে ধরিল "নাও শীগ্‌গির শীগ্‌গির কাট আমি বেশিক্ষণ থাক্‌তে পারব না কিন্তু!"

বিনয় গম্ভীর মুখে বলিল "মাকে খুসী কর্‌বার জন্যে আমরা একাজ কচ্চি। আমি ত একলা পারব না, ওকে ধ'রে না থাক্‌লে ও উঠে পড়বে। তুমি যদি মাঝখানে চলে যাও তাহলে সমস্তই মাটি হয়ে যাবে, ভাল ত হবেই না বরং বিশ্রী হবে। মনে করেছি আজ থেকে ওকে বাবার সঙ্গে সকালবেলা বেড়াতে পাঠাব. তা ও যেতে পারবে না মাও খুসী হবেন না, বরং রাগ কর্‌বেন। মামার বাড়ী যেতে কি আমারও ইচ্ছে করে না? কিন্তু মাকে খুসী করা সব চেয়ে আগে!" বিপিন বলিল "সেজমামা আজ আমাদের একটা করে টাকা দেবেন বলেছিলেন তা দিয়ে ঘুড়ী আর লাটাই কিনতুম, হীরালালের লাটাইটা খুব ভাল আর প্রকাণ্ড। সূতোতেও খুব বেশী কোরে মাঞ্জা দেওয়া—কট্ কট্ করে ঘুড়ী কেটে যায়!" বিনয়ের মনের কথা মনেই ছিল। সে কল্পনা নেত্রে মায়ের প্রসন্ন-স্নেহ-হাস্য-মণ্ডিত মুখচ্ছবি চিন্তা করিয়া লোভ দমন করিল। অগত্যা দুঃখিত চিত্তে বিপিন ক্ষীরো ঝিকে জানাইয়া আসিল তাহারা আজ আর মামার বাড়ী যাইবে না। মেনির গায়ে হাত বুলাইয়া আশ্বস্ত করিয়া বিনয় বলিল "চুপকরে থাক্, লক্ষী মেয়ে! নড়লে খারাপ হয়ে যাবে। দেখবে তখন তোমায় কত সুন্দর দেখাবে।" বিপিন নত হইয়া

জুতার ফিতাটা ভাল করিয়া বাঁধিয়া লইল, কারণ অবাধ্য চক্ষু দাদার সম্মুখেই বন্যা নামাইতে প্রস্তুত! মনে মনে আপনাকে তিরস্কার করিল "ছিঃ বেটাছেলে কাঁদতে নেই, বাবা কখনও কাঁদেন না।" সজোরে ওষ্ঠ দংশন করিয়া জামায় নাক ঘগড়াইয়া সে অত্যন্ত মনোযোগের সহিত দাদার সাহায্যে অগ্রসর হইল। বিনয়ও মেনির উপর অত্যন্ত মনোযোগী হইয়া একটুখানি মুখ ফিরাইয়া রহিল—দুজনেই বুঝিল দুজনের দুর্ব্বলতা দুজনের নিকট অজ্ঞাত রহিয়া গেল।

অনেক পরিশ্রমের পর কার্য্য শেষ হইল। স্তুপাকৃতি কর্ত্তিত কেশ মেনির দেহচ্যুত হইয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। ছাড়া পাইয়াই মেনি একদৌড়ে বাগানে গিয়া উপস্থিত! বিনয় ও বিপিন আনন্দে চিৎকার করিতে করিতে তাহার অনুসরণ করিল।

বাগানে ঘাসের উপর শুইয়া হাত পা ছুঁড়িয়া আনন্দের প্রথম আবেগটা উপশমিত হইলে তাহারা ক্ষুধা অনুভব করিল।

য়েই সামান্য কার্য্যটিতে কত সময়ই লাগিয়াছে? ঘামে জামা কাপড় পর্য্যন্ত ভিজিয়া গিয়াছে। অনভ্যস্ত হস্তে কাঁচি ধরিয়া এখনও হাত হইতে ঘাড় পর্য্যন্ত টন্ টন্ করিতেছিল। বিনয় বলিল "ওঃ! এত সময় যে লাগ্‌বে তা আমি- আন্দাজই কর্ত্তে পারিনি। কিন্তু কি বল ভুলোটাকে খুব সুন্দর দেখাচ্চে না?" বিপিন একটু খানি সন্দিগ্ধভাবে উত্তর দিল "আমার যেন মনে হচ্চে এর চেয়ে আর বছরেই ভাল দেখিয়ে ছিল।" "পাগল আর কি, সে রকমত সব কুকুরকেই দেখায় এ আমাদের মেনুরাণী ওকে তো আল্লাদা হতে হবে, সে আর নতুন কি?" "তা সত্যি! আচ্ছা চলনা কেন ক্ষীরোকেই জিজ্ঞাসা করা যাবে—ক্ষিদেও যে পেয়েছে।"

দুজনে গৃহাভিমুখে দৌড়াইল পশ্চাতে মেনুও ছুটিতে ভুলিল না। ক্ষীরোদা দালানে পা ছড়াইয়া বসিয়া সলিতা পাকাইতে ছিল, সহসা বিভর্ৎস দর্শন মেনি যখন তাহার ক্রোড়ে লাফাইয়া পড়িতে গেল সে আতঙ্কে চিৎকার করিয়া উঠিল "ওরে বাপ্‌রে এটা আবার কি গো।" ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিয়া দুঃখে ক্রোধে নিশ্চল ভাবে সে মেনির প্রতি চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। মুখে বাক্য নিঃসরণ হইল না।

বিনয় গর্ব্বিত ভাবে বলিল "এ আমরা নিজেরাই করেচি—'রাম টহলও' করেনি কেউ-ই করে'ন। আর জান চুল কাট্‌বার সময় মেনুকে একবারও লাগিয়ে দিই নি।" "খুব করেচ, মা ফিরে আসুক দেখিন তখন ভাল করে, টের পাবে আহা! অমন বেরালটা গা মা এতো ভাল বাসে, বাবুর সাথে সাথে ছায়া টুকুনের মত ফেরে, কাল ভিকু ওকে সাবান লাগিয়ে নাইয়ে দিয়েছে, একি পাহাড়ে দস্যি ছেলে পুলে গো, বাছার কি দুদ্দশাই করেচে, মরে যাই?"




বিনয় অত্যন্ত বিস্ময় পূর্ণ চোখে ক্ষিরোদার প্রতি চাহিয়া ঢোক গিলিয়া জিজ্ঞাসা করিল "কেন ! তুমি কি ওকে সুন্দর দেখ্‌চ না ?" হুঁ তা আর দেখ্‌চিনে ? যা দেখ্‌চি তাতে হাস্‌ব কি কাঁদ্‌ব ভেবে পাচ্ছিনা, ওকি আর বেরাল আছে গা, ওকে এখন 'রাত ভিত' দেখ্‌লে মানুষ ভয়ে ভির্‌মি যাবে।" স্তম্ভিত প্রায় কনিষ্ঠের স্কন্ধে হস্তার্পণ করিয়া অস্ফুট স্বরে বিনয় বলিল "সরে এস বিপিন্‌, তাঁর ভাল লাগ্‌বে অথন, খাবার খেয়ে আমি ক্ষিরিকে বুঝিয়ে দেব ও বড় বোকা।"

বিনয়ের বাগ্মিতা ও সহস্র উদাহরণেও নির্ব্বোধ সৌন্দর্য্য জ্ঞানহীনা ক্ষিরোদা কিছুই বুঝিল না। তা নাই বুঝুক ছেলেদের মনঃক্ষোভ সেজন্য খুব বেশীক্ষণ স্থায়ী হইল না। বরং তাহাকে কৃপাপাত্র ভাবিয়া একটু খানি করুণার চক্ষেই তাহারা চাহিয়া দেখিল অশিক্ষিত পল্লিগ্রামবাসিনীর রুচির কি সংকীর্ণতা !!

অস্তগামী সূর্য্যের গোলাপী আলোয় আপাদ মস্তক পুষ্প খচিত কামিনী গাছটার হেলান দিয়া, বাগানের অপর প্রান্তে পুষ্পচয়নে ব্যস্ত ভ্রাতার দিকে চাহিয়া বিনয় বলিল "বিপিন্‌ শুনে যা।" হাতের মুঠা ভরা ফুল গুলা কোঁচার খুটে বাঁধিয়া বিপিন্‌ ছুটিয়া আসিল "মালা গাঁথ্‌বে দাদা ? সুতো মান্‌জা দেওয়া যদিও-তা হোক্‌ এতেই হয়ে যাবে।"

বিনয়ের চঞ্চল চক্ষু ততক্ষণে নীল আকাশের মাঝে মাঝে যেখানে আবির মাখান রাঙা মেঘ খণ্ডে গিরিমালার চিত্র আঁকিতেছিল তাহার উপর ন্যস্ত হইয়াছিল। চোখ না ফিরাইয়া বিপিনকে বলিল "না আজ আর মালা গাঁথ্‌বোনা আচ্ছা অত গুলো পাখী সারবেঁধে কোথায় যাচ্চে বল দেখি ? ওদের বোধ হয় স্কুলের ছুটি হয়েছে তাই বাড়ী যাচ্চে। এক, দুই, তিন, চার উঃ ও গুণে শেষ হবেনা।" উড্ডীয়মান পক্ষীদলের উপর হইতে চোখ ফিরাইয়া বিনয় বিপিনের প্রতি ফিরিয়া চাহিল। বাগানের ঘাসের উপর বসিয়া বিপিন মেনির গলায় মালতী ফুলের মালার জন্য সুতার মাপ লইতে লইতে বলিল "আচ্ছা দাদা মা যদি মেনুমনিকে দেখে খুসী না হন্‌ ?" বিনয়ের তরুণ হৃদয়ে নিরাশা সহজে স্থান লাভ করিতে পারে না, সে অবিচলিত কণ্ঠে উত্তর দিল" কক্ষণ না, মা নিশ্চয়ই খুসী হবেন্‌, তুমি দেখনা সব ঠিক হয়ে যাবে।

বিবাহ বাটী হইতে ফিরিতে কর্ত্তা ও গৃহিণীর অনেক রাত্রি হইয়া গিয়াছিল। গৃহস্বামী হেমবাবুর বন্ধু কন্যার বিবাহ। কাজেই লোক জনের আহার শেষ পর্য্যন্ত তাঁহাকে অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল। তাঁহারা যখন বাটী ফিরিলেন তখন কলিকাতার রাস্তা অনেকটা জনহীন হইয়া গিয়াছে। রাস্তার ধারের বড় বড় দোকান গুলার অধিকাংশই বন্ধ হইয়া গিয়াছে। শয়ন গৃহে ছেলেরা আপনাদের নির্দ্দিষ্ট শয্যায় শয়ন



করিয়াছিল। পাশের ঘরে পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করিবার জন্য তাঁহারা প্রবেশ করিবার মাত্র মেনি তাহার অভ্যাস মত চিৎকার করিতে করিতে আসিয়া প্রভুর মনোযোগ আকর্ষণ করিল। তাহার সারা দিনের প্রাপ্য তখনও বাকি, কাজেই চিৎকারের মাত্রা কিছু অধিক হইয়া পড়িয়াছিল। গৃহিণী বিস্ময় বিস্ফারিত চক্ষে চাহিয়া ভীত কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন "ওগো! দেখ দেখ! মেনির চেহারা দেখ? ধীরে ধীরে দরজা খুলিয়া জলের গ্লাশ হাতে ক্ষিরো ঝি ঘরে ঢুকিল। জলের গ্লাশটা টেবিলের উপর নামাইয়া রাখিয়া কণ্ঠস্বর যথাসম্ভব মৃদুতর করিয়া বলিল "ছেলেদের কির্ত্তি! তারা আজ সারাদিন এই কম্মেই কাটিয়েচে, বিকেল বেলা মামার বাড়ী পর্য্যন্ত যাব বলেনি। আবার বলা হচ্চে মাকে খুসী করবার জন্যে করিচি। আমি তাদের হাজারো বার বল্লু যে মা খুসি হওয়া থাক্ এ দেখে গালে মুখে চড়াতে লাগবে—তা ও সবাদস্যি ছেলে কি সে কথায় কান দেয়, বল্লে তুই পাড়াগেঁয়ে নোক্—মুরুখ্যু—তুই কি জান্‌বি—মা নতুন ফেসেয়ান ভাল বাসে, এতেই আবার বাবুদের গুমুর কত! ক্ষিরো যে অত্যন্ত রাগিয়াছিল তাহা তাহার কণ্ঠ স্বরেই ব্যক্ত হইতেছিল।

পিতা পদ লেহনে নিযুক্ত পোষিত জীবটিকে দেখিতেছিলেন, ক্ষিরোর কথা শেষ হইলে তিনি উঠিয়া দাড়াইলেন। পাজী গুলো! যত কিছু বলি না হতভাগারা একেবারে মাথায় চড়ে বসেছে, আজ তোদের মাথায় বেতের ছড়ি ভাঙব। অমন চমৎকার বেরালটা কত সখ করে কিনেছি, সেটাকে একেবারে বানর বানিয়ে দিয়েছে!" মাতাও স্নেহপাত্রটির প্রতি চাহিয়াছিলেন, কিন্তু রামধনুর যেমন ক্ষণে ক্ষণে বর্ণের বিভিন্নতা ঘটে তাঁহার চক্ষে মেনুরও আকৃতি তেমনি ধীরে ধীরে পরিবর্ত্তিত হইতেছিল। অত্যন্ত ক্রোধের সময়ও ক্ষিরো স্বীকার করিয়াছে "সুধু তোমায় খুসী করবার জন্যই তারা একাজ করেছে"। সপ্তাহ কাল ধরিয়া যে মাতুলালয়ের লোভনীয় উপহার ও স্পৃহ-নীয় সঙ্গ তাহাদের একমাত্র আনন্দ ও আলোচের বিষয় ছিল সেই পরম লোভ-নীয় নিমন্ত্রণের এই অবসর তাহারা স্বেচ্ছায় ত্যাগ করিয়াছে সুধু তাহাদের স্নেহময়ী মাতাকে একটুখানি খুসী করিবার জন্য। সপ্তাহের ছুটিটায় তাহারা খেলার অবসর পায় না। সন্ধ্যা হইলে কতদিন ক্ষুন্ন মনে বলিয়াছে "এক্ষুনই সন্ধ্যা হয়ে গেল!" আহা বাছারা! মায়ের কানে শুধু ঐ দুইটি কথাই বাজিতেছিল "তোমায় খুসী করবার জন্যে।" ক্ষীরোদার অন্য কোন কথা তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করে নাই। সস্নেহে মেনীকে কোলের কাছে টানিয়া সকরুণ মিনতিপূর্ণ কটাক্ষে স্বামীর প্রতি চাহিয়া পত্নী বলিলেন "হাঁগা? আমার একটি কথা রাখবে?" স্বামী আশ্চর্য্যভাবে বলিলেন "কি?" "ছেলেরা ভাল ভেবেই একাজ করেছিল শুধু এবারকারমত





তাদের শাসনের ভার আমার উপর রাখবে কি?" স্বামী স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলিলেন "অনায়াসে—বেশ ত! তুমি যা ভাল বোঝ কর। আমি জানি এসব বিষয়ে—এই ছেলেদের শাসন টাসন সম্বন্ধে—তোমাদের উপর ভার দেওয়াই ভাল। এসব বিষয়ে শুধু রাগ মেটাবার জন্যে মারধর না করে তোমরা তাদের ভাল শাসনই করতে পার—মেয়েদের জন্যে ভগবান্ ঐ ক্ষমতাটি বিশেষ করেই দিয়েছেন।" স্ত্রী হাসিয়া কৃতজ্ঞচক্ষে স্বামীর দিকে চাহিলেন।

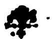
আস্তে আস্তে শয়ন গৃহের দ্বার খুলিতেই ছেলেরা দৌড়িয়া আসিয়া মাতাকে জড়াইয়া ধরিল। তাহারা জাগিয়াই ছিল বাহিরে গাড়ী থামিবার শব্দের সহিত তাহাদের বক্ষের স্পন্দন শব্দও দ্রুততর হইয়া উঠিয়াছিল তবুও পিতার বিরক্তির ভয়ে চুপ করিয়া বিছানায় পড়িয়া দরজার দিকে সোৎসুক নেত্রে বার বার চাহিতে ছিল।

মা ছেলেদের কোলের কাছে টানিয়া লইয়া সস্নেহে তাহাদের ললাটে চুম্বন করিলেন" এখনও তোরা ঘুমুস্নি যে? ছেলেরা আনন্দোৎফুল্ল মুখে উৎসাহের সহিত তাহাদের সারাদিনের কাজের হিসাব দিলে, মা বলিলেন "তোমরা যে সারাদিন আমার কথাই ভেবেচ তাতে আমি ভারি খুসী হয়েছি।" ছেলেরা হাসিয়া মায়ের কোলে মাথা রাখিয়া বলিল 'তা আমরা জানতুম মা! ক্ষীরি এমনি বোকা সে কেবল কেবল বলছিল তুমি খুব রাগ করবে। সে যদি কিছু বোঝে, ভা-রী বোঝে সে। মা হাসিয়া ব'ললেন" কিন্তু আমি তোমাদের মা কি না? তাই আমার খু—ব বুদ্ধি আমি ঠিক্ বুঝতে পেরিছি। "মাতা পুত্রে ভক্তি স্নেহের আদান প্রদান হইয়া গেল। জগতে সকল কার্য্য সকলের বুঝিবার জন্য নয়, এমন অনেক বিষয় আছে যাহা চক্ষে দেখা যায় না, হৃদয় দিয়া শুধু অনুভব করা যায়।

শ্রীইন্দিরা দেবী।

বর্ত্তমান সমাজের উপযোগী স্ত্রীশিক্ষার বিষয় সমূহ।

এরূপ শিক্ষা তাহাদের কার্য্যকরী হইতে পারে না, সুতরাং শিক্ষার বিশেষ কোন সুফলের আশা করা যায় না। এই পাঁচ বা ছয় বৎসরে বালিকারা বিদ্যালয়ে সাধারণতঃ কিছু বাঙ্গালা সাহিত্য, ভূগোল, অঙ্ক, ইংরাজী ও সেলাই শিখিয়া থাকে। বাঙ্গলা যাহা শিখে তাহাতে ভাষাজ্ঞান কিছুমাত্র হয় না। ভবিষ্যতে সুখ দুঃখের কথা জ্ঞাপন করিয়া পিত্রালয়ে বা স্বামীর নিকট পত্র লিখিবার শক্তিটুকু হয় এই মাত্র। সংসার যাত্রা নির্ব্বাহের জন্য যতটুকু অঙ্কের আবশ্যক




তাহাও অনেক স্থলে বিদ্যালয়ের নির্দ্দিষ্ট পাঠ্যের মধ্যে থাকে না এবং নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যেও তাহা শিখিতে পারে না। কেবল মাত্র সেলাইটি কাজে লাগে।

ছাত্রীদিগের বৃত্তি পরীক্ষার নিমিত্ত যে সকল পাঠ্যপুস্তক নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাতে প্রাথমিক শিক্ষার উপযোগী সমস্ত বিষয়ই সন্নিবিষ্ট আছে। ষষ্ঠমানের নির্দ্দিষ্ট শিক্ষণীয় ও পাঠ্য বিষয় গুলি অধ্যয়ন সমাপ্ত হইলে বালিকাদের পাঠাই জীবনের উপযোগী হইয়া কার্য্যকরী হইতে পারে। বিজ্ঞানের সরল ও মূলসূত্রগুলি শিখাইবার ব্যবস্থা থাকাতে বিশেষ উপকার হয়। স্বাস্থ্যরক্ষা ও শিশুপালন সম্বন্ধে একটু বিশেষ ব্যবস্থা করা আবশ্যক বলিয়া মনে হয়। স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মগুলি যদি বালিকা-দিগকে শিক্ষা দেওয়া হয় ও অবশ্য পালনীয় বলিয়া অল্প বয়স হইতেই তাহাদিগের মনে ধারণা জন্মাইয়া দিতে পারা যায়, তবে তাহারা সেই গুলি পালন করিতে বিশেষ যত্নশীল হইবে ও পরে অভ্যস্থ হইয়া গেলে, নিয়মগুলির সামান্য ব্যতিক্রমও সহ্য করিতে পারিবে না। বিদ্যালয় ত্যাগ করিবার অল্প দিন পরেই আমাদের বালিকারা জননীর পদবী লাভ করে, সুতরাং তাহাদিগের পক্ষে শিশু পালন সম্বন্ধীয় শিক্ষার ব্যবস্থা বাহুল্য বলিয়া মনে করা যায় না। স্বাস্থ্যরক্ষা ও শিশুপালনের সাধারণ নিয়মগুলি না জানা আমাদের দেশের শিশুগণের অকাল মৃত্যুর অন্যতম কারণ বলিলে বোধ হয় অত্যুক্ত হইবে না। জগতের জ্ঞান ভাণ্ডার স্বরূপ ইংরাজী ভাষা এক্ষণে আমাদের রাজভাষা। সাংসারিক এমন বিষয় প্রায় নাই যাহাতে ইংরাজী ভাষার কিছু না কিছু প্রয়োজন আছে। কত মহিলা অল্প স্বল্প ইংরাজী জানা বাঞ্ছনীয় মনে করেন ও না জানাতেও অসুবিধা ভোগ করিয়া থাকেন। সামান্য একটু ইংরাজী না জানাতে ঔষধ ভ্রমে মাতা সন্তানকে বিষ পান করাইয়া তাহার মৃত্যুর কারণ হইয়াছেন এরূপও শুনা গিয়াছে। বালিকাদিগের পাঠ্য তালিকায় এক্ষণে ইহাও সন্নিবিষ্ট হওয়া আবশ্যক। তাহাদের শিক্ষাকালের মধ্যে যে টুকু শিখান সম্ভব এবং ঐ সময়ের মধ্যে যে টুকু তাহারা শিখিতে পারে তাহাই পরম লাভ। এইরূপ অতি সামান্য শিক্ষা দ্বারা জ্ঞানালোচনার বিশেষ সহায়তা না হইলেও সাংসারিক বিষয়ে অনেক সহায়তা হইবে। শিক্ষা আরব্ধ হইয়া থাকিলে পরে তাহারা তাহাদের ইচ্ছা, রুচি ও প্রয়োজনানুসারে উন্নতি সাধন করিতে পারিবে।

শিক্ষা বলিতে যাহা বুঝায়, তাহা এত অল্প কালের মধ্যে আমাদের সমাজের বালিকাদের প্রাপ্ত হওয়া নিতান্তই অসম্ভব। আবশ্যক হইলে সমস্ত বিষয়ই শিক্ষা করিয়া লইতে পারে এইরূপ ভাবে শিক্ষার সূত্রপাত হওয়া আবশ্যক। বালিকা-গণের ভবিষ্যৎ সাংসারিক জীবনের প্রয়োজন সাধন সহজ ও তাহাতে অধিকতর উপযুক্ত করাই আমাদের বর্ত্তমান সমাজের



প্রাথমিক স্ত্রী শিক্ষার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। উপস্থিত ক্ষেত্রে ইহা অপেক্ষা অধিক কি আশা করা যাইতে পারে। বাল্য বিবাহ, অবরোধ প্রথা, অকাল মাতৃত্ব, একান্নবর্ত্তীত্ব প্রভৃতি কারণে বিবাহের পর বালিকাদিগের শিক্ষার পথ অধিকাংশস্থলে রুদ্ধ হইয়া যায়। চেষ্টা ব্যতীত শিক্ষোন্নতির অন্য উপায় থাকে না।

বালিকাদিগের অত্যল্প শিক্ষাকালের মধ্যে প্রদত্ত শিক্ষা এইরূপ হওয়া উচিত ও বাঞ্ছনীয় যে তাহা তাহাদের একান্ত প্রয়োজনীয় এবং তাহাদের জীবনে কার্য্যকরী হইয়া শিক্ষার সার্থকতা সম্পাদন করে। এইরূপ সফলতা দর্শন করিলে স্ত্রীশিক্ষার প্রতি সাধারণ লোকের অনুরাগ ও উৎসাহ সমধিক বর্দ্ধিত হইবে। বলা বাহুল্য, আবশ্যকতা স্বীকার করিলেও, এক্ষণে সমাজে স্ত্রী শিক্ষার প্রতি অমনোযোগী ব্যক্তির অভাব নাই। এই প্রণালীতে শিক্ষা প্রাপ্ত বালিকা বিদূষী বলিয়া গণ্য না হইলেও সে আপনার ভবিষ্যৎ জীবনের প্রয়োজনীয় বিষয় সমূহের শিক্ষা ও তদ্বিষয়ের একটা স্থূল ধারণা লাভ করিবে। বিবাহের বয়স বৃদ্ধি, এবং স্ত্রীর শিক্ষার প্রতি স্বামী অধিকতর মনোযোগী ও উৎসাহী না হইলে, আমাদের সমাজে স্ত্রী শিক্ষার সম্পূর্ণতার আশা করা দুরাশা। এক্ষণে সাধারণতঃ ১২।১৩ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে বালিকাগণের বিবাহ হয় না। ৬। ৭ বৎসর বয়সে শিক্ষা আরম্ভ হইলেও বিবাহের পূর্ব্বে ৬। ৭ বৎসর শিক্ষার সময় থাকে। এই সময়ের মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সাধারণ ভাবে শিক্ষা দেওয়া বোধ হয় নিতান্ত দুঃসাধ্য নহে।

১। সাহিত্য (গদ্য, পদ্য ও ব্যাকরণ)।

২। বিজ্ঞান (নির্দ্দিষ্ট সরল ও মূল সূত্র গুলি)।

৩। ইতিহাস (ভারত বর্ষের কিম্বা বঙ্গ দেশের)।

৪। ভূগোল।

৫। গণিত (পাটীগনিত ও শুভঙ্করী)।

৬। স্বাস্থ্য রক্ষা ও শিশু পালন প্রণালী। (শিশু পালন প্রণালী অবশ্য বয়ঃস্থা বালিকাদিগের জন্য)।

৭। ইংরাজী (এই সময়ের মধ্যে যেটুকু সম্ভব)

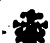
৮। শিল্প কার্য্য (সেলাই, রন্ধন, প্রভৃতি)।

৯। রেখাঙ্কন।

১০। পাক প্রণালী।

এই কয়টি বিষয় ৬। ৭ বৎসর ধরিয়া শিক্ষা পাইলে, সে শিক্ষা বোধ হয় নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর হইবে না। সাধারণতঃ গৃহস্থলী করিবার পক্ষে ইহাই যথেষ্ট হইতে পারে।

পাক প্রণালী সম্বন্ধে বিশেষ শিক্ষা না পাইলেও প্রায় সকল বালিকা ইহা আয়ত্ত করিয়া থাকে। ইহা শুধু মৌখিক উপদেশ দ্বারা বিদ্যালয়ে শিখান কঠিন এবং অসম্ভব। ভূগোল সম্বন্ধে কিছু জ্ঞানের আবশ্যকতা যে জন্য তাহাত দূরের কথা,



সংবাদ পত্র পাঠ কালেই বুঝিতে পারা যায় দেশ গুলির নাম পর্য্যন্ত অনেককেই প্রহেলিকার মত বোধ করিতে দেখা যায়। ইতিহাস, দেশের পূরাকীর্ত্তি গুলির অমূলক কিম্বদন্তি দূর করিয়া ও তাহাদের সহিত প্রকৃতরূপে পরিচিত করিয়া বিস্ময় ও শ্রদ্ধাসহিত স্বদেশপ্রীতি আনয়ন করিবে এবং অতীত ঘটনার সহিত কল্পনার উদ্রেক করিবে। ইহা ব্যতীত অতীত কালের ভিন্ন ভিন্ন সময়ের আচার ও ব্যবহার, সামাজিক, রাজনৈতিক প্রভৃতি বিবরণ জ্ঞাত হওয়া ইতিহাস অধ্যয়নের ফল তো আছেই। অঙ্ক, বাজারের জমা খরচ হইতে আরম্ভ করিয়া ধোপার হিসাব পর্য্যন্ত সংসারের দৈনিক সকল কাজেই আবশ্যকীয়। রেখাঙ্কন, উচ্চশ্রেণীর সাহিত্য ও কাব্য, সূচিকার্য্য ও অন্যান্য অনেক কার্য্যে আবশ্যক হইতে পারে। ভাষা জ্ঞানের সহিত উচ্চ আদর্শ ও ভাব সমূহ হৃদয়ে বদ্ধমূল করিয়া, উদার ও রুচি মার্জ্জিত করে। যদিও ১২।১৩ বৎসর বয়স্কা বালিকা সাহিত্য ও কাব্যের সর্ব্বপ্রকার উচ্চভাব গুলি ধারণা করিতে সমর্থা হয় না, কিন্তু ঐ সময়ের মধ্যে যাহাতে উচ্চ শ্রেণীর সাহিত্য চর্চ্চার স্বাদ প্রাপ্ত হইয়া, উহার প্রতি রুচি জন্মে এরূপ শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। নিতান্ত নূ্যন কল্পে ইহাই আবশ্যক, ইহার কোনটিই বাহুল্য বা নিষ্প্রয়োজনীয় নহে যে বর্জ্জন করা যাইতে পারে। এতদ্ব্যতীত অভিভাবকগণের রুচি অনুসারে বালিকাদিগকে কিয়ৎ পরিমাণে কণ্ঠ ও যন্ত্র সঙ্গীত, এবং ধাত্রী বিদ্যা প্রভৃতি ললিত কলা শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। প্রত্যক্ষ ভাবে ইহা সংসার যাত্রা নির্ব্বাহের পক্ষে অনাবশ্যক বিবেচিত হইলেও স্ত্রী শিক্ষার বহির্ভূত বিষয় বলিয়া স্বীকার করা যায় না। সাধারণতঃ এইরূপ ভাবে শিক্ষা প্রদত্ত হইলে বালিকাদিগের শ্রম ও সময় নষ্ট করাইয়া, ব্যর্থ মনোরথ হইয়া স্ত্রীশিক্ষার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না। বর্ত্তমান সমাজের অত্যল্পকালে শিক্ষার অবসর প্রাপ্তা, অচিরে সংসার প্রবেশোন্মুখী বালিকাদের শিক্ষা, তাহাদের জীবনে কার্য্যোপযোগী হইয়া যাহাতে সফলতা ও সার্থকতা লাভ করে এবং ব্যর্থ শিক্ষার যাহাতে তাহাদের সময়ের অপব্যয় না হইয়া আবশ্যকীয় শিক্ষা প্রাপ্ত হয় সেইদিকে দৃষ্টি রাখা একান্ত কর্ত্তব্য। এই প্রণালীমতে শিক্ষিতা বালিকা ইচ্ছা ও চেষ্টা করিলে ভবিষ্যতে জ্ঞানোপার্জ্জনের পন্থা সুগম করিয়া লইতে পারিবে। উপযুক্ত পাত্রে পরিণীতা হইয়া স্বামী কর্ত্তৃক সুশিক্ষা লাভ করিয়াছেন এমন মহিলার অভাব নাই। বিদ্বান্ স্বামী তাঁহার সহধর্ম্মিণী ও সহযোগিনী ইচ্ছা করেন, ইহা বোধ হয় অস্বাভাবিক নহে। সন্তানগণের সুশিক্ষার নিমিত্ত মাতারও সুশিক্ষিতা হওয়া আবশ্যক। এইরূপ শিক্ষা প্রাপ্তা মাতা তাঁহারা সন্তানগণের প্রাথমিক শিক্ষার ভার সুলভ গৃহ শিক্ষকের হস্তে অর্পণ না

করিয়া স্বয়ং অনায়াসেই গ্রহণ করিতে পারিবেন। কখন কাহাকে কি অবস্থায় পতিত হইতে হইবে, তাহার নিশ্চয়তা নাই। সমাজে এমন সহস্র সহস্র সহায়-সম্বলহীনা হতভাগিনী বিধবা আছে, যাহারা এক মুষ্টি অন্নের জন্য অপরের গলগ্রহ স্বরূপ হইয়া প্রতিদিন অকারণে বা সামান্য কারণে অবমানিত, লাঞ্ছিত ও তিরস্কৃত হইয়া জীবন দুর্ব্বহ মনে করিতেছে। তাহারা এইরূপ নির্দ্দিষ্ট শিক্ষাও প্রাপ্ত হইয়া থাকিলে, তদ্দ্বারা অনায়াসে শিক্ষা দান করিয়া সসম্মানে নিজের জীবিকা অর্জ্জন করিতে পারে। এতদ্দ্বারা সমাজেরও একটি অভাব মোচন হয়। হিন্দুসমাজে শিক্ষয়িত্রীর নিতান্ত অভাব। অন্তঃপুরস্থা বালিকা বধূদিগের জন্য শিক্ষয়িত্রী আবশ্যক হইলে খৃষ্টীয় সমাজের মহিলা কিম্বা খৃষ্টীয় প্রচারিকা ব্যতীত গত্যন্তর নাই। (অবশ্য আজকাল স্ত্রী-মহামণ্ডলের জন্য হিন্দু শিক্ষয়িত্রীর অভাব হয় না, পূর্ব্বের কথাই বলিতেছি।) ইহাতে অনেক স্থলে সুফল না ফলিয়া কুফলই ফলিত। সেই সকল শিক্ষয়িত্রীগণের মুখ্য উদ্দেশ্য খৃষ্ট-ধর্ম্ম প্রচার, এবং উপরি-উক্ত বিষয়গুলির শিক্ষাদানের যোগ্যতাও তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকের নাই। ক্রোসেট্, টাইটিং, শ্যাট্‌ল প্রভৃতি সেলাই কাজ, টুপি, মোজা, গেঞ্জী প্রভৃতি উলের কাজ, শেনীল, ক্রুয়েল, স্ল্যাগে, সলমা চুমকীর কাজ, কার্পেট প্রভৃতির কাজ, এই সব উচ্চ শ্রেণীর সূচীকার্য্য ও শিল্পকার্য্য, পরিচ্ছদ সীবন ইত্যাদি অনেকানেক শিল্পকর্ম্ম এবং রেখাঙ্কন, চিত্রাঙ্কন, সঙ্গীত, রন্ধন প্রভৃতি স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষণীয় অনেক বিষয় আছে। এই সকল শিল্পকার্য্য দ্বারা তাঁহারা গৃহের শোভা সম্পাদন করিয়া পরিবারবর্গের সহিত বিমল আনন্দ অনুভব ও সাংসারিক ব্যয়ের লাঘব করিতে পারেন। দুঃস্থ মহিলাগণ এই সমস্ত শিল্পজাত দ্রব্য বিক্রয় দ্বারা কিম্বা এই সকল শিল্পের শিক্ষাদান করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিতে পারেন। এই কার্য্যগুলির কোনটিই বর্ত্তমান সমাজের অনুপযোগী কিম্বা অননুমোদিত নহে। ইহা ব্যতীত টাইপ রাইটিং, শুশ্রূষা ও ধাত্রীকার্য্য প্রভৃতি দ্বারাও জীবিকা নির্ব্বাহ হইতে পারে। প্রায় প্রতি পল্লীতে বালিকাদিগের আশানুরূপ সুশিক্ষা হইতেছে না। প্রাথমিক স্ত্রীশিক্ষা কার্য্যকরী না হইলে স্ত্রীশিক্ষার সম্পূর্ণতার আশা করা বৃথা। বর্ত্তমান সমাজের অনুরূপ ও উপযোগী করিয়া ধীরে ধীরে স্ত্রীশিক্ষার উন্নতিকল্পে চেষ্টা করিতে হইবে, নতুবা হঠাৎ আমূল সংস্কার বা পরিবর্ত্তনের চেষ্টা নিষ্ফল হইবে। স্ত্রীশিক্ষার আবশ্যকতা সকলেই উপলব্ধি করিলেও বর্ত্তমান সমাজের উপযোগী করিয়া শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা না থাকাতে, হিন্দুসমাজের বালিকাদের শিক্ষার প্রকৃত উন্নতি এতদিন হইতে পারে নাই।

শ্রীউষাপ্রভা দেবী,
মুর্শিদিয়া।



৺উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের জীবনী।

১৫ বৎসর বয়সে লিখিত রোমরাজ্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

চতুর্থ অধ্যায়।

রোমের চতুর্থ রাজা আঙ্কস মার্শস।

১। আঙ্কস মার্শস পম্পিউলসের পুত্র ও নিউমার দৌহিত্র ছিলেন এবং মাতামহের ধর্ম্ম ও সত্যনিষ্ঠা অধিকার করিয়া ছিলেন।

২। তিনি যুদ্ধে রোমুলসের প্রকৃতি অবলম্বন করতঃ তাবৎ শত্রু জয় করিয়া তাহাদিগকে অধীন করিলেন, রোমের লোকসংখ্যা বৃদ্ধি করিলেন, টাইবর নদীর তটে আষ্টিয়া নামে প্রাচীর নির্ম্মাণ করিলেন এবং রোমনগর উচ্চ প্রাচীরে পরিবেষ্টিত করিলেন। এতদ্ভিন্ন তিনি কৃষি ও বাণিজ্য সম্বন্ধেও যথেষ্ট উৎসাহ প্রদান করিয়াছিলেন।

৩। পরে তিনি ২৪ বৎসর রাজত্ব করিয়া আপনার শিশু সন্তানদ্বয়কে টার্কুইনিয়স প্রিস্কসের হস্তে সমর্পণ করিয়া মানবলীলা সম্বরণ করেন। কিন্তু টার্কুইনিয়স বিশ্বাসঘাতক হইয়া আপনি সিংহাসন অধিকার করিলেন।

পঞ্চম অধ্যায়।

রোমের পঞ্চম রাজা টার্কুইনিয়স প্রিস্কস।

১। টার্কুইন প্রথমতঃ গ্রীসদেশের অন্তঃপাতী করিন্থ নগরে বাস করিতেন। দেমারেটস নামক এক ধনবান্ বণিক্ তাঁহার পিতা ছিলেন।

২। টার্কুইনিয়া দেশ তাঁহার জন্মভূমি ছিল। উহার স্মরণার্থ, টার্কুইনস এবং দ্বিতীয় টার্কুইন হইতে পৃথক্ বলিয়া জানিবার জন্য প্রিস্কস, তাঁহার এই দুই নাম হয়।

৩। তিনি রোমানদের রাজ্যসীমা বহুদূর বিস্তৃত করিয়া টাস্কানী জয় করেন এবং রোমনগরকে নানা প্রকার সাধারণ হিতকর কীর্ত্তিস্তম্ভাদি দ্বারা সুসজ্জিত করেন। ঐ সকলের মধ্যে কতকগুলি অট্টালিকা অদ্যাপিও বিদ্যমান রহিয়াছে। সর্ব্বসাধারণের প্রীতিভাজন হইবার জন্য তিনি সেনেটর ও নাইটদিগের (ক) সংখ্যা বৃদ্ধি করেন।

৪। রোমীয় রাজাদিগের মধ্যে তিনিই সর্ব্বপ্রথমে রাজদণ্ড, রাজমুকুট ও রাজপরিচ্ছদ ধারণ করেন এবং যানারোহণ করিয়া জয়োৎসব করিবার প্রথা প্রবর্ত্তিত করেন। (খ)

৫। টার্কুইনের সম্বন্ধে এক অদ্ভুত গল্প আছে। একদিন প্রধান দৈবজ্ঞ আক্সস নোভিয়সের বিদ্যা পরীক্ষার নিমিত্ত তিনি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে,

---

(ক) যোদ্ধ কুলীন। (খ) রোমানেরা কোন শত্রুকে জয় করিলে সেনাপতি তাহাকে যানের পশ্চাৎ বাঁধিয়া জয়ধ্বনি ও আমোদ প্রমোদ করিতে করিতে রোমে আনিতেন এবং তথায় ধুমধাম করিতেন। ইহাকে জয়োৎসব কহিত।



তিনি যাহা মনে করিয়াছেন তাহা হওয়া সম্ভব কি না? তাহাতে নোভিয়স দৈবলক্ষণ দ্বারা বিবেচনা করিয়া উত্তর করিলেন যে, হাঁ তাহা সম্ভব বটে। রাজা বলিলেন, কি বলিলে? আমি যে একখান ছুরিকা দ্বারা এই প্রস্তরস্তম্ভটি ছেদন করিব মানস করিয়াছি। দৈবজ্ঞ বলিল, সবলে আঘাত কর, মানস সফল হইবে। কথিত আছে, ভূপতি সে স্তম্ভ ছেদন করিয়াছিলেন। ইহাতে দৈবজ্ঞের খ্যাতি প্রতিপত্তি বৃদ্ধি হইল, এবং রোমানেরা তদবধি তাঁহাদিগের পরামর্শ না লইয়া কোন দুঃসাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেন না।

৬। টার্কুইন্ লাটিনদিগের অনেক নগর অধিকার করিয়া ইটালির মধ্যে লাটিনদিগের নাম লোপ করিয়াছিলেন।

৭। অঙ্কশ মার্শসের পুত্রদ্বয় টার্কুনিয়সের বধের নিমিত্ত দুই কৃষককে নিযুক্ত করেন এবং তাহাদিগের হস্তেই তিনি হত হয়েন। ইহাতে টার্কুইন যেমন অন্যায় করিয়া তাহাদিগের পিতার সিংহাসন অধিকার করেন, তাহার প্রতিশোধ পাইলেন।

৮। টার্কুইন্ ৮৪ বৎসর বয়সে এবং ৩৮ বৎসর রাজত্বের পর হত হয়েন।

৯। তাঁহার দুইটি সন্তান ছিল, তিনি তাহাদিগকে স্বীয় জামাতা সরভিয়স্ টলিয়সের হস্তে সমর্পণ করিয়া যান।

রোমের ষষ্ঠ রাজা সর্ভিয়স টলিয়স্।

১। লাটিন রাজ্যের মধ্যে কর্ণিকুলা নগর টার্কুইন জয় করেন। টলিয়স্ তথাকার রাজপুত্র।

২। তিনি টাস্কান ও বিজেন্তিদিগকে পরাভূত করেন। প্রথমে তিনি রোমনগরবাসীদিগের অবস্থা পরিদর্শন করেন এবং প্রত্যেক ব্যক্তির ভূসম্পত্তির রাজস্ব নিরূপণ করিয়া দেন। ইহার পর পাঁচ বৎসরে একবার করিয়া নগরবাসীদিগের গণনা হইত এবং তাহাকে লষ্ট্রম গণনা বলিত।

৩। রাজ্যের নিয়ম সংশোধন ও রোমানদিগের সহিত লাটিনদিগের একতা স্থাপন, এই দুইটী তাঁহার রাজত্বের প্রধান কার্য্য।

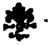
৪। সর্ভিয়সের দুই কন্যা ছিল, জ্যেষ্ঠা অতি পবিত্রা ও শান্তচরিত্রা ছিলেন। কনিষ্ঠা তদ্বিপরীত, দুঃশীলা ও হিংস্রস্বভাবা ছিল।

৫। দুই টার্কুইনের সহিত তাহাদিগের দুই ভগিনীর বিবাহ হয়। কিন্তু পরিণয়ের অনতিবিলম্বে জ্যেষ্ঠ টার্কুইন ও কনিষ্ঠ টুলিয়া পরস্পরে মিলিত হইবার আশয়ে তাঁহাদিগের আপনাপন স্ত্রী ও স্বামীকে হত্যা করিল।

৬। তাহাদিগের এই মনোভীষ্ট সিদ্ধ হইলেই তাহারা টলিয়সকে সিংহাসনচ্যুত করিল। পাপপরায়ণা টুলিয়া নিহত পিতার মৃতদেহের উপর দিয়া আপনার যান চালাইতে আজ্ঞা দিয়াছিল।

৭। সর্ভিয়স ৪৪ বৎসর রাজত্ব করেন। টার্কুইন জ্যেষ্ঠ (সুপর্ব্বস) তাঁহার উত্তরাধিকারী হয়েন।





রোমের সপ্তম ও শেষ রাজা টার্কুইন সুপর্ব্বস।

১। টার্কুইনের জন্ম বিষয়ে নিশ্চিত বৃত্তান্ত পাওয়া যায় নাই। কেহ কেহ তাঁহাকে টার্কুইন প্রিস্কসের পুত্র এবং অনেকে তাঁহাকে তাঁহার পৌত্র বলেন।

২। তিনি প্রজাদিগের উপর উপদ্রব ও বলপ্রকাশ করিতে লাগিলেন এবং রাজার পরিবর্ত্তে অত্যাচারী শাসনকর্ত্তা হইয়া উঠিলেন।

৩। তিনি রোমের ক্যাপিটল নামক প্রসিদ্ধ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করেন। এই প্রাসাদ অতীব বৃহৎ এবং উত্তরকালে রোমানদিগের মহত্বের পরিচায়ক বলিয়া পরিগণিত হয়।

৪। সুপর্ব্বসের পুত্র সেক্সটাস, কোলেটাইনস নামে এক রোমীয় ভদ্র যুবার পরম রূপবতী ও পতিব্রতা পত্নী লুক্রিসিয়ার সতীত্ব হরণ করাতে রাজ্যের সর্ব্বসাধারণ লোকে ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া রাজবংশের প্রতি বিদ্রোহী হইয়া উঠে। ইহা দ্বারাই রোমের স্বাধীনতার সূত্রপাত হয় এবং টার্কুইন বংশ একেবারে উচ্ছন্ন হইয়া যায়। (ক)

৫। টার্কুইন অতি অহঙ্কারী ও

(ক) লুক্রিসিয়া সৌন্দর্য্য অপেক্ষা সতীত্বের জন্যই অধিক বিখ্যাত ছিলেন। রাজপুত্র সেক্ষ্টস এক দিবস তাঁহার বন্ধু কোলেটাইনসের মুখে তদীয় স্ত্রীর প্রশংসার কথা শুনিয়া তাঁহাকে দর্শন করিতে গেলেন এবং তাঁহার অসামান্য রূপলাবণ্য নয়নগোচর করিয়াই কামমোহিত হইয়া স্থির করিলেন, ইহার সতীত্বনাশ না করিলে নয়। আর তিনি মনে করিলেন, আমি রাজপুত্র, কেহ আমাকে শাস্তি দিতে পারিবে না। এই ভাবিয়া ঐ দুরাচার অন্য এক রজনীতে লুক্রিসিয়াকে একাকিনী পাইয়া তাঁহার গৃহে উপনীত হইল। সে নির্লজ্জ হইয়া আপনার দুরন্ত রিপু চরিতার্থ করিবার কথা তাঁহাকে জ্ঞাপন করিল এবং দুরাশা-সুসিদ্ধির জন্য নানা হেয় কৌশল করিতে লাগিল। অসহায়া লুক্রিসিয়া কুলিশপাতসম তাহার বাক্য শ্রবণ করিয়া হতবুদ্ধি ও অচেতনপ্রায় হইলেন। পরে সাশ্রু-লোচনে ও গদগদ বচনে তাহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা ও অনেক অনুনয় বিনয় করিতে লাগিল। দুরাত্মা কিছুতেই কর্ণপাত করিল না। বরং সহজে দুষ্টাভিপ্রায়সিদ্ধির প্রতিবন্ধকতা দেখিয়া করস্থিত তরবারি বাহির করিয়া বলিতে লাগিল "যদি তুমি আমার বাক্যে সম্মত না হও, এইক্ষণে তোমাকে কাটিব এবং এক নিদ্রিত ভৃত্যকে কাটিয়া তাহাকে তোমার পার্শ্বে রাখিয়া রাষ্ট্রমধ্যে তোমার অপবাদ ঘোষণা করিয়া দিব।" ভয়বিহ্বলা অবলা কি করিবে কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। দুরাত্মা তৎক্ষণাৎ তাহার উপর বলপ্রকাশ করিয়া তাহার মনোরথ সিদ্ধ করতঃ স্বস্থানে প্রস্থান করিল। লুক্রিসিয়া দারুণ আত্মগ্লানিতে তাপিতহৃদয় হইয়া প্রাতঃকাল অবধি অপেক্ষা করিয়া রহিলেন। পরে স্বামী, শ্বশুর ও অন্যান্য বন্ধুগণকে আহ্বানপূর্ব্বক সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করিলেন এবং মৃত্যুই এক্ষণে তাঁহার পক্ষে শ্রেয় এই কথা উচ্চারণ করিয়াই এক শাণিত ক্ষুরধারে আপনার কণ্ঠচ্ছেদন করতঃ প্রাণত্যাগ করিলেন। উপস্থিত বন্ধুগণের মধ্যে ব্রুটস্ এই ভয়ঙ্কর ব্যাপার দর্শন করিয়া শল্যবিদ্ধের ন্যায় হইলেন এবং লুক্রিসিয়ার মৃতদেহ এক প্রকাশ্য স্থানে লইয়া গিয়া রাজবংশের দারুণ অত্যাচার বিষয়ে এরূপ অদ্ভুত বক্তৃতা করিলেন এবং স্বাধীনতা প্রাপ্তির জন্য সকলকে এ প্রকারে উৎসাহিত করিলেন যে, সকলেই তাঁহার প্রতি একান্ত




গর্ব্বিতস্বভাব ছিলেন, এই জন্য তাঁহাকে সুপর্ব্বস বলিত।

৬। অনন্তর টার্কুইন তাঁহার পুত্র সেক্সটসের পাপে সপরিবারে রোম হইতে দূরীকৃত হইলেন। তিনি ২৫ বৎসর রাজ্যশাসন করেন। পরে সিংহাসন পুনরধিকার করিবার মানসে অনেক বৃথা চেষ্টা পাইয়া টাস্কানিতে প্রাণ পরিত্যাগ করেন্।

৭। রোমের রাজতন্ত্র ক্রমাগত ২৪৫ বৎসর চলিয়াছিল, পরে টার্কুইনের সঙ্গে তাহারও শেষ হইল। এই সময়ে রোমের চতুঃসীমা ৪০ মাইলের অধিক ছিল না বটে, কিন্তু রোমানেরা এরূপ দৃঢ় ও পরাক্রমশালী হইয়াছিল যে, ভবিষ্যতে তাহারা যে সকল অসাধারণ দুঃসাহসিক কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিল এই সময়েই তাহার উপযুক্ত হয়।

৮। মার্কশ জুনিয়স্ ব্রুটস্ রোমের একজন প্রধান ধনাঢ্য ভদ্র লোক ছিলেন। তাঁহার ঔরসে এবং টার্কুইন প্রিস্কসের দুহিতা টার্কুইনার গর্ভে জুনিয়স ব্রুটসের জন্ম হয়। এই মহাত্মাই লুক্রিসিয়ার স্বামী কোলেটাইনসের সহিত মিলিত হইয়া রোমের সম্পূর্ণরূপ রাজ্য পরিবর্ত্তন করেন।

অনুরাগী হইল, উচ্চৈঃস্বরে ভূয়োভূয়ঃ তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিল এবং তৎক্ষণাৎ রোম হইতে রাজবংশকে দূরীভূত করিবার জন্য সকলে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইল।

শিশুজীবন ও কিণ্ডারগার্টেন।

শিশুদিগকে বৃথা ভয় দেখাইলে নির্ভীক শিশুদিগকে যে ভীরু করা হয়, শুধু তাহাই নহে, উহা দ্বারা তাহাদের নানাপ্রকার পীড়া জন্মে; আর পর জীবনেও মানুষ পীড়িতাবস্থায় শয্যার চারি দিকে যত প্রকার উপদেবতার কল্পনা করিয়া ভীত ও কাতর হয়, তাহাও ঐ শিশুকালের ভয় হইতে উৎপন্ন হয়। সেই কারণে পিতা মাতা সাধ্যমত সন্তানদিগকে সাবধানে রাখিতে অবহেলা করিবেন না। ঝির উপর সম্পূর্ণ নির্ভর না করিয়া নিজেরা যতদূর সম্ভব শিশুদিগের মানসিক উৎকর্ষসাধনের নিমিত্ত যত্ন করিবেন। ভয়ের পরিবর্ত্তে ছবির বই দেখাইয়া শান্ত ও বাধ্য করিতে বিস্মৃত হইবেন না।

শিশুর প্রথম বৎসর গাছে কুঁড়ি গজানর ন্যায়। উহা কেবল গাছ ফুঁড়িয়া উঠিয়াছে মাত্র। উহা এখন দিন দিন বাড়িতে ও শক্ত হইতে থাকিবে। কিন্তু সূর্য্যকিরণে উত্তমরূপে ফুটিয়া উঠিলে উহার যে কি প্রকার রূপ, আকার ও গন্ধ হইবে তাহা এখন বুঝা ভার। পরে শিশুর দ্বিতীয় বৎসরে স্নেহময়ী কৌতুকাবিষ্টা জননী জানিতে পারেন যে, ঐ শিশু কলির ভিতর একটী সুকোমল ও সুগন্ধ ফুল, কি একটী সুন্দর পদার্থ নিহিত আছে। সুতরাং

এখন হইতে পিতামাতার অতি সাবধানে চলিয়া ঐ অফুটন্ত কলিটিকে উত্তমরূপে পুষ্ট করা কর্ত্তব্য। কেননা কচি শিশুকে শিক্ষা দিয়া উপযুক্ত মানুষ করা মুখের কথা নহে। তাহার পরজীবনের যত স্বভাব ও চরিত্র ঐ ভালমন্দ বাল্য-শিক্ষার উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করিবে।

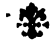
প্রত্যেক শিশুই নিজ স্বভাবগর্ভে অতি উচ্চ ও শ্রেষ্ঠ চরিত্রের বীজ বহন করে। ঐ বীজটী ভাল করিয়া দেখাও পিতামাতার কর্ত্তব্য। সুশিক্ষা দ্বারা ঐ অন্তর্নিহিত শক্তির উপযুক্তরূপে বিকাশ করিতে হইলে উহা ভাল করিয়া বুঝা একান্ত আবশ্যক। অন্তরের সমস্ত শক্তিকে উপকারী জানিয়া উহার কোন অংশ যাহাতে নষ্ট না হয় তাহাই করা প্রয়োজন। ইহাও স্মরণ রাখা উচিত যে, কোন আন্তরিক বৃত্তি অতি প্রবল হইলে তাহাকে দমন না করিয়া উহার যে বিপক্ষ বৃত্তিগুলি তেমন উৎকর্ষ লাভ করে নাই সেই গুলির উৎকর্ষ সাধন করিবার প্রয়াস পাওয়া উচিত। যে সকল শিশু চঞ্চল-প্রকৃতি ও দুর্দ্দান্ত এবং সর্ব্বদা সঙ্গী-দিগের সহিত মারামারি করে, তাহা-দিগকে ভয় দেখাইয়া শান্ত করিবার চেষ্টা করা অন্যায়। উহার পরিবর্ত্তে স্নেহ ও প্রেমের দ্বারা কোমল ভাবে তাহাদের কৃত কার্য্যের দোষ বুঝাইয়া দিলে আপনা হইতেই তাহাদিগের চরিত্রের ও স্বভাবের পরিবর্ত্তন হয়। কিন্তু অতি শিশুকালে যখন চরিত্রের কোন অঙ্গই পুষ্ট হয় নাই, কেবল উহার ভিত্তি মাত্র স্থাপিত হইয়াছে, তখন ঐ প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়া অসম্ভব। এখন আমরা শিশুদিগকে শিক্ষা দিবার প্রথম উপায় কি তাহাই দেখাইতে চেষ্টা করিব। (ক্রমশঃ)

ভূত না মানুষ?

একাদশ পরিচ্ছেদ।

এ সুন্দর পুরুষ কে? এ কি চণ্ডদেব?

এক দিন যখন রজনী দ্বিপ্রহর এবং অমাবস্যার অন্ধকারে দিক্‌দিগন্ত পরিপূর্ণ, হাজার হাজার নক্ষত্র একটীও ফুলকে হাসাইতে পারিতেছিল না, লতা নাচিতে-ছিল কিন্তু নীরবে ও বিষাদ সহকারে, এমন সময় একজন ভীষণাকৃতি লোক একটী বনের মধ্য দিয়া আস্তে আস্তে চুপে চুপে যাইতেছিল। একটী ইষ্টকনির্ম্মিত প্রাচীরের নিকট আসিয়া সে থামিল এবং সেই ইষ্টক-প্রাচীরের সন্নিকটে উপবিষ্ট হইয়া আস্তে আস্তে আগে একখানি তার পর আর একখানি, এইরূপ করিয়া ইষ্টক-প্রাচীর হইতে ইট খসাইতে লাগিল। অল্প-ক্ষণের মধ্যেই একজন মানুষ যাইতে আসিতে পারে প্রাচীরের মধ্যে এরূপ একটী দরজা বাহির হইল। লোকটী ঐ দরজা

অপর দিকে আগমন করতঃ পুনরায় উপবিষ্ট হইয়া ঐ খসান ইটগুলি প্রাচীরের গায়ে পূর্ব্ববৎ সংলগ্ন করিয়া দিল এবং ঐরূপ আস্তে আস্তে চুপে চুপে অন্য একটী ইষ্টকময় গৃহের ইষ্টক খসাইতে লাগিল। ঐ স্থানেও একটী দরজা বাহির করিয়া সে গৃহের ভিতর প্রবেশ করিল এবং অতি সুকৌশলে দরজাটি পুনরায় বন্ধ করিয়া দিল।

সেই গৃহে একজন সুন্দর পুরুষ বসিয়া জয়দেবের কবিতা কণ্ঠস্থ করিতেছিল। তাহার মুখ মলিন ও দক্ষিণ হস্তে ক্ষত-চিহ্ন বিদ্যমান ছিল। গৃহাগত ব্যক্তি তাহার সম্মুখে আসিয়া অবনত মস্তকে দণ্ডায়মান হইল। সুন্দর পুরুষ তাহাকে দেখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং শশব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি সদ্দার সিং, খবর কি? স্বর্ণপদক কি পাইয়াছ?"

সর।—"হাঁ পাইয়াছি।"

সুঃ পুঃ—"কৈ দাও।—তুমি আমাকে বাঁচাইলে। স্বর্ণপদকটীর জন্য আমি যে কি অসুবিধা ভোগ করিতেছি, তাহা তোমাকে কি বলিব?"

সর—"পাইয়াছি বটে, কিন্তু আনিতে পারি নাই।"

সুঃ পুঃ—"কেন? তাহাতে যে আমার বিশেষ আবশ্যক।"

সর—"সে পদক আমার হস্তগত হওয়ার পূর্ব্বেই নন্দকের হস্তগত হইয়াছিল। সুতরাং উহা নন্দকের নিকটেই রহিয়াছে।"

সুঃপুঃ—"নন্দকের নিকট হইতে কি বলপূর্ব্বক কাড়িয়া আনিতে পারিলে না?"

সর—"না। সে বীরসিংহের নিকট হইতে কে কাড়িয়া আনিবে?"

সুঃ পুঃ—"কেন চারি পাঁচ জন মিলিয়া চেষ্টা করিলেই ত আনিতে পারিতে।"

সর—"সে কাজটা কি ভাল হইত? নন্দককে কি অপমান করা উচিত?"

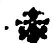
সুঃ পুঃ—"না, ভালই করিয়াছ। যদি আমি কখন ধরা পড়ি, তবে নন্দকের সাহায্যেই উদ্ধার হইব। যদি সে জানিতে পারে যে আমার লোকেরাই তাহার অপমান করিয়াছে, তবে সে আমার উপর অসন্তুষ্ট হইবে। সেই সঙ্গে সঙ্গে আমার রক্ষার উপায়ও তিরোহিত হইবে। নন্দক এখনও আমাকে ভালবাসে। নন্দক এখন কোথায়? সর্দ্দার সিং!"

সর—"নন্দককে সেইখানে বন্দী করিয়া রাখিয়া আসিয়াছি।"

সুঃ পুঃ—"সে কি সেই বনের ভিতর আবার একাকী প্রবেশ করিয়াছিল।"

সর—"হাঁ, কিন্তু সে একাকী নহে, তাহার সঙ্গে দেবদত্ত ছিল। সেও কম সাহসী নহে। নন্দককে সেই কূপসংলগ্ন পুকুরের পাড়ে বন্দী করিয়া রাখিয়া আসিয়াছি। সেখান হইতে সে কখনও বাহির হইতে পারিবে না।"

সুঃ পুঃ—"না পারুক, সে বড় দুঃসাহসী। সে নিজের প্রাণের মায়া রাখে না, বিশেষতঃ তাহার যে অদাম উৎসাহ,



তাহাতে সে আমাদিগকে আবিষ্কার করিয়া ফেলিতে পারে।"

সর—"সেই জন্য তাহাকে আটক করিয়া রাখিয়াছি।"

সুঃ পুঃ—"গত বারেও ত তাহাকে ভূগর্ভে আটক করিয়া রাখিয়াছিলে, তাহাতেই বা কি ফল হইয়াছিল ?"

সর—"গত বার চন্দনীর মাতা নন্দককে মুক্ত করিয়া দিয়াছিল, এবার আর পারিবে না "

সুঃ পুঃ—"এবারও চন্দনীর মাতা তাহাকে উদ্ধার করিবে। চন্দনীর মাতাকে ইহলোক হইতে অপসারিত করিতে আবার সচেষ্ট হও।"

সর—"হাঁ, তাহাই করা উচিত, সেই যত অনিষ্টের মূল।"

সুঃ পুঃ—"দেবদত্ত এখন কোথায় ?"

সর—"ওঃ, তাহাকে একেবারে যমের বাড়ী প্রেরণ করিয়াছি।"

সুঃ পুঃ—"বেশ করিয়াছ, সে আমার পরম শত্রু। সে তাহার স্ত্রীর জন্য না করিতে পারে এমন কাজই নাই।"

সর—"ব্যাটা সেই পদক দেখিবামাত্রই অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিল। আমার অনুচরেরা তাহাকে একেবারে যমালয়ে প্রেরণ করিয়াছে।

সুঃ পুঃ—"যাহা করিয়াছ, তাহা ভালই করিয়াছ কিন্তু—"

সর—"কিন্তু কি ? কাপুরুষেরাই পাপ করিতে ভয় পায়।"

সুঃ পুঃ—"তা ঠিক, সর্দ্দার সিং ! কিন্তু দেখ সেই আহত হওয়ার পর হইতেই আমার মনে কি একটা ভাবের উদয় হইয়াছে। সে ভাবটা বোধ হয় অনুতাপ।"

সর—"অনুতাপ ! অনুতাপের মত ক্ষুদ্র ভাব আর কিছুই নাই।"

সুঃ পুঃ—"দেখ সর্দ্দার সিংহ ! আমার অতি মহৎকুলে জন্ম। আমার পিতার অতুল ঐশ্বর্য্য। আমার ভ্রাতাকেও লোকে কত প্রশংসা করে, কিন্তু সর্দ্দার সিং ! কেবল এই পাপের জন্যই আমি মানব-চক্ষে ঘৃণার্হ হইব। নন্দকের মনেও হয়ত আমার উপর সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে।"

সর—"না, আপনার উপর নন্দকের মনে এ পর্য্যন্তও কোন সন্দেহের উদয় হয় নাই।"

সুঃ পুঃ—"সর্দ্দার সিংহ ! এইরূপে লুক্কায়িত থাকিয়া আর জীবন বহন করিতে ইচ্ছা হয় না। যে দিন হইতে আমি নন্দকের হাতে আহত হইয়াছি, সেই দিন হইতেই আমার মনের ভাবান্তর হইয়াছে। দেখ, নন্দক এখনও আমার উপর কোনরূপ সন্দেহ করে নাই, হয়ত সে আমাকে কোন নিরপরাধ সাধু বলিয়া ভাবিতেছে।"

সর—"বেশ ত, আমরা ত তাহাই চাই।"

সুঃ পু—"এতদিন চাহিয়াছি বটে, কিন্তু এখন এ সব বড় ভাল বোধ হয় না।"

সর—"সকলেইত আপনার প্রশংসা করে।"

সুঃ পু—"আমি আর এ ধর্ম্মের আবরণে



আবৃত থাকিতে পারি না। আমার ইচ্ছা করে, নন্দকের নিকট আত্মপ্রকাশ করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করি।"

এই কথা শ্রুত হইবামাত্র সর্দ্দার সিংহ দুই হস্তে কর্ণ আবৃত করিয়া পলকের মধ্যে উঠিয়া দাঁড়াইল। তৎকালে ঠিক তাহাকে ভুতের মতই দেখাইতেছিল। সে কহিল, এ কি বলিতেছেন কর্ত্তা মহাশয়! এ সর্ব্বনেশে কথা কি শুন্‌বার? আমরা যে পথে চলেছি ঠিক সেই পথেই চল্‌ব। এক চুলও নড়্‌বো না।"

সুঃ পু—আমরা শীঘ্রই প্রকাশ হইয়া পড়্‌ব।

সর—যদি প্রকাশ হয়েই পড়েন, তখন নন্দকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেই চলিবে। নন্দক আপনাকে নিশ্চয়ই ক্ষমা করিবে, কারণ সে অতিশয় বলবান্ পুরুষ। বিশেষতঃ সে আপনার পিতার অন্নেই আজন্ম প্রতিপালিত। কিন্তু চন্দনীর মাতা ও চন্দনী দুষ্ট ও নিমকহারাম, এইবার তাহাদিগকে ভালরূপে শিক্ষা দিতে হইবে যেন আর তাহারা কখনও এ রাজ্যের বায়ু বরুণ ভোগ করিতে না পারে। নন্দককে বন্দী করিয়াছি এবং দেবদত্তকে জমালয়ে প্রেরণ করিয়াছি। এই বলিয়া সর্দ্দার সিং সুন্দর পুরুষকে অভিবাদন করিয়া চলিয়া গেল।

এই ব্যক্তি যে নন্দকের পরিচিত সেই ভিষণাকৃতি ব্যক্তি, তাহা বোধ হয় পাঠক-পাঠিকাগণ অনেক পূর্ব্বেই বুঝিতে পারিয়াছেন।

সর্দ্দার সিংহ যখন বহির্গত হয়, তখন অপর কক্ষ হইতে কে গাহিতেছিল—তাহার স্বর যেমন করুণ, তেমনি মর্ম্ম-স্পর্শী।

হায়রে অশোকের বনেতে সীতা কাঁদিয়া
আকুল।
ভিজিল নয়নজলে বসন ভূষণ এলো চুল।

যে গাহিতেছিল, সে থামিয়া থামিয়া, কাঁদিয়া, কাঁদিয়া গাহিতেছিল। অতএব সে আবার গাইল—

তুমি নন্দনের আবহাওয়া
তুমি নন্দনের আবছায়ালো,
গাঁদা, যুই, বেলা, বেলি, তুমিত দিবেই
ফেলি,
শরতে কি হরষিত বসন্তজায়া?

(ক্রমশঃ)

শ্রীঅম্বুজা সুন্দরী দাস গুপ্ত, ঢাকা।

রত্ন বিসর্জ্জন।

(১)

একদা গো এক বিজন প্রান্তর
ভেদ করি চলে পথিক একা!
চলিতে চরণ পড়িছে লুটিয়া
কুঞ্চিত তাহার ললাটরেখা!

(২)

হৃদয় তাহার দিয়েছে ভাঙিয়া
কি যেন কি এক বিষাদ এসে।
সুখভরা প্রাণ, শান্তিভরা হিয়া
গেছে যেন তারা কোথায় ভেসে।

(৩)

গড় গড় নাদে পড়িছে অশনি,
ঢালিছে জলদ অগাধ বারি!
নাহিক বিরাম দিবস রজনী,
সংহার মুরতি এসেছে ধরি।

(৪)

(আজি) নাহিক সূর্য্য আকাশের গায়,
নাহিক তারকা কচিৎ কোথায়,
নাহিক চাঁদিমা নীরব নিশায়,
গাহে শুধু ঝিল্লী বসিয়া হোথা।

(৫)

অন্ধকারে ভরা আকাশ ধরণী
কোথাও নয়ন কিছু না গলে!
পথ ঘাট সব গিয়েছে ডুবিয়া
দর দর ধারে বরষা-জলে!

(৬)

বারো বেজে গেছে ঘড়িতে তখন
অন্ধকারে নিশা গেজেছে বেশ!
দস্যু তস্করাদি আনন্দে মগন,
লুটিবে যে তারা দেশ বিদেশ!

(৭)

এ হেন নিশায় প্রান্তর বাহিয়া
চলেছে পথিক গৃহের পানে।
কে যেন তাহার আশায় চাহিয়া
রয়েছে বসিয়া ব্যাকুল প্রাণে!

(৮)

নাহি লক্ষ্য তার জীবনের পানে,
প্রতি পলে মৃত্যু করিতেছে ঠিক!
তার কাছে মৃত্যু কিছুই ত নয়,
গৃহে যে মরিছে অমূল্য মাণিক!

(৯)

চলিতেছে পান্থ ভাবিতেছে মনে—
"না জানি কপালে কি আছে আজ"!
বলেছে ডাক্তার "আজি এ নিশীথে
পড়িবে তোমার কপালে বাজ"!

(১০)

কত দিন হতে পথিকের নারী
রোগের শয্যায় দিয়াছে গা ঢালি,
স্বর্ণ প্রতিমার সকল শরীরে
কে যেন আসিয়া ঢেলেছে কালি!

(১১)

আপনার মনে চলেছে পথিক,
অন্ধকারে কিছু দেখা না যায়।
সহসা কি যেন বাজিল শরীরে
"কে ও" বলে পান্থ সমুখে চায়!

(১২)

সহসা সমুখে জলদগম্ভীরে
কে যেন হাঁকিল তুলিয়া স্বর।
চমকিত পান্থ প্রান্তরের ক্রোড়ে।
ছুটিল সে স্বর ভেদি' অম্বর!

(১৩)

"কি কাজ পথিক মোর পরিচয়ে
মোর নামে স্তব্ধ ধরার প্রাণী!
লুটে পুটে লই ধনীর সম্পদ,
লোকে বলে মোরে দস্যু ভবানী।"

(১৪)

লাফ্ দিয়ে দস্যু ধরিল পথিকে
টানিল তাহারে বুকের পানে!
নীরব নিস্তব্ধ দস্যুর কবলে
ভাবে পান্থ, 'হরি, রাখ হে প্রাণে'।

(১৫)

"আমি যদি মরি বিজন প্রান্তরে
আর কোন ক্ষতি নাহিক তায়,
গৃহে যে আমার জীবন-প্রদীপ
নিভিবে তাহারে কে দেখে হায়"!

(১৬)

কহিল ভবানী, "ওহে ও পথিক
কি আছে তোমার আমায় দাও,
স্বর্ণ রৌপ্য কিম্বা হীরক মাণিক,
দাও মোরে যদি পরাণ চাও"।

(১৭)

কাঁদিয়া কহিল পথিক তখন
"নাহি মোর পাশে এখন কিছু,
তবে দিতে পারি বিবিধ রতন
এস যদি তুমি আমার পিছু"।

(১৮)

"কি আছে তোমার, কি দিবে হে তুমি,"
কহিল ভবানী, কাঁপায়ে ধরা!
"যা আছে আমার, তাই দিব আমি,
সুবর্ণ-কলস মাণিকে ভরা"!

(১৯)

"একটী মাণিক রাখিব কেবল
দিব না তোমায় সেটীকে ভাই!
সেটী যে আমার জীবনের বল,
হৃদয়ের মাঝে রেখেছি তাই"!

(২০)

এত বলি পান্থ হইল নীরব,
হাসিল ভবানী, কি জানি কেন!
লোলুপ নয়ন চাহিল বিভব
তাই সে কহিল ভাবটী হেন!

(২১)

"হে পথিক! তুমি লুকাইলে কেন
যতনে হৃদয়ে রেখেছ যারে?
দাও মোরে এনে, সে রতনখানি,
বুঝিয়া লইব বারেক তারে"!

(২২)

ভীষণ আঁধারে পথিকের আঁখি
জ্বলিল ভীষণ, প্রবল বেগে!
ভবানীর কথা পশিল শ্রবণে,
উঠিল পথিক দারুণ রেগে!

(২৩)

তখনি সে রাগ করিল দমন,
বুঝিয়া আপন অবস্থা তার।
পড়েছে সে এবে দস্যুর কবলে
জীবন উদ্ধার হয়েছে ভার!

(২৪)

নামাইয়া স্বর, কহিল পথিক
"বলো না ভবানী, বলো না আর।
সেটী যে আমার অমূল্য মাণিক!
সংসার খেলনে করেছি সার"।

(২৫)

তাও যে শায়িত অন্তিম শয্যায়,
নে'যাবে নিয়তি ভোরের বেলা!
আমিও চলিব তার সাথে সাথে
ভবের সাগরে ভাসায়ে ভেলা!

(২৬)

কি ভাবিল দস্যু শুনি এই কথা,
ক্ষণ পরে স্বরে কাঁপা'ল বন।
"আমি যদি তার রক্ষা করি প্রাণ,
বিনিময়ে তার কি দিবে ধন"?

(২৭)

পুলকে নাচিল পথিকের প্রাণ,
সুখ-দুখ মাখা ভাষায় কয়।
"তা'হলে ভবানী, সরবস্ব দিয়ে
নাচিয়া বেড়াব ভুবনময়"!

(২৮)

"সত্য দিব আমি" কর এই পণ
আমার শরীর পরশ করি"।
করিল প্রতিজ্ঞা পান্থ সেই মত,
দস্যুর শরীর করেতে ধরি।

(২৯)

"এস" বলে দস্যু হয় অগ্রসর।
পিছনে চলিল পথিকবর।
ভবনে আসিয়া হেরিল দু'জনে
ডুবেছে মাণিক, কাল-সাগরে!!

(৩০)

হৃদয় বাঁধিয়া আশার বাঁধনে
কহিল পথিক দস্যুরে তবে।
"কি দেখিছ আর ভবানী ঠাকুর?
সঞ্জীবনী মন্ত্রে জাগাও এবে"?

(৩১)

লাবণ্য-বিহীন মৃতদেহখানি
লইল ভবানী আপন ক্রোড়ে।
কি এক শিকড় ধরিল সে নাকে,
অমনি বচন ফুটিল মুখে!

(৩২)

অধরে আবার ছুটে এল হাসি
রূপে ভরে গেল দেহটী তার!
মন, প্রাণ, আত্মা দেখা দিল আসি,
দশেন্দ্রিয় কাজে মগ্ন আবার!

(৩৩)

সরম আসিল নয়নের কোণে,
ঘোমটা টানিল রমণী শিরে,
প্রভাতকুসুম ফুটিল আবার,
পথিকের অই হৃদয়ে ধীরে!

(৩৪)

পুলকিত প্রাণে, রোমাঞ্চ শরীরে
পড়িল পথিক দস্যুর পায়।
বলিল তখন, "দস্যু নহ তুমি,
ছলে ভুলাইতে এলে আমায়"।

(৩৫)

বিদ্রূপের হাসি হাসিল ভবানী,
কহিল পথিকে মধুর সুরে—
"পেয়েছ ত এবে জীবন-সঙ্গিনী,
প্রতিজ্ঞা পালিয়া পলাও দূরে"।



(৩৬)

"নিশ্চয় পালিব" বলিয়া পথিক,
রমণীরে বুকে লইল তুলি!
"রহিল বিভব, চলিলাম আমি
করেতে ধরিয়া ভিক্ষার ঝুলি।

(৩৭)

"যে ধন আমারে, দিয়েছ ঠাকুর,
তার কাছে এ সব কিছুই নয়!
লও তুমি বুঝে রতন প্রচুর,
চলিনু ঘুরিতে ভুবনময়"!

(৩৮)

এত বলি পান্থ নীরব হইয়া
বুকের রতনে বুকেতে টানে।
ফুটন্ত কপোলে দানিল চুম্বন,
উষার আলোক আসিল প্রাণে।

শ্রীসত্যেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়,
দিগনগর, নদীয়া।

হাসির কথা।

(১)

পৃথিবীর আকার—এক গ্রাম্য পাঠশালার গুরুমহাশয় বালকগণকে কহিলেন—"দেখ বালকগণ! অদ্য রবিবার। কিন্তু কেন তোমাদিগকে পাঠশালায় আনা হইয়াছে তাহা কি জান?—অদ্য ইন্‌স্পেক্টর্ সাহেব পাঠশালা দেখিতে আসিবেন। তিনি 'ভূগোল' বড় ভাল বাসেন। যদি তিনি পৃথিবীর আকার কিরূপ জিজ্ঞাসা করেন, তাহা হইলে তোমরা আমার এই নস্যাধারের ন্যায় বলিবে।"

গুরুমহাশয়ের দুইটী নস্যাধার ছিল, একটী গোলাকার, অপরটী চতুষ্কোণ। তিনি রবিবারে গোলাকারটী এবং অপর সকল বারে চতুষ্কোণটী ব্যবহার করেন। অদ্য রবিবার, তাই তিনি গোলাকারটী আনিয়াছেন।

ক্রমে ইন্‌স্পেক্টর্ সাহেব বিদ্যালয়ে পৌঁছিলেন। তিনি বালকগণকে পৃথিবীর আকার কিরূপ জিজ্ঞাসা করিলে একটী বালক সানন্দে উত্তর করিল—"মহাশয়! পৃথিবীর আকার চতুষ্কোণ, কিন্তু কেবলমাত্র রবিবারে গোলাকার হয়।"

শ্রীসরোজাক্ষ চক্রবর্ত্তী

নূতন সংবাদ।

১। যুদ্ধে আহত তুর্কী সৈন্যদিগের পরিবারবর্গের সাহায্যার্থ লেডী হার্ডিঞ্জ পূর্ব্বে ১৭,০০০ টাকা দান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সম্প্রতি তিনি পুনরায় নিম্নলিখিত দানগুলিও প্রাপ্ত হইয়াছেন:—নাভার মহারাণী ১,৫০০০৲, রাধো




প্রসাদ নারায়ণ সিং আলাহাবাদ ১০০৲, ইষ্টমাল রাউত যোধপুর ১০৲, মাণ্ডয়ার দরিদ্র মুসলমান রমণীগণ ৭৲ এবং নবাব আবদুল মাজিম ২৫০৲ টাকা দান করিয়াছেন।

২। বরদার মহারাজা গাইকোয়াড় সম্প্রতি জাপান হইতে ধাতুনির্ম্মিত এক বুদ্ধমূর্ত্তি প্রস্তুত করাইয়া আনিয়া নিজ রাজ্যে স্থাপন করিয়াছেন। জাপানের অন্তর্গত কাটোনামক স্থানে বুদ্ধের যে প্রতিমূর্ত্তি আছে, ইহা তাহারই অনুকরণে প্রস্তুত।

৩। ১লা জানুয়ারী দিল্লীর দুর্গ ও চাঁদনীচকের মধ্যবর্ত্তী প্রান্তরে সৈন্য-প্রদর্শনী হইয়াছিল। লর্ড হার্ডিঞ্জ অসুস্থতা প্রযুক্ত উপস্থিত থাকিতে পারেন নাই। তাঁহার পরিবর্ত্তে লেডী হার্ডিঞ্জ, স্যার ওমর, লেডী ক্রীশ প্রভৃতি সৈন্য-প্রদর্শনীতে উপস্থিত ছিলেন।

৪। জর্ম্মনী দেশের সমরবিভাগ এক অভিনব যন্ত্রের আবিষ্কার করিয়াছেন। এই যন্ত্রের সাহায্যে যুদ্ধের সময় চতুর্দ্দিকের অবস্থা সম্বন্ধে সুন্দর আলোক-চিত্র গ্রহণ করা যাইতে পারিবে। একটী মধ্যবিৎ আকারের হাউইএর মধ্যে একটী ছবি তুলিবার যন্ত্র, প্লেট্ ও প্যারাসুট থাকিবে। এই হাউই অনুমান ২৬০০ফিট উর্দ্ধে উঠিয়া সশব্দে বিদীর্ণ হইয়া যাইবে। তৎপরে ছবি তুলিবার যন্ত্রটী প্যারাসুটের সাহায্যে ধীরে ধীরে নামিতে থাকিবে। এই সময়ে প্লেটের উপর চতুর্দ্দিকের চিত্র অঙ্কিত হইয়া যাইবে।

৫। পুঁটীয়ার রাণী শ্রীযুক্তা হেমন্তকুমারী দেবী প্রস্তাবিত হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে দশ হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

৬। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে ডাক্তার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয় বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রতিনিধি মনোনীত হইয়াছেন।

৭। মিঃ টি, পালিত মহাশয় নব-বর্ষের উপাধি-বিতরণে স্যার উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

৮। বিগত বড় দিনের উৎসব উপলক্ষে সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ ও সম্রাজ্ঞী মেরী বিলাতের নানা স্থান হইতে ইংলণ্ডের কারখানায় ইংলণ্ডের মজুরদিগের নির্ম্মিত বহু উপহার প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইহাঁরা পূর্ব্বেই জানাইয়াছিলেন যে, এইরূপ উপহার ব্যতীত অন্য উপহার গ্রহণ করিবেন না।

৯। গত ৫ই জানুয়ারী গড়ের মাঠ হইতে একখানি বিমানবিহারী জাহাজ ৯০০ ফিট উর্দ্ধে উঠিয়া যথেচ্ছাক্রমে চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া ফিরিয়া নামিয়া আসে। পরে আরও দুই খানি ব্যোমতরণী শূন্যপথে আরোহণ করিয়া ২১০০ ফিট উর্দ্ধে উঠিয়া অদৃশ্য হইয়া যায় এবং ২০ মিনিট কাল শূন্যে ভ্রমণ করিয়া ধীরে ধীরে নামিয়া আসে। দুইজন ফরাসী ইহাদের আরোহী ও পরিচালক ছিলেন।

সমালোচনা।

মর্ম্মভেদী—শ্রীমতী সুরেশ্বরী দেবী প্রণীত ও শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ইহা পুত্রহারা জননীর মর্ম্ম-ভেদী শোকোচ্ছ্বাস। একমাত্র পুত্র হারাইয়া জননী অধীরা হইয়া লিখিয়াছেন—

মোদের নয়নমণি তুমি ধ্রুব তারা,
তোমা বিনা ভ্রমিতেছি ফণী মণিহারা।
সংসার শ্মশান প্রায়
প্রাণে শুধু হায় হায়,
নিয়ত বহিছে এবে নয়নের ধারা,
পথ নাই পাই খুঁজে হই দিশেহারা।

এইরূপ আক্ষেপ উক্তিতে প্রত্যেক কবিতা পরিপূর্ণ। জননীর এই হৃদয়ভেদী উক্তি সকলের প্রাণ স্পর্শ করিবে।

বন-প্রসূন—শ্রীমতী ভুবনমোহিনী দেবী প্রণীত। মূল্য ৴০ মাত্র। ইহা এক-খানি কবিতা পুস্তক। ইহার সকল কবিতাগুলিই সরল ও ভাবপূর্ণ। আমরা কবিতাগুলি পাঠ করিয়া আনন্দিত হইয়াছি। ধ্রুব, বুদ্ধের প্রতি, সাবিত্রী প্রভৃতি কয়েকটী কবিতা বড় মধুর হইয়াছে। লেখিকার লিখিবার বেশ শক্তি আছে। আশা করি, এই পুস্তকখানি সর্ব্বসাধারণের নিকট আদৃত হইবে।

বামারচনা।

নিবেদন।

(১)

জগদীশ!
বিশাল বিশ্বের বুকে
রাখ গো লুকায়ে মোরে।
ধরণীর মিছা মোহে
ভুলায়োনা দয়া করে।

(২)

আপন আপন করি
আপন কিছুই নয়।
সংসারের সুখ হায়
শুধু মরীচিকাময়।

(৩)

তুমিই ভরসা মম
সুখে দুখে দিবাযামী।
তোমারে সঁপিয়া প্রাণ
নির্ভীক, নিশ্চিন্ত আমি।

(৪)

যে কদিন বেঁচে রব
করিব তোমার কাজ।
কর্ম্মশেষে তব পদে
মাগি ঠাঁই বিশ্বরাজ!

শ্রীকুসুমকুমারী গুহ।

নব দেশ।

১

চল সখি! যাই মোরা সেই নব দেশে
হেথায় থাকিয়া আর
কিছুই না দেখি সার,
ছোট বড় জীব দেখ তথায় বিকাশে
চল সখি! যাই মোরা সেই এক দেশে।

২

কেমনে যাইব তথা ভাবিয়া না পাই,
কোন্ দিক কোন্ স্থান
নাহি হয় অনুমান,
একবার ভাবি পথ পাই কি না পাই,
কেমনে যাইব সেথা মনে ভাবি তাই।

৩

কাতারে কাতারে জীব যাইছে চলিয়া,
বাল বৃদ্ধ শিশুগণ
যায় চলি অগণন,
ক্লান্ত নাহি হয় কেহ সে পথ হাঁটিয়া,
কত শত জীব দেখ যাইছে ছুটিয়া।

৪

ওরা সব যেই দেশে করিছে গমন,
খুঁজিয়াছি বিশ্বধাম
নাহি পাই তার নাম,
সে দেশের নাম নাহি জানে কোন জন,
তবে কোথা এরা সব করিছে গমন।

৫

মাতৃগর্ভ হ'তে জীব লভিয়া জনম,
দিন মাস বর্ষ গতে
যায় যথা দিনে রেতে
অশ্রান্ত অনন্ত ভাবে হ'য়ে নিমগন,
যাইবারে সেই দেশে চায় মম মন।

৬

জাতিভেদ নাহি আছে যে দেশের প্রথা,
নাহি হিংসা নাহি পাপ
নাহি আছে শোক তাপ,
দ্বেষ ঈর্ষ্যা নাহি জানে যে দেশবারতা
ত্বরা করি চল সখি যাই মোরা তথা।

৭

নাহি জল, নাহি স্থল উন্নত, ভূধর,
চারি দিক শূন্যাকার
সব যাহে নির্ব্বিকার,
উপর গগনে মেঘ না করে বিহার
সেই দেশে আয় সখি যাই একবার।

৮

কত দিন আসিয়াছি না হয় স্মরণ,
ছাড়িয়া ভবের বেশ
চল যাই সেই দেশ,
অনন্তের কোলে শুয়ে আছে জীবগণ,
চল সখি করি মোরা সে দেশে গমন।

হেমাঙ্গিনী।

১৬।৪ নং মধুরায় লেন, ইণ্ডিয়ান্ প্রেসে শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও
শ্রীসন্তোষকুমার দত্ত কর্ত্তৃক ৭৯ নং আণ্টনিবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 585. May, 1912.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

৪৯ বর্ষ। ৫৮৫ সংখ্যা। | বৈশাখ, ১৩১৯। | ১০ম কল্প। ১ম ভাগ।

*বৈ	জ্যৈ	আ	শ্রা	ভা	আ
আঃ র	ম	শ	বু	শ	ম
শেঃ ৩০	৩২	৩২	৩১	৩১	৩০
সো	শু	ম	শু	সো	বু
†A	M	J	Jy.	Au.	S
‡14	14	15	17	17	17
আঃ সো	বু	শ	সো	বৃ	র
শেঃ 30	31	30	31	31	30
ম	শু	র	বু	শ	সো

সংক্ষিপ্ত নূতন পঞ্জিকা।

বঙ্গাব্দ ১৩১৯ সাল।

ফসলী ১৩১৯—২০।

হিজরী ১৩২৯—৩০।

খ্রীষ্টাব্দ ১৯১২—১৩।

শকাব্দ ১৮৩৪।

সংবৎ ১৯৬৯—৭০।

মগী ১১৭৪—৭৫।

ব্রাহ্ম সংবৎ ৮৩—৮৪।

কা	অ	পৌ	মা	ফা	চৈ
আঃ বৃ	শ	সো	ম	বৃ	শু
শেঃ ৩০	৩০	২৯	৩০	২৯	৩১
শু	র	সো	বু	বৃ	র
O	N	D	J	F	M
17	16	16	14	13	14
আঃ ম	শু	র	বু	শ	শ
শেঃ 31	30	31	31	28	31
বৃ	শ	ম	শু	শু	সো

র	ম	শ	বু	শ	ম
সো	বু	র	বৃ	র	বু
ম	বৃ	সো	শু	সো	বৃ
বু	শু	ম	শ	ম	শু
বৃ	শ	বু	র	বু	শ
শু	র	বৃ	সো	বৃ	র
শ	সো	শু	ম	শু	সো

§ ১	৮	১৫	২২	২৯
২	৯	১৬	২৩	৩০
৩	১০	১৭	২৪	৩১
৪	১১	১৮	২৫	৩২
৫	১২	১৯	২৬	
৬	১৩	২০	২৭	
৭	১৪	২১	২৮	

বৃ	শ	সো	ম	বৃ	শু
শু	র	ম	বু	শু	শ
শ	সো	বু	বৃ	শ	র
র	ম	বৃ	শু	র	সো
সো	বু	শু	শ	সো	ম
ম	বৃ	শ	র	ম	বু
বু	শু	র	সো	বু	বৃ

	বৈ	জ্যৈ	আ	শ্রা	ভা	আ
শুঃ এঃ,	১৪	১৪	১১	৮	৭	৬
পুঃ	১৮	১৭	১৫	১৩	১১	১০
কৃঃ এঃ,	৩০	২৯	২৬	২৪	২২	২১
অঃ,	৪	৩১	৩০	২৭	২৬	২৪

আঃ—আরম্ভ। শেঃ—শেষ।

শুঃ এঃ—শুক্ল একাদশী, পূঃ পূর্ণিমা

কৃঃ এঃ-কৃষ্ণ একাদশী, অঃ-অমাবস্যা

*** ১৪ই বৈশাখ শনিবার ও ১৩ই জ্যৈষ্ঠ সোমবার, শুক্ল একাদশী ১৮ই বৈশাখ বুধবার ও ১৭ই জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার পূর্ণিমা। ৩০শে বৈশাখ সোমবার ও ২৯শে জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার, কৃষ্ণ একাদশী, ৪ঠা বৈশাখ বুধবার ও ৩রা জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার অমাবস্যা ইত্যাদি।

* বৈ-বৈশাখ রবিবার আরম্ভ ও ৩০শে সোমবার শেষ। ১লা বৈশাখ ইং ১৪ই এপ্রেল।

† A এপ্রেল আরম্ভ সোমবার, শেষ ৩০শে মঙ্গলবার।

‡ ১৪ই এপ্রেল ১লা বৈশাখ, ১৪ই মে ১লা জ্যৈষ্ঠ ইত্যাদি।

§ ১লা বৈশাখ রবিবার, ২রা সোম ইত্যাদি। ১লা জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার, ২রা বুধ ইত্যাদি।

বৈশাখ রবিবার } ১, ৮, ১৫,
জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার } ২২, ২৯।

এক এক দিকে ৬টা করিয়া দুই দিকে ১২ মাসের গণনা।

	কা	অ	পৌ	মা	ফা	চৈ
শুঃ এঃ,	৫	৫	৫	৫	৫	৫
পুঃ,	১০	৯	৯	৯	৯	৯
কৃঃ এঃ,	২০	১৯	১৯	১৯	১৯	২০
অঃ	২৪	২৩	২৩	২৪	২৩	২৪

*** ৫ই কার্ত্তিক সোমবার ও ৫ই অগ্রহায়ণ, বুধবার, শুক্ল একাদশী। ১০ই কার্ত্তিক শনিবার ও ৯ই অগ্রহায়ণ রবিবার পূর্ণিমা।

২০শে কার্ত্তিক মঙ্গলবার ও ১৯শে অগ্রহায়ণ বুধবার, কৃষ্ণ-একাদশী। ২৪শে কার্ত্তিক শনিবার অমাবস্যা ইত্যাদি।

এইরূপ মধ্যম স্তম্ভের তারিখের সহিত বাম বা দক্ষিণ স্তম্ভের মাস, বার মিলাইয়া ধরিলে মাস, বার ও তিথি ঠিক হইবে।

নববর্ষ।

নববর্ষ সমাগমে মানবের মনে কত নব ভাবের উদয় হয়। এই সময়ে বিগত বৎসরের সমস্ত অবসাদ, নৈরাশ্য, দুর্ব্বলতা, ক্ষণেকের জন্য হৃদয় হইতে দূরে পলায়ন করে। যে চির দরিদ্র, নববর্ষে তার অবস্থার পরিবর্ত্তন হইতে পারে এই আশায় সে উৎসাহিত হয়। যে চিররুগ্ন, এখন হইতে সে স্বাস্থ্যের উন্নতির আশা করে। যে বার বার সকল কর্ম্মে বিফলমনোরথ হইয়াছে, সে মনে করে আগামী বৎসরে হয়ত তাহার আশা পূর্ণ হইবে। যে শোকে তাপে বড়ই কাতর, সে নববর্ষে শান্তি-লাভের আশা করে। এইরূপে নববর্ষ মানবের মনে আশার বাণী শুনাইয়া তাহাকে উৎসাহের সহিত কর্ত্তব্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত করে। যদি নববর্ষের আরম্ভ মানবের সম্মুখে এই আশার প্রদীপ না জ্বালিত, তাহা হইলে বোধ হয় মানবের কত আশা, কত উৎসাহ চির দিনের মত অতল জলে ডুবিয়া যাইত। কত প্রাণ অকালে বিনষ্ট হইয়া যাইত, কত জীবন অকর্ম্মণ্য হইয়া সংসার ও জগতের মহা অনিষ্টের হেতু হইয়া উঠিত। আশাই মানবের প্রাণ, আশাই জীবনধারণের একমাত্র উপায়, আশাই একমাত্র সকল কার্য্যের কার্য্যকরী শক্তি। এই আশার বাণী নববর্ষ আমাদিগকে ভাল করিয়া শুনায়। তাই পৃথিবীর সকলে নববর্ষকে এত সমাদরে অভ্যর্থনা করে। যে নববর্ষ আমাদের প্রাণে এইরূপে সকল বিষয়ে শক্তির সঞ্চার করিয়া আমাদিগকে আশায় উৎসাহিত করে, তাহাকে কেনা সর্ব্বান্তঃকরণে আদরের সহিত বরণ করিয়া লইতে ব্যগ্র হয়? এস নববর্ষ! আজ তুমি আমাদের শত নৈরাশ্য, শত দুর্ব্বলতা, সহস্র দুঃখ, তাপ, ও দারিদ্র্য, হৃদয়ভেদী শোকের তীব্র জ্বালা দূর করিয়া দিয়া সান্ত্বনার হস্ত বুলাইয়া ও আশার বাণী শুনাইয়া আমাদের প্রাণে ও জগদ্‌বাসীর প্রাণে অসীম শক্তির সঞ্চার করিয়া দাও। আজ আমরা আনন্দের সহিত আশাপূর্ণহৃদয়ে তোমাকে বরণ করিতেছি, আমাদের সকলের প্রাণের আশা যেন পূর্ণ হয়।

আজ যেমন এক দিকে তোমাকে আমাদের মধ্যে বরণ করিয়া লইবার জন্য প্রাণ ব্যগ্র হইতেছে, অপর দিকে আবার পুরাতন বর্ষকে বিদায় দিতে প্রাণ তেমনি আকুল হইতেছে। এই পুরাতন বৎসর এক দিন এমনি নূতন রূপ ধারণ করিয়া আমাদের সম্মুখে আসিয়াছিল, কত আশার বাণী শুনাইয়াছিল, কত আনন্দের মুখ দেখাইয়াছিল, হৃদয়ে কত শান্তি ঢালিয়াছিল, কত সুখের কল্পনায় প্রাণকে মাতাইয়াছিল, কত নব নব ভাব প্রাণে জাগাইয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। আজ আবার এই বৎসর কত সুখ দুঃখের স্মৃতি বক্ষে ধারণ করিয়া, কত প্রাণপুত্তলিকাকে হরণ করিয়া, কত প্রাণের

সুখ ও শান্তি চিরজীবনের জন্য বিনাশ করিয়া আমাদের নিকট হইতে বিদায় হইতেছে। হে নববর্ষ! তুমি একদিকে যেমন নব আশায় ও নব আকাঙ্ক্ষায় প্রাণকে আকৃষ্ট করিতেছ, অপর দিকে পুরাতন বর্ষ সেইরূপ কত সুখ দুঃখের স্মৃতি জাগ্রত করিয়া দিয়া প্রাণকে আকুল করিতেছে। আজ কাহাকে ধরিব, কাহাকে পরিত্যাগ করিব আমাদিগকে এই কঠিন সমস্যার মীমাংসা করিতে হইবে। পুরাতনকে আজ বিদায় দিতেই হইবে। কালের গতি চির দিনই এই ব্যবস্থা করিয়া আসিতেছে ও তাহা এইরূপই চলিবে। তবে আজ আর বৃথা সময়ক্ষেপ করিয়া তোমাকে ক্লেশ দিব না। নববর্ষ! এস, আজ প্রাণ ভরিয়া তোমাকে বরণ করিয়া লই ও বিশ্বপিতার চরণে প্রাণের আকাঙ্ক্ষা নিবেদন করি।

তৃষিত হৃদয়ে নাথ বিতর প্রেম বারি।
নিবার পাপ, সন্তাপ, দীনদুঃখহারী।
নবপ্রীতি নব আশা জাগাও হে প্রাণে,
সঞ্চার নব শকতি তব কর্ম্মসাধনে।
নাশ সকল বিঘ্ন (তব) কৃপা বিতরি।

শুভ নববর্ষ আগমনে প্রার্থনা।

হে ভবেশ! আজি নব বর্ষ আগমনে,
আসিয়াছি মোরা সবে তোমার চরণে।
ওহে দেব! মোরা অতি দীন দুরবল,
ধৃতিহারা, অবিশ্বাসী, চিত অ নির্ম্মল,
সংবিদ বিহনে তব শুভ ইচ্ছা নাথ!
বুঝিতে পারি না কিছু, ভ্রমি দিন রাত।
বর্ষ গত শোকে তাপে, বিক্ষিপ্ত হৃদয়,
হইল না কোনও কাজ প্রভু দয়াময়!
যাক সে অতীত, তাহা তুলে কাজ নাই,
নবীন বরষে বিভু! প্রাণে বল চাই।
তোমার মঙ্গল কার্য্য মঙ্গল নিয়ম
সাধিবারে দিও দেব! প্রাণে শক্তি মম।
কি মোরা বলিব আর তব ইচ্ছামত
আমাদের কর নাথ জীবন গঠিত।

শ্রীহরিপ্রসাদ মল্লিক,
পানিহাটী—"অক্ষয় কুটীর"।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

পার্লামেণ্টের নূতন সভ্য—সার জে, রিজ পার্লামেণ্টের গত নির্ব্বাচনে নির্ব্বাচিত হইতে পারেন নাই, সম্প্রতি উদারনৈতিক সভ্যপদপ্রার্থী মিঃ ডবসনকে পরাজিত করিয়া তিনি সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

দুর্ঘটনা—চট্টগ্রামের মিউনিসিপাল উদ্যানের মধ্যে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার

যে প্রস্তরনির্ম্মিত অৰ্দ্ধমূৰ্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল, তাহা ভূমিসাৎ হইয়া ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

পঞ্জাবে লোকসংখ্যা গণনার ফল—পঞ্জাবের লোকসংখ্যা গণনায় জানা গিয়াছে যে, তথায় নারী অপেক্ষা পুরুষ ২৫ লক্ষ অধিক। পূর্ব্বে পুরুষ ২২ লক্ষ অধিক ছিল।

জাহাজ নিরুদ্দেশ—সম্প্রতি টাইটানিকনামক একখানি প্রকাণ্ড জাহাজ বরফস্তূপে লাগিয়া জলমগ্ন হইয়া গিয়াছে, তাহাতে প্রায় ১৬ শত লোকের প্রাণ নষ্ট হইয়াছে। সিটি অব গ্লাসগো নামক আর একখানি জাহাজ হ্যালিফক্স হইতে গ্লাসগো যাত্রা করিয়াছিল। তাহাতে ১০০ শত যাত্রী ও ৯৮ জন নাবিক ছিল, কিন্তু সেই জাহাজখানির আর কোনও সংবাদ পাওয়া যাইতেছে না। অনেকে অনুমান করিতেছেন যে, এই জাহাজখানিও বরফস্তূপে লাগিয়া জলমগ্ন হইয়াছে।

পৃথিবীর পুরুষ ও স্ত্রীলোকের সংখ্যা—জর্ম্মান পণ্ডিত হারগুলিস চাম্বারক গণনা করিয়া দেখিয়াছেন যে, পৃথিবীতে ১৭০ কোটী লোকের বাস। তন্মধ্যে ১০৩ কোটী ৮০ লক্ষ লোকের তত্ত্ব অনুসন্ধান করিয়া তিনি জানিয়াছেন যে, ইহাদের মধ্যে ৫২,১৭,০০,০০০ জন পুরুষ ও ৫১, ৬৩,০০,০০০ জন স্ত্রীলোক। প্রতি সহস্র পুরুষে ৯৯০ জন স্ত্রীলোক। ইউরোপ ও আফ্রিকাতে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের সংখ্যা অধিক। প্রতি সহস্র পুরুষে ইউরোপে ১,০২১ জন ও আফ্রিকাতে ১,০৪৫ জন স্ত্রীলোক। এসিয়াতে প্রতি সহস্র পুরুষে স্ত্রীলোকের সংখ্যা ৯৬১ জন, আমেরিকাতে ৯৬৪ জন ও অষ্ট্রেলিয়াতে ৯৩৭জন। ইউগাণ্ডাতে হাজার পুরুষে স্ত্রীলোকের সংখ্যা ১,৪৬৭, আলাস্কাতে হাজার পুরুষে স্ত্রীলোকের সংখ্যা কেবল মাত্র ৩৯১ এবং মালয় ষ্টেটে ৩৮৯ জন।

প্রায়শ্চিত্ত।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

পর দিন বৈকালে মোহিত ভাবিল "বিমলাবাবু আমাকে যাইতে বলিয়া দিয়াছেন, যাইলে ভাল হয়, কিন্তু আজ থাক্।" মোহিত কিছুক্ষণ বাটীর নিকটস্থ সার্কুলার রোডে বেড়াইয়া সন্ধ্যাকালে বাটী আসিয়া নিজ কক্ষে পড়িতে বসিল। ভৃত্য নিতাই আসিয়া বলিল "আপনার এই চিঠিখানা এসেছে, ছোট বাবু দিলেন।" মোহিত পত্র লইয়া পিতার হস্তাক্ষর দেখিবামাত্র খুলিয়া পাঠ করিল। অন্যান্য সংবাদের শেষে তাহার পিতা লিখিয়াছেন "আমি একটী সুন্দরী সদ্বংশজাতা কন্যা স্থির করিতেছি, ইচ্ছা যে আগামী অগ্রহায়ণ মাসেই তোমার বিবাহ দিব এবং আশা করি যে, তুমি এবার আর আমার



বাক্য লঙ্ঘন করিবে না। তোমাকে অন্নের জন্য কখন চিন্তা করিতে হইবে না, তথাপি কেন যে তোমার বিবাহে অমত, আমি বুঝিতে পারি না, বিবাহ করিলে কি পড়া শুনা হয় না? যাহাই হউক, আমি আশা করি যে, তুমি অন্যান্য বারের মত এবারে আর আমাকে মনঃক্ষুণ্ণ করিবে না।"

মোহিত পত্রখানা বার বার পড়িল, তাহার পর টেবিলের উপরে মাথা রাখিয়া পিতাকে কি লিখিবে ভাবিতে লাগিল।

বহুক্ষণ পরে উত্তর স্থির করিয়া কল্য উত্তর লিখিব ভাবিয়া শয্যায় আসিয়া শয়ন করিল। কিন্তু সহসা তাহার মনে হইল "না এখনি লিখি।" তখনি মোহিত উঠিয়া পত্র লিখিতে বসিল।

অন্যান্য কথার পরে লিখিল "আপনি এত দিন যখন আমাকে ক্ষমা করিয়াছেন, তখন আর একটী বৎসর ক্ষমা করিবেন। বি, এল, পরীক্ষাটা দিয়া আপনার আদেশ পালন করিব। আমায় ক্ষমা করিবেন।" তখনি নিতাইকে ডাকিয়া পত্রখানা ডাকে দিতে বলিল। পরে আলোক নির্ব্বাপিত করিয়া শয্যায় শয়ন করিল। পত্রখানা নিতাই সেই রাত্রিতেই ডাকে দেয় নাই। মোহিত কিন্তু চাকরের হস্তে দিয়া মনে করিল ডাকে দেওয়া হইল, তাই নিশ্চিন্ত মনে শুইল। এ দিকে নিতাইও পত্রখানা বালিশের নীচে রাখিয়া আরামে নিদ্রা গেল।

দুই দিন পরে মোহিত সন্ধ্যাকালে বিমলাচরণ বাবুর বাড়ীতে উপস্থিত হইল। চাকর বলিল "বাবু বাড়ী নাই, উপরের ঘরে একটু বসুন, এখনি তিনি আসিবেন।"

মোহিত ভাবিল ফিরিয়া যাই। বলিল "কাল আস্‌ব, আমি এসেছিলাম বিমলা বাবুকে বলো"। চাকরটী বাবুর খানসামা, আদব কায়দা অনেকটা জানিত, সে বলিল "একটু বসুন, বাবু এই এলেন বলে।" খানসামা ছাড়িল না, অগ্রে অগ্রে উপরে উঠিল, অগত্যা মোহিতও তাহার সঙ্গে চলিল।

মোহিতকে বিমলাবাবুর বাহিরের কক্ষে বসাইয়া খানসামা বলিল "তামাক ইচ্ছা কর্‌বেন কি?" মোহিত একটু হাসিয়া বলিল "না আমি তামাক খাই না।" খানসামা চলিয়া গেল। মোহিত টেবেল হইতে একখানা পুস্তক লইয়া দেখিতে লাগিল।

পশ্চাৎ হইতে একটা অস্ফুট শব্দ শুনিয়া মোহিত ফিরিয়া দেখিল নীরজা। মোহিত হাসিয়া বলিল "নিরো ভয় পেয়েছ নাকি?" নীরজা অপ্রতিভ হইয়া বলিল, "না, আপনি কখন এলেন?"

"একটু আগে, বিমলা বাবু কখন আস্‌বেন?"

"আর বেশী দেরি নাই। আপনি এতক্ষণ একা বসে আছেন?"

"কি করিব," তারপরে একটু হাসিয়া বলিল "এইতো তুমি এসেছ, একা আর কই?"

নীরজা লজ্জিত হইয়া একটু হাসিয়া






বলিল "বাবার আস্‌তে আর বেশী দেরি নাই"। "কিরে নিরো, তোর বাবার কাজ তুই কর্‌ছিস্‌ না কি"? বলিতে বলিতে বিমলাচরণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

"তাহার পর, মোহিত বাবু অনেকক্ষণ এসেছেন নাকি?"

"আজ্ঞে না, এই একটু আগে।"

"দুদিন আসেন নাই, আমি ভাবিলাম বুঝি ভুলেই গেলেন,"

মোহিত অস্ফুট স্বরে বলিল "পড়িতে হয়, সময় অল্প" ইত্যাদি

নীরজা চলিয়া গেল। বিমলা বাবু মোহিতের সহিত নানাবিষয়ক কথোপকথন করিতে লাগিলেন। শেষে নীরজার কথা উঠিল, মোহিত তাহার অপূর্ব্ব দয়ার কথা উল্লেখ করিলে বিমলা বাবু বলিলেন "পড়ায়ও তাহার যথেষ্ট মন, খুব চমৎকার পিয়েনো বাজাইতে পারে" ইত্যাদি। শেষে আনন্দের আধিক্যে বলিলেন "চলুন, আপনাকে তাহার বাজনা শোনাই"।

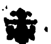
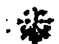
নীরজা কিন্তু বড়ই বিপদে পড়িল। সে অনেক অপরিচিত লোকের সম্মুখে পিয়েনো বাজাইয়া প্রশংসা লইয়াছে, কিন্তু এই অপরিচিতের চক্ষু তাহাকে বিনা যত্নে এতটা অধিক প্রশংসা দেয় যে, সে তাহা সামলাইয়া উঠিতে পারে না, তাই সে বড়ই গোলে পড়িল। পিতার পুনঃ পুনঃ অনুরোধে অগত্যা পিয়েনোর কাছে বসিয়া বাজাইল, কিন্তু মোহিত বাবু বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিলেন না। বিমলা বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন "মোহিত বাবু, নিরো কেমন বাজাইল?"

"অতি সুন্দর।"

নীরজার কিন্তু মনে হইল সে আজ ভাল বাজাইতে পারে নাই, আঙ্গুলগুলি আজ তেমন ছুটীতে পারে নাই, তাল আজ তেমন ঠিক হয় নাই, তথাপি মোহিত ভাল বলিল। নীরজা ভাবিল, মোহিত বাবু তাহার অযথা প্রশংসা করিলেন।

সেই দিন হইতে মোহিত প্রায় প্রত্যহই বৈকালে আসিত এবং বিমলা বাবু, নীরজা ও সুরেন্দ্রের সহিত কত গল্প করিত। নীরজার লজ্জার ব্যবধানটা ক্রমে সরিয়া গেল,সে মোহিত বাবুর নিকটে বসিয়া কত দেশের কত গল্প শুনিত, কত সম্বাদ শুনিত, কোন দিন কার্য্যগতিকে না আসিলে অনুযোগ করিত ও না আসার কারণ জিজ্ঞাসা করিত। সুরেন্দ্রও তাহার সহিত খুব মিশিয়া গেল, ক্রমে বিমলাচরণ বাবুও তাহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতে লাগিলেন। মানবের স্বভাবই এই যে, ঘনিষ্ঠতা হইলেই স্নেহ জন্মে, আত্মীয়তা হইলেই ভালবাসা জন্মে। বিমলাচরণ তাহাকে আপনি ছাড়িয়া তুমি বলা ধরিলেন। ক্রমে গিরিবালা দেবীও মোহিতের সাক্ষাতে বাহির হইতেন, সম্মুখে বসিয়া খাওয়াইতেন এবং কত স্নেহসূচক সম্ভাষণ করিতেন।

তাঁহারা সকলে মিলিয়া মধ্যে মধ্যে ইডেন গার্ডনে বেড়াইতে যাইতেন ও খালের উপর বোটে চড়িয়া বেড়াইতেন



নীরজা মোহিতের সম্মুখে গান করিত, হার্ম্মোনিয়ম বাজাইত। এইরূপে চারি পাঁচ মাস অতিবাহিত হইয়া গেল।

একদিন সন্ধ্যাকালে বিমলা বাবু মোহিতকে বলিলেন "মোহিত, তোমাকে আমি একটা গুরুতর বিষয়ে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিব, সেটা বড় গোপনীয় কথা, যার কথা সেও এখনও জানে না"। মোহিত বিস্মিত হইয়া বলিল "কি ? বলুন।" একটু ইতস্ততঃ করিয়া বিমলাচরণ ধীরে ধীরে নীরজার বাল্যজীবনের কাহিনী বিবৃত করিলেন। কিরূপ বয়সে নীরজার বিবাহ হইয়াছিল, কতদিন পরে বিধবা হয়, এবং সে নিতান্ত শিশু বলিয়া তাহার নিকট সে কথা গোপন করিয়া রাখা হইয়াছে, সমস্ত বলিলেন। মোহিতও বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইল, তাহার মুখ দিয়া একটীও কথা বাহির হইল না।

"এখন তুমি কি পরামর্শ দাও ?"

মোহিত যেন সংজ্ঞা লাভ করিয়া বলিল "কোন্ বিষয়ে পরামর্শের কথা বল্‌ছেন ?" "আমি মনে করিতেছি তাহার পুনর্ব্বার বিবাহ দিব। তুমি কি মত দাও ?" "বিবাহ দেবেন ?" কপালের ঘর্ম্ম মুছিয়া মোহিত বলিলেন "হিন্দু সমাজে এ বিবাহ চলবে কি ?" "হিন্দু সমাজ ? প্রয়োজন ? এক গাছি সূতা এখনও বাপের ভয়ে আছে, যে দিন নীরজার বিবাহ দিব, সে দিন সেই গাছিও ফেলিয়া দিব।"

"এরূপ বিবাহ কি কেহ করিবে ?"

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বিমলা বাবু বলিলেন "ভট্টাচার্য্যের তনয় না করিতে পারে, কিন্তু তদপেক্ষা সহস্র গুণে শ্রেষ্ঠ, সুশিক্ষিত পাত্র দুষ্প্রাপ্য হইবে না"।

মোহিতকে বহুক্ষণ নীরব দেখিয়া বিমলাচরণ বলিলেন "তুমই বেশ বিবেচনা করিয়া দেখ না, এতে কি দোষ ? যে বালবিধবা স্বামার নাম জানে নাই, প্রায় চক্ষেও দেখে নাই, তার বিবাহ দেওয়া কি সাধারণ বিধবাবিবাহের সঙ্গে তুলনীয় হইতে পারে ? যে সময়ে তার অতি শৈশবকাল, একটা কুসংস্কারের বশে তাহার আত্মীয়রূপী শত্রুতে যদি সেই অজ্ঞানাবস্থায় তাহার বিবাহ দিয়া দেয়, সে স্বামীর মৃত্যু হইলে কি সে বালিকাকে বিধবা বলে ? না তাহাকে বিবাহ করিলে পাপ স্পর্শে ? স্বামী বলে যখন তার বোধ পর্য্যন্ত জন্মে নাই, কিসের জন্য সে চির-জীবনের বৈধব্যে ব্রতী হইবে ?"

বিমলা বাবু মোহিতকে কোন উত্তর দিতে না দেখিয়া বলিলেন "তবে আজ এ প্রসঙ্গ থাক্, অন্য দিন হবে।" মোহিত বলিল "আজ্ঞা হঁ্যা, আমি আজ আসি।"

"সে কি, তোমার যে আজ এখানে নিমন্ত্রণ ? আহার করিয়া যাও।"

"আজ থাক্, কাল হবে।" বলিতে বলিতে মোহিত সত্বর সেই কক্ষ হইতে বাহির হইল।

বিমলা বাবু কিয়ৎক্ষণ বিষণ্ণ ভাবে বসিয়া রহিলেন। মোহিতের কাছে তিনি এরূপ ভাব আশা করেন নাই।



নীরজা একমনে বসিয়া পড়িতেছিল, পদশব্দে চাহিয়া দেখিল মোহিত চলিয়া যাইতেছে। সে আসিয়া বলিল "মোহিত বাবু, আমার এ অঙ্কটা একটু বুঝিয়ে দিন্ না"। মোহিত স্থিরনেত্রে নীরজার মুখের দিকে চাহিয়াছিল। সে ভাবিতেছিল "নীরজা বিধবা সত্য, কিন্তু তাহার তাহাতে দোষ কি ?" এ তাহার আত্মীয় দিগের দোষ, তাহার পিতামহের দোষ। সর্ব্বোপরি আমার ভাগ্যের দোষ, তাহার দোষ কি ?"

নীরজা বলিল "বসুন না"। মোহিত বলিল "আজ থাক্ কাল"—

নীরজা হাসিয়া বলিল, "কাল বসবেন ? আজ সমস্ত রাতটা বুঝি দাঁড়িয়ে থাক্‌বেন ?"

"হ্যাঁ,—না, নীরজা—নীরজা, তোমার দোষ কি ?"

দ্বিগুণ হাসিয়া নীরজা বলিল "কি দোষ আমার ? স্বপ্ন দেখ্‌ছেন বুঝি ? বসুন"।

"আজ নয় কাল।" এই বলিয়া মোহিত দ্রুতপদে চলিয়া গেল।

নীরজা বিস্মিত হইল। অভিমানে তাহার চোখে এক ফোঁটা জলও আসিল।

নবম পরিচ্ছেদ।

মোহিত সাত আট দিন বিমলাচরণ বাবুর বাটীতে গেল না। এত দিনের মধ্যে সে একটা কথাও স্থির করিতে পারিল না। বিমলা বাবু তাহাকে একটা পরামর্শের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন মাত্র, তথাপি মোহিতের মনে হইতেছিল যে, তিনি তাহার মস্তকে এক মহাভার চাপাইয়া দিয়াছেন। নীরজা সুন্দরী, সুশীলা, শিক্ষিতা, ধনীর কন্যা, তাহার বিবাহের জন্য পাত্রের ভাবনা নাই। মোহিত সে ভাবনা ভাবে নাই, সে তাহার নিজের ভাবনা ভাবিতেছিল।

সে কি করিবে ? কোন্ পথে চলিবে ? কেহ তাহাকে কোন আশা দেয় নাই, তথাপি সে বহুদিন হইতে যেন কিছু আশা করিয়া বসিয়া আছে। সে এখন তাহা বেশ বুঝিতে পারিল, তাহা না হইলে বিমলাবাবু নীরজার বিবাহের কথা উত্থাপন করাতে তাহার আপনার ভাবনা আসিয়া জুটিবে কেন ? আর মনকে চোখ্ টিপিলে চলিবে না, জীবনের সমস্ত গতিটা ভাল করিয়া বুঝিয়া একটা পথ ধরিয়া চলিতে হইবে। মোহিত নিজে বুঝিতেছে যে, বিমলাবাবুর এ বিবাহ দেওয়া কিছুই অন্যায় নয়, নীরজারও ইহাতে কোন পাপ নাই, সে স্বামীর কিছুই জানে না। যে তাহাকে বিবাহ করিবে, সেও সৌভাগ্যশালী, তবু তাহার মনের মধ্যে পিতার মলিন মুখ, সমাজ, বিষম জাগিতেছিল। মোহিত অস্থির হইয়া উঠিল।

আবার হৃদয়ের কোণ হইতে ধীরে ধীরে একখানি জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি আঁধার আকাশের গায়ে চন্দ্রের ন্যায় উদয় হইল, তাহার আলোকে সমস্ত অন্ধকার দূরে পলাইয়া গেল। এ মূর্ত্তির

কাছে বুঝি আর সমস্ত কিছুই নয়। পিতার অসন্তোষ, সমাজ, নিন্দা, অর্থ, কলহ, সমস্ত এক কোণে ক্রমশঃ ক্ষুদ্রাকার হইয়া গেল, মোহিত উঠিয়া বসিল।

নীরজা এ কয় দিন মনে মনে খুব রাগ করিয়া রহিল। "মোহিত বাবু আসিলে আর কথা কহিব না, পিয়ানো বাজাইব না, গান গাহিব না"। ক্রমে যত দিন যাইতে লাগিল, তত রাগটাও মন হইতে একটু একটু করিয়া চলিয়া যাইতে লাগিল। মোহিত বাবু সাত আট দিন আসিলেন না, অসুখ হয় নাই তো? নীরজার রাগ ভয়ে পরিণত হইল। সে সুরেন্দ্রকে খোঁজ লইতে বলিল। সুরেন্দ্র বলিল "আজ রাস্তায় আমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল, ভাল আছেন, বল্‌লেন কাল যাব।" নীরজা আশা করিয়া রহিল "কাল নিশ্চয় আসিবেন।"

কল্য আসিল এবং চলিয়া গেল। মোহিত আসিল না। নীরজার মনে আবার তাহার উপর অভিমান হইল। তখন তাহার মনে হইল "আমার উপর রাগ করেন নাই তো"। তারপরে মনে পড়িল, সে দিন তিনি কি দোষের কথা বলিতেছিলেন, "হয়ত আমি কোন দোষ করেছি"। নীরজা ব্যাকুলা হইল।

কয়েক দিন পরে মোহিত আসিয়া ধীরে ধীরে একখানি চেয়ারে বসিল। নীরজা অলক্ষ্যে চাহিয়া দেখিল, বেশ প্রফুল্ল মুখ, স্নেহোৎফুল্ল নয়ন, শরীরে কোন গ্লানির চিহ্ন নাই, তখন গম্ভীর মুখে নীরজা রাগ করিয়া রহিল। মোহিত তাহার অভিমান বুঝিতে পারিয়া স্নেহপূর্ণ কণ্ঠে কহিল "নিরো, রাগ করেছ বুঝি? এতদিন আমার মনটা বড় খারাপ ছিল, তাই আস্‌তে পারি নাই।" নিরজা দেখিল হাস্যপূর্ণ মুখ, তবুও চোখের কোলে কে যেন কালী ঢালিয়া দিয়াছে। নীরজা বলিল "মন খারাপ ছিল, কোনো অসুখ করেছিল কি?" মোহিত পূর্ব্বের মত হাসিয়া বলিল "নিরো! অসুখ না হ'লে বুঝি মন খারাপ হয় না?" "তা হয়, তবে আপনার মন খারাপ হয়েছিল কেন, মোহিত বাবু?"

"তুমি শুনে কি কর্‌বে?"

"শুনে আবার কি ক'রব, এমনি শুন্‌ব, বল্‌বেন না?"

মোহিত কম্পিতকণ্ঠে বলিল "আজ থাক্, আর এক দিন বল্‌ব।"

"সে দিন কি বল্‌ছিলেন 'নীরজা তোমার দোষ কি?' সে কথাটাও বল্‌বেন না?"

"এক দিন ব'ল্‌ব, তবে আজ নয়, নিশ্চয় ব'ল্‌ব, রাগ করো না নিরো"।

নীরজা রাগ করিত, কিন্তু মোহিতের সস্নেহ স্বরে রাগটা তেমন যোগাইল না।

(ক্রমশঃ)

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী।




সর্ব্বানন্দদায়িনী

মাতৃরূপা নারী তুমি দুর্ল্লভ জগতে
ভারত পবিত্র গেহে কর অধিষ্ঠান।
ভগিনীরূপিণী তুমি ধন্য এ মহীতে
ভুলিতে পারে কে তব স্নেহের সে দান?
পত্নীরূপে হে রমণি! বিরাজিত যবে,
প্রেমের কিরণে দীপ্ত আঁধার সংসার।
ল'ভে নিরমল শান্তি অশান্তমানবে,
দুহিতৃরূপেতে তুমি প্রীতিপ্রদায়িনী,
শান্তি, সুখ, দাও যবে আনন্দদায়িনি!

পানিহাটী "অক্ষয়কুটীর,"
শ্রীহরিপ্রসাদ মল্লিক

৺ উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের আত্মজীবনী

অনুসন্ধানে জানা গেল স্কুলসমূহের ডেঃ ইনস্পেক্টর জগৎ বাবুর পুত্র পুলিসের ইনস্পেক্টর। জগৎ বাবু আমাকে খুব স্নেহ করিতেন এবং আমাদিগের কার্য্যে তাঁহার অত্যন্ত সহানুভূতি ছিল। তিনি পুত্রকে ডাকাইয়া আমাকে তাঁহার পরিচিত করিয়া দিলেন এবং আমাদিগকে সহায়তা করিতে বিশেষ করিয়া বলিলেন। পূর্ণ বাবু এক দিন নির্দ্দিষ্ট করিয়া আমাদিগকে হরিনাভিতে থাকিতে বলিলেন এবং সেই দিন তিনি ইনস্পেক্শনে আসিবেন জানাইলেন। আমরা সেই দিন আসিয়া দেখি গ্রামে হুলস্থুল পড়িয়াছে এবং জমীদারের লোক ও পুলিসের লোক এথায় সেথায় দলবদ্ধ রহিয়াছে।

গ্রামের সব লোকের জমীদারের রায়ে রায়, স্থানীয় পুলিসও উৎকোচ দ্বারা বশীভূত, ইনস্পেক্টরের এজাহারে সকলেই বলিল—ব্রাহ্মসমাজ ত এখানে কখনও ছিল না, এ গৃহ পাড়ার রক্ষাকালী পূজার গৃহ।

ইনস্পেক্টর উভয় পক্ষের জবানবন্দী লইয়া পুলিসের উপর খুব শাসাইয়া গেলেন। পরে আমরা সাক্ষাৎ করিলে বলিলেন, দেখ আমি সকলই বুঝিতেছি। কিন্তু যাহার দখল আছে, তাহা রক্ষা করাই আমাদের কার্য্য, আমরা স্বত্বাস্বত্ব মীমাংসা করিতে পারি না। আপনারা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট অভিযোগ করুন, আমি যতদূর সাধ্য সহায়তা করিব। আর যাহারা আপনাদের ধর্ম্মে আঘাত করিয়াছে, তাহারা সহজে এড়াইতে পারিবে না।

আমাদের না আছে সহায়, না আছে সম্বল। ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া তাঁহার কার্য্যে লাগিলাম। আদালতে ২।১টী বন্ধুও পাইলাম। যাঁহাদের নাম আসামী-



শ্রেণীভুক্ত করা হইয়াছিল, তাঁহাদের নামে সমন গেল।

নালিসের পূর্ব্বে গ্রামে মহা জনরব হইয়াছিল যে আমরা গ্রামে পদার্পণ করিলে প্রহারিত হইব, মাথা কাটা যাইবে। মোকর্দ্দমার দিন আদালতে গিয়া দেখি জমীদারের সহিত গ্রামের প্রধান প্রধান লোক সেখানে উপস্থিত। জমীদার আমাকে দেখিবামাত্র হাত যোড করিয়া বলিলেন "আপনি রক্ষা করেন ত রক্ষা—আপনাকে রক্ষা করিতেই হইবে"। আমি এ অবস্থা দেখিয়া কি বলিব ভাবিয়া পাইলাম না। আমি বলিলাম "আপনাদের কোনও অনিষ্ট হয় সে ইচ্ছা আমার কিছুমাত্র নাই। আমরা নিরাশ্রয় গরিব লোক—একটী ঈশ্বরোপাসনার স্থান করিয়াছি, আপনারা তাহাতে কেন হস্তা হন। তাহাতে আমাদের উপাসনা করিতে দিলেই সব গোল মিটিয়া যায়। জমীদার তখন আমার অনেক গুণস্তুতি করিয়া বলিলেন "দেখুন আপনি সব বুঝেনত, আপনারা যে স্থানে উপাসনার স্থান করিয়াছেন সে পাড়ার মধ্যস্থলে, মেয়েরাও তাহার চারি দিকে যায় আসে। আমি গ্রামের প্রান্তে এক খণ্ড জমী মৌরসী পাট্টা করিয়া আপনাকে দিতেছি, তথায় উপাসনাগৃহ নির্ম্মাণ করুন। আর যত দিন গৃহ না হয়, তত দিন আমার উদ্যানবাটী আপনাদের অধিকারে থাকিবে, আপনারা স্বচ্ছন্দে আসিয়া তথায় উপাসনাদি করিবেন। আমি আপনাদের উপাসনার পক্ষ বই বিপক্ষ নহি।" এই বলিয়া তিনি নালিস তুলিয়া লইবার জন্য কাকুতি মিনতি করিতে লাগিলেন। জমীদার যে কি অন্যায় কার্য্য করিয়াছিলেন তাহা আগে বুঝেন নাই, পরে উকীলদের মত লইয়া বুঝিয়াছিলেন যে ধর্ম্মবিদ্বেষীর কার্য্যের অতি গুরুতর দণ্ড, তাহাতেই ভয় পাইয়াছিলেন।

আমরা যখন বলিলাম "আমাদের নিজের একটু স্থান পাওয়াই আবশ্যক। তাহা কবে কিরূপে হইবে? তাহা না হইলেত মোকর্দ্দমা তুলিতে পারি না।" তিনি বলিলেন "এখানে ইহার সব প্রস্তুত"। এই বলিয়া কেদার বাবুর খুড়া ও বৈমাত্রেয় ভ্রাতা সঙ্গে ছিলেন, তাঁহাদের দ্বারা তাঁহাদের একখানি জমীর পাট্টা লেখাইলেন এবং সেইখানেই তাহা রেজিষ্টারী হইল। আমরা মোকর্দ্দমা তুলিয়া লইলাম জমীদার স্বদলে আমাকে অম্বরেব সহিত ধন্যবাদ দিয়া গৃহে প্রস্থান করিলেন।

(ক্রমশঃ)

মার্সি মারভিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

ডিসেম্বর মাস, ভীষণ শীত, সমস্ত দিন তুষারপাতে লণ্ডনের রাজপথ অতিশয় কর্দ্দমাক্ত হইয়াছে। যেন সমস্ত লণ্ডন



নগরী ঘন কুয়াষার আবরণে বিষণ্ণ ও মলিন হইয়াছে। সেদিন অন্য দিন অপেক্ষা সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে মারসি কার্য্য হইতে অবসর প্রাপ্ত হইয়াছিল। সে বাটীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া অন্য কোন বিষয়ে মনোনিবেশ না করিয়া এক বাতায়ন সন্নিধানে উপবেশন করিয়া একখানি পুস্তকপাঠে রত হইল। সে দিন অন্য দিন অপেক্ষা তাহার মন কেন অধিক-তররূপে নিস্তেজ ও দুর্ভাবনাগ্রস্ত হইয়া উঠিয়াছিল, মারসি নিজেই তাহা বুঝিতে পারিল না। সে পুস্তকপাঠে মনোনিবেশ করিয়া মানসিক অবসাদ দূর করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। এ দিকে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনীভূত হইয়া আসিলে যখন লণ্ডনের রাজপথ বৈদ্যুতিক আলোকে আলোকিত হইল, তখন সোপানশ্রেণীতে কাহার দ্রুতপদবিক্ষেপ ধ্বনি ধ্বনিত হইল। পরক্ষণেই কে একজন মারসির গৃহের দ্বারে করাঘাত করিতে লাগিল। বাটীর চাকরাণী কোন কার্য্যহেতু গৃহে প্রবেশ প্রার্থনা করিতেছে ভাবিয়া অন্য-মনস্কভাবে মারসি বলিল—

"ভিতরে আইস"। মারসির এই কথা উচ্চারিত হইবামাত্র সহসা দ্বার উদ্ঘাটিত হইল। লর্ড মারভিল স্বয়ং মারসির সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। মারসি লর্ড মারভিলকে সহসা সম্মুখে দর্শন করিয়া বিস্ময়ে ও আনন্দে অর্দ্ধমূর্চ্ছিতাবস্থায় চীৎকার করিয়া বলিল—

ষ্টিফেন, ষ্টিফেন। এ কি? এ! তুমি?"

লর্ড মারভিল স্নেহপূর্ণ স্বরে উত্তর করিলেন—

"হাঁ, প্রিয়তম মারসি, আমি তোমার নিকটে পুনরায় ফিরিয়া আসিয়াছি"।

এই কথা বলিয়া লর্ড মারভিল কিছুক্ষণ নীরবে মারসির সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিলেন। মারসিও কিছুক্ষণ একটিও কথা কহিতে পারিল না। গভীর আনন্দে উভয়ের হৃদয় সবেগে স্পন্দিত হইতে লাগিল। অবশেষে মারসি আর নীরব থাকিতে না পারিয়া কম্পিত স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"ষ্টিফেন, ষ্টিফেন, তুমি কি বিবাহিত হইয়াছ?"

লর্ড মারভিল উত্তর করিলেন—

"না। প্রিয়তম মারসি, আমি আজিও বিবাহিত হই নাই। অধিকন্তু এলোইস আমাকে বাগ্দান-বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়াছে। মারসি, মারসি, আমাকে ভর্ৎসনা করিও না। কারণ তুমি ভর্ৎসনার ভাবে ভ্রুকুটি করিতেছ। আমি স্বয়ং আমাদের বাগ্দান-বন্ধন ভঙ্গ করি নাই। এলোইস স্বয়ং ইহা ভঙ্গ করিয়াছে। যেই মাত্র এলোইস আমাকে বাগ্দান-বন্ধন হইতে মুক্ত করিল, সেই মুহূর্ত্তে আমি তোমার নিকট দৌড়িয়া আসিয়াছি। এক্ষণে বল প্রিয় মারসি, তুমি আমাকে কবে বিবাহ করিবে?"

লর্ড মারভিল এই কথা বলিয়া মারসির মনের কথা জানিবার জন্য তাহার নয়নের




প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলেন। মারসি সলজ্জভাবে উত্তর করিলেন—

"ষ্টিফেন, যে দিন তুমি বলিবে: সেই দিনই আমি তোমাকে বিবাহ করিব। কিন্তু এরূপ শুভ সংবাদ সহসা বিশ্বাস হইতেছে না। আমি সম্পূর্ণ বিস্মিত হইয়া গিয়াছি"।

লর্ড মারভিল বলিলেন—

"তোমাকে অত্যন্ত শীর্ণ দেখাইতেছে। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই আমি তোমার ম্লান গণ্ডদেশে লোহিত গোলাপ ফুটাইয়া তুলিতে সক্ষম হইব"। মারসি বলিল—

"ষ্টিফেন, কিন্তু আমি কিছুই ভালরূপ বুঝিতে পারিতেছি না। কেন এলোইস তোমাকে বিবাহ করিতে অস্বীকৃত হইল? কেন সে তোমাকে বাগ্দান-বন্ধন হইতে মুক্ত করিল? আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না"।

লর্ড মারভিল মৃদু হাস্য করিয়া বলিলেন—

"সমস্ত বিবরণ শ্রবণ করিলে তোমারও মন বদলাইয়া যাইবে। আমি আর লর্ড উপাধিধারী ব্যক্তি নাই। আমি লর্ড উপাধি হইতে বঞ্চিত হইয়াছি। বল, প্রিয় মারসি আমি আর লর্ড উপাধিধারী ব্যক্তি নহি, সেজন্য কি আমি তোমারও প্রেমলাভে বঞ্চিত হইব?"

"মারসি উত্তর করিল—

আমি শুনিয়া সুখী হইলাম যে, তুমি এক্ষণে আর লর্ড উপাধিধারী নহ। তোমার লর্ড বন্ধুরা আর বলিতে পারিবেন না যে, তুমি উচ্চ শ্রেণীস্থ লোক হইয়া একজন সামান্য নগণ্য বালিকাকে বিবাহ করিয়াছ। এক্ষণে আমরা দুই জনেই সামান্য লোক

(ক্রমশঃ)

মহাসমুদ্রে দুর্ঘটনা।

জাহাজ ভঙ্গ।

১৫৯৫ জন আরোহী জলমগ্ন।

কয়েক মাস হইল, ইংলণ্ডে "টাইটানিক" নামক একখানা জাহাজ নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইংলণ্ডেশ্বরী মহারাণী মেরী এই জাহাজ ভাসান ক্রিয়া সম্পাদন করিয়াছিলেন। তখন এই জাহাজের নির্ম্মাণপ্রণালী দেখিয়া লোকে বলিয়াছিল, "শোলা জলে ডুবিতে পারে, কিন্তু এই জাহাজ কখনও ডুবিতে পারে না।" বিগত ১০ই এপ্রিল বুধবার এই জাহাজ ইংলণ্ড হইতে আমেরিকা অভিমুখে প্রথম যাত্রা করে, এবং ১৫ই রাত্রিকালে আটলাণ্টিক মহাসাগরে ভাসমান বরফ-স্তুপের সংঘর্ষণে ইহা খোলার কুচির ন্যায় ডুবিয়া যায়। মানুষের গর্ব্বের এই মূল্য।



মানুষের বুদ্ধিতে যাহা হইতে পারে তাহা সমস্তই করা হইয়াছিল। জাহাজখানা ৫৮৮ হাত দীর্ঘ ও ৬১ হাত প্রশস্ত, যাত্রী ও মাল্লাতে ৩৫০০ জন লোক এই জাহাজে বাস করিতে পারিত। প্রথম শ্রেণীর ৫৫০, দ্বিতীয় শ্রেণীর ৪০০ ও তৃতীয় শ্রেণীর ৫০০ যাত্রী একই সময়ে আহারে বসিতে পারিতেন, জাহাজে এমন স্থান ছিল। জাহাজের এক তলা ও দুই তলাতে ভ্রমণের দুই মাইল দীর্ঘ পথ ছিল। যে কোন যাত্রী অবাধে এই দুই মাইল পথ ভ্রমণ করিতে পারিতেন। জাহাজের মধ্যে ব্যায়াম করিবার জন্য এক বৃহৎ ঘর ছিল। এই ঘরে ব্যায়ামের উপযোগী সর্ব্ব প্রকার সরঞ্জাম ছিল। এতদ্ব্যতীত স্কোয়াস খেলিবার জন্য আর এক ঘর ছিল। জাহাজের মধ্যে স্নানের বিবিধ বন্দোবস্ত ছিল। কেহ টারকিস স্নান, কেহ তাড়িত স্নান, কেহ বা সন্তরণের পর স্নান করিতেন। সন্তরণের জন্য জাহাজের মধ্যে এক সরোবর ছিল। টারকিস স্নানের জন্য উষ্ণ ও শীতল জলের ভিন্ন ভিন্ন জলাধার ছিল। এই স্থানে পরম রমণীয় মর্ম্মরপ্রস্তরনির্ম্মিত প্রস্রবণ হইতে অবিরত জলধারা পতিত হইত।

স্নানান্তে যাত্রিগণ আহার-গৃহে যাইতেন। সে ঘর বৃহৎ, সুন্দর, ও নানা সাজ সজ্জায় অলঙ্কৃত।

ভূমণ্ডলের যথায় যত উৎকৃষ্ট ফল ও অন্যান্য আহার্য্য দ্রব্য পাওয়া যায়, সমস্তই যাত্রীদের জন্য সংগৃহীত হইত। আহারের পর অনেক যাত্রী তামাক সেবনের গৃহে প্রবেশ করিতেন। সে ঘর মেহগিনি কাষ্ঠে নির্ম্মিত। ইহার পর যাত্রিদল জাহাজের বারন্দায় যাইয়া সমুদ্রের অনন্ত নীলাম্বুর শোভা সম্ভোগ করিতেন। বারান্দার রেলিং নানাজাতীয় সুন্দর লতায় আচ্ছাদিত। তাহাতে কেমন সুন্দর ফুল ফুটিয়া থাকিত।

ইহার পর যাত্রীরা বৃহৎ বৈঠকখানায় যাইয়া পরস্পরের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিতেন।

যাত্রীদের জন্য পড়িবার ও লিখিবার ঘর ছিল, পাঠগৃহে কত পুস্তক, কত সংবাদ-পত্র ছিল। বিনা তারে পৃথিবীর নানা দেশের সংবাদ সংগ্রহ করিয়া জাহাজের মধ্যে সংবাদপত্র প্রকাশ করা হইত। পাঠের ও লিখিবার ঘরে বড় বড় জানালা ছিল, সে জানালার মধ্য দিয়া নীলাম্বুর গম্ভীর সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া প্রাণ পুলকিত হইয়া উঠিত।

জাহাজের শয়ন, দরবার ও পোষাক ঘর প্রভৃতি পৃথিবীর মধ্যে অতুলনীয়। যে দেশের যাহা উৎকৃষ্ট, তাহারই অনুকরণে এই সকল নির্ম্মিত হইয়াছে। জাহাজের মধ্যে গৃহের সুখ সম্ভোগ আর কোথাও সম্ভব ছিল না। মানুষ ভাবিয়াছিল, তাহার জ্ঞান বুদ্ধিকে কেহ পরাস্ত করিতে পারিবে না। রাত্রি ১০ টার সময় এই ভীমকায় অদ্বিতীয় জাহাজের তলদেশে বরফস্তূপের সংঘর্ষণ হয়, আর রাত্রি



২টার সময় আটলাণ্টিক মহাসাগরের বারিরাশির তলে ১৫৯৫ জন যাত্রী ও নাবিক সহ জাহাজখানি নিমজ্জিত হয়। এমন বৃহৎ, এমন দ্রুতগামী, এমন সুখৈশ্বর্য্যপূর্ণ জাহাজ ভূমণ্ডলে আর হয় নাই। আশা ছিল ১৭ই তারিখ এই জাহাজ আমেরিকায় পহুছিবে, কিন্তু ১৫ই তারিখেই জলমগ্ন হইল।

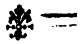
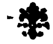
স্থান ও সময়ের দূরত্ব দূর করিবার জন্য জগন্ময় এক মহা আকুলতা দেখা যাইতেছে। তাই স্থলে রাস্তা, রেল পথ প্রভৃতি, জলপথে অসংখ্য অর্ণবযান এবং আকাশমার্গে বায়ুযান নির্ম্মিত হইতেছে ইউরোপ এবং আমেরিকা পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত, কিন্তু এই দুই মহা দেশের মধ্যে এক বিশাল মহাসমুদ্র থাকায় পরস্পরের মধ্যে অনেক ব্যবধান রহিয়াছে এই ব্যবধান এবং দূরত্ব হ্রাস করিবার জন্য প্রতিনিয়ত কত নূতন নূতন উন্নত প্রণালীর জাহাজ প্রস্তুত হইতেছে এবং নূতন নূতন জলপথও আবিষ্কৃত হইতেছে। সকলেরই প্রাণপণ চেষ্টা এই যে, কাহার জাহাজ সর্ব্বাগ্রে যাইতে পারে। বৎসরের মধ্যে এপ্রিল মে ও জুন এই তিন মাসে অর্থাৎ বসন্তকালে ইউরোপ ও আমেরিকার অনেক লোক দেশভ্রমণে বহির্গত হন, এবং এই সময় দ্রুতগামী জাহাজ সকল শীঘ্র যাইবার জন্য আটলাণ্টিকের উত্তর প্রান্তের পথ দিয়া যাতায়াত করে। উত্তর মেরুতে যে সকল বরফ পুঞ্জীভূত হয়, সেই সকল বরফস্তূপ এই সময় ভাঙ্গিয়া উত্তর মহাসাগরে পতিত হয় এবং ক্রমশঃ দক্ষিণ দিগে ভাসিয়া গিয়া অবশেষে উষ্ণ মণ্ডলে উপনীত হয় ও তথায় গলিয়া যায়।

গত ৪ঠা এপ্রিল তারিখে টাইট্যানিক যখন প্রথম বাহির হইয়া সাউথাম্টনের বন্দরে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন সহস্র সহস্র লোক এই জাহাজ দেখিবার জন্য তীরে সমবেত হইয়াছিল। কে তখন জানিত যে ঠিক এক পক্ষ পরেই এত বড় জাহাজ পৃথিবীর এতগুলি ধনকুবেরকে বক্ষে ধারণ করিয়া আটলাণ্টিকের মধ্যে চিরদিনের জন্য অদৃশ্য হইয়া যাইবে?

টাইট্যানিক্ বন্দরে আসিলে ইউরোপ ও আমেরিকার বহুসংখ্যক লোক এই জাহাজে চড়িয়া আমেরিকা বেড়াইয়া আসিতে ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। আমেরিকার বহু ধনকুবের ত অনেক আগে হইতেই এই জাহাজে চড়িয়া বাড়ী যাইবার জন্য ইংলণ্ডে বসিয়াছিলেন। সকলেরই প্রাণের ইচ্ছা এই যে, পৃথিবীর এই অদ্বিতীয় জাহাজের প্রথম যাত্রাতেই তাঁহারা তাহাতে আরোহণ করেন। এই আত্মপ্রসাদের জন্য বহু লোক এই জাহাজের যাত্রী হইয়াছিলেন। বসন্তকালে আটলাণ্টিক মহাসাগরের উত্তর দিয়া সকল প্রসিদ্ধ যাত্রী জাহাজ যাতায়াত করিয়া থাকে। ডাঙ্গায় যেমন কাহার ঘোড়া আগে যাইতে পারে ইহা লইয়া ঘোড়দৌড় হয়, সেইরূপ আটলাণ্টিক মহাসাগরেও এই সময় অনেক প্রসিদ্ধ কোম্পানীর জাহাজসমূহের মধ্যে রীতি মত "দৌড় বাজী" লাগিয়া যায়। যে সকল




প্রসিদ্ধ জাহাজ কোম্পানী এই দৌড় বাজীতে পাল্লা দিয়া থাকেন, তাহাদিগের মধ্যে "কানার্ড," "হোয়াইট ষ্টার" এবং "হামবার্গ আমেরিকা লাইন"ই প্রধান। ইঁহাদিগের প্রত্যেকেরই এই পথের জন্য দুই খানা করিয়া জাহাজ আছে—কিন্তু হোয়াইট ষ্টারের অলিম্পিক্ ও টাইট্যানিক সকলকে পরাস্ত করিয়াছে। এবার টাইট্যানিকের বৃত্তান্ত পড়িয়া সকলেই এই জাহাজে যাত্রা হইয়া চলিয়াছিলেন। হোয়াইট ষ্টার লাইনের চেয়ারম্যান মিঃ ইস্‌মেও স্বয়ং এই প্রথম যাত্রায় এই জাহাজে যাত্রী ছিলেন। তিনি নিজে উপস্থিত থাকিয়া জাহাজের তত্ত্বাবধান করিতেছিলেন। সকলেই মনের আনন্দে ইন্দ্রপুরী সদৃশ এই বিশাল জাহাজে নিউইয়র্কের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। কেহই কল্পনা করিতে পারেন নাই যে, ভবিতব্য তাঁহাদিগের জন্য কি ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছিলেন। ইংলণ্ড এবং স্কট্‌ল্যাণ্ডের সীমা ছাড়াইয়া আটলাণ্টিকের মধ্য দিয়া ক্রমে জাহাজ উত্তর পথ দিয়া যাইতে লাগিল। এ পর্য্যন্ত কখনও এ পথে কোনও বিপদ হয় নাই বলিয়া কাহারও প্রাণে বিপদের কোন চিন্তারও উদ্রেক হয় নাই। তাহা ছাড়া আকাশে কোনও দুর্যোগের লক্ষণ ছিল না। নক্ষত্রশোভিত আকাশের নীচে মহাসাগরের জলরাশি একখানা নীল বসনের ন্যায় পড়িয়াছিল। প্রকৃতিতে প্রলয়ের কোন চিহ্ন ত দূরের কথা, কোথায়ও একটু প্রবল বায়ু পর্য্যন্ত ছিল না। সমুদ্রের বিশাল বক্ষ নীরব, নিস্পন্দ, স্থির, কোথায়ও ঊর্ম্মির লেশ ছিল না। একজন যাত্রী বলিয়াছেন যে, ঠিক পুকুরের জলের ন্যায় সমুদ্রের বারিরাশি নির্ব্বাত নিষ্কম্প হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। আর মাথার উপর অনন্ত আকাশ ব্যাপিয়া অগণ্য তারকা-রাজি যেন দীপমালা জ্বালিয়া রাখিয়াছিল। এমতাবস্থায় কেহ কল্পনাও করিতে পারে নাই যে, তাহাদিগের আসন্ন বিপদ উপস্থিত হইয়াছে। রাত্রির আহারাদির পরে যাত্রীদিগের অনেকেই যে যাহার কক্ষে চলিয়া গিয়াছিলেন, কেহবা ধূমপান-কক্ষে বসিয়া ধূমপান করিতেছিলেন, কেহ কেহ বা দল বাঁধিয়া তাস খেলিতেছিলেন, কেহ কেহ বা সঙ্গীতে নিযুক্ত ছিলেন। এইরূপে সকলেই আপন আপন ইচ্ছানুযায়ী আমোদে কাল কাটাইতেছিলেন। এদিকে জাহাজ দ্রুতবেগে নীলাম্বুরাশি ভেদ করিয়া আপনার গন্তব্য পথে চলিতেছিল। মিঃ ইস্‌মে ও জাহাজের কাপ্তেন মিঃ স্মিথ্ পরামর্শ করিয়াছিলেন যে, ১৭ই এপ্রিল রাত্রিকালে তাঁহারা নিউইয়র্কে জাহাজ পৌঁছাইয়া দিবেন, এইজন্যই জাহাজ খুব দ্রুতগতিতে চলিতেছিল। আকস্মিক বিপদ হইতে পারে, একথা কাহারও মনে উদয় হয় নাই। যাহা হউক জাহাজ চলিতে চলিতে রাত্রি প্রায় সাড়ে দশটার সময় হঠাৎ কিসে যেন একটু ধাক্কা লাগিল। যাত্রীরা সকলেই প্রায় তখন জাগিয়াছিলেন, কিন্তু ধাক্কা এত মৃদু

বোধ হইল যে কেহ তাহা অনুভবই করিতে পারেন নাই। তাহার পরমুহূর্ত্তেই আবার একটা ধাক্কা একটু জোরে লাগিল। এবারও অনেকে মনে করিলেন যে হয়ত ভাসমান বরফস্তূপের সহিত জাহাজের সংঘর্ষণ হইয়াছে এবং ইহা বিপদজ্জনক নহে মনে করিয়া কেহ কোন শঙ্কা করিলেন না। কিন্তু ইহার প্রায় দশমিনিট পরে হঠাৎ জাহাজের ইঞ্জিন প্রভৃতি সব বন্ধ হইয়া গেল। তখন যাত্রীদিগের মধ্যে মিঃ বার্ড নামক জনৈক ভদ্রলোক ব্যাপার কি জানিবার জন্য উপরে গেলেন। বলা বাহুল্য, তিনি তখন কল্পনাও করিতে পারেন নাই যে তাঁহাদিগের আসন্নকাল উপস্থিত। চলিতে চলিতে হঠাৎ জাহাজের গতিরোধ হওয়ায় তিনি ভাবিলেন যে নিশ্চয়ই কোনও গুরুতর ব্যাপার উপস্থিত হইয়াছে এবং সেই জন্যই জাহাজ চলা বন্ধ হইয়াছে। মিঃ বার্ড তখন কৌতূহল পরবশ হইয়া প্রকৃত ঘটনা জানিবার জন্য তাড়াতাড়ি ক্যাবিন হইতে বাহির হইয়া জাহাজের উপরিভাগে গেলেন, কিন্তু কোথায়ও কোন প্রকার জনতা বা আতঙ্কের চিহ্ন দেখিতে পাইলেন না। তিনি কেবল দেখিলেন যে জাহাজের ডেকের উপর কাপ্তেন ও নাবিকগণ মিলিয়া জটলা করিতেছে, বাহিরে আকাশ ও জল, কোথায়ও কোন চাঞ্চল্যের চিহ্ন নাই, কেবল জাহাজের দুই পার্শ্বে বরফস্তূপ ভাঙ্গিয়া যাইতেছে। তাই দেখিয়া মিঃ বার্ড ভাবিলেন যে হয়ত এই বরফস্তূপের সহিত জাহাজের সংঘর্ষণ হওয়ায় কাপ্তেন সতর্কতা অবলম্বন করিবার জন্য জাহাজ থামাইয়া দিয়াছেন। এই মনে করিয়া তিনি পুনরায় আপনার ঘরে ফিরিয়া আসিলেন। আসিবার সময় অন্য কোনও যাত্রীর সহিত তাঁহার দেখা হইল না, সকলে মনের আনন্দে যে যার ঘরে আমোদ প্রমোদ করিতেছিলেন। একদল লোক খেলিবার ঘরে বসিয়া তাস খেলিতে ছিলেন, মিঃ বার্ড তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনারা কিছু জানেন কি, জাহাজ হঠাৎ থামিল কেন?" তাহারা খেলিতে খেলিতেই উত্তর করিল "কি জানি কেন থামিল, আমরা কেবল একটু ধাক্কা টের পাইয়াছি।" মার কোলে শিশু যেমন আপনাকে নিরাপদ মনে করে জাহাজের সকলেই আপনাদিগকে তেমনি নিরাপদ মনে করিতেছিলেন। মিঃ বার্ড সব দেখিয়া শুনিয়া নিজের ক্যাবিনে ফিরিয়া আসিলেন, কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই জাহাজে বিপদের ঘণ্টাধ্বনি বাজিয়া উঠিল। বিনা মেঘে বজ্রাঘাত হইলে মানুষ যেমন স্তম্ভিত ও হতবুদ্ধি হইয়া যায়, জাহাজের যাত্রিগণ হঠাৎ এই ঘণ্টাধ্বনি শুনিয়া বিস্মিত ও হতবুদ্ধি হইয়া পড়িল। আর একটু পরেই কাপ্তেনের গম্ভীর স্বর শুনা গেল। তিনি বলিলেন—"যাত্রিগণ! জীবন বাঁচাইবার কোমর বন্ধ পরিয়া ডেকের উপরে এস।" তখন যে যেখানে যে ভাবে ছিল সকলেই লাইফ বেল্ট পরিয়া কাপ্তেনের আদেশ মত







জাহাজের ডেকে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। তখন সকলে বুঝিতে পারিলেন যে তাঁহারা কি বিষম বিপদে পতিত হইয়াছেন বরফস্তূপের সহিত জাহাজের সংঘর্ষণ হওয়ায় তাহার তলদেশ ফাটিয়া গিয়াছে এবং সেইখান হইতে হু হু শব্দে জল জাহাজে প্রবেশ করিতেছে। বৈজ্ঞানিক উপায়ে বর্ত্তমান সময়ে এমন সকল কল আবিষ্কৃত হইয়াছে যে জাহাজের তলদেশ ফাটিয়া গেলেও জাহাজের ক্যাবিনগুলির মধ্যে কোনমতেই জল প্রবেশ করিতে পারে না। ট্যাইট্যানিক জাহাজেরও এইরূপ ব্যবস্থা ছিল। এই ব্যবস্থার ফলে জাহাজ কোনমতেই সমুদ্রে ডুবিতে পারে না। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এই জাহাজের তলদেশে জল প্রবেশ করিয়া সেই শীতল জল ইঞ্জিনের বয়লারের সংস্পর্শে আসাতে সমুদয় বয়লার ও টারবাইনগুলি ফাটিয়া গেল এবং তাহার ফলে জাহাজ খানি দুই খণ্ড হইয়া গেল। তখন আর জলের গতিরোধ করে কাহার সাধ্য? এই ভীষণ অবস্থা উপলব্ধি করিবা মাত্র কাপ্তেন বিপদের ঘণ্টা বাজাইয়া দিলেন এবং মুহূর্ত্তমাত্র সময় নষ্ট না করিয়া বিপন্ন যাত্রীদিগের প্রাণ বাঁচাইবার ব্যবস্থা করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি মার্কনি যন্ত্রের সাহায্যে সমুদ্রের চারিদিকে বিনাতারে আপনাদিগের বিপন্ন অবস্থার সংবাদ প্রেরণ করিতে লাগিলেন। বিপদের সময় মানুষের জাতীয় চরিত্রের শিক্ষা এবং মহত্ত্বের পরিচয় পাইবার যেমন সুযোগ ও সুবিধা হইয়া থাকে, এমন আর কোন অবস্থাতেই হয় না। এই ভীষণ বিপদের সময় টাইট্যানিকের নাবিক, কাপ্তেন এবং কর্ম্মচারীগণ যে অমানুষিক বীরত্ব, সাহস, ধীরতা এবং নির্ভীকতার পরিচয় দিয়াছেন, পৃথিবীর ইতিহাসে চিরকাল তাহা স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত হইয়া থাকিবে। কাপ্তেন স্মিথ যখন বুঝিলেন যে আর কিছুতেই জাহাজ রক্ষা হইবার উপায় নাই এবং কখন সাহায্য উপস্থিত হইবে এবং হয় ত হইবে কি না তাহারও কোন ঠিকানা নাই, তখন তিনি নিমেষের মধ্যে আপনার কর্ত্তব্য অবধারণ করিয়া লইলেন এবং সকলের আগে স্থির করিলেন যে নিজের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। যিনি নিজের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী জানিয়া আপনার দায়ীত্ব এবং কর্ত্তব্য ধীর ও স্থির চিত্তে সম্পাদন করিতে পারেন, তিনি সকলের পূজ্য ও নমস্য। শুধু কি কাপ্তেন স্মিথ এইরূপ করিয়াছিলেন? তাঁহার জাহাজের অশিক্ষিত নাবিকেরা পর্য্যন্ত যে সাহস এবং বীরত্বের পরিচয় দিয়াছে, তাহা পাঠ করিতে করিতে সর্ব্ব শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে।

জাহাজের এই বিপন্ন অবস্থার কথা মার্কনি যন্ত্রের সাহায্যে চারিদিকে পাঠান হইতে লাগিল এবং জাহাজ হইতে ঘন ঘন হাউই ছোঁড়া হইতে লাগিল। আশা এই যে, যদি কোনও সমুদ্রগামী জাহাজ এই সংবাদ পায় অথবা হাউই দেখিতে পায়, তাহা হইলে উহা উদ্ধার করিতে






আসিবে। এদিকে জাহাজের মধ্যে প্রবল বেগে জল উঠিতে আরম্ভ করিল। তখন জাহাজের ডেক সমুদ্র হইতে ৪৬ হাত উচ্চ ছিল, কাপ্তেন নাবিকদিগকে এক এক করিয়া জলিবোটগুলি নামাইতে বলিলেন। জাহাজে যাত্রী ও নাবিক সর্ব্বশুদ্ধ ২৩৪০ জন লোক ছিল, কিন্তু যে পরিমাণ বোট ছিল তাহাতে ৯০০ শত জনের অধিক লোক ধরিবার স্থান ছিল না, সুতরাং ইহা স্থির হইল যে সকলের প্রাণ রক্ষা হইবে না। এই সময় কি ভয়ানক! এখন আরোহীদের মধ্যে কে মরিবে আর কাহাকে বাঁচিতে দেওয়া হইবে, তাহা স্থির করিতে হইবে। ২৩৪০ জন লোকের মধ্যে কেবলমাত্র ৯০০ শত লোক বাঁচিতে পারে, এই ৯০০ জনের নির্ব্বাচন কেমন করিয়া হইবে? জগতের লোক আজ স্তব্ধ হইয়া শুনিতেছে যে এই মহামূহূর্ত্তে, এই জীবন মরণের সন্ধিস্থলে, যাত্রীর মধ্যে একজনও আপনার জীবন বাঁচাইবার জন্য লজ্জাজনক ব্যাকুলতা দেখা যায় নাই। জাহাজে বহু ধনকুবের ছিলেন, পৃথিবীর অদ্বিতীয় ধনী কর্ণেল আষ্টর প্রমুখ আমেরিকার অনেক ধনীলোক এই জাহাজে ছিলেন, ইচ্ছা করিলে অগণিত ধনরত্ন দিয়া তাঁহারা আপন আপন জীবন রক্ষা করিতে পারিতেন। কিন্তু ধন্য তাঁহাদিগের শিক্ষা,সভ্যতা এবং মনুষ্যত্ব,মৃত্যুকে সম্মুখীন দেখিয়াও কেহ বিচলিত হইলেন না—কেহ আপনার প্রাণ বাঁচাইবার কিম্বা ব্যাকুলতা দেখাইলেন না।—সেই ভীষণ বিপদে যাহার যেখানে কাজ ছিল সে সেই থানে দাঁড়াইয়া কাপ্তেনের আদেশ পালন করিয়াছে এবং আপনার কর্ত্তব্য সাধন করিয়া মহাসাগরের লবনাম্বুরাশির মধ্যে অনন্ত কালের জন্য বিশ্রাম লাভ করিয়াছে। আজ সমগ্র সভ্য জগৎ তাহাদিগের এই অদ্ভুত কর্ত্তব্যপরায়ণতা এবং ত্যাগস্বীকারের বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া অশ্রুজলের সহিত তাহাদিগের উদ্দেশে কৃতজ্ঞতা অর্পণ করিতেছে।

সকলে ডেকের উপর সমবেত হইল কাপ্তেন জলদ গম্ভীর স্বরে বলিলেন, যাত্রীদিগের মধ্যে যাঁহারা পুরুষ তাঁহারা পিছাইয়া যান আগে স্ত্রীলোক এবং শিশুদিগের প্রাণ রক্ষা করিতে হইবে। এই আদেশ শুনিয়াই পুরুষেরা পিছাইয়া গেলেন। তখন স্ত্রীলোক এবং শিশুদিগকে তাড়াতাড়ি কিছু খাওয়াইয়া দেওয়া হইল কারণ ইহারা জলিবোটে অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য অকুল সমুদ্রে ভাসিবে। কোথায় যাইবে, তাহার স্থিরতা নাই। মহাসাগরের তরঙ্গরাশি যে দিকে ভাসাইয়া লইয়া যাইবে সেই দিকেই ইহারা ভাসিতে ভাসিতে যাইবে। তাহাদের আশা এই যে, যদি সমুদ্রগামী কোনও জাহাজ তাহাদিগকে দেখিতে পায় তাহা হইলে তাহাদিগের উদ্ধার হইবে। বোটে মানুষের যাইবার স্থান নাই সুতরাং আহার্য্য ও পানীয় কোথায় রাখিবে? এই জন্য সকলকে তাড়াতাড়ি পেট ভরিয়া খাওয়াইয়া দেওয়া হইল



তখন একখানি জলিবোটে স্ত্রীলোক এবং শিশুদিগকে পুরিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইল। এই সময়কার হৃদয় বিদারক দৃশ্য বর্ণনা করা যায় না। স্বামীর বক্ষ হইতে স্ত্রীকে ছিনাইয়া লওয়া হইল, পিতার কোল হইতে কন্যাকে কাড়িয়া লওয়া হইল এবং এইরূপে বলপ্রয়োগ করিয়া স্ত্রীলোকদিগকে বোটে পাঠান হইতে লাগিল। অনেক স্ত্রীলোক কিছুতেই আপন স্বামীকে ফেলিয়া বোটে গেলেন না, তাঁহারা স্বামীর সঙ্গে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিলেন। নাবিকেরা কিছুতেই সেই স্ত্রীলোকদিগকে বিচ্ছিন্ন করিতে পারিল না। সীমাহীন আকাশ যেমন সীমাহীন বারিধিকে সেই অসীমের মধ্যে আলিঙ্গন করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল তেমনি এই সকল কল্যাণী সাধ্বী রমণী আপন আপন স্বামীর বক্ষে মাথা রাখিয়া অনন্ত কালের মত সেই অসীমের মধ্যে ডুবিয়া যাইবার জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করিলেন। মানুষের যুক্তি তর্ক তাঁহাদিগকে স্বামীর আলিঙ্গন হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে পারিল না। রমণী! তোমার এই প্রেমের পরাকাষ্ঠা, সতীত্বের কাহিনী চিরদিন ইতিহাসের পৃষ্ঠা অলঙ্কৃত করিয়া রাখিবে। যে সকল অন্ধ তার্কিক বলে যে প্রেম ও সতীত্ব শুধু দেশ বিশেষেরই সম্পত্তি, আজ তাহারা চক্ষু মেলিয়া দেখুক যে প্রেম এবং নিষ্ঠা দেশ কাল এবং পাত্রে আবদ্ধ নহে। ইহা সমগ্র বিশ্বের গৌরব এবং রমণী হৃদয়ের সর্ব্বস্ব, ইহা সকল দেশে এবং সকল স্থানেই সমানভাবে সুগন্ধ বিতরণ করে এবং এই তাপদগ্ধ পৃথিবীতে স্বর্গের সঙ্গীত শুনায়।

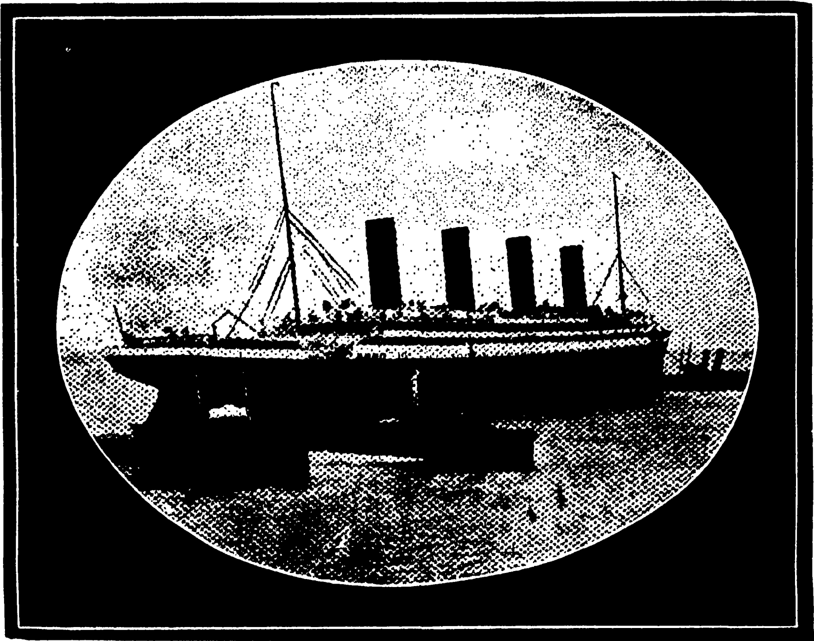
আমেরিকার ধনকুবের কর্ণেল অ্যাষ্টর এবং যুক্তরাজ্যের সভাপতি মিঃ টাফটের এডিকং মেজর বাট্, এই দুইজনে অনেক স্ত্রীলোককে বোটে উঠাইয়া দিতে সাহায্য করিতে লাগিলেন। অ্যাষ্টর আপনার স্ত্রীকে ও অনেক রুগ্ন ও ভয়বিহ্বলা রমণীকে বোটে উঠাইয়া দিলেন এবং শেষ পর্য্যন্ত অসীম উৎসাহের সহিত এই উদ্ধার কার্য্যে ব্যাপৃত রহিলেন, কিন্তু একবার ভ্রমেও নিজেকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিলেন না। কি মহান স্বার্থ ত্যাগ! এই জাহাজে আর এক মহাপ্রাণ বড়লোক ছিলেন। কাউণ্ট টলষ্টয়ের পর সমগ্র ইউরোপ মহাদেশে এমন মহাপ্রাণ ব্যক্তি আর দ্বিতীয় ছিলেন না। ইনি সুবিখ্যাত রিভিউ অব্ রিভিউ পত্রিকায় প্রথিত নামা সম্পাদক মিঃ ষ্টেড্। জগতের যেখানে দুঃখ, এবং অবিচার—যেখানে প্রবল দুর্ব্বলের উপর অত্যাচার করিয়াছে, সেইখানেই মহামতি ষ্টেড্ জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে অত্যাচার দমন করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া যাইতেন। দীন দুঃখীর এমন বন্ধু আর কেহ নাই। এই মহাপ্রাণ সম্পাদক এই জাহাজে যাত্রী ছিলেন। আমেরিকায় একটী কংগ্রেস হইতে ছিল, সেই কংগ্রেসে যোগ দিবার জন্য মিঃ ষ্টেড এই জাহাজে







পরহিতৈষী ও মহাত্মা উ. টি. ষ্টেড



টাইট্যানিক জাহাজ।

আমেরিকা যাইতেছিলেন, তাঁহার মৃত্যুর বিশেষ বিবরণ কিছুই বাহির হয় নাই। একজন নাবিক সেই ভীষণ রজনীতে ষ্টেড্‌কে জাহাজের রেলিং ধরিয়া একবার দাঁড়াইতে দেখিয়াছিল। আবার কেহ কেহ বলেন যে ষ্টেড্ যখন দেখিলেন যে বাঁচিবার আর কোন উপায় নাই তখন ধীরে ধীরে আপনার ক্যাবিনে যাইয়া দরজা বন্ধ করিলেন, সেই হইতে আর কেহ তাঁহাকে দেখে নাই। আবার কেহ কেহ বলেন যে জাহাজ যখন ডুবিয়া গেল তখন কর্ণেল আষ্টর এবং ষ্টেড্ উভয়ে সাঁতার দিয়া একটী কাঠের ভেলা ধরিয়াছিলেন, কিন্তু শেষে বরফ জলে একেবারে অবশাঙ্গ হইয়া ধীরে ধীরে অতলজলে ডুবিয়া গিয়াছেন। এইরূপে জগতের দুইজন অদ্বিতীয় লোক মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে একজন অদ্বিতীয় ধনী। ইনি বিলাসিতার ক্রোড়ে লালিত পালিত হইলেও এই ভীষণ দুর্দ্দিনে মৃত্যু অবধারিত জানিয়াও নিজের প্রাণকে তুচ্ছ করিয়া অসংখ্য গরীব রমণীর প্রাণ বাঁচাইয়াছেন এবং শেষে আপনার স্ত্রীকে বোটে উঠাইয়া দিয়া নিজে নাবিকদিগের সহিত সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। আর একজন আজীবন গরীব দুঃখীর জন্য সংগ্রাম করিয়া শেষে জীবনের শেষ মুহূর্ত্তে যখন দেখিলেন যে নিজে জীবন দান করিলে আর একটী অসহায় গরীবের প্রাণ রক্ষা হইতে পারে তখন তিনি সেই নিস্তব্ধ রজনীতে ধীরে ধীরে অপরের অলক্ষ্যে আপনার কক্ষে যাইয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলেন। পাছে সেই মরণোন্মুখ যাত্রীদিগের ভীষণ আর্ত্তনাদ শুনিয়া বীরের হৃদয় বিচলিত হয়, তাই বোধহয় মহাত্মা ষ্টেড্ সকলের অজ্ঞাতে আত্মগোপন করিয়া নিজের কক্ষে যাইয়া দ্বার রুদ্ধ করিলেন এবং পলকে পলকে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। শেষে যখন বুঝিলেন যে সব শেষ হইয়া গিয়াছে তখন আষ্টরের সহিত নিজেও সমুদ্রে ঝাঁপ দিলেন।

আর একটা প্রাণস্পর্শী দৃশ্য এই :— এক নারী স্বামীকে ছাড়িয়া কিছুতেই যাইবেন না। স্বামী বলিলেন "প্রিয়তমে! বাড়ীতে আমাদের অসহায় সন্তানগুলি রহিয়াছে। তাহাদের মুখ স্মরণ করিয়া তুমি আপনার প্রাণ রক্ষা কর।" সন্তানের কথা স্মরণ করিয়া সে নারী কান্দিতে কান্দিতে তখন নৌকায় উঠিলেন।

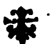
১০ জন নারী স্বামীর আদেশ লঙ্ঘন করিতে না পারিয়া নৌকায় উঠিলেন। তাঁহাদের স্বামিগণ জাহাজের সহিত জলমগ্ন হইলেন। যে নারী স্বামীর জন্য অনায়াসে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে পারে, সেই নারীর চক্ষের সম্মুখে স্বামী জলে ডুবিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। ১০ জন নারী বিধবা হইলেন।

আর এক অদ্ভুত কাহিনী বাহির হইয়াছে, ইহা মার্কনি যন্ত্রে যে কর্ত্তব্যপরায়ণ যুবক তারহীন সংবাদ প্রেরণ করিতেছিল তাহার। জাহাজ ডুবিতে আরম্ভ করিলে




কাপ্তেন স্মিথ ইহাকে ক্রমাগত চারিদিকে বিপদের বার্ত্তা প্রেরণ করিতে আদেশ করিয়াছিলেন। যুবক অবিচলিত ধৈর্য্য ও অধ্যবসায় সহকারে আপনার ক্যাবিনে বসিয়া তার পাঠাইতেছিল। বাহিরে বাঁচিবার কত আয়োজন হইতেছে, বোটে উঠিয়া মানুষ আত্মরক্ষা করিতেছে—কিন্তু যুবকের সে দিকে ভ্রূক্ষেপ নাই, একাগ্রমনে কাপ্তেনের আদেশ পালন করিতেছে। জাহাজ ক্রমে ক্রমে প্রায় ডুবিয়া আসিল, এই সময় বহুদূর হইতে কার্পেথিয়া নামক জাহাজ সংবাদ পাঠাইলেন যে ভয় নাই, তোমাদের বিপদের সংবাদ পাইয়াছি, উদ্ধারের জন্য রওনা হইলাম। এই সম্বন্ধে যুবকের মুখ আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল, কিন্তু যন্ত্র ছাড়িয়া যাইবার আদেশ ছিলনা, সুতরাং যুবক সেখানে বসিয়া আপনার কর্ত্তব্য করিতে লাগিল। ক্রমে যুবকের ক্যাবিনের মধ্যে জল আসিল, ঢেউয়ের পর ঢেউ আসিয়া যুবকের পাদমূল ধৌত করিতে লাগিল। এই সময় কাপ্তেন আসিয়া বলিলেন "যুবক! তুমি তোমার কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিয়াছ, এখন নিজের প্রাণ বাঁচাও"। ইহার নাম মিঃ ফিলিপ, দুঃখের বিষয়, ইহার প্রাণ রক্ষা হয় নাই। বহুদিন পূর্ব্বে ইংরাজ বালক ক্যাসাবিয়াঙ্কার কর্ত্তব্যপরায়ণতার কাহিনী পড়িয়াছিলাম এবং মনে আছে পড়িতে পড়িতে চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইয়াছিল। আজ আবার কতকাল পরে আর এক ক্যাসাবিয়াঙ্কার কাহিনী পড়িয়া চক্ষের জল রাখিতে পারিতেছি না। ধন্য সেই জাতি, যে জাতির মধ্যে বিপদের সময় শত শত, সহস্র সহস্র ক্যাসাবিয়াঙ্কা দেখা দেয় এবং আপনার কর্ম্মস্থলে দাঁড়াইয়া কর্ত্তব্য পালন করিতে করিতে হাসি মুখে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে। এ জাতি বড় হইবে না ত জগতে কে বড় হইবে?

জাহাজখানা ডুবিবার পরে আর এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখা গিয়াছিল। সে দৃশ্য অতি ভয়াবহ; যাহারা সাঁতার জানিত তাহারা সাঁতার দিয়া বোটের নিকট আসিল, যাহারা বোটে ছিল তাহারা প্রাণপণে অনেককে টানিয়া তুলিল এবং যতক্ষণ মানুষ ধরে ততক্ষণ মজ্জমান ব্যক্তিদিগকে বোটে উঠাইতে লাগিল। শেষে যখন আর বোটে স্থান নাই তখন মজ্জমান ব্যক্তিরা হাত তুলিয়া বলিল "আর না, আর না, আমরা আর তোমাদিগকে বিপন্ন করিব না—ভগবান তোমাদিগকে রক্ষা করুন, আমাদিগকে বিদায় দাও।" কি আশ্চর্য্য শিক্ষা ও সংযম! কি শোকাবহ দৃশ্য! বোটে এবং ভেলার উপর যাহারা ভাসিতেছিল তাহারা সকলে ঠেসাঠেসি করিয়া পিঠে পিঠ ঠেকাইয়া বসিয়াছিল। এমন কি একটু জোরে নিঃশ্বাস পড়িলেও নৌকা ডুবিয়া যাইত। রাত্রি প্রভাতে যখন কার্পেথিয়া জাহাজ ইহাদিগকে উদ্ধার করিতে আসিল তখন কেহ মুখ ফিরাইয়া সে জাহাজের দিকে চাহিয়া দেখিতেও পারে নাই, পাছে মুখ ফিরাইতে গেলে



নৌকা উল্টাইয়া যায়। তাহার পর কাপ্তেন স্মিথের কথা। ইঁহার সাহস, বীরত্ব এবং কর্ত্তব্যপরায়ণতার কথা চিরদিন সকলের মনে জাগরূক থাকিবে। এখন জানা যাইতেছে যে এই বিপদ ঘটিবার কিছু পূর্ব্বেই টাইটানিকের টেলিগ্রাফ কর্ম্মচারী রাত্রিতে হঠাৎ এক তার পাইলেন যে নিকটেই প্রকাণ্ড দুইটী বরফস্তূপ ভাসিয়া আসিতেছে। টাইটানিকের অগ্রগামী কোনও জাহাজ অপরাপর জাহাজকে সতর্ক করিয়া দিবার জন্য বিনা তারে এই সংবাদ পাঠাইয়াছিলেন। এই সংবাদ পাইবামাত্র টেলিগ্রাফ কর্ম্মচারী জাহাজের কাপ্তেনকে উহা জানাইয়াছিলেন এবং কাপ্তেনও একজন লোককে মাস্তুলের উপর হইতে সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে বলিয়াছিলেন। কিন্তু সেই লোকটী যখন বরফস্তূপ দেখিতে পাইল তখন জাহাজ থামাইবার আর সময় ছিল না। দেখিতে দেখিতে বিশালকায় জাহাজ পূর্ণবেগে বরফস্তূপের উপর আসিয়া পড়িল এবং তাহার পর যে কারণে উহা নিমেষের মধ্যে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িল তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। স্মিথ যখন এই বিষম বিপদের গুরুত্ব উপলব্ধি করিলেন এবং দেখিলেন যে জাহাজ বাঁচাইবার আর কোনও উপায় নাই, তখন মানুষের যাহা সাধ্য তাহা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। জাহাজে অনেক ক্রোরপতি ছিলেন, ইচ্ছা করিলে কাপ্তেন নিজের জীবন বাঁচাইতে পারিতেন, তাহা ছাড়া দুই এক জন ক্রোরপতির জীবন রক্ষা করিয়া নিজেও লক্ষপতি হইতে পারিতেন। বিপদের সময় জাতীয় চরিত্রের সমুদয় ভাব এবং প্রকৃতি যেমন সহজে বাহির হইয়া পড়ে, এমন আর কোন সময়েই হয় না। এই বিষম দুর্দ্দিনে কাপ্তেন স্মিথের আচরণ দেখিয়া ইংরাজ চরিত্রের মহত্বে ও বীরত্বে সমগ্র হৃদয় আনন্দে এবং বিস্ময়ে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। তিনি নিমেষের মধ্যে কর্ত্তব্য স্থির করিয়া লইলেন। মার্কনি যন্ত্রের পরিচালককে মহাসমুদ্রের চারিদিকে এই বিপদের বার্ত্তা জানাইবার জন্য নিযুক্ত করিয়া এবং অধস্তন কর্ম্মচারী ও নাবিকগণকে লইয়া যাত্রীদিগের প্রাণ বাঁচাইবার ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। সকল যাত্রী যখন ডেকের উপরে সমবেত হইল তখন ধনী দরিদ্র নির্ব্বিশেষে তিনি অকম্পিত কণ্ঠে সকলকে কহিলেন "পুরুষেরা পিছাইয়া যাও আগে স্ত্রীলোক ও শিশুদিগের প্রাণ রক্ষা করিতে হইবে।" ইহাদের অধিকাংশই দরিদ্র, আর যাহাদের পিছু সরাইয়া দিলেন তাহারা অগাধ ঐশ্বর্য্যের অধিকারী, কিন্তু তাহাতে কি হইবে?—জাহাজের চিরন্তন রীতি রক্ষা করিতে হইবে দুর্ব্বলকে আগে বাচাইতে হইবে - নিজের প্রাণ দিয়া নারীকে রক্ষা করিতে হইবে—এ সে নীতি নয় যে নীতিতে বলিয়াছে,

আত্মানং সততং রক্ষেৎ
ধনৈরপি দারৈরপি।



তার পর ধীরে ধীরে জাহাজ ডুবিতে লাগিল। স্মিথ্ তখনও জাহাজের সেতুর উপর দাঁড়াইয়া চারিদিকের ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন এবং নাবিকদিগকে কর্ত্তব্য পালনে উৎসাহ দিতে লাগিলেন। এমন সময় দূরে দেখিলেন যে একখানি বোটে কয়েকজন যাত্রী ভয়ানক জনতা করিতেছে। এরূপ করিলে হয়ত এখনই উহা জলমগ্ন হইবে, সুতরাং তাহাদিগকে সতর্ক করিবার জন্য তিনি ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। কিন্তু বোট তখন দূরে চলিয়া গিয়াছে, এত দূরে তাঁহার কণ্ঠ স্বর পৌছাইবে না, কিন্তু সতর্ক করা প্রয়োজন, তাই স্মিথ তৎক্ষণাৎ মেগাফোন যন্ত্রের সাহায্যে তাহাদিগকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন "ছিঃ! ইংরাজের ন্যায় আচরণ কর—অধীর হইও না"। স্মিথের আর এক জন সহ-কর্ম্মচারী স্ত্রীলোকদিগকে শেষ নৌকায় বোঝাই করিয়া দিয়া সেই নৌকার নাবিকের হাত ধরিয়া বলিয়া দিলেন—"আমার স্ত্রীকে যাইয়া বলিও আমি আমার কর্ত্তব্যপালন করিয়া মরিয়াছি"। এইবার স্মিথ দেখিলেন যে মানুষের যাহা সাধ্য তাহা তিনি ও তাঁহার সহকর্ম্মীগণ করিয়াছেন, আর কিছুই করিবার নাই। তখন তিনি তাঁহার অনুরক্ত নাবিক-দিগকে একত্র করিয়া শেষ মুহূর্ত্তের জন্য প্রস্তুত হইলেন। মাস্তুলের নিকটস্থ সেতুর উপর দাঁড়াইয়া কাপ্তেন বিধাতার নিকট তাঁহার শেষ প্রার্থনা জ্ঞাপন করিলেন—নাবিকগণ বাদ্য যন্ত্র আনিয়া সুর বাঁধিলেন। সকলে উচ্চ কণ্ঠে গাহিতে লাগিলেন "Nearer to thee O God" (হে ভগবান আমাদিগকে তোমার আরও নিকটে লইয়া যাও)। একজন যাত্রী এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন—আমরা বোটে বসিয়া দেখিলাম দূরে সাগর জুড়িয়া বিশালকায় টাইট্যানিক্ ধীরে ধীরে জলধি-বক্ষে ডুবিয়া যাইতেছে। কাপ্তেন জাহাজের সমুদয় আলো জ্বালাইয়া দিয়াছিলেন, সেই আলোকমালা সমুদ্র জলে প্রতিবিম্বিত হইয়া দূর হইতে সমগ্র জাহাজখানিকে একটা মায়াপুরীর ন্যায় দেখাইতে ছিল। আর সেই জাহাজের উপরে কাপ্তেন স্মিথ নীরব নিস্তব্ধ হইয়া মৃত্যুর জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। জাহাজের উপর হইতে উপাসনা সঙ্গীত ব্যাণ্ডের সুরে মিলিত হইয়া আকাশ বায়ুকে কাঁপাইয়া তুলিয়াছিল—ক্রমে সেই সঙ্গীত ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া আসিল—সে আলোকমালা একে একে নিবিয়া গেল—তাহারপর?—তাহারপর পৃথিবীর অদ্বিতীয় জাহাজ তাহার কাপ্তেনকে আপনার চূড়ার উপর বসাইয়া সাগরগর্ভে ধীরে ধীরে মিলাইয়া গেল"।

১৪ই এপ্রিল রবিবার রাত্রি প্রায় সাড়ে দশটার সময় টাইট্যানিক জাহাজের সহিত তুষার পর্ব্বতের সংঘর্ষণ হইয়াছিল, রাত্রি ২টার সময় ১৫৯৫ জন যাত্রী সহ জাহাজ জলমগ্ন হইল। ৫৩৫ জন যাত্রী ও ২১০ জন নাবিক, কেহ

নৌকায় কেহ ভেলায়, কেহ বা জলের মধ্যে ভাসিতে লাগিল। বিনা তারে এই দুর্ঘটনার সংবাদ পাইয়া কার্পেথিয়া জাহাজ রাত্রি ৪ টার সময় তথায় পঁহুছিয়া অকূল সমুদ্রে ভাসমান লোকদিগকে নিজ বক্ষে আশ্রয় দান করিল।

(সঞ্জীবনী হইতে গৃহীত।)

ঋগ্বেদে স্বর্গের বিস্তীর্ণ বর্ণনা

১১৩ সূক্ত, ৭-১১ ঋক্।

৭। যে ভুবনে সর্ব্বদা আলোক, সে স্থানে স্বর্গলোক সংস্থাপিত আছে। হে ক্ষরণশীল! সেই অমৃত ও অক্ষয় ধামে আমাকে লইয়া চল। ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও।

৮। যে স্থানে বৈবস্বত রাজা আছেন, যে স্থানে স্বর্গের দ্বার আছে, যে স্থানে এই সমস্ত প্রকাণ্ড নদী আছে, তথায় আমাকে লইয়া গিয়া অমর কর। ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও।

৯। সেই যে তৃতীয় নাগলোক, তৃতীয় দিবালোক, যাহা নভোমণ্ডলের উর্দ্ধে আছে, যথায় ইচ্ছানুসারে বিচরণ করা যায়, যে স্থান সর্ব্বদা আলোকময়, তথায় আমাকে লইয়া গিয়া অমর কর। ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও।

১০। যথায় সকল কামনা নিঃশেষে পূর্ণ হয়, যথায় প্রধ্নমাক দেবতার ধাম আছে, যথায় যথেষ্ট আহার ও তৃপ্তি লাভ হয়, তথায় আমাকে লইয়া গিয়া অমর কর। ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও।

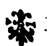
১১। যথায় বিবিধপ্রকার আমোদ, আহ্লাদ, আনন্দ বিরাজ করিতেছে, যথায় অভিলাষী ব্যক্তির তাবৎ কামনা পূর্ণ হয়, তথায় আমাকে লইয়া গিয়া পূর্ণকাম ও অমর কর। ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও।

১০ম মণ্ডল—৫৬ সূক্ত।

১। এই (অগ্নি) তোমার এক অংশ আর এই (বায়ু) তোমার এক অংশ, তোমার তৃতীয় অংশ জ্যোতির্ম্ময় (আত্মা) স্বরূপ। এই তিন অংশদ্বারা তুমি (অগ্নি, বায়ু ও সূর্য্য) মধ্যে প্রবেশ কর। তোমার শরীরের প্রবেশ কালে তুমি কল্যাণমূর্ত্তি ধারণ কর এবং দেবতাদিগের সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পিতা স্বরূপ (সূর্য্যের) ভুবনে তুমি প্রিয় হও।

২। হে বাজিন (জনৈক ঋষিকুমার)! পৃথিবী তোমার শরীর গ্রহণ করিতেছেন, তিনি আমাদিগের প্রীতিজনক হউন, তোমারও কল্যাণ করুন। তুমি স্থান ভ্রষ্ট না হইয়া জ্যোতিঃ ধারণ করিবার জন্য দেবতাদিগের সহিত এবং আকাশের সূর্য্যের সহিত তোমার আত্মাকে মিশাইয়া দাও।

৩। হে পুত্র! তুমি বিলক্ষণ বলে বলী ও সুশ্রী ছিলে। যেরূপ উত্তম স্তব






করিয়াছিলে, তদ্রূপ উত্তম স্বর্গে যাও। তুমি উত্তম ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছ, তাহার উত্তম ফল প্রাপ্ত হও। উত্তম দেবতা ও উত্তম সূর্য্যের সহিত একীভূত হও।

৪। আমাদিগের পিতৃপুরুষগণ দেবতার মত মহিমার অধিকারী হইয়াছেন। তাঁহারা দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়া দেবতাদিগের সহিত ক্রিয়া কলাপ করিতেছেন। যে সকল জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ দীপ্তি পাইয়া থাকে, তাঁহারা উহাদিগের সহিত একীভূত হইয়াছেন, তাঁহারা দেবতাদিগের শরীর মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন।

৫। তাঁহারা নিজ ক্ষমতাবলে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে বিচরণ করিয়াছেন। যে সকল প্রাচীন ভুবনে কেহ যায় নাই, তাঁহারা তথায় গিয়াছেন। তাঁহারা নিজ শরীর দ্বারা সমস্ত ভুবন আয়ত্ত করিয়াছেন। তাঁহারা প্রজাবর্গের উপরে নানা প্রকারে নিজ নিজ প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন।

৭। লোকে যেরূপ নৌকাযোগে জল পার হয়, যেরূপ স্থলপথে পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন দিক্ অতিক্রম করে, যেরূপ স্বস্তি দ্বারা বিপদ্ হইতে উদ্ধার হয়, তদ্রূপ বৃহতকৃথ ঋষি নিজ ক্ষমতাবলে অপন মৃত পুত্রকে অগ্নি প্রভৃতি পার্থিব পদার্থ ও সূর্য্য প্রভৃতি দূরবর্ত্তী পদার্থের সহিত একীভূত করিয়া দিলেন।

৬৩ সূক্ত।

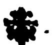
১। যে সকল দেবতা অতি দূর দেশ হইতে আসিয়া মনুষ্যদিগের সহিত বন্ধুত্ব করেন, তাঁহারা বিবস্বতের পুত্র মনুর সন্তানদিগের প্রতি অতি সন্তুষ্ট হইয়া তাহাদিগকে আশ্রয় দান করেন। তাঁহারা নহুষ পুত্র যযাতির যজ্ঞে অধিষ্ঠান হয়েন এবং তাঁহারা আমাদিগের মঙ্গল করেন।

২। হে দেবতাগণ! তোমাদিগের সকল নামই নমস্কার করিবার যোগ্য, বন্দনীয় এবং যজ্ঞে উচ্চারণ যোগ্য। যাঁহারা অদিতির গর্ভে জন্মিয়াছেন, কিংবা জলে কিংবা পৃথিবী হইতে জন্মিয়াছেন, তাঁহারা সকলে আমার এই আহ্বান শ্রবণ করুন।

৩। সকলের জননীভূতা পৃথিবী যাহাদিগের জন্য মধুময় দুগ্ধ বহাইয়া দেন, এবং সমাকীর্ণ, অবিনাশী, আকাশ অমৃত ধারণ করেন, সেই সকল অদিতি সন্তান দেবতাদিগকে স্তব করেন, তাহাতে মঙ্গল হইবে, তাঁহাদিগের ক্ষমতা অতি প্রশংসনীয়, তাঁহারা বৃষ্টি আহরণ করেন, এবং তাঁহাদিগের কার্য্য অতি সুন্দর।

৪। সেই সকল প্রবল পরাক্রান্ত দেবতা লোকের নিকট পূজা পাইবার জন্য অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। তাঁহারা অনিমেষ নয়নে মনুষ্যদিগকে দর্শন, অর্থাৎ তত্ত্বাবধান করেন। তাঁহাদিগের রথ জ্যোতির্ম্ময় *, তাঁহাদিগের কার্য্যের বিঘ্ন নাই, তাঁহারা নিষ্পাপ, তাঁহারা লোকের মঙ্গলের জন্য স্বর্গের উন্নত প্রদেশে বাস করেন।

* বেদে পুনঃ পুনঃ উক্ত হইয়াছে যে যাহা জ্যোতির্ম্ময় তাহাই দেবতাদিগের স্বরূপ, যথা দ্যুলোক দেবলোকের নামান্তর মাত্র।







৫। মনু অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া শ্রদ্ধাযুক্ত চিত্তে সাত জন হোতা লইয়া যে সকল দেবতার উদ্দেশে অতি উৎকৃষ্ট হোমের দ্রব্য উৎসর্গ করিয়াছেন, সেই সমস্ত দেবতা আমাদিগকে অভয় দান করুণ এবং সুখী করুণ, আমাদিগের সকল বিষয়ে সুবিধা করিয়া দিন এবং সর্ব্বত্র কল্যাণ বিতরণ করুণ।

৮। যাঁহাদিগের বুদ্ধি উৎকৃষ্ট এবং জ্ঞান সুন্দর, যাঁহারা স্থাবর জঙ্গম সমস্ত জগতের অধীশ্বর, হে তাদৃশ দেবতাগণ! এক্ষণে আমাদিগকে অতীত ও ভবিষ্যৎ সকল পাপ হইতে উদ্ধার করুন এবং আমাদিগকে কল্যাণ বিতরণ করুন।

পাঁচন ও মুষ্টিযোগ।

রক্ত আমাশার অব্যর্থ ঔষধ।

রক্ত আমাশার প্রথম অবস্থায় পেয়ারা পাতার রস অতি উপকারী। ইহাতে পেটের মল সমুদায় পরিষ্কার হইয়া বাহির হইয়া যায় ও অল্প সময়ের মধ্যে আরাম হয়।

কাল জামের পাতার রস ও ছাগল দুধ রক্ত আমাশার মহৌষধ। ইহাতে অতি অল্প সময়ের মধ্যে রক্ত বন্ধ হয় ও কমিয়া আসে। তিন চার দিন প্রাতে একবার করিয়া খালি পেটে উহা সেবন করার বিধি।

পুরাতন ও নূতন উভয় রক্ত আমাশা জরের পক্ষেই পুরাতন তেঁতুল ও ইসবগুল ও মিশ্রি একত্র ভিজাইয়া প্রাতে ও দুপুরে সেবন করিলে অতি অল্প সময়ের মধ্যে আশ্চর্য্য উপকার পাওয়া যায়।

যাঁহারা গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে ছোট শিশুদের এই অসুখের জন্য অত্যন্ত কষ্ট পান তাঁহারা এই ঔষধটি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন।

নূতন সংবাদ।

কুমারী কর্ণেলিয়া সরোবজী বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা ও আসামের কোর্ট অব ওয়ার্ড সমূহের অস্থায়ী পরামর্শ দাত্রী ছিলেন, এখন হইতে তিনি এই পদে স্থায়ীরূপে নিযুক্ত হইলেন।

"ওলন্দাজ বণিক" নামক লর্ড ক্বিবারসামের বেম্‌ব্রাটের অঙ্কিত একখানি ছবি ছিল, উহা তিনি ৭॥০ সাড়ে সাত লক্ষ টাকা মূল্যে নিউইয়র্কের মিঃ ফ্রিকের নিকট বিক্রয় করিয়াছেন।

লণ্ডনে ভারতীয় ছাত্রগণের তত্ত্বাবধানের জন্য যে কমিটি হইয়াছে, তাহারই সংশ্রবে ক্রমওয়েল রোডে একটি বাড়ী আছে। ঐ বাড়ীতে ভারতীয় আইন




পাঠার্থী ছাত্রগণের সুবিধার জন্য এক লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠিত হইবে। সার টমাস্ ব্যালে এই লাইব্রেরীতে অনেক গুলি পুস্তক দান করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। লাইব্রেরী গৃহের আসবাবাদির জন্য ২২৫০ টাকা ও পুস্তক কিনিবার জন্য কতক টাকা দিয়াছেন এবং লাইব্রেরী রক্ষার জন্যও বৎসরে ১৫০০ টাকা দিবেন।

কয়েক বৎসর হইতে কতিপয় স্কটলণ্ডের জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিত ভূমি কম্পের কারণ অনুসন্ধান করিতেছিলেন। তাঁহারা ৭০০ ভূমিকম্প পরীক্ষা করিয়া বলিতেছেন পৃথিবীর অক্ষ পরিবর্ত্তনের সময়ই প্রায় ভূমিকম্প হইয়া থাকে।

মোকামা ঘাটে গঙ্গার উপর সেতু নির্ম্মাণের প্রস্তাব হইতেছে।

শুনা যাইতেছে, টাইট্যানিক জাহাজের দুস্থ যাত্রীদিগের সাহায্যের নিমিত্ত এ পর্য্যন্ত ৪২ লক্ষ টাকা সংগ্রহ হইয়াছে।

পানিহাটী অক্ষয় কুটীর নিবাসী প্রতিভা-শালী নবীন সুলেখক শ্রীযুক্ত হরিপ্রসাদ মল্লিক মহাশয় দুইটি রৌপ্য পদক ও এক খানি মূল্যবান পুস্তক প্রদান করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। বামাবোধিনীর গ্রাহকগণের মধ্যে যে গ্রাহক মহাশয় "মাদকতা নিবারণের উপায়" ও গ্রাহিকা মহোদয়াগণের মধ্যে যিনি "পল্লিগ্রামে স্ত্রী-শিক্ষা প্রসারের প্রয়োজন ও তাহার প্রকৃষ্ট উপায়" সম্বন্ধে গবেষণা পূর্ণ সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রবন্ধ প্রেরণ করিবেন তাঁহারাই পদক দ্বয় প্রাপ্ত হইবেন। উক্ত ঠিকানায় ভাদ্রের প্রথম সপ্তাহ মধ্যে প্রবন্ধ প্রেরণ করিতে হইবে। পরীক্ষান্তে পূজার পর পুরস্কার দেওয়া যাইবে। তবে, উপযুক্ত প্রবন্ধ শীঘ্র প্রাপ্ত ও মনোনীত হইলে এ নিয়মের ব্যতিক্রম হইতে পারে। হরিপ্রসাদ বাবুর সাধু উদ্দেশ্যের জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ।

সতী শৈবলিনী।

প্রশস্ত কক্ষের মাঝে ধবল শয্যায়
শায়িত যুবক এক রোগশীর্ণ কায়
পার্শ্বে বসি চিন্তাকুল আত্মীয় স্বজন
কাতর নয়নে হেরে তাহার আনন।
পদতলে সমাসীনা শোকাকুলা জায়া
সৌন্দর্য্য প্রতিমা যেন মূর্ত্তিমতী মায়া
অনন্ত অমিয়সিক্ত পূত প্রেম পাশে
বাঁধিয়া রাখিতে চায় হৃদয় বিলাসে।

নির্ম্মম কাল আসি বসিয়া শিয়রে
যুবকের প্রাণ ধরি আকর্ষণ করে
কিন্তু হের পতি প্রাণা রমণীর বল
ঘুচিতেছে তার সর্ব্ব প্রয়াস বিফল।
সহসা চাহিলা যুবা কাতর নয়নে
অশ্রুমতী শোকাতুরা বণিতার পানে
প্রেম পূর্ণ অর্থ পূর্ণ নীরব ভাবায়
যেন হায়! হৃদি ব্যথা প্রকাশিতে চায়।



নিরাশ জড়িত সেই দৃষ্টি সকরুণ
বিঁধিল সতীর হৃদে শেল নিদারুণ
বুঝিল সে স্বামী তার মাগিছে কাতরে
অনন্ত বিদায় হায় চিরদিন তরে।
পতিপ্রাণা দৃষ্টিমাত্র পারিলা বুঝিতে
স্বামীর পরাণ পাখী চাহে না ত্যজিতে
হৃদয় পিঞ্জর হায়! তাহার কারণ
মৃত্যুসনে প্রাণপণে করিতেছে রণ।
বুঝিলা সে সতী আর নাহিক উপায়
বিফল যতন, পতি পরাণরক্ষায়
ধীরে ধীরে উঠে বালা তাজি দীর্ঘশ্বাস
সহসা ফুটিল তার মুখে মৃদু হাস।
ত্যজিয়া স্বামীর পাশ চলিলা ভামিনী
অম্বর ত্যজিয়া যেন উজলা দামিনী
যতনে পরিল সতী অম্লান অম্বর
যাপিতে পতির পাশে অনন্ত বাসর।
চরণে অলক্ত রাগ সীমন্তে সিন্দুর
ধরিল হাসির রেখা আনন বিধুর
চারি বৎসরের শিশু লয়ে তায় কোলে
মুহুর্মুহু চুম্ব দেয় বদন কমলে।
পুনঃ আসি বসে সতী পতির চরণে
সহসা ভবন খানি ভরিলা কিরণে
কেহ না বুঝিলা হায়! তাহাদের ভাব
সকলেই মুহ্যমান শোকেতে নীরব।
ক্ষণ পরে পুনঃ সতী দেবতার ঘরে
চলিলা সহাস্যমুখে প্রফুল্ল অন্তরে
ভক্তি ভরে ভিক্ষা করে পতির মঙ্গল
কাতর পরাণ তার রুদ্ধ আঁখি জল।
উঠিল দ্বিতল কক্ষে মহা গণ্ড গোল
আত্মীয় স্বজন কণ্ঠে রোদনের রোল
যুবার পরাণ পাখী যায় বুঝি চলি
হৃদয় পিঞ্জর খানি চিরতরে ভুলি।
চমকি উঠিল সতী আকুল পরাণ
যেন চারি ভিতে কিছু করে অন্বেষণ
গোপনে আধার হ'তে দ্রবময় সুরা
ঢালিল মস্তকে নিজ পতি শোকাতুরা।
নিজ হস্তে অগ্নি জ্বালি প্রদানিল তায়
সহসা হাসিল কক্ষ আলোক মালায়
হাসিলা আহুতি পেয়ে দেব হুতাশন
ভীম তেজে সতীদেহ করিলা বেষ্টন।
অনল মণ্ডিত দেহ ঊর্দ্ধ যুক্ত করে
ধরিয়া পবিত্র 'গীতা' ধায় বেগভরে]
হাস্যমুখী হেরিবারে পতির চরণ
পূরাতে প্রাণের তার শেষ আকিঞ্চন।
সহসা শ্বশুর তার আসি নিম্নতলে,
দেখিলা সে বধুমাতা মণ্ডিতা অনলে
সভয়ে সকলে ডাকে উচ্চ কণ্ঠ স্বরে
অমনি প্রতিমা খানি পড়ে ভূমি পরে।
হায়! হায়! সর্ব্বনাশ দেখে সবে আসি
ধরাতলে বিলুণ্ঠিত শরতের শশী
সেবিতে অনন্তধামে পতির চরণ
অনলে সরলা বালা ত্যজিল জীবন।
মা মা বলি ক্ষুদ্র শিশু করিলা ক্রন্দন
বালকের আর্ত্তনাদে পুরিল ভবন
উঠিল শোকের রোল কাঁদে সর্ব্বজন
তারি মাঝে যুবা এবে ত্যজিল পরাণ।
স্তম্ভিত দর্শক বৃন্দ বিস্মিত নয়ন
হেরি হেন অপরূপ যুগল মরণ
সবে কহে ধন্য! ধন্য!! সতী সাধ্বী রাণী
অর্জ্জিলে অক্ষয় কীর্ত্তি নিজ প্রাণ দানি।
স্বর্গ হতে দেবগণ দেখিল চাহিয়া
সতীর এ আত্মদান পতির লাগিয়া

দিনমণি ভীমতেজে কর প্রসারিয়া
চাহে যেন গ্রাসিবারে কৃতান্তে ধরিয়া।
শোক তপ্ত হৃদে রবি গেলা অস্তাচলে,
উত্তপ্ত দীরঘ শ্বাস ত্যজি ধরাতলে,
নেমে এল সন্ধ্যা সতী বিষাদ আননে
হেরিতে সতীর মৃত্যু পতির মরণে।
ত্বরা করি নিশারাণী আসিলা ধরায়
আবরিয়া নিজদেহ মলিন ভূষায়
আত্মীয় স্বজন এবে হরি ধ্বনি করি
চলিলা শ্মশানে দুটী শব স্কন্ধে ধরি।
রমণীর আর্ত্তনাদে কাঁদিল গগন
কাঁদিল স্বরগধামে সুরবালাগণ
মিলিত সে অশ্রুরাশি প্রবল ধারায়
বৃষ্টি রূপে দেখা দিল তাপিত ধরায়।
মনোরম চিতা রচি রাখিল দুজনে
তদুপরি বিভূষিয়া কুসুম চন্দনে
মুহুর্মুহু হরিধ্বনি কাঁপিল গগণ,
সবার হৃদয় আজি বিস্ময়ে মগন।
উঠিল চিতার ধূম আবরি গগন
স্বর্গ হ'তে দেবগণ করে বরিষণ
পারিজাত ফুলমালা দম্পতির শিরে
সমবেত সবে সতীসম্মানের তরে।
ত্রিদিব আসন হ'তে দেব সুরপতি
আদেশিলা সারথিকে "যাও দ্রুতগতি
ল'য়ে এস সযতনে দুইটী রতনে
ত্যজেছে জীবন সতী পতির কারণে"।
সহসা উন্মুক্ত হ'ল স্বরগ তোরণ
মনোহর পুষ্পরথ দিল দরশন
আসিল শ্মশানভূমে দিক আলোকিয়া
লয়ে গেল পতি পত্নী দুজনে তুলিয়া।
যাও মা স্বামীর সনে অমর ভুবনে
অনন্ত শান্তির মাঝে ভ্রম দুই জনে
সেথা কভু পশিবেনা বিদ্রুপের হাসি
নাহি সেথা ঈর্ষা দ্বেষ অশান্তির রাশি।
যে কীর্ত্তি পশ্চাতে রাখি করিলা গমন
লভিবে মা তায় তুমি অক্ষয় জীবন
অনন্ত এগাথা তব গাহিবে সকলে
পতি তরে সতী প্রাণ ত্যজিল অনলে।
হেররে নয়ন মেলি হিন্দুর সন্তান
কলুষিত কার্য্যে তোরা সদা নিমগন
আর ওই গৃহ কোণে সতী পতিব্রতা
তোদের মঙ্গল তরে পুণ্য কার্য্যে রতা।
হিন্দুর অস্তিত্ব লুপ্ত হ'ত এত দিন
যদি না রহিত হেথা সাধ্বী নারীগণ
ডুবে যেত নদীগর্ভে ধর্ম্ম সনাতন,
ঘৃণ্য ব্যভিচারে সবে ঢেলে দিত প্রাণ॥

শ্রীনীরদ শশী ঘোষ
৪১ নং চড়কডাঙ্গা রোড,
বেলেঘাটা।

বামারচনা।

নব বর্ষ।

এস নব বর্ষ, লয়ে প্রীতি হর্ষ
এস ভাই, এস প্রফুল্ল মনে।
অতীতের কথা, অতীতের ব্যথা
যাও বাইতে অতীতের সনে।

নবীন উৎসাহে এস নব বর্ষ,
নবীন আনন্দে মাতিয়া যাও।
তব আগমনে, মানবের মনে
প্রীতির প্রবাহ ঢালিয়া দাও।
মুছে দাও দুঃখ, শোক, ব্যথা, যত
প্রেম প্রীতি দিয়া পুরাও প্রাণ।
প্রণয়ের হারে বাঁধ আজি সবে
নব প্রাণ সবে কর গো দান।
এস নব বর্ষ লয়ে নব হর্ষ
নব ভাবে কর প্রফুল্ল সবে।
হাসিতে হাসিতে এসহে নূতন
দাও গো বিদায় অতীতে তবে।
অতীতের কথা, অতীতের ব্যথা
কি কাজ তুলিয়া ভুলিয়া যাও।
মনের হরষে নূতন বরষে
আদরে সবাই বরিয়া লও।
জয় জগদীশ! চির প্রেমময়!
প্রণমি সদাই চরণে তব।
নূতন আনন্দে জগত তোমার
থাক্ সদা নাথ, নিতুই নব।

শ্রীমতী চারুশীলা মিত্র।

কত দূরে ?

(শ্রীযুক্ত অবিনাশ চন্দ্র সেন বি, এ, দাদা মহাশয়ের মৃত্যু উপলক্ষে)*

একে একে হায়
কত দিন চলে যায়
কোথায় রয়েছ তুমি কিছুই জানিনা।
সুদূরে সংসার রাখি
হ'য়ে কার অনুরাগী
ভুলিয়াছ প্রাণাধিক! আপনার জনা।
সরায়ে কুহেলি রাশি
হেথায় নীরবে বসি
মরমের ব্যাকুলতা তোমারে জানাই।
হৃদি তন্ত্রী ছিন্ন করে
সুখে আছ কোন্ পুরে
জানিনা সে দেশ কোথা, কত দূরে ভাই।
মরতের মৃদু গানে
মরতের বংশী তানে
তোমার শ্রবণ মন হয় না চঞ্চল।
মরতের স্নিগ্ধ আলো
আর নাহি লাগে ভাল
স্বরগের বংশী রবে রয়েছ বিহ্বল।
তাই নাহি কাছে এস
আর নাহি ভাল বাস,
পশেনা শ্রবণে তব মৃদু আলাপন।
অজানিত দেশে গিয়ে
কেমন স্বভাব পেয়ে
ভুলিয়াছ জননীর আদর যতন।
বালিকা দয়িতা তব
বিসর্জ্জন দিয়ে সব
কঠোর বৈধব্য ব্রত করেছে ধারণ।
তব স্মৃতি বুকে ধরে
এ সংসার কারাগারে
যৌবনে যোগিনী প্রায় যাপিছে জীবন।

---

* ৩৭ বৎসর বয়সে বাগআঁচড়ায় দাদার মৃত্যু হয়।

অসীম যাতনা ভারে
মৃদু হিয়া ভেঙ্গে পড়ে
এ দীর্ঘ বিরহ তাপ সবে কতকাল।
সংসারের প্রতি ঘায়
শুখায়ে ঝরিবে হায়
হায়রে কঠিন বিধি, কি পোড়া কপাল।
মা তব পাগল শোকে
হৃদয় ভেঙ্গেছে দুঃখে
সবারি মলিন মুখ কি ভীষণ হায়।
তব শোকে আহা মরি!
পিতা যে এ ধরা ছাড়ি
গিয়াছেন তব পাশে শান্তির আশায়।
মুহূর্ত্তে করিলে ছাই
সোনার সংসার ছাই
ডুবাইয়ে দুঃখময় অকূল পাথারে।
বাল বনিতার বুকে
দুটী কচি মেয়ে রেখে
কোথায় রয়েছ তুমি, হায় কত দূরে।

শ্রীপ্রিয়বালা রায়।

১৬।৪ নং মধুরায় লেন, ইণ্ডিয়ান্ প্রেসে শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত
ও
শ্রীসন্তোষকুমার দত্ত কর্ত্তৃক ৯ নং আণ্টনবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

No 593. Registered No C. 134. April, 1913.



স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি. এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫০ বর্ষ। ৫৯৬ সংখ্যা।	চৈত্র, ১৩১৯। এপ্রেল, ১৯১৩।	১০ম কল্প। ১ম ভাগ।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২।৵০, অগ্রিম ষাণ্মাসিক ১৷০, পশ্চাদ্দেয় বার্ষিক ৩৲ টাকা মাত্র।

সূচীপত্র।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 596. April, 1913.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫০ বর্ষ। ৫৯৬ সংখ্যা। } চৈত্র ১৩১৯। এপ্রেল ১৯১৩। { ১০ম কল্প। ১ম ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

কাপ্তেন স্কটের মৃত্যু—কাপ্তেন স্কট কয়েকজন সহচর লইয়া দক্ষিণ মেরু আবিষ্কার করিবার জন্য যাত্রা করিয়াছিলেন। সম্প্রতি সংবাদ আসিয়াছে যে, খাদ্যাভাবে সহচরবৃন্দসহ তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন।

রাজকার্য্যে রমণীর গৌরবলাভ—লর্ড কারমাইকেল মহোদয় কোর্ট অব্ ওয়ার্ডসের সহকারীর পদে নিযুক্তা মিস্ কর্ণেলিয়া সোরাবজির কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার কার্য্য স্থায়ী করিয়াছেন। মিস্ কর্ণেলিয়া ও তাঁহার পরবর্ত্তী সকলেই এই কার্য্যে গবর্ণমেণ্টের নিয়মানুযায়ী পেন্সন প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

কুমারী সুজানি কার্পেলিকে উপাধি দান—সংস্কৃত কলেজের মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সভাপতিত্বে এক পণ্ডিত-সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। পণ্ডিতমণ্ডলী ফরাসী কুমারী সুজানিকে 'ভারতী' উপাধি প্রদান করিয়াছেন। এই বিদেশিনী কুমারীর শিক্ষালাভের স্পৃহা ও অধ্যবসায় দেখিয়া আমাদের তাহা শিক্ষা করা উচিত। আমরা সংস্কৃত শিক্ষা বিষয়ে যেরূপ উদাসীন রহিয়াছি, তাহাতে লজ্জিত হইতে হয়।

কলিকাতার বৃক্ষতত্ত্বাবধান—কলিকাতা স্কোয়ার এবং উদ্যানসমূহে ও পথপার্শ্বে যে সকল বৃক্ষ আছে, তাহাদের বিশেষ তত্ত্বাবধানের প্রস্তাব হইতেছে।

কংগ্রেসের আয়োজন—আগামী বর্ষে করাচীতে কংগ্রেসের অধিবেশন হইবে, এইরূপ সংকল্প হইয়াছে ও আয়োজন হইতেছে।

পালোয়ানের পুরস্কার—বিখ্যাত

পালোয়ান রামমূর্ত্তির ক্রীড়া-কৌশল দর্শনে হায়দ্রাবাদের নিজাম বাহাদুর সন্তুষ্ট হইয়া নগদ প্রায় দশ সহস্র মুদ্রা, হীরক-অঙ্গুরী ও ঘড়ীর চেন পুরস্কার দিয়াছেন।

শ্রীমতী সত্যবালা দেবীর অভ্যর্থনা—সঙ্গীতবিদ্যায় সুনিপুণা শ্রীমতী সত্যবতী দেবী সম্প্রতি কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিয়াছেন। তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য বসুমতী কার্য্যালয়ে এক সান্ধ্য সম্মিলনের আয়োজন হইয়াছিল। সভায় বহু পণ্ডিত-মণ্ডলী ও সাহিত্যিকগণের সমাবেশ হইয়াছিল। সত্যবালা দেবী সুমধুর স্বরে একটী বেদগান করিয়া সকলকে পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন।

ভূত না মানুষ?

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

দেবদত্তের দুর্ভাগ্য ও নন্দকের সৌভাগ্য।

দেবদত্ত আপন পত্নীর গলার স্বর্ণপদক দর্শন করিয়া অজ্ঞান হইয়া ভূমিতে নিপতিত হইলেন। তাঁহার সর্ব্বশরীর ধূল্যবলুণ্ঠিত হইতে লাগিল। তাঁহার পদ্ম চক্ষু নিমীলিত হইয়া রহিল। তাঁহার পরম হিতৈষী নন্দক কর্ত্তব্য কর্ম্মানুরোধে তাঁহার স্ত্রীর অনুসন্ধানের সহায়তা করিবার জন্য তাঁহাকে জ্ঞানহীন অবস্থায় ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। তিনি এখন ঘোর শত্রুমণ্ডলীর মধ্যে জীবন ও মৃত্যুর সন্ধিস্থলে। তখন পৃথিবীর কতক স্থান জ্যোৎস্নায় পূর্ণ, কতক, স্থান অন্ধকারে আবৃত, কারণ বনের মধ্যে বৃক্ষতলে অর্থাৎ যে যে স্থানে চন্দ্রকিরণ প্রবেশ করিতে পারে না, সেই সেই স্থানে অন্ধকার, তদ্ব্যতীত সর্ব্ব স্থান জ্যোৎস্নায় পূর্ণ।

নন্দককে চলিয়া যাইতে দেখিয়া কয়েকজন অদ্ভুতাকৃতি লোক আসিয়া দেবদত্তকে ঘিরিয়া বসিল। তখন বনের চারি দিকে অনেক ফুল ফুটিয়াছে। এই কৃত্রিম বন ব্যতীত বোধ হয় অন্য কোন বনে এত অধিক সুবাসিত ফুল বিকশিত হয় না। যাহারা দেবদত্তকে ঘিরিয়া বসিয়াছিল, তাহারা কি প্রকারে দেবদত্তকে বধ করা যায় তাহার কল্পনা করিতেছিল। দেবদত্ত চণ্ডদেবের প্রধান শত্রু, কারণ চণ্ডদেব দেবদত্তের স্ত্রী অপহরণ করিয়াছেন। এই প্রধান শত্রুকে হাতে পাইয়া হত্যা না করিয়া কিছুতেই ছাড়িয়া দেওয়া হইবে না। তখন অনেকেই অনেক প্রকার কল্পনা করিতে লাগিল। কেহ বলিল উহাকে গলা টিপিয়া মারিয়া ফেল। কেহ বলিল উহার গলা কাটিয়া ফেল। কেহ বলিল উহাকে অজ্ঞানাবস্থাতেই আগুনে ফেলিয়া দাও। একজন বলিল—"না, এ সবে প্রয়োজন নাই। অজ্ঞানাবস্থায় ইহাকে স্রোতস্বিনীর মধ্যে ফেলিয়া দাও, সে নিজে নিজেই



মরিবে। আমরাও তাহার মৃত্যুর অপরাধ হইতে মুক্তি পাইব। এই উপায়ে সে নিশ্চয়ই মরিবে এবং আমরা তাহার মরণান্তে মৃত্যুর দণ্ড হইতে বাঁচিব।

যে এই কথা কহিল, সে অন্ধকারে দাঁড়াইয়াছিল। সকলেই একবাক্যে তাহার কথায় সায় দিল। তখনও ফুল হাসিতেছিল, চাঁদ হাসিতেছিল, লতা নাচিতেছিল। দেবদত্তের মৃত্যু সন্নিকট দেখিয়া তাহারা কেহই হাস্য হইতে নিবৃত্ত হইল না এবং এই নরাকৃতি ভূতের অধঃপতন দেখিয়া কেহই দুঃখিত হইল না। দেবদত্ত জ্ঞানহীন হইয়া ভূমিতলে নিপতিত ছিলেন। পূর্ব্বোক্ত বক্তা বলিলেন—"চল এই বেলা আমরা সকলে ধরাধরি করিয়া উঁহাকে নদীর স্রোতের মধ্যে ফেলিয়া দিয়া আসি।"

ইহাই ভাল মনে করিয়া সকলে দেবদত্তকে ধরাধরি করিয়া লইয়া চলিল। বনের মধ্য দিয়া কতকদূর গমন করিয়া তাহারা এক নদীর তীরে উপনীত হইল এবং দেবদত্তকে ঐ নদীর স্রোতের মধ্যে ফেলিয়া দিল। দেবদত্তের দেহ জলে ডুবিয়া গেল কি স্রোতে ভাসিয়া গেল, তাহা পাঠক-পাঠিকাগণ বুঝিয়া লউন। আমি আর এ বিষয় বিস্তৃত ভাবে লিখিয়া সময় নষ্ট করিতে ইচ্ছা করি না। যাহারা এই নারকীয় ও দুঃসাহসিক কর্ম্ম করিল, তাহাদের মধ্যে নন্দকের পূর্ব্বপরিচিত সেই ভীষণাকৃতি ব্যক্তিও ছিল। দেবদত্ত নিপাত হইল জানিতে পারিয়া সে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছিল। সে যতদূর সম্ভব দ্রুতবেগে অগ্রসর হইয়া এ সংবাদ কর্ত্তাকে জ্ঞাপন করিয়াছিল, তাহা পাঠক পাঠিকাগণ পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে অবগত হইয়াছেন। এই ঘটনার পূর্ব্বে নন্দক সম্বন্ধে যে একটী বিষম ভয়াবহ ও বিস্ময়জনক ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল, তাহা এখনও পাঠকপাঠিকাগণের কর্ণগোচর হয় নাই। আমি এক্ষণে সেই ঘটনার বিষয় বলিব।

নন্দককে আমরা বহুক্ষণ ছাড়িয়া আসিয়াছি। চলুন, পাঠকপাঠিকাগণ! সেই নির্জ্জন অন্ধকারের মধ্যে তিনি একাকী কি করিতেছেন একবার দেখিয়া আসি।

সেইরূপ ভীষণ স্থানে সেইরূপ বিকট হাস্যধ্বনি শ্রবণ করিয়াও নন্দক বিচলিত হইলেন না। কেবল মাত্র তিনি আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতে লাগিলেন—কৈ, কোন স্থানেও মানুষের চিহ্ন দেখা গেল না। কিন্তু থাকিয়া থাকিয়া সেই বিকট হাস্যধ্বনি নৈশ কানন বিদীর্ণ করিতেছিল। কোথা হইতে যে সেই স্বর আসিতেছিল, নন্দক তাহা বুঝিতে পারিলেন না। তিনি সময় সময় দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিতেছিলেন। সময় সময় তাঁহার মন বিস্ময়সাগরে ডুবিয়া যাইতেছিল। আবার সময় সময় সন্দেহ তাঁহাকে দোদুল্যমান করিতেছিল। তিনি ভাবিতেছিলেন—এ কি হাসি, না ইহা সত্য সত্যই ভূতের খেলা? এইরূপ কর্ম্ম যাহারা করিতেছিল, তাহারা ভূত না মানুষ?




তখন চতুর্থীর চাঁদ উঠিয়াছিল। সেই ঘন নিবিড় বনের মধ্যেও স্থানে স্থানে চাঁদের আলো প্রবেশ করিতেছিল, তদ্দর্শনে নন্দকের মনে এইরূপ ভাবের উদয় হইতেছিল যে, বনাধিষ্ঠাত্রী দেবতা যেন তাঁহার দুর্দ্দশা দর্শন করিয়া শুভ্র দশন বিকশিত করিয়া হাস্য করিতেছেন! নন্দক তখন সেই স্বল্পালোকেই সেই ভীষণ স্থানটী ভাল করিয়া দেখিতে চেষ্টা করিলেন। কি ভীষণ বন! কিন্তু এই বনের মধ্যেও ফুলের অভাব ছিল না। এক একটী গাছে এত ফুল ফুটিয়াছিল যে, তাহাকে ফুটন্ত ফুলের স্তবক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। নন্দক দেখিলেন চারি দিকেই ঘন নিবিড় বনরাজি, কেবল তাঁহার পশ্চাতে সলিলপূর্ণ একটী পুষ্করিণী। ঐ পুষ্করিণীর উপর দিয়াই নন্দক এই স্থানে আনীত হইয়াছিলেন। তিনি বিশেষ অনুধাবন করিয়া বুঝিলেন যে, তিনি যে কূপের মধ্যে পতিত হইয়াছিলেন সেই কূপের সঙ্গে এই পুষ্করিণী সংলগ্ন এবং কূপের মধ্যে এমন একটী অত্যাশ্চর্য্য দ্বার আছে যে, তদ্দ্বারা জলের মধ্যে যাতায়াত করা যায়। নন্দক আরও বুঝিলেন যে, তিনি যে পুষ্করিণী হইতে উঠিয়াছেন, ঐরূপ পুষ্করিণী আরও আছে, নচেৎ তিনি যাহার সঙ্গে জলে ডুবিয়াছিলেন, যে তাঁহাকে এই পথে লইয়া আসিয়াছিল, সে কোথায় গেল! সম্ভবতঃ সেও এইরূপ একটী পথে অন্য দিকে গিয়া থাকিবে। এখান হইতে বহির্গমনের অন্য কোন পথ আছে কি না, নন্দক তখন অনন্যমনা হইয়া তাহাই অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। সহসা বহু হাঁচির শব্দে নির্জ্জন বনভূমি মুখরিত হইয়া উঠিল। নন্দক অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোথা হইতে ঐ শব্দ আসিতেছে, কিছুই নির্ণয় করিতে পারিলেন না। কখন ঊর্দ্ধ হইতে, কখন অধঃ হইতে, কখন দক্ষিণ হইতে, কখনও বা বাম দিক হইতে শব্দ আসিতেছিল। সহসা হাঁচির ধ্বনি ক্রন্দন-ধ্বনিতে পরিণত হইতেছিল। করুণ অকরুণ ক্রন্দনের শব্দে দিগ্‌দিগন্ত মুখরিত হইল। এ কি? এ কাণ্ডের মূলে যথার্থই মানুষ না ভূত? এ কীর্ত্তিসমূহ কি প্রতিধ্বনিকে, না অন্য কাহাকে অপহরণ করায়?

বিস্ময়ের কথঞ্চিৎ হ্রাস হইলে নন্দক নিস্তব্ধ ও অন্যমনস্ক হইয়া এই বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি চিন্তার পথে বহুদূর অগ্রসর হইতে না হইতেই গভীর বনাভ্যন্তর হইতে ব্যাঘ্র ডাকিয়া উঠিল। বনগর্ভ ভেদ করিয়া গর্জ্জনের উপর গর্জ্জন আরম্ভ হইল! নন্দক এ ঘটনাতেও ভীত হইলেন না। কিন্তু বিস্ময়ে ও সন্দেহে একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। ভাবিলেন—এ কি যথার্থই বাঘ?

ক্রোধে নন্দকের শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিল। নন্দক পলকমধ্যে তীক্ষ্ণ তরবারি কোষমুক্ত করিলেন। কিন্তু কেহই তাঁহাকে আক্রমণ করিতে আসিল

না। বরং ক্রমে ক্রমে ব্যাঘ্রের গর্জ্জন থামিয়া গেল। নন্দকের আশ্চর্য্যের সীমা পরিসীমা রহিল না। তিনি জীবনের মায়া ত্যাগ করিয়া বনের নিবিড় হইতে নিবিড়তম প্রদেশে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু তাঁহার অভিলাষ কার্য্যে পরিণত করিবার পূর্ব্বেই তাঁহার চিত্তোদ্বেগ দ্বিগুণ বৃদ্ধি করিয়া তাঁহার সম্মুখস্থ বৃক্ষরাজি সবেগে দুলিয়া উঠিল। পুষ্পবৃক্ষ হইতে পুষ্প, ফলবৃক্ষ হইতে ফল এবং অন্য সকল বৃক্ষ হইতে শুষ্ক পত্র ঝর ঝর করিয়া ঝরিতে লাগিল।

এ কি আশ্চর্য্য! নন্দকও প্রথমে আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। তৎপরে ভাবিতে লাগিলেন—এখন কি করা কর্ত্তব্য। তিনি এইরূপ ভাবিতেছিলেন, এমন সময়ে তাঁহার মস্তকোপরি কতকগুলি বৃক্ষশাখা নত হইয়া পড়িল। সেই সঙ্গে সঙ্গে ঝপাঝপ্ শব্দে নন্দকের পশ্চাৎস্থিত জলের মধ্যে কতকগুলি ভারী জিনিষ পতিত হইল। নন্দক বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া রহিলেন। আর কোন স্থানে কোন সাড়া শব্দ নাই।

পর দিবস সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে তিনি যাহা দেখিতে পাইলেন, তাহাতে তাঁহার মন ঘোর বিস্ময়সাগরে ডুবিয়া গেল। তিনি দেখিলেন, তাঁহার সম্মুখে তাঁহার মাতা, এবং তাঁহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হইতে ঝর ঝর করিয়া জল ঝরিতেছে। তিনি পশ্চাৎ ফিরিয়া দণ্ডায়মান ছিলেন বলিয়া তাহা না দেখিলেও অনুধাবন করিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার মাতা এইমাত্র জল হইতে তীরে উঠিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার মাতা তাঁহাকে দেখিয়া কিছুমাত্র আশ্চর্য্য হইলেন না, বরং সন্তুষ্টচিত্তে পুত্রের মুখের দিকে চাহিয়া মৃদু-মধুর স্বরে গাহিয়া উঠিলেন—

"প্রভু!
আমি বাছিয়া লব না তোমারি দান,
তুমি যাহা দেও তাই ভালো,
(তুমি) বিষাদের
পাশে রেখেছ হরষ, আঁধারের
পাশে আলো।
আমি লব না কি তব প্রসাদের ফুল,
যদি তাহে কণ্টক রহে,
নিভাব কি পুণ্য হোমের অনল,
যদি তাহে অন্তর দহে,
বহুক শিথিল, তুলুক ঝটিকা
তোমার কৃপা পবনে,
আমি কেমনে রোধিয়া লইব শরণ
নীরব শূন্য মরণে। ইত্যাদি।

জননীর সঙ্গীত শ্রবণে নন্দকের পাষাণ প্রাণও গলিয়া গেল। তিনি জননীর পদস্পর্শ করিতেও ভুলিয়া গেলেন।

জননী পুনরায় গাইলেন—

বিশ্বরাজালয়ে বিশ্ববীণা বাজিছে,
স্থলে জলে নভঃস্থলে,
বনে উপবনে, নদী নদ গিরি গুহা
পারাবারে,
নিত্য জাগে সরস সঙ্গীতমধুরিমা,
নিত্য নিত্য রসভঙ্গিমা।
নব বসন্তে নব আনন্দে, উৎসব নব,




অতিমঞ্জুল, অতিমঞ্জুল, শুনি মঞ্জুল
গুঞ্জন কুঞ্জে,
শুনি মর্ম্মর পল্লবপুঞ্জে। ইত্যাদি।

(ব্রহ্মসঙ্গীত)

ইহার পর নন্দকের মাতা যে নন্দককে সেই ভীষণ স্থান হইতে উদ্ধার করিয়া লইয়া আসিলেন, তাহা পাঠক-পাঠিকা-গণ অনায়াসেই বুঝিতে পারিয়াছেন।

(ক্রমশঃ)

অমূল্যা সুন্দরী দাস গুপ্তা।
ঢাকা।

প্রাচীন মহিলাদিগের অঙ্গাভরণ। *

যে ভারতবর্ষ মণি মুক্তা প্রভৃতি বিবিধ রত্নের এবং সুবর্ণ প্রভৃতি নানা ধাতুর আকর ছিল, সেই ভারতবর্ষে যে প্রাচীন কালে সুবর্ণ ও রত্নাদি দ্বারা প্রস্তুত আভরণ পরম যত্নে ব্যবহৃত হইত, এ কথা বলা বাহুল্য মাত্র। প্রাচীনকালে আভরণ সকলের মধ্যে কতিপয়সংখ্যক মাত্র রাজধার্য্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট ছিল। পুরুষ-দিগের ব্যবহৃত অলঙ্কারের সংখ্যা কম ছিল। অধিকাংশ ভূষণই মহিলাদিগের স্বভাবসুন্দর দেহকে আরও শোভনীয় করিবার জন্যই এতদ্দেশে সুপ্রচলিত ছিল। যদিও আর্য্য শাস্ত্রের অনেক স্থলেই আছে "শীলতাই স্ত্রীলোকদিগের ভূষণ," তথাপি গাত্রে অলঙ্কার ধারণ করিতে কাহাকে নিষেধ করা হয় নাই। তবে শীলতা-বর্জ্জিতা নারী অত্যুত্তম ভূষণে ভূষিতা হইলেও যে প্রকৃত ভাবে প্রশংস-নীয়া হইতেন না, তাহাই যে ঐরূপ উক্তির অভিপ্রেত, তাহা সকলেই জানেন। মহাকবি কালিদাস অভিজ্ঞান শকুন্তল নাটকের এক স্থানে লিখিয়াছেন "যাহা-দিগের আকৃতি মধুর, তাহাদিগের কিই বা ভূষণ না হইয়া থাকে।" বাস্তবিক সুন্দরী রমণীগণ পুষ্পাদি দ্বারা বা মণি, মুক্তা, স্বর্ণ ও রজতাদি দ্বারা, যেরূপেই অলঙ্কৃতা হউন না, তাঁহাদিগের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যচ্ছটা কোন প্রকারেই অপ্রকাশিত থাকিবার নহে। তবে স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য আহরিত সৌন্দর্য্যের সহিত মিশিয়া যে এক অবর্ণনীয় প্রীতির সৃষ্টি করে, ইহা কে না স্বীকার করিবেন? অতএব স্বভাবজাত শোভাকে কৃত্রিম শোভার সহিত মিশাইবার জন্য ভূষণের প্রয়োজনীয়তা লক্ষিত হইয়া থাকে।

আমাদের শাস্ত্রানুসারে মহিলাদিগকে ভূষণাদি দ্বারা সম্মানিতা করা একটী

* এই প্রবন্ধ ইতিপূর্ব্বে অন্য পত্রিকাতেও প্রকাশিত হইয়াছিল। কিন্তু স্ত্রীপাঠ্য পত্রিকায় এরূপ প্রবন্ধ থাকা অনুপযোগী হইবে না মনে করিয়া পূর্ব্ব প্রবন্ধের কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করিয়া ইহা বামাবোধিনীতে প্রদত্ত হইল।






প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া পরিগণিত। এ কথা এখানে বলা আবশ্যক যে, যে ভারতবর্ষে ধর্ম্মার্থে অর্থ ব্যয় করা প্রধান কর্ত্তব্যমধ্যে বিবেচিত হইত, সেই দেশের গৃহস্থ ধর্ম্মার্থে অর্থব্যয়ে বিমুখ হইয়া, লৌকিক মানমর্য্যাদা রক্ষার্থে অবস্থানুসারে ব্যয় না করিয়া, গৃহিণীদিগকে অঙ্গাভরণ দান করাই পরম পুরুষার্থ বলিয়া বিবেচনা করিতেন না। তবে গৃহস্থদিগের বিবিধ ব্যয়ের মধ্যে মহিলাদিগের সম্মানার্থে, প্রীতি সম্পাদনার্থে এবং আরও নানাবিধ প্রয়োজনসাধনার্থে অবস্থানুসারে তাঁহাদিগকে ভূষণাদি দান করা একটী বিহিত ব্যয়ের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট ছিল।

আমাদের প্রাচীন শাস্ত্র পাঠে বুঝ যায় যে, বহুমূল্য হীরক ও মণিমাণিক্য হইতে আরম্ভ করিয়া, তাম্রাদি ধাতুও অলঙ্কার নির্ম্মাণার্থে ব্যবহৃত হইত। সুতরাং রাজাধিরাজ হইতে আরম্ভ করিয়া হীনাবস্থাপন্ন ব্যক্তিদিগের মধ্যেও অবস্থানুসারে বিবিধধাতুনির্ম্মিত বিবিধ প্রকার আভরণের প্রচলন ছিল। কালিকাপুরাণে দেবতাদিগকে ভূষণদানবিধি নামক একটী অধ্যায় আছে। ঐ অধ্যায়ে দেবতাদিগের উদ্দেশে ভূষণদান (নিবেদন) করিতে হইলে অথবা স্থাপিতা স্ত্রীদেবতার মূর্ত্তিকে সাজাইতে হইলে কোন্ কোন্ আভরণ দিতে হয় ও তাহা কোন্ কোন্ ধাতু দ্বারা নির্ম্মিত হইলে চলিতে পারে, তাহা বর্ণিত আছে। ঐ অধ্যায় পাঠে নারীদিগের কোথায় কোন্ ধাতুতে নির্ম্মিত অলঙ্কার ব্যবহার্য্য হইতে পারে, তাহা জানিতে পারা যায়। উক্ত পুরাণ পাঠে জানা যায়, কিরীট প্রভৃতি মস্তকের আভরণ সুবর্ণনির্ম্মিত হওয়া উচিত। আর গ্রীবা হইতে আরম্ভ করিয়া পাদাগ্র পর্য্যন্ত ভূষণ সকল সুবর্ণেরও হইতে পারে এবং রৌপ্যেরও হইতে পারে। কিন্তু বিশেষ এই যে, সকল প্রকার আভরণই তাম্রনির্ম্মিত করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। কারণ তাম্র সকল স্থলে সুবর্ণ সদৃশ বা সুবর্ণের অনুকল্প রূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। আমাদের শাস্ত্রানুসারে তাম্র অতি পবিত্র ধাতু। এইজন্য তাম্রের ভূষণ ধারণে ও দেবোদ্দেশে দান করায় বিশেষ ফল আছে। পাদদেশে কেবল রৌপ্যালঙ্কার দিতে হয়, কালিকাপুরাণে এইরূপ উক্ত আছে।

পুরাকালে কেবল শোভার জন্যই মণি, মুক্তা ও স্বর্ণাদি দ্বারা নির্ম্মিত আভরণ ধারণ করা হইত না। ঐগুলি স্বাস্থ্যের পক্ষে এবং ধর্ম্মানুষ্ঠানাদির পক্ষেও অনুকূল বলিয়া ব্যবহারের নিয়ম ছিল। যখন আমরা দেখি, অনেক সময়ে অষ্ট ধাতু দ্বারা নির্ম্মিত মাদুলি অনেকানেক পীড়ার উপশম পক্ষে সহায়তা করে, ঔষধ বিশেষ পূর্ণ যে সকল মাদুলি ব্যবহৃত হয়, তাহা স্বর্ণ রজত ও তাম্রাদি দ্বারা নির্ম্মিত হইয়া থাকে, তখন আমরা অবশ্যই মনে করিতে পারি যে, ধাতুবিশেষ অঙ্গে ধারণের অনেক গুণ আছে। মনুসংহিতার



সপ্তম অধ্যায়ে বর্ণিত আছে যে, নৃপতিগণ সর্ব্বদা বিবন্ন রত্ন সকল ধারণ করিতেন। কারণ উহা সর্ব্বদা শরীরে থাকিলে শত্রুর চক্রান্তে বিষের সহিত মিশ্রিত খাদ্য এবং দৈবাৎ দূষিত সুতরাং এক প্রকার বিষাক্ত খাদ্য ব্যবহৃত হইলে তাহা অনেক স্থলে অনিষ্ট করিতে পারে না। এইরূপে শাস্ত্রে স্বর্ণ ও রত্নাদি ধারণের অনেক গুণ দেখিতে পাওয়া যায় :—

ভূষণং ভূষয়েদঙ্গং যথাযোগ্যবিধানতঃ।
শুচি সৌভাগ্যসন্তোষদায়কং কাঞ্চনং স্মৃতম্॥
গ্রহদৃষ্টিহরং পুষ্টিকরং দুঃখপ্রণাশনম্।
পাপদৌর্ভাগ্যশমনং রত্নাভরণধারণম্॥
ভাবপ্রকাশঃ।

অনুবাদ। যথাযোগ্য বিধানানুসারে ভূষণ দ্বারা অঙ্গ ভূষিত করিবে। সুবর্ণ পবিত্র, সৌভাগ্যদায়ক ও সন্তোষপ্রদ। রত্নাভরণ ধারণ করিলে গ্রহের কুদৃষ্টি নিবারিত হয়, শরীরের পুষ্টি সাধিত হয়, উহা শারীরিক ও মানসিক দুঃখ নষ্ট করে এবং পাপ ও দৌর্ভাগ্য বিদূরিত করে।

মৌক্তিকঞ্চ মধুরং সুশীতলং
দৃষ্টিরোগশমনং বিষাপহম্।
রাজযক্ষ্মা-পরিকোপ-নাশনম্
ক্ষীণবীর্য্যবলপুষ্টিবর্দ্ধনম্॥
রাজবল্লভঃ।

অনুবাদ। মৌক্তিকাভরণ মধুর, সুশীতল, দৃষ্টিরোগনিবারক এবং বিষদোষহারক। উহা রাজযক্ষ্মার পরিকোপ নাশ করে। যাহারা ক্ষীণবীর্য্য, মুক্তালঙ্কার ধারণ করিলে তাহাদের বল বৃদ্ধি ও পুষ্টি সাধন হয়।

রত্নশাস্ত্রে মুক্তা সম্বন্ধে যেরূপ গুণ বর্ণিত আছে, সেইরূপ দোষও কীর্ত্তিত আছে। উৎপত্তিস্থানানুসারে এবং প্রকৃতি ও বর্ণানুসারে উহাদের নামভেদ ও শ্রেণীভেদ হয় এবং পরীক্ষা দ্বারা গুণদোষ নির্ণীত ও মূল্যাদি নিরূপিত হয়। অপ্রাসঙ্গিক ও প্রস্তাববাহুল্য হইবে ভাবিয়া ঐগুলি বর্ণিত হইল না।

কত দীর্ঘ কাল হইতে ভারতবর্ষে রত্নের ব্যবহার প্রচলিত আছে, সৃষ্টির কালনির্ণয়ের ন্যায় তাহারও কাল নির্ণয় করা কঠিন। ঋগ্বেদে "হোতারম্ রত্নধাতারম্" এইরূপ দৃষ্টান্তক্রমে রত্নের নাম থাকাতে বোধ হয় বেদপ্রধান যুগেও রত্নের সমাদর ছিল। পাতঞ্জল দর্শনে 'অপরিগ্রহস্থৈর্য্যে সর্ব্বরত্নোপস্থানম্' এই সূত্রে রত্নের নাম থাকাতে বোধ হয় দর্শন ও যোগচর্চ্চার সময়েও রত্ন আদরের বস্তু ছিল। মহাভারতে শুক্রনীতির নাম পাওয়া যায়, সুতরাং মহাভারতের বহুপূর্ব্বে রচিত শুক্রনীতি গ্রন্থে রত্নের বিশেষ বিবরণ বর্ণিত থাকাতে বোধ হয় মহাভারতের বহুপূর্ব্বে এদেশে রত্নের প্রচলন ছিল। ইহা ভিন্ন অগ্নিপুরাণ, গরুড়পুরাণ প্রভৃতি পুরাণ শাস্ত্রে, মনু প্রভৃতি প্রণীত সংহিতা শাস্ত্রে, বৃহৎ সংহিতা প্রভৃতি জ্যোতিষশাস্ত্রে, ভাবপ্রকাশ প্রভৃতি আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থে রত্নের বিবরণ পাওয়া যায়। অভিধানে ও কাব্যেও বিবিধ রত্নাভরণের নাম

জানা যায়। এই সকল আলোচনা করিলে বোধ হয় সত্যযুগ হইতে এদেশে মণিমাণিক্যাদি রত্ন এবং স্বর্ণাদি ধাতু দ্বারা নির্ম্মিত নানা প্রকার আভরণ ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে।

প্রাচীন আর্য্যমহিলাগণ কোন্ কোন্ আভরণ কোন্ কোন্ অঙ্গে ধারণ করিতেন, তদ্বিবরণ অমরকোষে অনেক প্রাপ্ত হওয়া যায়। উক্ত গ্রন্থের রঘুনাথ চক্রবর্ত্তী কৃত ত্রিকাণ্ড চিন্তামণি এবং মহেশ্বর পণ্ডিত কৃত অমর বিবেক, এই দুই নামে অভিহিত দুই খানি টীকা আছে। উক্ত টীকাদ্বয় এবং অমরকোষ হইতে সংগ্রহ করিয়াই এই প্রস্তাবে বর্ণনীয় প্রধান প্রধান আভরণগুলির বিবরণ লিপিবদ্ধ করা যাইতেছে। কিন্তু এতদ্ব্যতিরিক্ত আরও অনেকবিধ ভূষণের নাম পাওয়া যায়, সেগুলির উল্লেখ অমরকোষে নাই। সেই সকল বিবরণ অপরাপর কোষগ্রন্থ এবং অন্যান্য গ্রন্থ হইতে যতদূর সম্ভব সংগ্রহ করা যাইতেছে। প্রাচীনকালের আভরণগুলি কিরূপ আকারবিশিষ্ট ছিল এবং বর্ত্তমান সময়েই বা সেইগুলি কি কি নামে অভিহিত হইয়াছে, এবং কোন্ কোন্ আভরণের বঙ্গদেশে বিরল প্রচার বা অপ্রচার দেখা যায়, তাহাও সাধ্যমত বিবৃত করা যাইতেছে :—

মণ্ডনঞ্চাথ মুকুটং কিরীটং পুন্নপুংসকম্।
চূড়ামণিশিরোরত্নং তরলো হারমধ্যগঃ।
বালপাশ্যা পরিতথ্যা পত্রপাশ্যা ললাটিকা॥

মণ্ডনকে ভূষণ বলে। মুকুট ও কিরীট এই দুইটী মস্তকাভরণ এক পর্য্যায়বাচক। (মক্ + করণবাচ্যে উট্) মস্তক ইহা দ্বারা মণ্ডিত হয় বলিয়া ইহাকে মুকুট (বা মকুট) বলে। (কৄ + কর্ত্তৃবাচ্যে কীটন্) রশ্মি বিক্ষেপ করে বলিয়া ইহাকে কিরীট কহে। মুকুটস্থ প্রধান মণির নাম চূড়ামণি বা শিরোরত্ন। মস্তকে ধারণযোগ্য হার গাঁথিবার সময় উহার মধ্যভাগে যে একটী বড় মণি দেওয়া যায়, তাহাকে তরল বলে। (তার + লা + কর্ত্তৃবাচ্যে ক) তারকাকৃতি করিয়া দেয় বলিয়া ইহার নাম তরল। উহাকে নায়কও কহে। প্রচলিত ভাষায় উহা পদক এই নামে খ্যাত।

বালপাশ্যা ও পরিতথ্যা এই দুইটী সীমন্ত ভূষণ। স্ত্রীলোকদিগের চুলে উহা পাশাকৃতিরূপে জড়ান থাকে। (বালং কেশং পাশ্যতীতি) কেশকে বন্ধন করে বলিয়া উহার নাম বালপাশ্যা অথবা (বালপাশ + হিতার্থে যং) বালপাশের অর্থাৎ কেশসমূহের হিতকর বলিয়া উহার নাম বালপাশ্যা। উহা মস্তকস্থিতা সুবর্ণাদিরচিতা এক প্রকার পট্টিকা (পেটি বা পাড়ী)। (পরিতথা + যন্) মস্তককে যথাযথরূপে ভূষিত করে বলিয়া সম্ভবতঃ উহাকে পরিতথ্যা কহে। চলিত ভাষায় ইহার নাম শিথি।

এতদ্ভিন্ন আরও কতকগুলি মস্তকাভরণের নাম পাওয়া যায়। চুলের বন্ধন দৃঢ় থাকিবে, এইজন্য কেশের মধ্যে



একপ্রকার সুবর্ণনির্ম্মিত শলাকাবিশেষ (কাঁটা) প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হইত, ইহাকে গর্ত্তক কহে। অশ্বত্থপত্রের ন্যায় আকারবিশিষ্ট, হীরা-মণি-মাণিক্যাদি-জড়িত হংসতিলক নামে একপ্রকার মস্তকাভরণ ছিল। বোধ হয় উহা এখনকার পানপাতার সদৃশ হইবে।

(ক্রমশঃ)

৺উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের আত্মজীবনী

রোমরাজ্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

পঞ্চম অধ্যায়।

ভল্‌সীয়দিগের সহিত যুদ্ধ।

১। খ্রীঃ পূঃ ৪৯৭ অব্দে ভল্‌সীয়দিগের সহিত রোমের তৃতীয় যুদ্ধ হয়।

২। ঐ জাতি বহুকালাবধি রোমানদিগের উপর অনেক অত্যাচার ও অনিষ্টাচরণ করাতে এই যুদ্ধ সংঘটন হয়।

৩। রোমনগর স্থাপনের ২৫৯ বৎসর পরে ইহার আরম্ভ হয় এবং রোমানেরা ইহাতে জয়ী হয়েন।

৪। এই যুদ্ধ প্রথমতঃ রোমের পক্ষে ভয়জনক হইয়াছিল। পরে কুইণ্টস সিন্সিনেটস নামে এক ব্যক্তি হলচালন করিতেছিলেন, রোমানেরা তাঁহার অসাধারণ বুদ্ধি দর্শন করিয়া তাঁহাকে (ক) ডিরেক্টর বা রোমের সর্ব্বাধ্যক্ষ করিল। এই ব্যক্তি যুদ্ধের সেনাপতিত্ব গ্রহণ করেন। ইনি প্রথমে এক মহাধনবান্ রোমান ছিলেন, কিন্তু তাঁহার পুত্র সিজোকে কোন গুরুতর দণ্ড হইতে রক্ষা করিতে তাঁহার সকল অর্থ নষ্ট হয়। ইহাঁর প্রথম বয়সের সাহসিক কার্য্য সকল দেখিয়া এই প্রয়োজনীয় ভার ইহাঁর উপর সমর্পিত হয়।

৫। যুদ্ধ সমাধা করিয়াই সিন্সিনেটস পুনর্ব্বার ভূমিকর্ষণ এবং ক্ষেত্রকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

৬। রোমানদিগের সহিত ভলসীয়দিগের আরও অনেক যুদ্ধ হয় এবং তন্মধ্যে কোরাইওলেনস (খ) নামে এক ভদ্রবংশীয় রোমান যুবক যে সমরানল প্রজ্বলিত করিয়া দেন, তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান। ২৬২ রোমাব্দে বিচারকেরা তাঁহার কোন গুরুতর দোষ প্রমাণ করিয়া নির্ব্বাসনাজ্ঞা প্রদান করেন। তাহাতে তিনি ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া ভলসীয়-

(ক) যখন রোমে ঘোর বিপদ উপস্থিত হইত অথবা কন্সলদিগের কথা কেহ অমান্য করিত অথবা অন্য কোন প্রয়োজন পড়িত, তখন সেনেটরেরা পূর্ণ ক্ষমতা দিয়া কিছুকালের জন্য এক ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিতেন; তাঁহাকে ডিরেক্টর বলিত।

(খ) প্রথমে ইহাঁর নাম ক্যায়স মার্সিয়াস্ ছিল। ভলসাইয়ের দুর্গ কোরাইওলি আক্রমণ করাতে তাঁহার নাম কোরাইওলেনস হইয়াছিল।






দিগের নিকট গমন করিলেন এবং উক্ত জাতির আশ্রয়ে স্বজাতীয় রোমানদিগের বিরুদ্ধে স্বয়ং সেনাপতি হইয়া যুদ্ধারম্ভ করিলেন।

৭। তিনি প্রতিবারেই জয়লাভ করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার ভয়ে সমুদায় রোমজনপদ থর থর কম্পমান হইল।

৮। কিন্তু তিনি তাঁহার অভিলাষ সিদ্ধ করিতে পারিলেন না। যখন রোমনগর আক্রমণার্থে তিনি তাহার সম্মুখে শিবির স্থাপন করিলেন, সেনেটরেরা আসন্ন ঘোর বিপদ দেখিয়া তদীয় ক্রোধশান্তির জন্য অনেক ভদ্র বর্ষীয়সী স্ত্রীলোকের সহিত তাঁহার মাতা ভিটুরিয়া ও পত্নী ভলম্নিয়াকে তাঁহার নিকট পাঠাইলেন। তাঁহারা স্তুতি, মিনতি ও সাশ্রুনয়নে বারম্বার মাতৃভূমি রোমরক্ষা করিবার জন্য অনুনয় বিনয় করাতে নিষ্ঠুর কোরাইওলেনসের কঠিন হৃদয় আর্দ্র হইল এবং তখন তিনি স্বীয় দারুণ প্রতিজ্ঞা পরিত্যাগ করিয়া বাষ্পপূর্ণনেত্রে জননীকে বলিলেন, মাতঃ! তুমি রোমরক্ষা করিলে বটে, কিন্তু তোমার পুত্রকে পাইবার আর প্রত্যাশা করিও না।

পরে তিনি ২৬৬ রোমাব্দে সংগ্রাম হইতে ভল্‌সীয় সৈন্যগণকে প্রতিনিবৃত্ত করিলেন। কিন্তু রোমলুণ্ঠনে নিরাশ হইয়া (৪৮৭ খৃঃ পূঃ) তাহারা তাঁহার প্রাণসংহার করিল। ইহাই তাঁহার বিদ্রোহজনিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত।

৯। ভল্‌সীয়ানেরা তথাপি যুদ্ধে নিরস্ত হয় নাই। কিন্তু কোরাইওলেনসের মৃত্যুর পর তাহাদিগের সকল চেষ্টাই বিফল হইল এবং অবশেষে তাহারা রোম সেনাপতি স্পিউরিয়স্ কেসিয়স্ কর্ত্তৃক সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হইল।

১০। ইহার তিন বৎসর পরে স্পিউরিয়স্ দরিদ্রলোকদিগের উপর দয়ালু হইয়া প্রসিদ্ধ আগ্রেরিয়ান ল অর্থাৎ ভূমিসম্পর্কীয় আইন প্রস্তুত করেন। ইহাতে সেনেটরেরা তাঁহাকে রাজত্ব-লাভাকাঙ্ক্ষা বলিয়া দোষী করেন এবং ২৬৮ রোমাব্দে (খৃঃ পূঃ ৪৮৪ অব্দে) টার্পিয় পর্ব্বত (ক) হইতে নিক্ষেপ করিয়া তাঁহাকে হত্যা করেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

ভিজেন্টিদিগের সহিত যুদ্ধ।

১। খৃঃ পূঃ ৪০৪ অব্দে ভিজেন্টিদিগের সহিত রোমানদিগের যুদ্ধারম্ভ হয়।

২। অনন্তর ৩৫৮ রোমাব্দে (খৃঃ পূঃ ৩৯৫ অব্দে রোমানেরা ডিক্টেটর কমিলসের অধীনে ক্রমাগত দশ বর্ষ (খ) আক্রমণের পর বিজেন্টিনগর হস্তগত করেন।

৩। কামিলস্ এক মহাবীর ছিলেন।

(ক) কোন প্রধান ব্যক্তি দোষী প্রমাণ হইলে রোমানেরা তাঁহাকে টার্পিয় পর্ব্বত হইতে ফেলিয়া দিয়া বধ করিত।

(খ) ইতঃপূর্ব্বে রোমান সৈন্যগণ কয়েক মাস যুদ্ধবেশ পরিত্যাগ করিয়া ভূমিকর্ষণ করিত। কিন্তু এই ভিজেন্টিদিগের সহিত যুদ্ধসময়ে সেনেটরেরা তাহাদিগের বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিলেন এবং সম্বৎসর যুদ্ধ করিবার নিয়ম করিলেন।



তিনি ফাইডেণ্টেট্‌শ জাতি এবং ফলশী নগর জয় করিয়া আপনার শৌর্য্যবীর্য্য প্রকাশ করেন এবং গলদিগের হস্ত হইতে রোমনগর রক্ষা করেন।

সপ্তম অধ্যায়।

গলিক যুদ্ধ।

১। ৩৬৩ রোমাব্দে গলদিগের সহিত রোমের প্রথম যুদ্ধ হয়।

২। গলেরা এই যুদ্ধের প্রবর্ত্তক। তাহারা লক্ষাধিক সৈন্য লইয়া উত্তর দিক্ দিয়া ইটালীতে প্রবেশ করিল। তাহাদিগের প্রত্যাশা ছিল যে, অনেক দ্রব্য লুণ্ঠন করিবে। তাহারা প্রথমে ক্লুসিয়ম্ (ক) আক্রমণ করিয়া পরে রোমের দিকে যাত্রা করিল।

৩। রোমানেরা যখন গলদিগের আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিল, তখন তাহারা অনেক সৈন্যের সহিত ফেরিয়স্ কন্সলকে যুদ্ধার্থে পাঠাইল।

৪। আলিয়া নদীর তীরে দুই দলে এক তুমুল সংগ্রাম হয়। তাহাতে রোমানদিগকে সম্পূর্ণরূপ পরাভব স্বীকার করিতে হইয়াছিল।

৫। জয় লাভ করিয়াই গল জাতি (খৃঃ পূঃ ৩৮৯) এককালে রোম নগরে প্রবেশ করিল। তাহারা লুটপাট আরম্ভ করিল। সেনেটরদিগের মধ্যে যাহাকে সম্মুখে পাইল, খড়্গাঘাতে তাহার প্রাণ সংহার করিল এবং সমুদায় নগরটী সমভূমি ও ভস্মসাৎ করিয়া ফেলিল।

৬। যুবক রোমানেরা মান্‌লিয়সের সহিত কাপিটল নামক সুদৃঢ় দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিল। গলাধিপতি ব্রেনস রাজধানী বিলুণ্ঠিত ও ভস্মসাৎ করিয়া অবশেষে সেই কাপিটলই আক্রমণ করিল।

৭। গলগণ ছয় মাস কাল কাপিটল অবরোধ করিয়া রাখিয়াছিল (খ)। পরে রোমানেরা নির্ব্বাসিত কামিলস্‌কে পুনরাহ্বান করিলে, তিনি অতি শীঘ্র নগর রক্ষার্থ ধাবমান হইলেন। তিনি পথিমধ্যে দুই সহস্র লোক সংগ্রহ করিয়া গলদিগকে পরাভূত ও রোম হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। অনেক দূর পর্য্যন্ত তিনি তাহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন এবং তাহাদিগের অধিকাংশকে কালকবলে প্রেরণ করিলেন।

৮। কামিলস জয়পতাকার সহিত রোমে প্রত্যাগমন করিলেন এবং তাহার ধ্বংসাবশেষ স্থানান্তরিত করিয়া এক নূতন নগর নির্ম্মাণের অনুমতি দিলেন। এই নূতন রোমনগর তাঁহার সাহায্যে নির্ম্মিত

(ক) টস্কানীর একটী নগর।

(খ) কথিত আছে, কোন রজনীতে রোমানেরা সকলেই নিদ্রিত ছিল, এমন সময়ে গলগণ এক অরক্ষিত গুপ্ত পথ দিয়া কাপিটল পর্ব্বতের উপর উঠিতেছিল। কিন্তু তাহাদের পদশব্দে জুনদেবীর হংসী সকল চীৎকার করিয়া উঠিল এবং তাহাতে সেনাপতি মান্‌লিয়স্ জাগ্রত হইয়া রোমানদিগকে রক্ষা ও গলদিগকে দূরীভূত করিলেন।




হওয়াতে তিনি "দ্বিতীয় রমুলস" বলিয়া খ্যাত হইলেন।

৯। ইহার অল্প কাল পরে মানলিয়স্ ও ডলাভেলা গলদিগকে ইটালীর সীমা হইতে দূরীকৃত করিয়া দিলেই গলিক যুদ্ধের শেষ হইল।

ভিখারিণী।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

হেমচন্দ্র অতিশয় অনন্যমনা হইয়া তাঁহার কথা শুনিতেছিলেন। তাঁহাকে নীরব দেখিয়া তিনি অতি আগ্রহান্বিত হইয়া বলিলেন, "তার পর, তার পর?"

জীবনস্বামী উত্তর করিলেন, "তার পর আমি দেশে ফিরিয়া আসিয়া সকল বিষয় শুনিলাম এবং তাহার অনেক খোঁজ করিলাম, কিন্তু তাহাকে কোথায়ও পাইলাম না।"।

ইহার পর তাহাদের আরও অনেক কথাবার্ত্তা হইল। হেমচন্দ্রের সৌম্যমূর্ত্তি দেখিয়া ও উদারজনোচিত কথাবার্ত্তা শুনিয়া জীবনস্বামী তাঁহার মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। হেমচন্দ্র কমলিনীকে ভগিনীর ন্যায় ভাল বাসিলেন। তিনি বৃদ্ধের সহিত নিজের পিতার ন্যায় অনেক আলাপ করিলেন। বৃদ্ধও পুত্র সম্বোধনে হেমচন্দ্রকে পরিতুষ্ট করিলেন এবং নিজেও এই অসহায় অবস্থায় হেমচন্দ্রকে পুত্রের ন্যায় পাইয়া বড়ই সুখী হইলেন। হেমচন্দ্র দেখিলেন অধিক রাত্রি নাই। তিনি তখনই গন্তব্য পথাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাঁহার সমস্ত পরিচ্ছদই ভিজিয়া গিয়াছিল, এক্ষণে সকলই শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। তিনি অনেকদূর অগ্রসর হইয়া একটী গৃহদ্বারে উপস্থিত হইলেন। অনর্গলাবদ্ধ দ্বার দেখিয়া হেমচন্দ্র বড়ই শঙ্কিত হইলেন এবং গৃহে প্রবেশ করিয়া কম্পিত স্বরে ডাকিলেন, "কুন্তল, কুন্তল,"—কাহারও সাড়া শব্দ নাই। প্রতিধ্বনি উত্তর করিল "কুন্তল, কুন্তল।" হেমচন্দ্রের প্রাণ উড়িয়া গেল। তিনি চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। তিনি কুসুম-নির্ম্মিতা প্রেমপুত্তলি কুন্তলকে গৃহে না দেখিয়া ভয়ানক বিপদাশঙ্কা করিলেন। তিনি ইতস্ততঃ অনেক অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, অনেক চীৎকার করিয়া ডাকিলেন, কিন্তু তাহার কোন সাড়া পাইলেন না। আলো জ্বালিয়া তিনি দেখিলেন মূল্যবান্ জিনিষ একটীও ঘরে নাই। যে সকল জিনিষ আছে, সে সকলও এদিক ওদিক ছড়ান পড়িয়া আছে। তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, সর্ব্বনাশ হইয়াছে। তবে কি তিনি পথিমধ্যে যে কাতর আর্ত্তনাদ শুনিয়া





ছিলেন তাহা তাঁহারই কুন্তলের কণ্ঠ-নিঃসৃত ? তবে কি কোন দস্যুদল তাঁহার সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া গিয়াছে ? ইত্যাদি ভাবিতে ভাবিতে গভীর নৈরাশ্যে তাঁহার হৃদয় অবসন্ন হইয়া আসিল, তিনি মাথায় হাত দিয়া এক স্থানে বসিয়া পড়িলেন। একটী গভীর মর্ম্মভেদী দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া তিনি আপনার মনে বলিয়া উঠিলেন, "তবে আমার কুন্তল অপহৃত হইয়াছে ?" কিছুক্ষণ নিশ্চেষ্টভাবে বসিয়া থাকিয়া তিনি উঠিলেন, আবার ইতস্ততঃ অনেক অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাহাতে কোনও ফল দর্শিল না। ক্রমে শীতল-সৌরভ-সমীরণময়ী উষারাণী প্রেমময়ী মূর্ত্তি ধারণ করিলেন, প্রভাতোদয়সূচক পক্ষিগণ মঙ্গলময়ী আরতি আরম্ভ করিল। বিধুপ্রিয়া কুমুদিনী নিশানাথের অন্তর্দ্ধানে বিষাদে নয়ন মুদিল। রজনী প্রভাত হইল। হেমচন্দ্র হতাশ হইয়া গৃহকোণে বসিয়া পড়িলেন। অমানুষিক অস্ফুট কাতর স্বরে তিনি আপনা আপনি বলিলেন, "তবে আমার দুঃখের নিমিত্ত কি প্রভাত হইল ?" তৎপর দিবস হেমচন্দ্র গ্রামের মধ্যে ও তাহার বাহিরে অনেক অন্বেষণ করিলেন, কিন্তু কোথায়ও কুন্তলের সন্ধান পাওয়া গেল না। হেমচন্দ্র শেষে নিরাশ হইয়া পত্নীর উদ্দেশে বাহির হইলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

পরিচয়।

হেমচন্দ্র পঞ্চবিংশতিবর্ষীয় একটী যুবক। শৈশবকালেই তাঁহার পিতৃমাতৃবিয়োগ হয়। তিনি একজন পিতৃবন্ধুর আশ্রয়ে লালিত পালিত হইয়া পরিশেষে তাঁহারই একমাত্র সন্তান কুন্তলের সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। হেমচন্দ্র যেরূপ গুণবান্, দেখিতেও সেইরূপ রূপবান্ ছিলেন। আর কুন্তল ? সেও সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী ছিল। কুসুমময়ী কুন্তল রূপে গুণে অতুলনীয়া। তাহার গৌর মুখকান্তি সরল অথচ মধুর, তাহার অবেণীবদ্ধ আলুলায়িত ভ্রমর-কৃষ্ণ কুঞ্চিত অলকদাম পৃষ্ঠোপরি বিষধর ফণীর ন্যায় অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিত। তাহার প্রশস্ত উন্নত ললাট, আকর্ণবিস্ফারিত ভ্রমর-পদভারস্পন্দিত নয়নযুগল, উষাকালীন মৃদু মলয়-মারুত-হিল্লোলিত কুসুমস্তর তুল্য ঈষৎ কম্পিত রক্তিম ওষ্ঠাধর, কৌমুদীস্নাত কুসুমস্তবকের ন্যায় উজ্জ্বল কপোলদ্বয় এবং তাহার সেই সর্ব্বাঙ্গীণ লাবণ্যের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে বোধ হয় যেন বিধাতার স্বহস্ততুলিকাসম্পাতেই এই অনিন্দ্য সুন্দরী বিশ্বমনোমোহিনী ছবিখানি চিত্রিত। আশৈশব তাঁহারা একত্র লালিত হওয়াতে তাঁহাদের প্রণয়-বন্ধন বড়ই মধুর হইয়াছিল। কালক্রমে কুন্তলের মাতাপিতাও সংসার হইতে চির বিদায় গ্রহণ করিলেন। বলিতে গেলে সংসারে তাহাদের আপনার বলিবার কেহই রহিল না।

এক দিবস কোনও কার্য্যানুরোধে হেমচন্দ্র গ্রামান্তরে গিয়াছিলেন। গৃহে



পত্নী একাকিনী রহিয়াছে মনে করিয়া তিনি প্রহরেক রাত্রিমধ্যে তথাকার কার্য্য সম্পন্ন করিয়া গৃহাভিমুখে ছুটিলেন। পথিমধ্যে যাহা যাহা সংঘটিত হইয়াছে, তাহা পাঠকপাঠিকাগণ সকলই অবগত আছেন।

হেমচন্দ্র পত্নীর অন্বেষণে বাহির হইলেন। কিন্তু তিনি কোথায় যাইবেন? তিনি বুঝিতে পারিলেন না কোথায় গেলে পত্নীর সন্ধান পাইবেন! অনেক দেশ পর্য্যটন করিলেন, কিন্তু কুন্তলের আর কোন সন্ধান করিতে পারিলেন না।

ক্রমে কুন্তলের অনুসন্ধানে দুই বৎসর অতীত হইল। হেমচন্দ্র একেবারে হতাশঃ হইতে লাগিলেন। তিনি ভাবিলেন, "হায় কুন্তল! তুমি কি ইহ জগতে তবে নাই? একবার দেখিয়া যাও, তোমার হেমচন্দ্র আজ ধূল্যবলুণ্ঠিত ও স্বদেশত্যাগী! একবার দেখিয়া যাও, আমি কত কষ্টে কাঁদিয়া কাঁদিয়া দিন কাটাইতেছি!" কেহ কোন উত্তর দিল না। কেবল একটী মর্ম্মস্পর্শী দীর্ঘ নিঃশ্বাস তাহার অন্তস্তলস্থ গভীর শোকোচ্ছ্বাসের সহানুভূতি প্রকাশ করিল। সেই দীর্ঘ নিঃশ্বাস চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িল। তিনি মনে মনে বলিলেন, "হা ভগবন্! এই ত আবার সূর্য্য পশ্চিম আকাশের দিকে আসিতেছেন। এই ত তিমিরাচ্ছন্ন যামিনী আসিতেছে। অন্ধকারের পর আবার আলো আসিবে—আবার অন্ধকার আসিবে। পর্য্যায়ক্রমে একবার সূর্য্যদেব পশ্চিম দিকে অস্ত যাইতেছেন, আবার পূর্ব্ব দিকে উদয় হইতেছেন। হে বিধাতঃ! কেবল এই অভাগার সুখ-সূর্য্য কি চিরকালের জন্য অস্তমিত হইয়াছে?"

হেমচন্দ্র কুন্তলের সেই অপরূপ রূপ-লাবণ্য-মণ্ডিত চম্পকচারু মূর্ত্তিখানি ও তাহার অনুপম গুণরাশির কথা ভাবিতে ভাবিতে একটী বৃক্ষের ছায়ায় ঘুমাইয়া পড়িলেন। নিদ্রাভঙ্গে দেখিলেন, সূর্য্য পশ্চিম গগনে ঢলিয়া পড়িয়াছে ও পক্ষিগণ সন্ধ্যাকালীন আরতি গাহিয়া আপন আপন কুলায়ে আশ্রয় লইতেছে। চক্রবাক্ আপনার শেষগান গাহিয়া চক্রবাকীর সহিত প্রেমালাপ করিতে করিতে নীড়োদ্দেশে ধাবিত হইতেছে। নিরাশ্রয় পথিকগণ আশ্রয়াভিলাষে গ্রামাভিমুখে ছুটিতেছে। রাখালগণ 'গোঠ হতে আইল নন্দদুলাল আমার' বলিয়া মধুরতানে চারি দিক মাতাইয়া সদলে গৃহাভিমুখে ছুটিয়াছে। ভীমরূপিণী নিশার আগমনে জগৎস্থ সকলেই যেন ভীত, সকলেই আপন আপন আবাসস্থান লইতেছে। কিন্তু আমাদের হেমচন্দ্র তখনও সেই প্রান্তরস্থিত বৃক্ষতলে উপবিষ্ট থাকিয়া আপনার অদৃষ্ট ভাবিতে-ছেন! তিনি ভাবিতে লাগিলেন, "জগতে সকলেরইত একটী না একটী আশ্রয় আছে, আমার নাই কেন? সকলেরইত আশা আছে, আমার নাই কেন? হায় কে জানে এ নিরাশ জীবন আর কতকাল বহন করিতে হইবে।" এইরূপ ভাবিতে




ভাবিতে তিনি এতদূর চিন্তামগ্ন হইলেন যে,বাহ্য জগতের বিষয়ে তাঁহার কিছুমাত্র জ্ঞান রহিল না। এদিকে রজনী ক্রমেই অন্ধকারময়ী হইতে লাগিল, আকাশে নক্ষত্রগণ ফুটিতে লাগিল, কিন্তু তাঁহার চৈতন্য নাই, তিনি সেইরূপ ভাবেই চিন্তামগ্ন! এমন সময়ে তাঁহার মস্তকের উপর একটা পেচক গম্ভীর স্বরে ডাকিয়া উঠিল। পেচকের কর্কশস্বরে তাঁহার চমক ভাঙ্গিল। তিনি দেখিলেন রাত্রি অধিক হইয়া পড়িয়াছে, চারি দিকে শিবাগণ ভীষণ চীৎকার করিতেছে। তিনি তাড়াতাড়ি গাত্রোত্থান করিলেন। দুইটা শৃগাল তাঁহাকে মৃত জ্ঞান করিয়া তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইতেছিল, তাঁহাকে উঠিতে দেখিয়া তাহারা বেগে পলায়ন করিল। হেমচন্দ্র কিয়ৎকাল কি ভাবিয়া আশ্রয়লাভের আশায় গ্রামাভিমুখে ধীরে ধীরে চলিলেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীরজনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়।

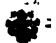
গিলিয়ান সিটনের উত্তরাধিকারিত্ব

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

ব্যারণসকম্ব পল্লীটি বেশ নির্জ্জন ও হরিতবর্ণ উপবনাকীর্ণ। চারি দিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড়। নির্ঝরিণী ও সুদূরবিস্তৃত শ্যামল প্রান্তরে এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটীর-রাজিতে স্থানটি গল্পে লিখিত পরীর রাজ্যের ন্যায় মনোরম। এই সুন্দর স্থানটির মধ্যে নানা প্রকার কারুকার্য্যখোদিত প্রকাণ্ড ব্যারণসকম্ব প্রাসাদটি পরী রাণীর প্রাসাদের ন্যায় প্রথম দর্শনেই দর্শকের মনে বিস্ময় উৎপাদন করিত। এই প্রকাণ্ড প্রাসাদের বর্ত্তমান অধিকারিণী গিলিয়ান সিটন সম্প্রতি তাঁহার সখী মেরিয়ণের সহিত এই প্রাসাদে বাস করিতেছিলেন। এই প্রাসাদের চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত বিপুল ব্যারণসকম্ব জমীদারীর তিনি এক্ষণে একমাত্র কর্ত্রী ও স্বত্বাধিকারিণী। কিন্তু তিনি এত বিপুল সম্পত্তির অধি-কারিণী হইলেও তাঁহার মনে কিছুমাত্র সুখ ছিল না। ব্যারণসকম্ব জমীদারীর অধিবাসী প্রজাবর্গের অন্তরে এই অকস্মাৎ আবির্ভূত নূতন ভূমধিকারিণীর প্রতি যে একটা আন্তরিক ঘৃণাভাবের সঞ্চার হইয়াছিল, সে সংবাদ গিলিয়ানের নিকট অজ্ঞাত ছিল না। এই কারণেই গিলিয়ানের অন্তরে কিছুমাত্র সুখ ছিল না।

আজ ব্যারণসকম্ব পল্লীটি পরিষ্কার ও নির্ম্মল প্রভাতালোকে দীপ্ত ও সমুজ্জ্বল দেখাইতেছিল। গ্রীষ্মের প্রথম আবির্ভাবে চারি দিক বেশ একটু উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল। গিলিয়ান ও মেরিয়ন এই সুন্দর প্রভাতকালে ব্যারণসকম্ব প্রাসাদের



বসিবার গৃহে বসিয়া কথোপকথন করিতেছিল। মেরিয়ণ সম্প্রতি কঠিন পীড়া হইতে আরোগ্য লাভ করিয়াছিল। তাহার আনন হইতে বিগত অসুস্থতার ম্লান ছায়া তখনও অপগত হয় নাই। গিলিয়ানের যত্নে ও শুশ্রূষায় সেই কঠিন পীড়ার সময়ও তাহাকে কোন প্রকার অভাব অনুভব করিতে হয় নাই। পীড়া হইতে মুক্ত হইলেও, গিলিয়ানের একান্ত অনুরোধে মেরিয়ণ ব্যারন্সকম্ব প্রাসাদে এতাবৎকাল বাস করিতেছিল। আজ প্রভাতে মেরিয়ণ তাহার বন্ধু মিসেস গোল্ডস্মিথের নিকট হইতে একখানি পত্র প্রাপ্ত হইয়াছিল। সেই পত্রের বিষয় উল্লেখ করিয়া মেরিয়ণ সম্পূর্ণ কৃতজ্ঞতাসূচক স্বরে বলিল—গিলিয়ান! মিসেস গোল্ডস্মিথ আমার জন্য কোন সম্ভ্রান্ত মহিলার সহকারীর কার্য্য সংগ্রহ করিয়াছেন, এবং এই সপ্তাহের মধ্যেই আমাকে কার্য্য গ্রহণ করিতে লিখিয়াছেন। দেখিতেছি, মিসেস গোল্ডস্মিথের আমার প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহ

গিলিয়ান মেরিয়ণের কথার উত্তরে ঈষৎ অবজ্ঞাপূর্ণ স্বরে বলিলেন—

হাঁ হাঁ! মিসেস গোল্ডস্মিথের তোমার প্রতি যে যথেষ্ট অনুগ্রহ তাহাতে কোন সন্দেহ নাই সত্য। কিন্তু আমার তাঁহার উপর অত্যন্ত রাগ হইতেছে। তুমিত জান যে, এখানে আমার নিকটে তোমাকে চিরদিন রাখিবার জন্য আমার কি পর্য্যন্ত না আগ্রহ। কিন্তু দেখ, তুমি চলিয়া যাইবে ইহা মনে করিয়া তুমি কি পর্য্যন্ত না আনন্দিত হইতেছ।

মেরিয়ণ দুঃখিত স্বরে উত্তর করিল—

আমি আমার সখীর এই সুন্দর সুখময় গৃহ পরিত্যাগ করিতে চাহিতেছি ইহা মনে করিতে আমার কষ্ট হইতেছে। কিন্তু আমি এ কথা স্পষ্ট করিয়া বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, আমি কাহারও ভার স্বরূপ হইয়া জীবন যাপন করিতে চাই না। আমি স্বাধীন ভাবে জীবন যাপনের বাসনা পরিত্যাগ করিতে পারিব না।

গিলিয়ান বলিলেন—"মেরিয়ণ, তুমি পূর্ব্বের কথা সমস্ত ভুলিয়া যাইতেছ। পূর্ব্বে তুমি আমাকে কোন্ বিষয়ে না সাহায্য করিয়াছ? কতদিন তুমি তোমার স্বকীয় উপার্জ্জনে আমাকে সুন্দর পরিচ্ছদ ক্রয় করিয়া দিয়া নিজে সামান্য পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া দারুণ শীতের দিন যাপন করিয়াছ। আরও—" মেরিয়ণ তাঁহাকে বাধা দিয়া বলিল—"কিন্তু তুমি আমাকে আমার সে সমস্ত সামান্য উপকারের কত অত্যধিক পরিমাণে প্রতিদান করিয়াছ তাহা আমি ভুলিতে পারিব না। স্মরণ করিয়া দেখ, আমার দীর্ঘকালীন কঠিন পীড়ার সময়ে তুমি আমার কত যত্ন, কত শুশ্রূষা করিয়াছ। আর এই সুন্দর প্রাসাদে যে নিজ গৃহের ন্যায় সুখে ও সচ্ছন্দে বাস করিতেছি, তাহা তোমার অকৃত্রিম স্নেহের নিদর্শন, ইহা জানিয়া কেমন করিয়া এ সমস্ত ভুলিব। সত্য, সময়ে সময়ে আমার মনে হয় যে,



আমিই এই সুন্দর প্রাসাদের অধিকারিণী, তুমি নহ।"

মেরিয়ণের এই কথাতে গিলিয়ান সহসা তীব্র আবেগভরে বলিলেন—আমারও সময়ে সময়ে মনে হয় যে, আমি যেন এই ব্যারন্সকম্ব প্রাসাদের অধিকারিণী নহি। হায়! আমি যদি ইহা কখন না দেখিতাম, তাহা হইলে ভালই হইত।

মেরিয়ণ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিল—প্রিয় জিল! কেন এ কথা বলিতেছ?

গিলিয়ান অশ্রুপূর্ণ স্বরে বলিলেন—একজন অনধিকারী ব্যক্তির ন্যায় ব্যবহার প্রাপ্ত হওয়া যে কি কষ্টকর তাহা তুমি জান না। তুমি দেখিতে পাইতেছ যে, ব্যারন্সকম্ব জমিদারির প্রজাবর্গ সকলের মনে এই ভাব মুদ্রিত রহিয়াছে যে, আমি ব্যারন্সকম্ব জমিদারির যথার্থ অধিকারী মিষ্টার এলান থরণসবাইয়ের নিকট হইতে প্রবঞ্চনাপূর্ব্বক এই সম্পত্তি গ্রহণ করিয়াছি। মিস লেথাম আমার কুহকে পড়িয়া তাহার সমস্ত সম্পত্তি মিষ্টার থরণসবাইকে দান না করিয়া উইল দ্বারা আমাকে প্রদান করিয়া গিয়াছেন। আমার মাতার মৃত্যুর পর মিস লেথামকে আমি একটি বার মাত্র দেখিয়াছিলাম। ছলনাপূর্ব্বক তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি আমাকে দান করিতে তাঁহাকে বাধ্য করা আমার ন্যায় অল্পবয়স্কা রমণীর পক্ষে কিরূপ অসম্ভব, তাহা তাহাদের বুঝাইয়া বলিলেও তাহারা বিশ্বাস করিতে চাহে না।

মেরিয়ণ বলিল—কিন্তু আমার এই মত যে, মিস লেথাম তাঁহার সম্পত্তি যাহাকে ইচ্ছা দান করিতে পারেন, তাহা লইয়া লোকের সমালোচনা করা অন্যায়। আমি যদি তোমার স্থলাভিষিক্ত হইতাম, তাহা হইলে ইহার জন্য বিন্দুমাত্র ব্যথিত হইতাম না। ইহা ব্যতীত আমার বিশ্বাস যে, তুমি যা মনে করিতেছ সেরূপ কোন ঘটনা ঘটে নাই। তুমি এইমাত্র না এলান থরণসবাইয়ের নাম করিলে? আমি নর্টন হলের মিষ্টার এলান থরণসবাইয়ের পিতামহীর সহচরীর কার্য্য গ্রহণ করিতে যাইতেছি। আমার বোধ হয় তোমার উল্লিখিত এই মিষ্টার থরণসবাই ও আমার নিয়োগকর্ত্তা নর্টন হলের থরণসবাই একই ব্যক্তি।

গিলিয়ান বিস্মিত হইয়া বলিলেন—নর্টন হলের এলান থরণসবাই? আমি এঁদের কথাই বলিতেছি। পূর্ব্বে এঁরাই ডান্সবারর জমিদারির অধিকারী ছিলেন। ঋণে জড়িত হইয়া ইহাঁরা ডান্সবারর জমিদারির অধিকারচ্যুত হয়েন। এক্ষণে এই নর্টন হলের সামান্য জমিদারি ব্যতীত ইহাঁদের আর কোন সম্পত্তি নাই। এলান থরণসবাই তাঁহার পিতামহীর সঙ্গে এই নর্টন হলেই বাস করেন। লোকে বলে যে, তিনি তাঁহার জমিদারিতে একজন সামান্য চাষার ন্যায় কর্ম্ম করেন।

মেরিয়ণ বলিল—তবে লোকে কেন বলিয়া থাকে যে, মিস লেথামের ব্যারন্সকম্ব জমিদারির তিনিই ন্যায্য অধিকারী। তাঁহাকেই এই জমিদারি মিস লেথামের





দান করিয়া যাওয়া উচিত ছিল। না দিবার কারণ কি তাহা আমিও বুঝিতে পারিতেছি না। ইহার কারণ কি তাহা তুমি কখন আমাকে বুঝাইয়া বল নাই।

গিলিয়ান বলিলেন—মেরিয়ণ! সত্যই কি আমি কখন ইহার কারণ তোমাকে বলি নাই? মিষ্টার এলান থরণসবাই মিস লেথামের একমাত্র ভ্রাতুষ্পুত্র। তিনি রীতিমত ইহাঁকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং ইহাঁকেই তাঁহার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করিতে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। মিস লেথাম তাঁহার এই ভ্রাতুষ্পুত্রকে বড়ই ভাল বাসিতেন, কিন্তু যখন মিষ্টার থরণসবাই লর্ড আরমিডেলের জ্যেষ্ঠ কন্যা লেডি আরমিডেলকে বিবাহ করিবার সঙ্কল্প করেন, তখনই মিস লেথামের সহিত তাঁহার মনোমালিন্য উপস্থিত হয়। মিস লেথাম লেডি আরমিডেলকে আদৌ দেখিতে পারিতেন না। লেডি আরমিডেলের প্রতি মিস লেথামের বিদ্বেষ ব্যতীত বিবাহের আর কোন প্রতিবন্ধক ছিল না। মিষ্টার থরণসবাই তাঁহার পিতৃষ্বসার এই প্রতিবন্ধকতাচরণে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার সহিত কলহ করেন। এই কলহের ফলে রাগের মাথায় মিস লেথাম তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রকে বঞ্চিত করিয়া আমাকেই তাঁহার সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী করিয়া যান। কিন্তু সকলেই মনে করিয়াছিল যে, শেষকালে তিনি মিষ্টার থরণসবাইকেই তাঁহার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করিয়া যাইবেন। ইহার কারণ এই যে, সম্প্রতি তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রের প্রতি তাঁহার ক্রোধ অনেকটা সাম্যভাব ধারণ করিয়াছিল। কিন্তু তাঁহার আকস্মিক মৃত্যুতেই তাঁহার উইল পরিবর্ত্তন করিবার অবসর হয় নাই।

মেরিয়ণ বলিল—এখন আমি সমস্ত বুঝিতে পারিলাম। কিন্তু জিল! যখন তুমি এত ধনের অধিকারিণী হইয়াছ, তখন এরূপ অবস্থাতে মিষ্টার থরণসবাইয়ের সহিত তোমার জমিদারির বাৎসরিক আয়টা ভাগাভাগি করিয়া গ্রহণ করা উচিত নহে কি?

গিলিয়ান বলিলেন—তুমি কি মনে কর মিষ্টার থরণসবাইয়ের নিকট আমি এ প্রস্তাব করি নাই? আমি তাঁহার নিকট এ প্রস্তাব করিয়াছিলাম, কিন্তু তিনি উকিলের দ্বারা আমার প্রস্তাবে সম্মত হইতে অস্বীকার করিয়াছেন।

মেরিয়ণ বলিল—বেশ, তবে তোমাকে এজন্য কেহ দোষ দিবে না। তুমি আশার অতীত করিয়াছ, এখন সমস্ত দুঃখ ও সন্তাপ তোমার মন হইতে দূর করিয়া দাও।

গিলিয়ান বিষণ্ন ভাবে বলিলেন—আমি আমার মন হইতে ইহা দূর করিতে পারিব না। অন্যের সম্পত্তি অপহারকের ন্যায় ব্যবহার প্রাপ্ত হওয়া যে কি কষ্টকর, তাহা তোমার কল্পনার অতীত, কিন্তু মেরিয়ণ! যদি তুমি নর্টন হলের কার্য্য গ্রহণ কর, তাহা হইলে হয়ত তুমি সে কাজটা সিদ্ধ করিতে পারিবে। ওঃ! না না, আমিই নিজে—



মেরিয়ণ বলিল—ব্যাপার কি ?

গিলিয়ান বলিলেন—কেন, তুমি কি বুঝিতে পারিতেছ না ? আমার মনে হইল যে, ইহা সৌভাগ্যের সঞ্চার। তুমি যে নর্টন হলের কার্য্য গ্রহণ করিতেছ, তাহা তাহাদিগকে লিখিয়া দাও। কিন্তু ডাক্তার তোমাকে শীতকালটা বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য বিয়ারিটজে বাস করিতে বলিয়াছেন, তুমি সেখানেই চলিয়া যাও। আমি তোমার "মেরিয়ণ এডামস" এই নাম গ্রহণ করিয়া নর্টন হলে চলিয়া যাই। গিলিয়ান যেন কোন একটা অদ্ভুত তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন এই ভাবে শেষের কথাগুলি বলিয়া সহসা নীরব হইলেন। মেরিয়ণ বিস্মিত হইয়া বলিল—গিলিয়ান এমন কথা বলিতেছ কেন ? তুমি কি সহসা পাগল হইলে ?

গিলিয়ান তাহার সখীর আসনের উপর হস্ত রাখিয়া বলিলেন—না না, আমি পাগল হই নাই। আমিই নর্টন হলে স্বয়ং যাইব। আমি কে তাহা জানিবার পূর্ব্বেই আমি তাহাদিগকে আমাকে ভাল বাসিতে বাধ্য করিব। তাহার পরে সমস্ত সহজ হইয়া উঠিবে।

মেরিয়ণ বলিল—হাঁ! তোমার পক্ষে সম্পূর্ণ সহজ হইতে পারে সত্য, কিন্তু আমি এরূপ বাতুলের কার্য্যে যোগ দিতে সম্মত হইতে পারি না।

গিলিয়ান বলিলেন—তুমি অবশ্য সম্মত হইবে। ওঃ! মেরিয়ণ, মেরিয়ণ, আমার জন্য সম্মত হও। যে পর্য্যন্ত না এলান থরণসবাইয়ের সঙ্গে ব্যারন্সকম্ব সম্পত্তি সম্বন্ধে একটা কোন মিটমাট না করিতে পারি, সে পর্য্যন্ত আমার মন শান্তি পাইবে না। এই ব্যারন্সকম্ব জমিদারির উত্তরাধিকারিত্ব ব্যাপারটাই কেবল দুই জন প্রণয়ীকে পৃথক করিয়া রাখিতেছে। কারণ যে পর্য্যন্ত না মিষ্টার থরণসবাই ব্যারন্সকম্ব জমিদারির অধিকার প্রাপ্ত হইতেছেন, সে পর্য্যন্ত লর্ড আরমিডেল তাঁহার কন্যার সহিত থরণসবাইয়ের ন্যায় অবস্থাসম্পন্ন লোকের বিবাহ দিতে সম্মত হইবেন না। লেডি আরমিডেল খুব সুন্দরী রমণী। তুমি যদি তাঁহাকে দেখিতে এবং বুঝিতে যে, তাঁহাকে সুখী করা তোমারই ক্ষমতাধীন, তাহা হইলে আমি যাহা তোমাকে করিতে অনুরোধ করিতেছি তাহা করিতে তুমি নিশ্চয়ই সম্মত হইতে। অঙ্গীকার কর মেরিয়ণ, অঙ্গীকার কর।

মেরিয়ণ দৃঢ়প্রতিজ্ঞাসূচক স্বরে উত্তর করিল—ইহাতে কি যে মঙ্গল উৎপাদিত হইবে তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না। যখন মিষ্টার থরণসবাই তোমার অধিকৃত সম্পত্তি গ্রহণ করিতে একেবারে অস্বীকার করিতেছেন, তুমি সেখানে গিয়া প্রস্তাব করিলে তিনি আরও দৃঢ়রূপে অস্বীকৃত হইবেন।

গিলিয়ান আনন্দপূর্ণ স্বরে বলিলেন—আমি সেখানে যাইব! বেশ, মেরিয়ণ বেশ। তবে তুমি আমার প্রস্তাবে সম্মত হও।




মেরিয়ণ বলিল—যদি তুমি অকৃতকার্য্য হও, তাহা হইলে কি হইবে ?

গিলিয়ান বলিলেন, আমি কখনও অকৃতকার্য্য হইব না।

মেরিয়ণ বলিল যাহা তোমার ইচ্ছা হয় কর। কিন্তু প্রস্তাবটা আমার কিছুতেই মনে ধরিতেছে না। কেমন করিয়া তুমি এ কাজটা সম্পাদন করিবে ?

লজ্জাবতী।

বৃন্দাবন-দৃশ্য।

গত বুধবার বেলা ১০টা ১০ মিনিটের ট্রেণে রাজাকাসড়া ষ্টেশন হইতে যাত্রা করিয়া বেলা প্রায় ১২॥ টার সময় আমরা মথুরা জংশন ষ্টেশনে নামিলাম। মথুরা জংশন ষ্টেশনটী বেশী বড় না হইলেও নিতান্ত ছোট নহে। সেখানে দুইখানা ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া করা হইল। ষ্টেশনে ট্রেন আসার সময় পাণ্ডা বা ব্রজবাসিগণ যাত্রীদিগের অপেক্ষায় থাকে, এবং যাত্রীরা নামিলেই "তোমার বাড়ী কোন্ জেলায়, তোমার নাম কি" ইত্যাদি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে করিতে তাহাদিগকে ঘিরিয়া ফেলে ও নূতন যাত্রী হইলে তাহাদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া ফেলে। আমাদের পুরাতন পাণ্ডা "দাঁতভাঙ্গা প্রহ্লাদ"। শুনিতে পাওয়া যায়, ইহাদের কোন পূর্ব্বপুরুষের দ্বন্দ্বযুদ্ধে দাঁত ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, তাই পুরুষানুক্রমে ইহারা 'দাঁতভাঙ্গা' নামে বিখ্যাত। যাহা হউক, আমাদের পূর্ব্ব-পরিচিত পাণ্ডাজী থাকায় আমাদিগকে কোন অসুবিধা ভোগ করিতে হয় নাই। আমাদের গাড়ী একেবারে স্বামী-ঘাটের উপর হরমুখরায় তুলীচন্দ্রের ধর্ম্মশালার সম্মুখে থামিল। আমরা সেই ধর্ম্মশালায় নামিলাম ও এক ধারে দুইখানি ঘর পাইলাম। ধর্ম্মশালাতে যে এরূপ সুন্দর বন্দোবস্ত, তাহা পূর্ব্বে জানিতাম না। আরও দুই তিন দল যাত্রী সেই বাড়ীতে ছিলেন, কিন্তু তাহাতে আমাদের কোনও অসুবিধা হয় নাই, তাঁহাদের সহিত আমাদের কোন সংশ্রব ছিল না। 'পাইখানা' ইত্যাদির বন্দোবস্তও অতি সুন্দর, পুরুষ ও স্ত্রীলোকের জন্য স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত। রাত্রিতে ধর্ম্মশালার ফটক বন্ধ থাকিত ও ভোরে খুলিয়া দেওয়া হইত এবং পূর্ব্বে যাত্রীদিগকে সাবধান করিবার জন্য বলিয়া দেওয়া হইত "ফটক খোলা হইতেছে, তোমাদের জিনিষ সাবধানে রাখিও।" ধর্ম্মশালার অবারিত দ্বার, সেজন্য তথাকার যাত্রীদিগকে সাবধান করিয়া দেওয়া হইত। ধর্ম্মশালার রক্ষণাবেক্ষণের ভার যাঁহার উপর, তিনিও অতি ভদ্র লোক। পরের উপকারের জন্য যাঁহারা ধর্ম্মশালা করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে শত শত ধন্যবাদ। ঈশ্বর তাঁহাদিগকে

দীর্ঘায়ু করুন, তাঁহারা জগতের পরম হিতৈষী। আমরা সেখানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া বেলা তিনটার সময় যমুনার তীরে গেলাম। ঘরের ভিতর হইতেই যমুনা দেখা যাইত। সেখানে গিয়া দেখিলাম, ঘাটে অনেকগুলি নৌকা বাঁধা রহিয়াছে। তাহা দেখিয়া আমাদের নৌকা চড়িতে সাধ হইল এবং তখনি একখানি নৌকা ভাড়া করিয়া খানিকটা বেড়াইয়া আসিলাম। সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে আমরা দর্শনে বাহির হইলাম এবং দ্বারকানাথ ও মথুরানাথ দর্শন করিয়া বিশ্রামঘাটে উপস্থিত হইলাম। তখন আরতির সময়, ঘাটের উপর জনতা অধিক, সেইজন্য আমরা একখানি নৌকা ভাড়া করিলাম এবং নৌকার উপর হইতে বিশ্রাম-ঘাটের আরতি দেখিলাম। সে সময়ের দৃশ্য অতি সুন্দর, শঙ্খ, ঘণ্টার ধ্বনি এবং আরতি-প্রদীপের স্নিগ্ধ ও উজ্জ্বল প্রভায় হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ হয়। সেই সময় চারি দিক হইতে দর্শকেরা ফুলের মালা আরতি-প্রদীপের উপর ছুড়িয়া ফেলিতে থাকে, সে দৃশ্যও অতি মনোহর। সে সময় শত সহস্র কচ্ছপ বিশ্রামঘাটে জলের উপর ভাসিয়া উঠে ও সিঁড়ির উপর পর্য্যন্ত ঘিরিয়া ফেলে। যাত্রীরা সে সময় তাহাদিগকে ছোলা-ভাজা খাইতে দেন এবং অনেকে ঘৃতের প্রদীপ জ্বালিয়া কচ্ছপের পিঠের উপর রাখিয়া দেন। পাণ্ডাজী বলিলেন "আপনাপন কুল উজ্জ্বল করিবার কামনায় যাত্রীরা গঙ্গার বক্ষে এইরূপে প্রদীপ ভাসাইয়া দেন"। কচ্ছপ-গুলি যে সময় জলের উপর ভাসিয়া যায়, তখন অন্ধকার রাত্রির নক্ষত্রের মত প্রদীপ-গুলি জ্বলিতে থাকে।

আমরা আরতি দর্শন করিয়া নৌকাতেই স্বামী-ঘাট পর্য্যন্ত আসিলাম ও তৎপরে বাসায় ফিরিলাম। রাত্রিতে দোকানের খাবার আনাইয়া সকলে আহার করিলাম। পরদিন বৃহস্পতিবার পূর্ব্বাহ্ণ ৬টার মধ্যে আমরা সকলে হাত মুখ ধুইয়া প্রস্তুত হইলাম। ঘোড়ার গাড়ী আগের দিন ঠিক করা ছিল, ৬টায় আসিবে। কিন্তু ৭টার সময় গাড়ী আসিল, তখন আমরা রাধাকুণ্ডে যাত্রা করিলাম। পথের মধ্যে প্রথমেই ভূতেশ্বর মহাদেবের মন্দির। মহাদেবের স্নিগ্ধ উজ্জ্বল মূর্ত্তি দেখিয়া বড়ই প্রীতিলাভ করিলাম। সেই মন্দিরের এক পার্শ্বে সিঁড়ি দিয়া খানিকটা নীচে নামিলে অন্ধকারের মধ্যে মাহেশ্বরী বা পাতালেশ্বরী দেবীর দর্শন হয়। ভগবতীর ৫১ পীঠের এক পীঠস্থান এই দেবী প্রতিমা; সেজন্য এই দেবীর মাহাত্ম্য অধিক। মাহেশ্বরী দেবী দেখিতে মন্দ নহেন। তাহার কিছু দূরে শান্তনুকুণ্ড। কুণ্ডের ঠিক মধ্যস্থলে মন্দির। চারি দিকে জল ও মধ্যে মন্দির দেখিতে অত্যন্ত মনোমুগ্ধকারী। জলের উপর সাঁকো, সেই সাঁকোর উপর দিয়া মন্দিরে যাইতে হয় এবং প্রায় নব্বইটা সিঁড়ির উপর দিয়া গিয়া উপরে "শান্তনু-বিহারী" প্রতিষ্ঠিত দেখা যায়। পাণ্ডাঠাকুর বলিলেন, গঙ্গার তিরোভাবের পর শান্তনু রাজা গঙ্গার দর্শনের কামনায় এখানে তপস্যা করিয়াছিলেন, তাই ইহার নাম



শান্তনুকুণ্ড এবং তৎপ্রতিষ্ঠিত বিগ্রহের নাম শান্তনুবিহারী। আরও কিছু দূর গিয়া গোবর্দ্ধন পাহাড়। পূর্ব্বে ধারণা ছিল যে, এখানে উচ্চ উচ্চ পাহাড় দেখিতে পাইব। কিন্তু সেরূপ কিছু নাই, নীচু নীচু মাটীর ঢিপির উপর ছোট বড় সকল প্রকার পাথর দিয়া মাটীগুলি যেন ঢাকা রহিয়াছে। শুনিলাম, গোবর্দ্ধনধারণের পর উহা নামাইবার সময় কৃষ্ণের হস্তস্খলিত হইয়া পড়িয়া গিয়া ঐরূপে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে। সেই পাথরের ঢিপির মধ্যে কুমানস গঙ্গা প্রায় দুই ক্রোশব্যাপী, তাহার নিকটেই মন্দিরে কৃষ্ণমূর্ত্তি দেখিলাম। আরও কিছু দূর গিয়া কুসুম সরোবর দেখিতে পাইলাম। সরোবরের জলও সুস্বাদু। সরোবরের উপর একটা বাগান-বাটী আছে, তাহাতে ভরতপুরের রাজার সমাধি, নিকটে একটী মন্দির ও তাহাতে উদ্ধবের মূর্ত্তি রহিয়াছে। অবশেষে রাধাকুণ্ড, শ্যামকুণ্ডের দর্শন পাইলাম। সে দুটী পাশাপাশি, অনেক যাত্রী সেখানে স্নান করিতেছিলেন। অগ্রে রাধাকুণ্ডে স্নান করিয়া পরে শ্যামকুণ্ডে স্নান করিতে হয়। কুণ্ডের জল তেমন পরিষ্কার নহে, সেজন্য আমাদের সেখানে স্নান করিবার তেমন ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু হঠাৎ সেখানে আমাদের জনৈক আত্মীয়ার সহিত সাক্ষাৎ হইল এবং তাঁহার অনুরোধে আমরা রাধাকুণ্ডে স্নান করিলাম এবং নিকটেই দুই তিন স্থানে ঠাকুর দর্শন করিলাম। তখন বেলা ১টা, সেখানেই বাজারে ঠাকুরের ভোগের জন্য মালপুয়া ভাজিতেছিল, আমরা তাহাই ক্রয় করিয়া জলযোগ করিলাম। আমাদের সেই আত্মীয়টি আরও কিছুক্ষণ সেখানে থাকিবার জন্য আমাদিগকে অনুরোধ করিলেন। তিনি "বলিলেন, কিছুক্ষণ অপেক্ষা কর, ছেলেদের অন্ন রাঁধিয়া দিতেছি"। কিন্তু নির্জ্জন পথে ফিরিতে রাত্রি হইলে চোর ডাকাইতের ভয়, সেইজন্য সেখানে আর অপেক্ষা না করিয়া ফিরিলাম এবং অপরাহ্নে পাঁচটার পর বাসায় পৌঁছিলাম। সকলেই ক্লান্ত, সেইজন্য রান্নার হাঙ্গাম না করিয়া বাজারের লুচি ও মিষ্টান্ন সকলে আহার করিলাম। সে দিন সন্ধ্যাবেলা আমরা আর বাহির হইলাম না। পরদিন "শুক্রবার" প্রাতে নৌকা করিয়া আমরা ধ্রুবঘাট পর্য্যন্ত গেলাম। ধ্রুবঘাটের নিকটে একটী মন্দিরে বালক ধ্রুবমূর্ত্তি, সেখান হইতে কিছু দূরে মধুবন, শুনা যায় সেখানে ধ্রুব তপস্যা করিয়াছিলেন। ধ্রুবঘাট হইতে আধ ক্রোশ গিয়া কংসলীলা দেখিলাম। এখানে কৃষ্ণ কংসকে বধ করিয়াছিলেন, এইজন্য এখানে কংস ও কৃষ্ণ-বলরামের মূর্ত্তি রহিয়াছে। উহা দেখিয়া আমরা আবার ধ্রুবঘাটে ফিরিয়া আসিলাম। ঘাটের ধারেই একটী ছোট দালান ছিল, উহাতে আমাদের খেচোড়ান্ন প্রস্তুত হইল। আহারান্তে দুইখানা গাড়ী ভাড়া করিয়া বাসায় আসিয়া বিছানা ইত্যাদি লইয়া বৃন্দাবন যাত্রা করিলাম। এখানে মথুরার পাণ্ডা দাঁতভাঙ্গা প্রহ্লাদ






বিদায় লইলেন। এই পাণ্ডাটি বেশ ভাল লোক, আমাদের ভাল করিয়া দর্শন করাইয়াছিলেন এবং পাওনার জন্য কোনও উপদ্রব করেন নাই, যাহা দেওয়া হইল, তাহাতেই সন্তুষ্ট হইলেন। তবে সকল স্থানেই 'এখানে দান করিতে হয়', "এখানে সংকল্প করিতে হয়" ইহা পাণ্ডাদের বুলি, কারণ সেগুলি তাঁহাদের প্রাপ্য। সকলেই তীর্থস্থানে সাধ্যমত অর্থ ব্যয় করিয়া থাকেন, তবে অনেক পাণ্ডা যাত্রীদের সাধ্যাতীত ব্যয় করাইবার জন্য জুলুম করিয়া থাকে। আমরা নিরাপদে শ্রীবৃন্দাবনে পৌঁছিলাম। সেখানকার পুরাতন পাণ্ডা রামপ্রসাদের খোঁজ করা হইল। শুনিলাম তাঁহার বৃন্দাবনপ্রাপ্তি হইয়াছে, তাঁহার পুত্র বালক, সেজন্য রামপ্রসাদের ভাই রামজীবন তাহাদের অবিভাবক স্বরূপ সেখানে থাকেন ও তিনিই আমাদের পাণ্ডা হইলেন। পাণ্ডাজী আমাদের তিন চারিটা বাসা দেখাইলেন, কিন্তু সকলগুলিই অপরিচ্ছন্ন, ক্ষুদ্র ও সঁ্যাৎসেঁতে, সেরূপ স্থানে ছেলেদিগকে লইয়া থাকা অসম্ভব, অগত্যা এখানেও আমরা তিলকচন্দ্রের ধর্ম্মশালায় গেলাম। আমরা এখানে দুইখানি ঘর পাইলাম, এখানকার রক্ষণাবেক্ষণের ভার যাঁহার উপর, তিনিও অতি ভদ্র লোক। এখানে আর কোন অসুবিধা ছিল না, কেবল পাইখানার অত্যন্ত অসুবিধা, হরিদ্বারের জম্বুরাজার ধর্ম্মশালার ন্যায় ছাদের উপর দুটী পাইখানা। অবশ্য তাহাতে খুব অসুবিধা। তবে দুই এক দিনের জন্য সেখানে থাকা এবং অন্য সকল সুবিধা ছিল বলিয়া উহাই আমরা মনোনীত করিলাম। আমরা ৪ টার সময় বৃন্দাবনে পৌঁছিয়াছিলাম। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া দর্শনে বাহির হইলাম ও শ্রীগোপীনাথ, রাধা দামোদর, রাধারমণ, পৌর্ণমাসী এবং গোবিন্দ দর্শন করিয়া বাসায় আসিলাম। পরদিন শনিবার প্রাতে 'শাহজী'র মন্দির, গোপীশ্বর মহাদেব, ব্রহ্মকুণ্ড, চৌষট্টী মহান্তের সমাজ, নিকুঞ্জবন ও নিধুবন দর্শন করিয়া 'শেঠে'র মন্দিরে গেলাম। তখন বেলা ১১টা হইবে, সেখানে গিয়া শুনিলাম, তখন ভিতরে প্রবেশ নিষেধ, কারণ সে সময় ঠাকুর বাহির হইতেছিলেন। দোল পূর্ণিমার পর কৃষ্ণা দ্বিতীয়া হইতে ত্রয়োদশী পর্য্যন্ত শেঠের বাড়ীতে শ্রীরঙ্গনাথ জিউর "ব্রহ্মোৎসব" নামক একটি উৎসব হইয়া থাকে, স্থানীয় লোক ইহাকে "শেঠের মেলা" বলে। পূর্ব্বাহ্নে ও রাত্রিতে নানা প্রকার যান বাহনে আরোহণপূর্ব্বক মন্দির হইতে ঠাকুর নিজ বাগানে গিয়া থাকেন। এই উপলক্ষে মন্দিরের প্রথম প্রাচীরের বাহিরে এবং মন্দিরের বহির্দ্বার হইতে বাগান পর্য্যন্ত রাজপথের দুই ধারে "সদাগন্নী মণিহারী", মিষ্টান্ন, খেলানা, বাসন, কাপড় প্রভৃতি নানা প্রকারের দোকান সাজান থাকে। এই বার দিন, উৎসবের মধ্যে পঞ্চমী ও দশমী তিথিতে বাগানের নিকট ঠাকুরের সম্মুখে সহস্রাধিক





টাকার বাজী পোড়ান হয়। এই মহোৎসবে প্রতি বৎসর প্রায় লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়া থাকে। এই কয় দিন প্রত্যহ শত সহস্র কাঙ্গালী ভোজনও হয়। ইহাকেই বলে অর্থের সদ্ব্যবহার। ধন্য শেঠ লক্ষ্মীচন্দ্র!! তোমার অক্ষয় কীর্ত্তি যুগে যুগে অমরত্ব লাভ করিয়া, তোমার নাম জগতে অমর করিয়া রাখুক। আমরা ঠাকুর দর্শন করিবার জন্য মন্দিরের এক পার্শ্বে বসিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। আধ ঘণ্টা পরেই সানাই বাজিয়া উঠিল, সকলেই ব্যস্ত হইয়া উঠিল এবং সকলেই উৎসুক নেত্রে মন্দিরের দিকে চাহিয়া রহিল। প্রথমে একটা সাজান হাতী, দুটী উট, ৮।১০ টী ঘোড়া বাহির হইল। তাহার পর চারি জন লোকের হাতে (রঙ্গিন পতাকার ন্যায়) শঙ্খ চক্র গদাপদ্ম, প্রায় পঞ্চাশ জন লোকের হাতে পতাকা ও কাঁধে বন্দুক, এইরূপে একে একে সকলে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া বাহির হইতে লাগিল, মধ্যে দুই দল ইংরাজী বাদ্য ছিল। অবশেষে রঙ্গ দেব জিউ বাহিরে আসিলেন; ৬০ জন বেহারা বৃহৎ কাষ্ঠমঞ্চ স্কন্ধে লইয়া বাহির হইল; সেই কাষ্ঠমঞ্চের উপর বৃহৎ গরুড়মূর্ত্তি ও তাহার উপর ঠাকুর বসিয়া আছেন। সে সময়ের বাহ্যিক দৃশ্য অতি সুন্দর, শত শত লোকের দৃষ্টি আর কোন দিকে নাই, সকলেই ঠাকুরের মুখ পানে চাহিয়া আছে। ঠাকুর নিজের বাগানের দিকে গেলেন, দর্শকবৃন্দও সঙ্গে সঙ্গে সেই দিকে ছুটিল। তখন বেলা ১২টা বাজিয়া গিয়াছে, আমাদের সঙ্গে ছোট ছেলে ছিল, সেই জন্য আর বিলম্ব না করিয়া বাসায় প্রত্যাগমনানন্তর রন্ধনাদি করিয়া আহার কার্য্য সমাধা করা হইল। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর বৈকালে পাঁচটার সময় আমাদের পাণ্ডাজী আসিলে দর্শনে বাহির হইয়া শ্রীমদনমোহন ঠাকুরের মন্দিরে গেলাম। মন্দিরের বাহিরে, সিঁড়িতে নিজেই আমাদের জেটতুতো ভাই স্বর্গীয় অনন্ত মোহন বাগচীর স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ ইংরাজীতে তাহার স্বহস্তে লিখিত এ, এম বাগচী নাম খোদা শ্বেত প্রস্তরখানি বসান রহিয়াছে দেখিলাম। স্বর্গীয় সেজ জাঠা মহাশয় তাঁহার একমাত্র উপযুক্ত পুত্র-বিয়োগের পর পুত্রের নামাঙ্কিত প্রস্তরখানি মদনমোহনের চরণে অর্পণ করিয়াছিলেন। সেই প্রস্তরখণ্ড দর্শনে পুরাতন স্মৃতি সকল জাগিয়া উঠিল এবং হৃদয় আকুল হইল। "মদনমোহন স্বর্গীয় দেবতাদিগকে চরণে আশ্রয় দিও।" এইরূপ আরও কত লোকের নামাঙ্কিত প্রস্তর খণ্ড সকল, প্রত্যেক মন্দিরের স্থানে স্থানে বসান রহিয়াছে। মদনমোহন ও কৃষ্ণচন্দ্রের মন্দির দেখিয়া সন্ধ্যার সময় শ্রীগোবিন্দ জীর মন্দিরে পৌঁছিলাম, এবং সেখানকার মঙ্গল আরতি দেখিলাম! ভগবানের কি মহিমা! আমাদের ন্যায় সংসারীর হৃদয়েও তাঁহার দর্শন ও নাম কীর্ত্তন পবিত্রতা ও বিমল আনন্দ আনিয়া দেয়। সন্ধ্যাবেলা আরতির বাদ্যে হৃদয়



নাচিয়া উঠে, তখন যেন সংসারের দুঃখ যন্ত্রণা সকল হৃদয় হইতে ক্ষণেকের জন্য অপসারিত হইয়া যায়। কিন্তু অধম আমরা, তাই দয়াময়ের করুণা কিছুই উপলব্ধি করিতে পারি না। গোবিন্দজীর আরতি শেষ হইলে আমরা ব্রহ্মচারীর মন্দিরে গেলাম, সেখানে নিত্য রাসলীলা হইয়া থাকে, সে সময়ও রাস হইতেছিল। দর্শক কয়েক জন স্ত্রীলোক ও দুই চারি জন পুরুষ উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে হিন্দুস্থানী স্ত্রীলোকই অধিক। ছোট ছোট চারিটী বালক রাধাকৃষ্ণ ও ললিতা বিশখা সাজিয়া রাস করিতেছিল। যেটি রাধিকা সাজিয়াছিল, সেটী নিতান্ত শিশু, আধ আধ ভাষায় কথা কহিতেছিল। তাহার হস্ত নাড়িয়া নাচ দেখিয়া সকলেই আনন্দ অনুভব করিতেছিলেন। আমাদের দুই বৎসরের পুত্র গোরারও ভারি আনন্দ, সেও তালে তালে নাচিতে লাগিল ও গানের সুর ধরিল। রাত্রি ৯টার সময় শেঠের বাড়ীর তোপধ্বনি শুনা গেল, রাত্রিতে ঠাকুর বাহির হইবেন তাহারই সঙ্কেত-ধ্বনি হইল, আমরাও দর্শনেচ্ছায় শেঠের মন্দিরে গেলাম। মধ্যাহ্নের ন্যায় সজ্জিত হইয়া রাত্রিতেও ঠাকুর বাহির হইলেন, তবে এ বেলা গরুড়-বাহনের পরিবর্ত্তে হনুমান বাহন হইয়াছেন। অনেকগুলি মশালের ও কয়েকটা গ্যাসের আলো ছিল। সে দিন পঞ্চমী তিথি, বাগানে বাজী পোড়ান হইয়াছিল। মন্দিরেও ২।৪টা বাজী পোড়ান হইল। পাণ্ডাজী বাগানে গিয়া বাজী পোড়ান দেখিবার জন্য আমাদিগকে অনুরোধ করিলেন, কিন্তু তখন রাত্রি ১০টা, ছোট ছেলেরা নিদ্রিত, সেই জন্য বাগানে না গিয়া আমরা বাসায় ফিরিলাম। পরদিন প্রাতঃকালে (রবিবারে) ৬টার সময় আমরা পঞ্চক্রোশী যাত্রা করিলাম, ছেলে মেয়েরা ডুলিতে চলিল। যদি কেহ হাঁটিতে না পারেন, সেই আশঙ্কায় অন্য ডুলিও সঙ্গে লওয়া হইল, কারণ আমাদের কাহারও হাঁটিবার অভ্যাস নাই। শ্রীবৃন্দাবনের পরিধি পূর্ব্বে পাঁচ ক্রোশ ছিল, কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে অনেকটা স্থান যমুনার গর্ভে ডুবিয়া যাওয়ায় এখন প্রায় তিন ক্রোশ আছে। তথাপি পূর্ব্ব সংস্কার বশতঃ এখনও সকলেই পঞ্চ ক্রোশই বলিয়া থাকেন। পঞ্চক্রোশীর পরিমাণের মধ্যে দ্বাদশটী ঘাট এবং উদ্ধবের ও অন্যান্য ঠাকুরের অনেকগুলি মন্দির দেখিলাম, মাঝে মাঝে সাধুদের আখড়াও দেখিলাম। পথটী বেশ নির্জ্জন ও মনোরম, মাঝে মাঝে খানিকটা রাস্তা বালি রং, তাহাতে বোধ হয় এক সময় এই সকল স্থান যমুনার জলে ডুবিয়া ছিল। পথের দুই ধারে কুল ও পেয়ারা গাছ, গাছগুলি মুকুলে আচ্ছন্ন, পাতা দেখা যাইতেছিল না, মুকুলের গন্ধে চারি দিক আমোদিত হইতেছিল। এই সকল দেখিতে দেখিতে অতি আনন্দের সহিত বিনা ক্লেশে পঞ্চক্রোশী ঘুরিয়া কেশীঘাটে আসিয়া আমরা স্নান করিলাম। ঘাটে, পথে, মন্দিরে

সর্ব্বত্রই ভিক্ষুকের প্রাদুর্ভাব। অন্ধ, খঞ্জ প্রভৃতি অক্ষম ব্যক্তিদিগকে দান করিবার জন্য হৃদয় আপনা হইতেই ব্যাকুল হইয়া উঠে, কিন্তু বলিষ্ঠ ও কার্য্যক্ষম ব্যক্তিদিগকে ভিক্ষা দেওয়ায় তাহাদের অন্যায়ের আরও প্রশ্রয় দেওয়া হয় বলিয়া মনে হইলেও তাহারা এত বিরক্ত করে যে, বাধ্য হইয়া তাহাদিগকে পয়সা দিতে হয়। স্নানান্তে আমরা শ্রীবঙ্কুবিহারী দর্শনে গেলাম, কিন্তু ইঁহার দর্শন দুঃসাধ্য, সকল সময় দর্শন পাওয়া যায় না, সৌভাগ্যবশতঃ ঠিক সময়ে উপস্থিত হওয়ায় আমরা দর্শন পাইলাম। ইঁহার ঝাঁকী দর্শন হয়, অর্থাৎ কিছুক্ষণের জন্য সম্মুখের পরদা ফেলা হয়, আবার সরান হয়, এই ভাবে তিনি দর্শন দেন। ইঁহার ইতিহাস এইরূপ যে, ঠাকুর পূজারীকে স্বপ্ন দিয়া বলিয়াছিলেন, অনেক লোক একত্র দেখিলে আমার ভয় হয়, সেজন্য আমাকে অধিকক্ষণ লোকের সম্মুখে রাখিও না। সেই হইতে ইঁহার ঝাঁকী দর্শন হয়। বঙ্কুবিহারী দর্শন করিয়া শ্রীরাধাবল্লভজী দর্শন করিলাম। ইঁহাকে অন্য মন্দিরের ঠাকুরের অপেক্ষা অধিক অলঙ্কারে সাজান হইয়াছে দেখিলাম। রাধাবল্লভ দর্শন করিয়া বেলা ১টার সময় আমরা বাসায় ফিরিলাম। ইচ্ছা ছিল ফিরিবার সময় শেঠের মন্দিরের ভিতর ও একবার গোবিন্দ দর্শন করিয়া আসি, কিন্তু এ যাত্রায় আর হইল না। যদি সুকৃতি থাকে, পুনরায় এ ইচ্ছা পূর্ণ হইবে এই আশা রহিল। আমরা সেই দিনই সন্ধ্যা ৬টার ট্রেনে বৃন্দাবন হইতে যাত্রা করিলাম। মথুরা জংশন ষ্টেশনে আমাদিগকে দেড় ঘণ্টা অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল। রাত্রি ১২ টার সময় আগরার বাড়ীতে আমরা ফিরিয়া আসিলাম।

শ্রীমতী নির্ম্মলা সান্যাল,
কেশবধাম।

নূতন সংবাদ

১। শুনা যাইতেছে বড় লাট বাহাদুর লর্ড হার্ডিঞ্জ এ বৎসর দেশভ্রমণে যাইবেন না। তিনি সিমলা গমনের পূর্ব্বাবধি দেরাদুনে অবস্থান করিবেন।

২। এইরূপ শুনা যাইতেছে যে, ইংলণ্ডের বোর্ড অব্ এডুকেশনের অন্যতম সদস্য মিঃ হর্নেল, মিঃ কুক্লারের স্থানে বাঙ্গালার শিক্ষাবিভাগের ডাইরেক্টর নিযুক্ত হইয়াছেন।

৩। শস্যের মহার্ঘ্যতার জন্য বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট অল্প-বেতন-ভোগী কর্ম্মচারীদিগের সাহায্যের জন্য তিন লক্ষ ষাটি হাজার টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন।

৪। আগামী বর্ষে চিকিৎসা-বিস্তার



উন্নতির জন্য ভারত গভর্ণমেণ্ট দশ লক্ষ টাকা সাহায্য প্রদান করিবেন স্থির করিয়াছেন।

৫। ইউরোপের সর্ব্ব স্থানেই অধুনা বিমান পোতের পরিচালন হইতেছে। সম্প্রতি এ সম্বন্ধে এক বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। ব্রিটনের দুইখানি, রুশিয়ার ছয়, ফ্রান্সের দশ ও জার্ম্মাণীর তেরখানি বিমান-পোত আছে। ইহা ব্যতীত ব্রিটনের ত্রিশ, জার্ম্মাণীর আড়াই শত, রুষিয়ার আড়াই শত ও ফ্রান্সের চারি শত বিমানগামী যন্ত্র আছে।

৬। আসাম বেঙ্গল রেল পথের কর্ত্তৃপক্ষগণ আদেশ দিয়াছেন যে, যাহারা চট্টগ্রাম সাহিত্য সম্মিলনে গমন করিবেন, তাঁহাদিগকে এক ভাড়ায় যাতায়াত করিতে দেওয়া হইবে। এজন্য সাহিত্য পরিষদের স্বাক্ষরিত নিদর্শনপত্র দেখাইতে হইবে।

৭। কলিকাতা হাইকোর্টের জজ কারণডফ সাহেব ছুটী লইলে নিউবোলড্ সাহেব তাঁহার স্থানে হাইকোর্টের জজ হইবেন, এবং জজ হারিংটনের স্থানে মিঃ বি, কে, মল্লিক জজের কার্য্য করিবেন, শুনা যাইতেছে।

৮। সম্প্রতি দার্জ্জিলিঙ্গে অত্যধিক তুষারপাত হইয়া টেলিগ্রাফ ও অনেক বৃক্ষাদির বিশেষ ক্ষতি করিয়াছে।

বামারচনা।

পরলোকগতার প্রতি।

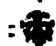
ওগো দেবী পুণ্যময়ী
হ'ল গত কত দিন,
তোমার ও ছবি দিদি
কোথায় হয়েছে লীন।

আজিও এমনই দিনে
মনে পড়ে গত বর্ষে,
পাহাড়ে পাহাড়ে মোরা
বেড়াতাম কত হর্ষে।

তখন জানি না সতী
পতি-পদে মাথা রাখি,
চ'লে যাবে সুরপুরী
দিয়া গো মোদের ফাঁকি!

এমন সুখের ঘর
পতি পুত্র পরিজন,
এ সব ফেলিয়া আছ
কোন সুখে নিমগন?

হারায়ে তোমার স্নেহ
অপরের মুখ চেয়ে,
মমতা-ভিখারী হ'য়ে
কাঁদে তব ছেলে মেয়ে।

মনে হয় নিতি সাঁঝে
　　তারাদল মাঝে থাকি,
চেয়ে থাকে ধরাপানে
　　তোমারি স্নেহের আঁখি

সারানিশি চাহি চাহি
　　চুপে ওই রাঙ মুখে,
পড়ে যে নীহারবিন্দু
　　প্রভাতে ধরণীবুকে!

নহে সে নীহারকণা,
　　তব তপ্ত অশ্রুধারা,
শ্যাম শষ্পে, লতা পত্রে
　　যেন মুকুতার পারা।

অয়ি ভাগ্যবতি সতি!
　　সিন্দুর লইয়া মাথে,
উজলিছ কোন স্বর্গ
　　দেব-রমণীর সাথে?

তোমার সন্তানগণে
　　কর দেবী আশীর্ব্বাদ,
জীবন কুশলে কাটে,
　　নাহি ভুঞ্জে পরমাদ॥

শ্রীসুকেশীবালা দেবী,　　নন্দনপুর।

বিদায়

সে দিনো বহিতেছিল এমনি হেমন্ত বায়,
　　সে দিনো কুহেলি ঢাকা,
　　নিশির শিশির মাখা,
হেসেছিল ম্লান হাসি শশী আকাশের গায়।
　　নীরব এ ধরাখানি,
　　নীরবে প্রকৃতিরাণী
কি যেন অজানা দুঃখে ফেলেছিল অশ্রুধারা,
　　পরিয়া কনকভূষা,
　　নীরবে আসিয়া উষা
চেয়েছিল মোর পানে যেন
　　　　ব্যথিতের পারা।

২

এমনি হেমন্তকালে এমনি সময়ে হায়!
　　শূন্য করি হৃদি বন,
　　শূন্য করি প্রাণ মন,
এমনি সময়ে মরি! দেবতা বিদায় চায়।

৩

দুটো কথা কহিবারে না মিলিল অবসর,
　　আঁখি নাহি পালটীতে
　　দুটী কথা না বলিতে
নিমেষে ভাঙ্গিয়া গেল সাধের
　　　　এ খেলাঘর!

৪

(সুধু) বিদায়ের স্মৃতিটুকু দিবা নিশি
　　　　জাগে মনে।
　　ফুরালে ভবের খেলা,
　　জীবন সায়াহ্নবেলা
বড় সাধ পুনরপি মিলিতে তাঁহার সনে।

শ্রীমতী চারুশীলা মিত্র




১৩১৯ সালের বামাবোধিনীর বর্ণমালানুসারে সূচী।





বামারচনা।





চিত্র।

১০।৪ নং মধুরায় লেন, ইণ্ডিয়ান্ প্রেসে শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত ও
শ্রীসন্তোষকুমার দত্ত কর্তৃক ২৯ নং আণ্টনিবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।



No. 595. Registered No. C. 134 March, 1913.



স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫০ বর্ষ। ১১ সংখ্যা। | ফাল্গুন, ১৩১৯। মার্চ্চ, ১৯১৩। | ১০ম কল্প। ১ম ভাগ।

বামাবোধিনী পত্রিকার

গ্রাহকমহোদয়দিগের জন্য

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বরচিত "জীবন চরিত, ৺পণ্ডিত প্রিয়নাথ শাস্ত্রী কর্ত্তৃক পরিশিষ্ট সম্বলিত নূতন সংস্করণ, বাঁধা ২৲ টাকা ও আবাঁধা ১৸৹ মূল্যে দেওয়া যাইবে। গৃহী হইয়াও সন্ন্যাসী 'মহর্ষি' বিষয়ের মধ্য হইতে কিরূপে আসক্তিবিহীন হইয় জীবনে ধর্ম্মে ও কর্ম্মে উন্নত হইয়াছিলেন, তাহার "জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত" দেখুন। মহর্ষির ও পণ্ডিত প্রিয়নাথ শাস্ত্রীর ফটো সন্নিবেশিত হইয়াছে।

অদ্যই পত্র লিখিবেন।

আমার খাতা—স্ত্রীলোকের অবশ্য পাঠ্য। বহু শিক্ষা পাইবেন। বঙ্গের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক কর্ত্তৃক ও পত্রিকা প্রভৃতিতে বহু প্রশংসিত। আপনার জন্য ৸৹ বার আনা স্থলে ॥৹ আট আনা মাত্র।

ঠিকানা :—

দি বেঙ্গল রিলায়েন্স বুরো,

২১ নং ষ্টেশন রোড, বালিগঞ্জ, কলিকাতা।

(এই নামটী সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবেন। ভবিষ্যতে ইহা হইতে কিরূপ লাভবান্ হইবেন, তাহা পরে বিজ্ঞাপ্য।)

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 595. March, 1913.

" কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫০ বর্ষ। ৫৯৫ সংখ্যা। } ফাল্গুন, ১৩১৯। মার্চ্চ, ১৯১৩। { ১০ম কল্প। ১ম ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

বড় লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ মহোদয়ের আরোগ্য সংবাদ—আমরা শুনিয়া আনন্দিত হইলাম, রাজপ্রতিনিধি লর্ড হার্ডিঞ্জ মহোদয় অনেক সুস্থ হইয়াছেন। তিনি এখন বায়ুসেবনার্থ বাহিরে গমন ও কতক কতক কাজ কর্ম্ম করিতে সমর্থ হইয়াছেন। মঙ্গলময় পরমেশ্বর আমাদিগের রাজপ্রতিনিধিকে সত্বর সম্পূর্ণ নিরাময় করুন।

ত্রিবাঙ্কুরে স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার—ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে ১৯১২ খৃষ্টাব্দে ৩৬টী নূতন বালিকাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহার পূর্ব্ব বৎসরে বিদ্যালয়ের সংখ্যা ২৩১ ছিল, ১৯১২ খৃষ্টাব্দে ২৬৭ হইয়াছে। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে শিক্ষার্থিনীর সংখ্যা ৪৩,০৮২ ছিল, ১৯১২ খৃষ্টাব্দে ৪৯,২০৮ হইয়াছে।

ব্যবস্থাপক সভায় নূতন সদস্য—ব্যারিষ্টার মিঃ এস, পি, সিংহ, রায় প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় বাহাদুর ও ডাক্তার নীলরতন সরকার এম, ডি, মহোদয়গণ এবার বঙ্গের ব্যবস্থাপক সভার নূতন সদস্য মনোনীত হইয়াছেন।

রুষরাজ্যে স্ত্রীলোকের অধিকার বৃদ্ধি—এতদিন রুষরাজ্যে কোন স্ত্রীলোক উকীল কিম্বা ব্যারিষ্টার হইতে পারিতেন না। সম্প্রতি তথাকার মন্ত্রিসভা রমণীদিগকে ব্যারিষ্টার হইবার অধিকার প্রদান করিয়াছেন।

বৃক্ষের জীবত্ব—সম্প্রতি বিজ্ঞানাচার্য্য

ডাক্তার জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় লর্ড কারমাইকেল মহোদয়কে যন্ত্র দ্বারা পরীক্ষা করিয়া বৃক্ষের জীবত্বের ও অন্যান্য অনেক নূতন বৈজ্ঞানিক প্রমাণ দেখাইয়াছেন। ডাঃ বসু এই তথ্যের প্রতিপাদক যন্ত্রও প্রস্তুত করিয়াছেন। এই যন্ত্রের নাম প্লাণ্ট অটোগ্রাফ (Plant Autograph)।

ম্যালেরিয়াতত্ত্ব—ডাক্তার মেজর ফ্রাইসাহেব বঙ্গের ম্যালেরিয়ার কারণ নির্ণয়ের জন্য বিশেষ ভার প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইনি ইহার মধ্যে কতক তথ্য সংগ্রহ করিয়া রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন। ফ্রাই সাহেব রিপোর্টে লিখিয়াছেন যে ম্যালেরিয়া এদেশে ইংরাজ আগমনের পূর্ব্ব হইতেই বর্ত্তমান রহিয়াছে এবং রেলগাড়ীর প্রচলন হওয়ায় জল নিকাশের পথ বন্ধ হওয়ায় যে ম্যালেরিয়ার উৎপত্তি হইয়াছে ইহা প্রকৃত নহে। এ দেশের লোকের স্বাস্থ্য রক্ষা সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতাকেই ফ্রাই সাহেব ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাবের কারণ বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন।

ধন্যবাদ জ্ঞাপন—বোম্বাই নগরে ভারতীয় মহিলাগণ এক সভা আহ্বান করিয়া দিল্লীতে বোমাদুর্ঘটনার সময় বড় লাটের পত্নী লেডী হার্ডিঞ্জ মহোদয়ার অসীম ধৈর্য্য এবং সাহসিকতার জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়াছেন। দিল্লীতেও একটী সভা হইয়া গিয়াছে। তাহাতে লেডী ক্রীগ সভাপত্নীর কার্য্য করিয়াছিলেন।

সার্থকতা।

(১)

আমারি ভিতরে তোমারি প্রকাশ
যতটা জেনেছি প্রাণে,
আশৈশব ধরি চেয়েছি হে নাথ,
ফুটাতে তা মোর গানে।
যদি সেই গান করেও কখন
ডেকে থাকে হায়, বারেক রাজন্
তোমারি চরণ পানে—
সার্থক হল তোমারি প্রকাশ
আমারি প্রাণের গানে!

(২)

যতটুকু মোরে পেরেছ গড়িতে
তোমারি মনের মত,
বিশাল জগতে তোমারি সেবায়
বিলাসু তা অবিরত!
মোর আশা সাধ যদি কোন দিন
জাগাইয়ে থাকে কারো হৃদি বীণ্
পালিতে এ সেবা ব্রত,
সার্থক তবে হল এ জীবন
লভি কৃপা অনাহত!

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত

মহাজন বাক্য।

ঈশ্বর বলিতেছেন "আমার দিকে ফের, আমি তোমার দিকে ফিরিব।" উপবাস, রোদন ও শোকসহকারে বস্ত্র ছিন্ন করিলে কি হইবে, হৃদয় ছিন্ন করিয়া ফের। তিনি দয়াময় করুণার সাগর, সহিষ্ণু, ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

আমি যে উপবাস মনোনীত করিয়াছি তাহা এই—পাপের বন্ধন উন্মোচন করা, এবং অত্যাচারিতদিগকে অত্যাচার হইতে উদ্ধার করা।

বলিদান অপেক্ষা ন্যায়াচরণ ও সুবিচার প্রভুর গ্রাহ্য।

যে ব্যক্তি ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস ও নির্ভর করে সেই ধন্য। কারণ সে নদী তীরে রোপিত বৃক্ষের ন্যায় চির-বর্দ্ধনশীল।

হে ঈশ্বর! আমি তোমার নিকট দুইটী বস্তুর জন্য প্রার্থনা করিতেছি—আমাকে অধিক ঐশ্বর্য্য দিও না, পাছে অহঙ্কারী হইয়া আমি বলি 'তুমি কে?' আমাকে নিরন্ন করিও না, পাছে পরস্ব অপহরণ করি এবং তোমার নাম বৃথা উচ্চারণ করি।

প্রভুকে বিশ্বাস কর এবং সৎকর্ম্মশীল হও, তাহা হইলে ঈশ্বরে বাস করিবে এবং নিশ্চয়ই তাঁহার হস্ত হইতে আহার প্রাপ্ত হইবে।

কি আহার করিবে, কি পান করিবে, কি পরিধান করিবে, তাহার জন্য চিন্তিত হইও না।

আকাশের পক্ষিগণকে দেখ, তাহারা বীজ বপন বা শস্য ছেদন করে না এবং শস্যাগারে শস্য সংগ্রহও করে না। ঈশ্বর তাহাদিগকে আহার দেন।

সর্ব্বাগ্রে ঈশ্বরের রাজ্য ও তাঁহার মহিমা অন্বেষণ কর, আর আর সমুদায় প্রয়োজনীয় বস্তু তিনি আপনা হইতেই প্রদান করিবেন।

ঈশ্বরের দয়া অপার ও অনন্ত। আমরা তাঁহাকে কতটুকু কৃতজ্ঞতা দান করিতে পারি? স্তব, স্তুতি, সঙ্গীত ও সংকীর্ত্তন দ্বারা অনবরত তাঁহার গুণগান কর এবং হৃদয়তন্ত্রী তাঁহার প্রশংসাধ্বনিতে ধ্বনিত কর।

ঈশ্বর তোমাকে যে ধন দিয়াছেন, তাহা দ্বারা তাঁহার গৌরব বর্দ্ধিত কর।

তোমার সমুদায় লাভের প্রথম ফল তাঁহার চরণে বিশেষরূপে উৎসর্গ কর।

নব বর্ষ।

উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।

(হে জীব সকল! উত্থান কর, অজ্ঞান নিদ্রা হইতে জাগ্রত হও এবং উৎকৃষ্ট




আচার্য্যের নিকট গমন করিয়া জ্ঞান লাভ কর।)

যত আয়ু বৃদ্ধি হইতেছে, তত আয়ুক্ষয় হইতেছে এবং ততই আমরা মৃত্যুর নিকটবর্ত্তী হইতেছি।

হায়! কি দুঃখের বিষয় যে, যে পরিমাণে বয়োবৃদ্ধি হয়, তাহার সঙ্গে সঙ্গে জীবন সেই পরিমাণে উন্নত হয় না, কিন্তু পাপ ও অপরাধের সংখ্যা বাড়িয়া থাকে।

বৎসর পুরাতন ও নূতন হয়, কিন্তু ঈশ্বর চির-নূতন। তাঁহার মহিমা ও করুণা নিত্য নবভাবে প্রকাশিত হইতেছে।

ধর্ম্মসাধনের জন্য ভবিষ্যতের উপর নির্ভর করিবে না। কোহি জানাতি কস্যাদ্য মৃত্যুকালো ভবিষ্যতি (কে জানে অদ্য কাহার মৃত্যু হইবে)।

আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা যেমন এদেশে বিদেশী পথিক ছিলেন, আমরাও সেইরূপ। আজই হউক, কালই হউক, তাঁহাদিগের ন্যায় আমরাও এখান হইতে চলিয়া যাইব।

হে প্রভু! আমরা যেন আমাদের গণা দিন স্মরণ রাখি এবং জীবনের প্রতিক্ষণ জ্ঞান ও ধর্ম্ম উপার্জ্জনে ও তোমার করুণা স্মরণে নিয়োজিত করি।

হে প্রভু! তুমি মনুষ্যজীবনকে অনিত্য ও অসার করিয়া তোমার জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছ, তাহা না হইলে নিত্য ও সারবস্তু যে তুমি, তোমাকে আমরা অন্বেষণ করিতাম না।

মনের মিল

বয়স বাড়িতে চলিল, কিন্তু অনেক চেষ্টা করিয়াও জ্ঞানের পথে অগ্রসর হইতে পারিলাম না। বার বার তিন বার চেষ্টা করিয়াও যখন প্রবেশিকা পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হইলাম, তখন একেবারে হাল ছাড়িয়া দিলাম। পিতার তিরস্কার ও তাড়না বৃথা হইল।

জ্ঞানাধিষ্ঠাত্রী দেবতার সহিত রাগা রাগী চলে, কিন্তু ধনাধিষ্ঠাত্রী দেবতার নিকট পার নাই। পিতা দিঘা-ঘাট ষ্টেশনের ষ্টেশন মাষ্টার। ত্রিশ টাকা হইতে আরম্ভ করিয়া সম্প্রতি তিনি উন্নতির চরম সোপানে আরোহণ করিয়া শত মুদ্রা অর্জ্জন করিতেছিলেন। কিন্তু আমার দুই ভগ্নীর বিবাহ দিয়া তিনি সমস্ত জীবনের বহুকষ্টসঞ্চিত অর্থ ব্যয় করিয়া নিঃস্ব হইয়াছিলেন।

শৈশবেই আমরা মাতৃহীন হই। পিতার এমনি কোমল প্রকৃতি যে, আমার বিবাহের সময় যথোচিত অর্থ আদায় করিয়া লইয়া তাঁহার ঋণ পরিশোধ করিতেও তিনি কুণ্ঠিত হইলেন। তাঁহার পুরাতন বন্ধু গোয়ালন্দের ষ্টেশন-মাষ্টার ধরিয়া বসিলেন যে, কন্যাদায় হইতে তাঁহাকে মুক্ত করিতে হইবে। তিনি তাহাতে দ্বিরুক্তি করিলেন না, একবার আমাদের অবস্থার




কথাও ভাবিলেন না। কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার দুশ্চিন্তা ও মনোবেদনা বোধ হয় তিনি তখনও ভুলিতে পারেন নাই। সুতরাং কপর্দ্দক গ্রহণ না করিয়াই আমার মাথায় তিনি এক গুরুতর বোঝা চাপাইয়া দিলেন।

আমি মর্ম্মান্তিক ক্ষুব্ধ হইলাম। একে বিবাহে আমার সম্পূর্ণ অনিচ্ছা। অর্থের অভাবে সংসারে যে কত কষ্ট, কত অসুবিধা ভোগ করিতে হয়, তাহা আমি মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছিলাম। এ অবস্থায় আর একজনের দায়িত্বভার গ্রহণ করিতে আমি একেবারেই অনিচ্ছুক ছিলাম। তাহার উপর, সে কন্যা যদি বা কিছু সঙ্গে আনিত, বিষয় না হউক, অন্ততঃ যদি বা কিছু টাকাও পাইতাম, তবুও কোন প্রকারে চুপ করিয়া থাকিতাম।

এ বিবাহে ক্ষুন্ন হইবার আরও কারণ ছিল। শেষে কি না আমাকে ষ্টেশন-মাষ্টারের কন্যা বিবাহ করিতে হইল! একে ত আমি ষ্টেশনের নামে বিরক্ত—সেই টিকিট লইবার ঘণ্টা, যাত্রীদের কোলাহল, এঞ্জিনের হুইসিল, গাড়ীর ঘড় ঘড় শব্দ শুনিতে শুনিতে প্রাণান্ত। কোথায় অভ্যাস বদলাইব—সহরের স্ত্রী বিবাহ করিয়া তাহার নিকট সহরের খোস্ গল্প শুনিব—না, সেই পুরাতন কথা, সেই গার্ডের গল্প, সেই সিগ্‌ন্যালম্যানের বিপদের ইতিহাস। মনে করিলেই আমার হৃৎকম্প হইত। এইরূপ অবস্থায় পত্নীপ্রেম যে আমার প্রগাঢ় হইবে না, সে কথা বলা বাহুল্য মাত্র।

এমন সময় পিতার মৃত্যু হইল। অন্ন-সংস্থানের জন্য আমাকে চাকরীর উমেদারী করিয়া বেড়াইতে হইল। সুযোগ বুঝিয়া আমার উপর অদৃষ্ট এবার পূর্ণমাত্রায় প্রতিশোধ লইল। ভাগ্য-দেবতা কেবল আমাকে ষ্টেশন-মাষ্টারের কন্যা বিবাহ করাইয়াই ক্ষান্ত রহিলেন না, সহকারী ষ্টেশন-মাষ্টারের পদে আমাকে নিযুক্ত করিয়া তবে ছাড়িলেন।

অদৃষ্টের সঙ্গে বিবাদ করা বৃথা, ইহা বুঝিয়া আমি আমার কর্ম্মে মনঃসংযোগ করিলাম। দিনের বেলা আমাকে কিছুই করিতে হইত না, রাত্রিতেই আমার ডিউটী। রাত্রি ৭টার সময় একটা অপ্ প্যাসেঞ্জার আসিত। তারপর রাত্রি ৮৷১০ মিনিটের সময় একটা ডাউন প্যাসেঞ্জার কানপুর অভিমুখে চলিয়া যাইত। রাত্রি ১১টার সময় কোন কোন দিন একটা গুড্‌স্ ট্রেন আসিত। কিন্তু তাহার আসার কোন স্থিরতা ছিল না। মেল ঠিক রাত্রি ১২৷৫ মিনিটে আমাদের ষ্টেশন পাস্ করিয়া যাইত। ছোট ষ্টেশন বলিয়া সেখানে মেল থামিত না। প্যাসেঞ্জার ট্রেনগুলির পর্য্যবেক্ষণ বড় কষ্টকর নয়; সে গুলি ধীরে আসিত, ধীরে যাইত—বন্দোবস্ত করিবার অনেক অবসর থাকিত। মেল ট্রেনেই কেবল ভয়। সেটা রাক্ষসের মত খপ্ করিয়া আসিয়া পড়িত, আবার মুহূর্ত্তের মধ্যেই বিলীন




হইয়া যাইত। কেবল মেলের আগমনের সময়ই আমাকে সতর্ক থাকিতে হইত

প্রথম প্রথম এ নূতন কাজ আমার মন্দ লাগিল না। টেলিগ্রামের দ্বারা পার্শ্ববর্ত্তী ষ্টেশন-মাষ্টারদিগের সহিত কথা-বার্ত্তা কহা, টিকিট দিবার সময় যাত্রীদের হুড়াহুড়ি দেখা, সিগ্‌ন্যালম্যানদিগের উপর কর্ত্তৃত্ব করা, বেশ ভালই বোধ হইত। তবে আমি বেশী কর্ত্তৃত্ব চালাইতাম না--নিজেই অনেক কাজ করিয়া লইতাম। বিশেষতঃ রাত্রিতে কুলীরা সব নিদ্রিত থাকিত। তাহাদের ঠেলিয়া তোলা এতই বিরক্তিকর যে, তাহাদের সামান্য কাজ করিয়া লওয়া ইহা অপেক্ষা অনেক সহজ বোধ হইত। লাইন ক্লিয়ার পাইলে আমি স্বহস্তেই সিগ্‌ন্যাল্ ফেলিতাম,সিগ্‌ন্যাল উঠাইতাম। কুলিরা এ কারণে আমার নিকট বিশেষ বাধ্য ছিল।

কিন্তু কিছুদিন পরে আমার চঞ্চল মন বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। সেই এক-ঘেয়ে কাজ, সেই তারের টুন্ টুন্ শব্দ, "গাড়ী ছোড়া হ্যায়, ঘণ্টা লাগাও" বলিয়া ছেদি সিংকে হুকুম, যাত্রীদের সেই হুড়া-হুড়ি, হাতাহাতি, মারামারি, হুস্ হুস্ শব্দে ট্রেনের আগমন, ক্রমে আমার নিকট বড়ই বিরক্তিকর বোধ হইতে লাগিল। চোক-বাঁধা বলদের মত আমি যেন নেশার ঝোঁকে আমার নিয়মিত কাজে ঘুরিতে লাগিলাম।

দিনের বেলা মনটা কেমন উদাস-ভাবে ছুটাছুটী করিতে থাকিত। বন্ধু-বান্ধব নাই, আত্মীয় পরিজন নাই যে তাহাদের সঙ্গে দুই দণ্ড গল্প করিয়া মনটাকে শান্ত করিব। বৃদ্ধ ষ্টেশন-মাষ্টারটি বড়ই গম্ভীর, গল্প সল্প করিতে বড় ভালবাসিতেন না। তাঁহার ২টী ছেলে ছিল। কিন্তু ছেলেদের প্রতি আমি আদৌ অনুরক্ত ছিলাম না। সুতরাং আমার দিনগুলি নিতান্তই কষ্টকর হইয়া উঠিল।

শেষে বিশ্বসংসারই আমার নিকট কেমন নীরস, কঠোর বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। স্নেহের বন্ধন নাই, প্রেমের আকর্ষণ নাই, কার্য্যের তাড়না নাই, আমি আমার উদ্দেশ্যহীন অলস জীবনটাকে লইয়া কি করিব কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না।

এমন সময় আমার স্ত্রী ঘর করিতে আসিল। তিন বৎসর বিবাহ হইয়াছে বটে, কিন্তু নিরুপমার সহিত এখনও পর্য্যন্ত আমার আলাপ পরিচয় হয় নাই। শুনিয়াছিলাম সে অতি সুন্দরী। ভগ্নীরা তাহার গুণেরও প্রশংসা করিত। বলিত, তাহার নিরুপমা নাম ব্যর্থ হয় নাই। কিন্তু অদৃষ্টের নিকট পরাজিত হইয়া বালিকার উপরই আমার আক্রোশটা পড়িয়াছিল, সুতরাং অন্ধের নিকট প্রাতঃসূর্য্যের কিরণ যেমন ভাবহীন, সৌন্দর্য্য-হীন, আমার নিকট আমার পত্নীর গুণাবলীও তদ্রূপ হইয়াছিল। মনের মিল ত দূরের কথা, ষ্টেশন-মাষ্টারের







মেয়ে যে কখন আমার মন আকর্ষণ করিতে পারিবে, সে যে কখন আমার কোন কাজে লাগিবে, এমন ভরসা আমার ছিল না। মানব কি ভ্রান্ত!

কিন্তু এই জনহীন সঙ্গিহীন ষ্টেশনে তাহাকে • পাইয়াও আমি পুলকিত হইলাম। মনের মতন নাই হ'ক, তবুও সে আপনার জিনিষ, মনের কথা নাই হ'ক, তাহার সহিত বাজে ঘর কন্নার কথা কহিয়াও যে সেই কর্ম্মহীন দীর্ঘ দিনগুলি কোন প্রকারে কাটাইতে পারিব, এ চিন্তা আমার পক্ষে কম সুখের নহে।

যৌবনে সকলেরই যেমন অবস্থা হয়, আমারও তদ্রূপ ঘটিল। অনেক দিন পরে নিজের স্ত্রীকে দেখিয়াই আমি চমকিত হইলাম। সেই বিজন স্থানে বৎসরেক কাল বঙ্গললনার সুকোমল মূর্ত্তি আমার দৃষ্টি-গোচর হয় নাই। সহসা পত্নীর সেই লজ্জা-সঙ্কোচ-বিজড়িত কান্তি পূর্ণ মুখখানি দেখিয়া যে আমি মুগ্ধ হইব তাহাতে বিচিত্র কি?

কিন্তু আমি অবাক্ হইলাম। মানুষ এত বদলাইতে পারে, আমার এ ধারণা ছিল না। সেই ক্ষুদ্র একাদশ-বর্ষীয়া বালিকা বধূ যে এমন পূর্ণ বিকসিত হইয়া ফুটিয়া উঠিতে পারে, সেই শিশু সুকোমল সুন্দর মুখখানি যে এমন নিরুপম সৌন্দর্য্য বিকীর্ণ করিতে পারে, তাহা আমি জানিতাম না। বর্ষা-কালে নদী যেমন কূল ছাপাইয়া পড়ে, নবযৌবন ও নবীন সৌন্দর্য্য তাহার সর্ব্বাঙ্গ তেমনি ছাপাইয়া পড়িতেছিল।

এতদিনে আমি কাজ হাতে পাইলাম। কাজের গোলমালে দিনগুলি একরকম কাটিতে লাগিল। সকালে উঠিয়া দৈনিক বাজার হাট করিতে ও চাকরের সহিত বকাবকি করিতেই সময় কাটিয়া যাইত। দুপর বেলা স্ত্রীর সহিত দু'চারটা কথা কহিতে না কহিতেই সন্ধ্যা আসিয়া পড়িত।

ক্রমে ক্রমে নিরুপমার সহিত আমার বন্ধুত্ব জন্মিল। মনের ছবিতে তাহাকে যত কালো করিয়া চিত্রিত করিয়াছিলাম, দেখিলাম তা'র চেয়ে সে অনেক অধিক উজ্জ্বল। গার্ডের গল্প ছাড়াও সে অনেক গল্প জানিত, ট্রেনের কাহিনী ব্যতীত অন্য অনেক কাহিনী তাহার পুঁজি ছিল। সে যে অপদার্থ, অসার ও অকিঞ্চিৎকর নয়, ইহা হৃদয়ঙ্গম করিতে আমার অধিক বিলম্ব হইল না।

আমার অনাদর ও উপেক্ষা যে তাহার হৃদয়ে বেদনা দেয় নাই, এমন কথা বলিতে পারি না। ষ্টেশন-মাষ্টারের মেয়ে যে আমার পছন্দ নয়, এ কথা সে জানিত। আমার সঙ্গে সে গল্প করিত বটে, কিন্তু তাহার হৃদয়-দ্বার উদ্ঘাটিত করে নাই। একটা সঙ্কোচভাব, একটা আশঙ্কা সর্ব্বদাই তাহাকে কুণ্ঠিত করিয়া রাখিত। ট্রেন সম্পর্কীয় কোন গল্প সে এক দিনের জন্যও আমার নিকট করে নাই। সে বুদ্ধিমতী; সন্দেহ নাই।

আমি অলক্ষ্যে লক্ষ্য করিতাম, ট্রেনের শব্দ শুনিলেই সে জানালার নিকট ছুটিয়া




দেখিতে যাইত। যতক্ষণ পর্য্যন্ত না ট্রেন অদৃশ্য হইত, ততক্ষণ সে একদৃষ্টে চলন্ত গাড়ীগুলির দিকে চাহিয়া থাকিত। ট্রেনের নেশা যে তাহার এখনও কাটে নাই, তাহা আমার অগোচর ছিল না, তবে আমার সমক্ষে সে আপনাকে সম্পূর্ণ সংযত রাখিত।

সেই নির্জ্জন নিরানন্দ স্থানে একজন সাথী পাইয়া, যত্ন করিবার একজন লোক পাইয়া, আমার মনেরও অনেক পরিবর্ত্তন হইল। দোষগুণ লইয়াই মানুষ। দোষ দেখিলেই খড়্গ-হস্ত হওয়া বুদ্ধিহীনের কাজ। অনেক ত্রুটি, অনেক দোষ ক্ষমা করিয়া না লইলে সংসার চলে না।

ষ্টেশন-মাষ্টারের মেয়ে যে কোন দিন আমার মন আকর্ষণ করিতে পারিবে না ভাবিয়াছিলাম, সে বদ্ধমূল ধারণাও শিথিল হইয়া আসিতে লাগিল। সেই মেয়ের মধ্যে এমন শক্তি নিহিত ছিল অথবা আমার মনের এমনি পরিবর্ত্তন হইয়াছিল যে, চুম্বক যেমন লোহাকে টানে, সেও তেমনি আমার হৃদয় আকর্ষণ করিতে লাগিল।

এমন করিয়া কিছুদিন কাটিয়া গেল। হঠাৎ একদিন আমার মনে হইল, রাত্রি ৮টা হইতে ১২টা পর্য্যন্ত ষ্টেশনে আমার কোন কাজ থাকে না, সময়টা কোন মতেই যেন কাটিতে চায় না। বাড়ী ফিরিবারও যো নাই। তখন আমার ডিউটি—কোন্ সময় কোন্ কাজ আসিয়া পড়ে, স্থিরতা নাই। নিরুপমাকে ষ্টেশনে আনিতে পারিলেই সব গোল চুকিয়া যায়। তাহাকেও একলা থাকিতে হয় না—আমারও একজন সঙ্গী হয়। বিশেষতঃ ষ্টেশনে সে সময়ে কুলীরা ছাড়া আর কেহ থাকে না।

পরদিনই নিরুপমার নিকট এই প্রস্তাব করিলাম। সে ত কোন মতেই তাহাতে সম্মত হয় না, "মেয়েরা ষ্টেশনে যাবে কি? লোকে দেখিলে বলিবে কি?"

আমিও নাছোড়বান্দা। বলিলাম, "আচ্ছা, তুমি বুঝি কখন ষ্টেশনে যাও নাই? আমি বুঝি জানি না?" "যাব না কেন? ছেলেবেলায় বাবার সঙ্গে প্রায়ই ষ্টেশনে যেতুম্।" "আর এখন বুঝি বরের সঙ্গে যেতে পার না? আচ্ছা—তোমার মা কি কখনও ষ্টেশনে যেতেন না?"

"যাবেন না কেন? বাবা মাঝে মাঝে তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতেন।" "তবে—আর ত তোমার কোন আপত্তি শুন্‌ছি না।" "সকলে কি সব পছন্দ করে?" কথাটা যে আমাকে ঘা' দিয়া বলা হইল, সেটা বেশ বোঝা গেল। আমি না রাগিয়া বলিলাম, "দেখ তুমি যদি আমার সঙ্গে ষ্টেশনে না এস, তা হলে ৮টার পর আমি এখানে চলিয়া আসিব। তাতে যদি কাজের ক্ষতি হয় ত তুমি

অগত্যা নিরুপমাকে সম্মত হইতে হইল। প্রথম কদিন সে লজ্জায় বিশেষ কোন কথা কহে নাই—আমিও বেশী পীড়াপীড়ি করি নাই।




একদিন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আচ্ছা, বল দেখি, এ ঘণ্টাটা কেন বাজ্‌ল ?" সে বলিল "তা বুঝি জানি নি। মেল ষ্টেশন ছেড়েছে।"

দুই একটা প্রশ্নের উত্তরে বুঝিতে পারিলাম যে, ষ্টেশনের নাড়ী নক্ষত্র সে সবই জানে। কোন্ ঘণ্টা লাইন-ক্লিয়ারের, কোন্ ঘণ্টা যাত্রীদের টিকিট লইবার, ট্রেন নিকটস্থ হইলে কোন্ ঘণ্টা বাজে, এ সব তাহার কণ্ঠস্থ ছিল। তাহাকে যে আমি নূতন কিছু দেখাইব বা শিখাইব, আমার এমন ক্ষমতা ছিল না।

একদিন নিরুপমাকে বলিলাম, "তুমিত রোজই এখানে আস্‌চ, টেলিগ্রাফের সংকেতগুলি কেন শিখে ফেল না। চেষ্টা করিলে তুমি এক মাসের মধ্যেই সব শিখে ফেল্‌তে পারবে ?"

"কেন গো, এত ঠাট্টা করচ কেন ? মেয়েরা মূর্খ তা সবাই জানে।"

"আচ্ছা—এক মাসের মধ্যে যদি তোমায় শিখিয়ে দিতে পারি।"

"যাও—তোমায় আর মিছে বক্‌তে হবে না।"

কিন্তু আমি বুঝিলাম 'তাহার পেটে ক্ষিদে, মুখে লাজ'। সে টেলিগ্রাফের তারের নিকট যেরূপ উদ্‌গ্রীব হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে, প্রতি শব্দ যেরূপ ধীর-ভাবে লক্ষ্য করে, তাহাতে তাহার সংকেতগুলি শিখিবার যে বিশেষ ইচ্ছা আছে, সে বিষয়ে আমার কোন সংশয় ছিল না। সুতরাং আমার শিখাইবার আগ্রহ যত প্রবল হইল, তাহার শিখিবার আপত্তি ততই কমিয়া আসিতে লাগিল।

এক সপ্তাহের মধ্যেই সে রীতিমত শিখিতে লাগিল। ইংরাজিতে তাহার বিদ্যা রয়েল রিডার পর্য্যন্ত, সুতরাং সব কথা সে বুঝিতে পারিত না। কিন্তু এক মাসের মধ্যেই সে কাজ-চলা সংকেত-গুলি এক রকম শিখিয়া ফেলিল।

সহসা একদিন রাত্রিতে আমি প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হইলাম। নিকটে কোন ডাক্তার ছিল না। দুই ক্রোশ দূর হইতে নিবারণ বাবুকে ডাকিয়া পাঠাইলাম। তাঁহার ঔষধ খাইতে লাগিলাম। কিন্তু জ্বরের কোন উপশম দেখা গেল না। ডাক্তার বাবু বলিলেন, 'এ রেমিটেণ্ট ফিবার—৪১ দিনের কমে ভাল হইবে না'।

বৃদ্ধ ষ্টেশন-মাষ্টারটী আমার অনেক উপকার করিলেন। এক মাস ধরিয়া তিনি আমার কাজ করিয়া দিলেন। কিন্তু তখনও উপশমের কোন লক্ষণ না দেখিয়া অগত্যা তিনি আমার ছুটীর আবেদন-পত্রে আমার স্বপক্ষে খুব ভাল করিয়া লিখিয়া সাহেবের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। দুই মাসের ছুটী মঞ্জুর হইয়া আসিল।

৪১ দিন পরে আমার জ্বর ছাড়িল বটে, কিন্তু তাহার ধাক্কা সাম্‌লাইতে আমার আরও অনেক দিন লাগিল। দুই মাস পরে যখন আমার ছুটী ফুরাইল, তখনও দুই পা হাঁটিলেই আমি ক্লান্ত হইয়া পড়িতাম। আমার দুর্ব্বলতা তখনও যায় নাই।




দু'দিন নাইট্ ডিউটী করিতে না করিতেই পুনরায় আমার জ্বর আসিল। বেগতিক দেখিয়া আমি আবার ছুটীর দরখাস্ত করিলাম।

এক সপ্তাহের মধ্যেই উত্তর আসিল, "এখন লোকাভাব, ছুটী দেওয়া যাইতে পারে না"। ষ্টেশনমাষ্টার বাবু দয়া করিয়া কয়েকদিন আমার ডিউটী করিয়া দিলেন, কিন্তু তাঁহার কোলের ছেলেটীর বসন্ত হইল। তখন তাঁহার আর অবসর রহিল না। এমন কি তাঁহাকেও ছুটীর জন্য দরখাস্ত করিতে হইল।

দৃঢ় সংকল্প করিয়া আমি কাজে লাগিয়া গেলাম। অন্নের সংস্থান নাই—কাজ আমাকে করিতেই হইবে। মনের বলে আমি অসুখকে তাড়াইবার চেষ্টা করিলাম।

কিন্তু সাত দিন কাজ করিয়া পুনরায় জ্বরাক্রান্ত হইলাম। শরীর সাহেবকেও খাতির করে না, মানুষের অবস্থাও বুঝে না। ডাক্তার বলিলেন,"জ্বর সামান্য, দুর্ব্বল শরীরে রাত্রিজাগরণ প্রভৃতি অত্যাচারের জন্যই জ্বর হইয়াছে, সম্পূর্ণ বিশ্রাম পাইলেই জ্বর ছাড়িয়া যাইবে"।

তাঁহাকে সব কথা বুঝাইয়া বলিলাম। তিনি ঔষধ দিলেন, কিন্তু বলিয়া গেলেন "কার্য্যে ইস্তফা দেওয়া ব্যতীত আপনার আর উপায়ান্তর নাই"। অসুখের নিকট পারাপার নাই।

আমি অকূল পাথারে পড়িলাম। পরিবার লইয়া কাহার নিকট দাঁড়াইব—কাহার সাহায্য ভিক্ষা করিব? আমি নানা দুশ্চিন্তায় কাতর হইলাম।

আমাকে বিষণ্ণ দেখিয়া নিরুপমা আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিল, "ডাক্তার বাবু আজ কি বল্লেন?"

"ডাক্তার বাবু কাজ ছাড়িয়া দিতে বলিলেন। কিন্তু তাহ'লে খাব কি?"

নিরুপমা জানিত যে, পরের সাহায্য লইতে আমার একান্ত অনিচ্ছা। তাহার পিতা অনায়াসেই আমাদিগকে আশ্রয় দিতে পারেন, কিন্তু তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিতে আমি যে একান্তই অনিচ্ছুক, এ কথা তাহার অজ্ঞাত ছিল না।

নিরুপমার নিকট আমি কোনও দিন কোনও পরামর্শ জিজ্ঞাসা করি নাই। 'স্ত্রী-বুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী' বলিয়াই আমার বিশ্বাস ছিল। মূর্খ মেয়েরা যে পুরুষদের পরামর্শ দিতে পারে ইহা আমি বিশ্বাস করিতাম না। বুদ্ধিমতী নিরুপমাও গায় পড়িয়া কখন কোন পরামর্শ দিতে আসে নাই।

আজ বিপদে পড়িয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম,'এখন কি করা যায় বল দেখি?'

আমাকে উদ্বিগ্ন দেখিয়া নিরুপমা বলিল, "দেখ,একটা কাজ করলে হয় না? তুমি আমাকে রাত্রিতে ষ্টেশনে লইয়া যাও ত। আমি তোমার অনেক সাহায্য করিতে পারিব।"

বটেই ত, এ কথাটা আমার মনে হয় নাই।

নিরুপমা ত ষ্টেশনের কাজ আমা অপেক্ষা কোন অংশে কম জানে না।






টেলিগ্রাফের সংকেতগুলিও সে এক রকম শিখিয়া লইয়াছে। আমার সব কাজই সে বেশ্ চালাইতে পারিবে।

কুলীরা সকলেই আমার অনুগত। তাহাদের শিখাইয়া দিলাম যে, এ ব্যাপার তাহারা যেন কাহারও কাছে প্রকাশ না করে। যাত্রীদিগকে টিকিট-ঘরে প্রবেশ করিতে নিষেধ করিয়া দিলাম। টিকিট ঘরের পাশেই একটা ছোট মালের গুদাম ছিল। প্রথম দুই দিন নিরুপমাকে সেইখানে লুকাইয়া রাখিলাম।

কিন্তু নিরুপমা যখন দেখিল টিকিট কাটিতে আমার হাত কাঁপিতেছে, তখন সে আমাকে জোর করিয়া ইজি চেয়ারে বসাইয়া দিয়া নিজেই টিকিট কাটিয়া দিতে লাগিল। পাছে যাত্রীরা জানিতে পারে সেই ভয়ে সে পূর্ব্বেই হাতের গহনা খুলিয়া রাখিয়াছিল।

যখন ট্রেন ছাড়ার তার আসে, তখন সে আমাকে ইসারা করে। আমি ইজি-চেয়ারে শুইয়া কুলীদের ঘণ্টা দিতে বলি। গার্ডেরা মধ্যে মধ্যে আমার সহিত পরামর্শ করিতে আসে। এইজন্য প্যাসেঞ্জার ট্রেণ আসিলে আমি নিরুপমাকে মাল গুদামে রাখিয়া টিকিট ঘরের দরজা খুলিয়া দিই।

মেলের সময় কোন গোলমাল নাই। নিরুপমা প্রায় সব কাজই করে। সেই লাইন ক্লিয়ার দেয়, সেই কুলীদের ঘণ্টা দিতে বলে, সেই ষ্টেশনের আলোগুলি জ্বালাইয়া দেয়।

এইরূপে কোন প্রকারে এক মাস কাটিয়া গেল। বিশ্রাম লইয়া আমি সবল হইতে লাগিলাম। জ্বর আর দেখা দিল না।

আমি সবল হইয়া উঠিলাম। কিন্তু নিরুপমা আর আমাকে কোন কাজ করিতে দেয় না। টিকিট কাটিতে গেলে বলে, "বাড়াবাড়ি করিও না, আবার জ্বর আসিবে।" আমি তাহার সঙ্গে তর্কে পারিতাম না।

এক দিন ডাউন্ প্যাসেঞ্জার সবে মাত্র চলিয়া গিয়াছে। একটা টুলে বসিয়া একাগ্রমনে নিরুপমা টিকিট বিক্রয়ের হিসাব করিতেছিল। আমি ইজি চেয়ারে অর্দ্ধ-শয়ান হইয়া তাহাকে দেখিতেছিলাম। সে হিসাবে এমনি তন্ময় হইয়াছিল যে, তাহার অবগুণ্ঠন লোল কবরীচ্যুত হইয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে তাহার ঠিকানা ছিল না। তাহার সেই কুঞ্চিত ক্ষুদ্র ললাটে বিচ্ছিন্ন কুন্তলগুলি খেলিয়া বেড়াইতেছে। অবিশ্রান্ত পরিশ্রমে বালিকার সুদীর্ঘপল্লববিশিষ্ট কৃষ্ণবর্ণ চক্ষু কালিমায় ভরিয়া গিয়াছে।

আমি মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাহাকে দেখিতেছিলাম। তাহার নিঃস্বার্থ প্রেম, অপরিসীম যত্ন, অশ্রান্ত অধ্যবসায়ই আমাকে এ যাত্রা বাঁচাইয়াছিল। কৃতজ্ঞতায় আমার হৃদয় পূর্ণ হইয়াছিল।

সহসা টেলিগ্রাফের তারগুলি খট্‌খট্ করিয়া বাজিয়া উঠিল। তারগুলি নড়িতেই নিরুপমা উঠিল। অসময়ে তারের শব্দ শুনিয়া আমিও উঠিয়া গেলাম।







হেড্‌-অফিস্‌ হইতে তার আসিতেছে যে, ষ্টেশন-মাষ্টারের ছুটি মঞ্জুর হইয়াছে। আমাকেই তাঁহার কাজ করিতে হইবে। আমার কাজে সন্তুষ্ট হইয়া সাহেব আমার বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছেন।

নিরুপমা জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েচে ? হেড্‌আফিস্‌ থেকে হঠাৎ টেলিগ্রাম এল কেন? কোন স্থানে কলিসন্‌ হয়েছে নাকি ?"

হর্ষে উৎফুল্ল হইয়া নিরুপমাকে কাছে টানিয়া লইয়া বলিলাম, "হেড্‌-আফিস্‌ থেকে তার এসেছে যে, বুড় ষ্টেশনমাষ্টারের ছুটী মঞ্জুর হইয়াছে, আমাকে তাঁহার কাজ করিতে হইবে। আমার কাজে সন্তুষ্ট হইয়া সাহেব আমার বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছেন।"

আনন্দিত হইয়া নিরুপমা বলিল, "সত্যি ?" আমি বলিলাম "হাঁ, সত্যি"।

নিরুপমাকে এবার কাছে টানিয়া লইয়া বলিলাম, "নিরুপমা, আমার এ উন্নতি কেবল তোমারি জন্যে ? তোমার নিরুপমা নাম তুমি সার্থক করিয়াছ। দিদিরা মিথ্যা কথা বলিতেন না।"

নিরুপমা আমার হাতখানি ধরিয়া একটু হাসিয়া কহিল, "তা'হ'লে ষ্টেশনমাষ্টারের মেয়ে তোমার নিতান্ত অপছন্দ নয় ?"

আমি নিরুপমাকে আদর করিয়া বলিলাম, "দেখ, ফের এ সব কথা বলিলে আমি তোমার সহিত ঝগড়া করিব।"

এতদিনে আমাদের মনের মিল হইল।

শ্রীযতীশচন্দ্র বসু, এম, এ।

৺উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের জীবনী।

১৫ বৎসর বয়সে লিখিত রোমের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

২। রোমানদিগের সাধারণতন্ত্র

প্রথম অধ্যায়।

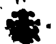
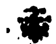
ব্রুটস ও কলেটাইনস।

১। রোমের শেষ রাজা টার্কুইনস সুপার্ব্বস সপরিবারে রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত হইলে দুই জন কন্সল বা অধ্যক্ষ রোমের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইলেন।

২। রোমনগর স্থাপনের ২৪৪ বৎসর পরে এবং খ্রীষ্টের জন্মের ৫১০ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহারা শাসন করিতে আরম্ভ করেন।

৩। কন্সলেরা রাজা ছিলেন না, তাঁহারা শাসনকর্ত্তা মাত্র। তাঁহাদিগের হস্তে সমুদায় রাজকীয় ক্ষমতা সমর্পিত হইত, কিন্তু অধিক দিন হস্তে ক্ষমতা থাকিলে পাছে তাঁহারা অত্যাচারী হইয়া উঠেন, এইজন্য এক বৎসর কাল মাত্র তাঁহাদিগের শাসনের সীমা নিরূপিত ছিল।

৪। ব্রুটস ও কলেটাইনস এই দুই জন প্রথম কন্সল হইলেন। কিন্তু টার্কুইন নাম রোমের সর্ব্বত্র এরূপ ঘৃণাস্পদ হইয়াছিল যে, কলেটাইনস্‌ ঐ

নাম গ্রহণ করাতে পদচ্যুত হইলেন এবং ভেলেরিয়স পর্শিকোলা তাঁহার পদে নিযুক্ত হইলেন।

৫। ব্রুটস অতি মহৎ লোক ছিলেন। টার্কুইন তাঁহার পিতা জুলিয়সের, তাঁহার ভ্রাতার এবং অন্যান্য সেনেটরদিগের প্রাণ সংহার করাতে তিনি ঐ নিষ্ঠুর অত্যাচারীর হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য সকল লোকের নিকট আপনাকে বাতুলের ন্যায় দেখাইতেন। কিন্তু এই সময়ই তাঁহার পরিচয় দিবার সুসময় উপস্থিত হইয়াছে বুঝিয়া আত্মভাব ব্যক্ত করিলেন।

৬। স্বদেশের প্রতি তাঁহার এরূপ অসামান্য অনুরাগ ছিল যে, সাধারণের হিতার্থে তিনি আপনার স্বাভাবিক স্নেহ-বন্ধনও ছেদন করিয়াছিলেন। তাঁহার দুই পুত্র সাধারণতন্ত্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়াছিল বলিয়া তিনি পিতৃভাব পরিত্যাগ করিয়া অম্লানবদনে তাহাদিগের শিরশ্ছেদনের আজ্ঞা দিলেন এবং স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া তাহা করাইলেন।

৭। টার্কুইন সিংহাসনে পুনঃ স্থাপিত হইবার প্রস্তাব করিয়া রোমে আপনার প্রতিনিধি প্রেরণ করেন, তাহা দ্বারাই ঐ চক্রান্তটী ঘটিয়াছিল, কিন্তু তাহা সফল হইল না।

৮। অতঃপর টার্কুইন অন্যান্য প্রতিবেশী রাজাদিগের সাহায্য লইয়া বারম্বার রোম আক্রমণ করেন। তন্মধ্যে এক যুদ্ধে টার্কুইনসের পুত্র আর্ণসের হস্তে ব্রুটসের এবং ব্রুটসের হস্তে আর্ণসের মৃত্যু হয়। এই যুদ্ধে ভেলারস্ রোমসেনাধ্যক্ষ ছিলেন এবং বিজেন্টি জাতি টার্কুইনের সহায় হইয়াছিল।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

সাধারণতন্ত্রকালে রোমানদিগের যুদ্ধের বিবরণ।

রাজ্যতন্ত্র বিলুপ্ত হইয়া সাধারণতন্ত্র আরম্ভ হইলেই রোমানেরা প্রতিবাসী জাতিদিগের সহিত ক্রমগত যুদ্ধারম্ভ করিল এবং এক দেশের পর অন্য দেশ, তৎপরে তৃতীয় দেশ, এইরূপে ক্রমশঃ নূতন নূতন দেশ সকল জয় করিয়া রোম-রাজ্যের সীমা বিস্তার করিতে লাগিল। তাহাদের জয়-পিপাসা সমস্ত ইটালীতে তৃপ্ত হইল না, প্রত্যুত ক্রমশঃ প্রবল হইয়া দক্ষিণে ভূমধ্যস্থ সাগর পার হইয়া আফ্রিকার উপর পড়িল, পশ্চিমে আটলান্টিক মহাসাগরে গিয়া নিবৃত্ত হইল, উত্তরে ডানিউব ও রাইন নদী এবং পূর্ব্বে ইউফ্রেটিস নদী পর্য্যন্ত অধিকার করিল।

২। এই সময়ের মধ্যে রোমানদিগের ১৯টী প্রধান যুদ্ধ হয়, পশ্চাৎ সংখ্যাক্রমে তাহার বিবরণ দেওয়া যাইতেছে। ১ ইট্রুরীয়, ২ লাটিন, ৩ ভল্সীয়, ৪ বিজেন্টিয়, ৫ গলিক, ৬ দ্বিতীয় লাটিন, ৭ সামনাইট, ৮ টরেন্টিয়, ৯ প্রথম পিউনিক, ১০ দ্বিতীয় পিউনিক, ১১ আন্টিওকসের সহিত, ১২ মাসিডোনীয়, ১৩ তৃতীয় পিউনিক, ১৪ করিন্থীয়, ১৫ পর্টুগাল, ১৬ নিউমানসীয়, ১৭ শ্লেভ বা দাসদিগের সহিত, ১৮



জুগার্থার সহিত, ১৯ মিথ্রিডেটিসের সহিত যুদ্ধ (ক)।

৩। এতদ্ভিন্ন মেরিয়স ও সিলা, সিজর, পম্পে এবং অন্যান্য রোমীয় সেনাপতি-দিগের মধ্যে অনেক বিবাদ, কলহ ও যুদ্ধ হয়। কিন্তু এই সংক্ষিপ্ত ইতিহাসে তাহার বিশেষ বর্ণনা করা যাইতে পারে না।

৪। যাহা হউক, রোমানেরা কেবল রাজ্যবৃদ্ধি করিবার জন্যই সকল যুদ্ধ করে নাই। অনেক স্থলে স্বদেশরক্ষার্থ এবং আশ্রিত ও মিত্ররাজ্যের সাহায্যার্থও সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

(ক) ১ ইট্রুরিয়া দেশ টাইবার নদীর পশ্চিম। ২ রোমের দক্ষিণস্থ লোকেরা লাটিন। ৩ টস্কানীর লোক ভলসীয় জাতি। ৪। বিজেণ্টিরা ভিয়াই নামে টস্কানীর এক প্রাচীন নগরের লোক। ৫ ফ্রান্সের প্রাচীন নাম গল। ৬ সামনিয়ম, বর্ত্তমান নেপল্‌স্। তথাকার লোকেরা সামনাইট। ৮ টরেণ্টিয়, ইটালীর টরেণ্টিয়মের লোক। ৯ আফ্রিকাস্থ কার্থেজ নগরের সহিত রোমের যে যুদ্ধ হয়, তাহাকে পিউনিক যুদ্ধ বলে। ১১ আণ্টিওকস্ আসিয়াস্থ তুরস্কের অন্তর্গত সিরিয়ার রাজা ছিলেন। ১২ মাসিডন, প্রাচীন গ্রীসের এক অংশ, বর্ত্তমান ইউরোপীয় তুরস্কের অন্তর্গত। ১৪ করিন্থ গ্রীসের এক প্রাচীন নগর। ১৫ পর্টুগাল বা প্রাচীন লুসিটনীয়া, স্পেনদেশের পশ্চিম। ১৬ নিউমানসিয়া স্পেনের ওল্ডকাসল প্রদেশের এক নগর। ১৭ সিসিলির লোকদিগকে রোমকেরা স্লেভ অর্থাৎ ক্রীতদাস কহিত। ১৮ জুগার্থা আফ্রিকার অন্তঃপাতী নিউমিডিয়ার রাজা, এই দেশের মধ্যে বর্ত্তমান আলজিয়ার্স প্রভৃতি দেশ। ১৯ মিথ্রিডেটিশ, আসিয়াস্থ তুরস্কের অন্তর্গত পোণ্টসের রাজা ছিলেন।

তৃতীয় অধ্যায়।

ইট্রুরীয় যুদ্ধ।

১। রাজাতন্ত্র বিলুপ্ত হইলে (খৃঃ পূঃ ৫০৮) ইট্রুরীয়দিগের সহিত রোমানদিগের প্রথম যুদ্ধ হয়।

২। ইট্রুরিয়াধিপতি পোর্সেনা টার্কুইনের স্বপক্ষ হইয়া বলশালী সেনানীগণের সহিত রোমনগর আক্রমণ করিয়াছিলেন। কিন্তু হোরেসিও কক্লিস ও স্পিউরিয়স স্কেভোলা এই দুই জন রোমান বীরপুরুষ এরূপ অসম সাহস ও বীরত্ব প্রদর্শন করিলেন যে, তাহাতে তিনি চমৎকৃত ও ভয়াক্রান্ত হইয়া সন্ধি প্রার্থনা করিতে বাধ্য হইলেন। কিন্তু যখন তিনি দেখিলেন যে, রোমান-দিগকে তিনি জয় করিতে পারিবেন না, তৎক্ষণাৎ টার্কুইনসের পক্ষ পরিত্যাগ করিলেন।

চতুর্থ অধ্যায়।

লাটিনদিগের সহিত যুদ্ধ।

১। পোর্সেনা পক্ষত্যাগ করিলে পর টার্কুইনের জামাতা মানলিয়স্ লাটিন-দিগকে যুদ্ধে উৎসাহিত করিল।

২। রিজিলস হ্রদের নিকট (খৃঃ পূঃ ৫০১) এক ঘোরতর যুদ্ধ হয় এবং রোমানেরা এই যুদ্ধে জয়পতাকা উড্ডীয়মান করেন।

৩। এই যুদ্ধে মানলিয়স্ লাটীনদিগের এবং আলস পষ্টুমস রোমানদিগের সেনাপতি ছিলেন।

৪। মানলিয়স হত হয় এবং তাহার সহিত ৩৪ সহস্র লাটিন সমরশায়ী হয়।





রোমানদিগের সহস্র সৈন্য মাত্র ক্ষয় হয়। মানলিয়সের মৃত্যু হইলে টার্কুইন পুনরায় রাজ্যপ্রাপ্তির আশায় এককালে জলাঞ্জলি দিলেন।

একাধারে সব

স্নেহে তুমি পিতা পাতা,
মমতায় যেন মাতা,
ভ্রাতা ও ভগিনী সম ভালবাসা-ভরা।
আত্মীয়গণের মত
শুভাকাঙ্ক্ষা অবিরত,
সুধাময় শিশুসম শুভ্র মনোহরা!
একপ্রাণতায় পতি,
মরণে অমৃত অতি,
দ্যুলোকে সুগতি তুমি ভয়ে বরাভয়।
পাপে তাপে আহা,—'হরি',
শোকেতে তরণী মরি,
বিপদের ঘোর দুঃখে বড় দয়াময়।
সেবায় সতত দাস,
বিশ্রামের নাহি আশ,
খাটি মরি বার মাস চির-ক্লান্তিহীন,
জীবনের রাজকাজে
রাজ রাজেশ্বরসাজে,
সত্য ন্যায়বান্‌রূপে চির রাত্রিদিন।
পালনেতে ধাত্রী মাতা,
দূর করি মর্ম্মব্যথা,
সখা সম আহা মনোরঞ্জনে নিপুণ,
পদে পদে করি দোষ,
তবু নাহি কর রোষ,
ক্ষমাতে মা বসুন্ধরা সগুণ নির্গুণ।
বিশ্বপ্রেমিকের মত
অপ্রেমেও হিতরত,
সদা নিরমল প্রেম নিষ্কাম সুন্দর।
না পেলেও প্রতিদান,
(নাহি মান অভিমান)
করে যাও আত্মদান।
বিরাট, মহান্, ভূমা, পুরুষ অক্ষর।
অখিল ব্রহ্মাণ্ডপতি,
হে মম পরম গতি,
প্রতিটি পলকে তুমি বিশ্ব ভুবনের।
ত্রিলোকের পালয়িতা,
ভকতের পরিত্রাতা,
ওগো, সে সময়ে তুমি আমারও প্রাণের।
জ্ঞান এ অন্তর যথা,
বিশ্বের ও ভারতী তথা,
নিমেষে নিমেষে মোর রহি হিয়ামাঝ।
নিখিল বন্দনা স্তুতি,
অধমের ও প্রেম প্রীতি
গ্রহণ করিছ এক অদ্বিতীয় রাজ।
বিশ্বের ধারি না ধার,
তুমি মোর প্রাণাধার,
তুমি মোর জ্ঞানদাতা, তুমি চিন্তামণি।
তুমি প্রাণ, তুমি মন,
জীবন যুড়ান ধন,
সর্ব্বস্ব রতন বলি তোমারেই গণি।
তোমারে পাইলে আমি
থাকি নত, দিন যামী
কিবা সুখ শান্তি স্বর্গে কিছু নাহি চাই




একাধারে সব সখা,
লভি গো তোমাতে একা,—
হেন তোমা বঞ্চি কেন এতদিন রই।
রাখিলে গো দূরে দূরে,
তপত দুঃখের পুরে,
সুখ সুখ করে কেন ঘুরালে আমায় ?
ওয়েসিস পরিহরি,
কেন দেব হরি হরি,
মরুভূমে কাঁদাইলে মৃগতৃষ্ণিকায় ?
দিতে চির সুপ্রভাত
বুঝি গো রাখিলে নাথ,
দুরন্ত আঁধারভরা জীবনে যামিনী ;
আজ সব অবসানে,
তিমিরের তিরোধানে,
পূরবে ভাতিল ওই দীপ্ত দিনমণি।

শ্রীমতী ক্ষীরোদকুমারী ঘোষ।

বিশ্বসেবা ব্রতে স্ত্রীলোকের সহকারিতা।

এ সংসার দুঃখময়। প্রকৃত সুখ অতি অল্প লোকের ভাগ্যে অতি অল্প সময়ই ঘটে। আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক, ত্রিবিধ দুঃখে সংসার জর্জ্জরিত। জরা, ব্যাধি, শোক, তাপ, দরিদ্রতা প্রভৃতি অশেষবিধ যন্ত্রণানলে মানব প্রতিনিয়ত দগ্ধ হইতেছে। সুখের মরীচিকায় প্রলুব্ধ হইয়া সংসারমরুভূমে প্রাণান্ত যাতনায় ছট্‌ফট্ করিতে করিতে নরনারী অবিরাম হাহাকার করিতেছে। অথচ সংসার এমনই মোহমন্ত্রে মুগ্ধ যে, পরস্পরের আর্ত্তনাদ পরস্পরে শুনিতে পায় না। যাহারা ধনের গরিমায় প্রমত্ত, দরিদ্রের হৃদয়বিদারক আর্ত্তনাদ তাহাদের কর্ণে প্রবেশ করে না। যাহারা জ্ঞানালোকে জ্যোতিষ্মান্, তাহারা অজ্ঞানান্ধ ভ্রান্তিশীল জনসমাজের অনন্ত দুঃখেরদিকে ফিরিয়া চাহে না! অথচ ধনী ও জ্ঞানী কেহই ভবযন্ত্রণা হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে না, সকলেই দুঃখ ভোগ করে, কিন্তু মোহান্ধতা ও স্বার্থপরতার জন্য, সমদুঃখীর সহিত সহানুভূতি অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়।

মরণশীল সংসারে বিস্মৃতি ভিন্ন আর কিছুতেই বোধ হয় সুখ নাই। আপনার প্রকৃত অবস্থা হৃদয়ঙ্গম হইলে, আত্মার বিবিধ দুর্গতির কথা স্মৃতিপথে জাগরূক থাকিলে, সংসারলভ্য সুখরাশিতে তৃপ্তি হয় না। যে যেখানে সুখী আছে, সকলেই আত্মবিস্মৃত। জীবনের গভীর উদ্দেশ্য ও দায়িত্বপূর্ণ কর্ত্তব্য ভুলিয়া গেলেই সংসারের অসার সুখে প্রাণ মগ্ন থাকিতে পারে। যাহারা নিজের অবস্থা ভাল করিয়া জানে না, তাহারা আত্মপ্রতারিত। তাহারা যে কৃপা-পাত্র, তাহাতে কি সন্দেহ আছে ? একটা না একটা অসুখের কারণ প্রত্যেকেরই সর্ব্বদা বর্ত্তমান আছে। কাহারও দুশ্চিকিৎস্য

ব্যাধি, কাহারও হৃদয়ভেদী শোক, কাহারও পাপের জ্বালা, কেহ দারিদ্র্যের কশাঘাতে অস্থির, কঠোর নৈরাশ্যে কেহ বা ভগ্নহৃদয়, সংসারের নির্ম্মমতায় কেহ বা মর্ম্মাহত। কাহার অশ্রুবারি নিবারণ করিবে? এক দিকে থামাইতে যাইয়া আর এক দিকে ক্রন্দনের রোল শুনিতে পাইবে। একটা সামাজিক অনিষ্ট দূর করিতে যাইয়া আর একটা নূতন অনিষ্ট ঘরে আনিতে হইবে। জনসমাজ প্রায় সকল দেশেই বিবিধ দুর্নীতি ও দুরাচারে কলুষিত, বাহিরের সভ্যতার আবরণ উন্মোচন করিলে অন্তর্বাহী পাপস্রোত অনুভব করিতে পারা যায়। কত স্থানে কত প্রকার দাসত্ব, কত প্রকার অত্যাচার, রমণী ও নীচ জাতিগণের উপর কত নিগ্রহ, কত দেশব্যাপী মারাত্মক পীড়ার তীব্র উৎপাত রহিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। একবার নিবিষ্টচিত্তে এ সকল বিষয় চিন্তা করিয়া দেখিলে আতঙ্কে প্রাণ শিহরিয়া উঠে।

সাধ করিয়া বুদ্ধদেব সংসার ত্যাগ করেন নাই। রাজকুমার যে উদাসীন হইয়াছিলেন, তাহা অতীব সঙ্গত। তাঁহার স্বভাবতঃ সরল ও পবিত্র হৃদয় এই শোক-তাপময় সংসারের যাতনার দুই একটী চিত্র দেখিয়াই গলিয়া গিয়াছিল। তিনি চিন্তা করিতে করিতে আত্মহারা হইয়াছিলেন। পাপী তাপী মানবের ভবজ্বালা নিবারণ করিয়া তাহাকে মৃত্যুর বিস্তীর্ণ পাশ হইতে রক্ষা করা তাঁহার জীবনের একমাত্র ব্রত হইয়াছিল। তিনি নির্ব্বাণ মুক্তির পথ জানিতে কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন। বিশ্বসেবাব্রতে তিনি জীবন সমর্পণ করিয়াছিলেন।

যাহার হৃদয় অবিকৃত আছে, সেই কাঁদিতে পারে। সংসারের বিবিধ প্রকার কুটিল ভাবের মধ্যে না পড়িলে অপরের কষ্ট দেখিয়া আমরা কষ্ট না পাইয়া থাকিতে পারি না। মানবপ্রকৃতিতে পরার্থপরতা একটী স্বাভাবিক বৃত্তি। সমবেদনা অনুভব করিবার শক্তি আমাদের প্রকৃতিজাত, অভিজ্ঞতালব্ধ নহে, ইহা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। নিজের কোন প্রকার কষ্ট হইলে, তাহা দূর করিতে চেষ্টা করা যেমন স্বাভাবিক, অপরের অশ্রুজলও দীর্ঘকাল দেখিতে ও শুনিতে পাইলে তাহার যথাসাধ্য প্রতিবিধান করিবার উদ্যম তেমনিই সহজ ও স্বাভাবিক। সেইরূপ আবার অপরের দুঃখে নির্ব্বিকার হইয়া নিশ্চেষ্ট থাকাও প্রকৃতির স্বভাববিরুদ্ধ। এই উপজীবিকা বৃত্তির উপরেই পরোপকার ও সেবার ভিত্তি।

হৃদয়ের নিকট বিচার ও বিবেচনা নাই। স্বার্থ ও ভবিষ্যৎ ফলাফল গণনা হৃদয়তার লক্ষণ নহে। দয়া সহজ ও সরল, বুদ্ধির দ্বারা তর্ক করিয়া সদয় হওয়া যায় না। হৃদয় দেশ, কাল, পাত্র বিচার করিতে জানে না, যেখানে যখনই দুঃখ যন্ত্রণা দেখে, সেখানে তখনই তাহার যথাসাধ্য উপশম করিতে চেষ্টা করে।

স্বার্থপরতা অনেক প্রকার আছে। স্বার্থপরতা সঙ্কীর্ণও হইতে পারে, বিস্তির্ণও হইতে পারে। আত্মীয় পরিবার ও প্রতিবেশিগণের মধ্যেই আমাদের প্রীতি আবদ্ধ থাকে। মনুষ্য বড় দুর্ব্বল, আপনার পরিবার, আপনার আত্মীয় স্বজন সে বেশ বুঝিতে পারে। জগতের ও জীবের কল্যাণকে স্বার্থের ন্যায় ভালবাসা সাধারণ লোকের চরিত্রে ঘটিয়া উঠে না। যাঁহার আজীবন শিক্ষা উদার, যাঁহার জ্ঞান উন্নত, যিনি ধর্ম্মবলে বলী, তিনিই বিশ্বপ্রেমে মত্ত হইতে পারেন। বিশ্ব-সেবাব্রতের জন্য জীবন উৎসর্গ করা কয় জনের ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে? যাঁহার সে স্বার্থত্যাগ, সে আত্মোৎসর্গ আছে, তিনিই ধন্য।

পৃথিবীতে যত সাধু ব্রত আছে, বিশ্বসেবা-ব্রত সকলের শীর্ষস্থানীয়। পরার্থপরতার মহিমা বলিয়া বুঝান যায় না, অনুভব করিয়া বুঝিতে হয়! প্রীতি সেবার জননী। প্রীতি যদি সর্ব্বভূতে বিস্তৃত না হয়, তাহা হইলে সেবাও সংকীর্ণ সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকিবে। হৃদয়হীন সেবাশুশ্রূষা সংসারে বিরল নহে, কিন্তু তাহাতে আত্মার কল্যাণ না হইয়া বরং অধোগতিই হয়। সার্ব্বভৌমিক প্রেম না জন্মিলে বিশ্বসেবা কল্পনার কথা মাত্র। দেশ, কাল ও জাতিগত কুসংস্কার এবং সংকীর্ণতা ছাড়াইয়া, সমস্ত জগতে প্রেম পরিব্যাপ্ত হওয়া বড় সহজ নহে। আমাদের প্রীতি-নদীর দুই তীর যেন প্রকাণ্ড, উচ্চ এবং পাষাণময়, কত প্রবল স্রোত ও উচ্ছ্বাস হইলে তবে সে বাঁধ ছাপাইয়া তাহার জল বিশ্বপ্রান্তরে ব্যাপিয়া পড়িবে, তাহা কে বলিতে পারে? তেমন প্রেমের বন্যা সকল নদীতে হয় না।

সার্ব্বভৌমিক প্রেম লাভ করিতে হইলে জ্ঞান বিস্তৃত এবং ধারণাশক্তি প্রখর হওয়া চাই। যে জগতের সংবাদ রাখে না, বা নরনারীর বিবিধ দুঃখ দুর্গতির কথা যাহার হৃদয়ে চিরকালের জন্য দৃঢ় মুদ্রিত হইয়া না যায়, সমস্ত মানবসমাজের সুখ দুঃখের সহিত তাহার অতি নির্জ্জীব সহানুভূতি থাকিবে। সাধারণ মানব-জাতির একটা ধারণা করিতে যাইলেও মনের অনেক প্রশস্ততার প্রয়োজন। আর, ধর্ম্মের জীবন্ত শক্তিতে অনুপ্রাণিত না হইলে এরূপ সর্ব্বজনীন প্রীতির উদ্ভব হইতে পারে না। বিশ্বপতি অদ্বিতীয় বিধাতাকে পিতা বলিয়া বিশ্বাস করিতে না পারিলে 'সব মানুষ পরস্পর ভাই ভাই' এ জ্ঞান জন্মে না। সমুদ্রের জল হইতে বাষ্প উঠিয়া মেঘের রূপ ধারণ করে এবং বৃষ্টির বেশে পর্ব্বতে পতিত হয়। সেই বৃষ্টির জল নদীরূপে প্রবাহিত হইয়া কত দেশ ভ্রমণ করিয়া পরিণামে আবার সেই সাগরে আসিয়া মিশাইয়া যায়। ঠিক এই প্রকারে মানব হৃদয়ের প্রীতি আগে ঊর্দ্ধে ঈশ্বরের চরণে প্রণত ও কৃতার্থ হইয়া পরিশেষে মানবসমাজে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। সেই অনন্ত প্রস্রবণের সহিত আমাদের হৃদয়-নদীর যোগ না থাকিলে আমরা কখন




সমস্ত বিশ্বকে প্রেমসলিলে স্নিগ্ধ করিতে পারি না।

বিশ্বসেবাব্রতে সহস্র সহস্র বিঘ্ন, বাধা ও প্রতিকূলতা মস্তক তুলিয়া দণ্ডায়মান, তাহাদিগকে পরাস্ত করিতে হইলে দুর্জ্জয় বিশ্বাস ও প্রাণপণ নির্ভরের প্রয়োজন। সত্য ও প্রেমের জয় হইবেই হইবে, এই বিশ্বাস দুর্ব্বল দেহেও বল সঞ্চার করিয়া দেয়।

রমণী অনেক বিষয়ে এই মহাব্রতপালনে সহকারিণী হইতে পারেন। তাঁহার হৃদয় দয়া মমতায় গঠিত। তিনি প্রীতিরূপিণী। প্রেমই তাঁহার প্রকৃতির প্রধান উপাদান। পুরুষ অপেক্ষা সকল দেশেই নারীর কোমলতা অধিক। দুর্ব্বল হইলেও স্ত্রীজাতি প্রেমবলে সবল। জননী, ভগিনী ও সহধর্ম্মিণীরূপে রমণীর স্নেহ মানবজাতিকে অমৃতে অভিষিক্ত করিয়া রাখিয়াছে। মরুভূমিতে পান্থ-পাদপের গাত্রে আঘাত করিলেই যেমন স্বচ্ছ ও স্নিগ্ধ পানীয় জল বহির্গত হয়, তেমনি সংসারে নারীহৃদয় মানবের দুঃখ জ্বালার সংস্পর্শে দ্রবীভূত হইয়া যায়, এবং তাহা হইতে অমৃতময় প্রেমবারি নিঃসৃত হইয়া দগ্ধ জনসমাজকে পরিতৃপ্ত করে।

পরের দুঃখ কষ্ট দেখিলে রমণী অশ্রুধারা সম্বরণ করিতে পারেন না, সেই জন্য তিনি পরসেবায় জীবন সমর্পণ করিতে প্রস্তুত। পরের সেবাশুশ্রূষা করা রমণীরই যেন অধিকার বলিয়া বোধ হয়। সেবাশুশ্রূষায় হৃদয়ের যে কোমলতা, যে সহানুভূতি, যে ধৈর্য্য এবং যে স্বার্থত্যাগের প্রয়োজন, তাহা নারীচরিত্রে বিশেষরূপে দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের দেশের স্ত্রীলোকেরা দাসীর ন্যায় অহরহঃ সকলের সেবা করিতেছেন, তাঁহাদের আর অন্য কাজ নাই। সেবার জন্যই যেন তাঁহাদের জীবন, তাহাই যেন তাঁহাদের প্রকৃতির একমাত্র অঙ্গ। স্নেহময়ী রমণী রোগীর শুশ্রূষা যেমন করিয়া করিতে পারেন, এমন আর কে পারে? তাঁহার সেবার কেমন এক সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য আছে, তাহা বলা যায় না! তাঁহার দয়ার কি মোহিনী শক্তি আছে, তাহা যে উপকার পাইয়াছে, সেই জানে।

রমণীর সহিষ্ণুতা চিরপ্রসিদ্ধ। সংসারের গুরুতর কষ্টের ভার রমণী নিজেই বহন করেন। প্রেম যাঁহার হৃদয়ের শোণিত, তিনি সহিষ্ণু না হইয়া থাকিতে পারেন না। সংসারের দৈনিক জীবনে কত উত্তেজক কারণ প্রতিনিয়ত উপস্থিত হইতেছে, কিন্তু গৃহিণীকে অতি অল্পই ক্রোধান্বিত হইতে দেখা যায় স্ত্রী-প্রকৃতি সাধারণতঃ স্নিগ্ধ, কোমলতা ও বিনয় তাহার ভূষণ। ক্রোধ এইরূপ সুকোমল প্রকৃতির বিরোধী।

স্বার্থত্যাগ স্ত্রীজাতির স্বভাবসিদ্ধ। পতি, পুত্র, আত্মীয় স্বজন, অতিথি, ও অভ্যাগত লোকের জন্য সর্ব্বস্ব সমর্পণ করাই তাঁহারা ধর্ম্ম বুঝিয়া মনে করেন। রমণীর স্বার্থত্যাগ কল্পনার কথা নহে, জীবনের পরীক্ষিত বিষয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ত্যাগস্বীকার ক্রমাগত



করিতে করিতেই তাঁহার জীবন অতিবাহিত হইয়া থাকে। সে স্বার্থনাশের ইতিহাস কে স্মরণ রাখে? উহা আমাদের জীবনে অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে, এই জন্য বিস্ময় বা মনোযোগ আকর্ষণ করে না। পতিব্রতা স্ত্রী স্বামীর জন্য কত ত্যাগস্বীকার, কত পরিশ্রমই না করেন! জননীর ন্যায় স্বার্থত্যাগ এ পাপময় সংসারে আর কোথায় দেখিতে পাওয়া যায়? রোগ যন্ত্রণার সময় কে আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া অবিরাম শুশ্রূষায় নিযুক্ত থাকেন? সে অপার্থিব স্বার্থনাশ কেবল জননীতেই সম্ভব। কত অজ্ঞাত পরিবার আছে, যেখানে অনেক সময় এরূপ স্বর্গীয় স্বার্থত্যাগের দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাহা ইতিহাসে লিপিবদ্ধ হইলে স্ত্রীচরিত্রের কতই না মহিমা বৃদ্ধি হয়। অশিক্ষিত, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, সমাজের গণনায় নিম্নশ্রেণীস্থ কত পরিবারের স্ত্রীলোকেরা প্রতিদিন নূতন নূতন দুঃখ, শোক ও দরিদ্রতার ভার অম্লান বদনে বহন করিতেছেন অথচ তাঁহাদের মুখে সন্তোষের হাসি! রমণী প্রিয়জনের জন্য পৃথিবীর সকল কষ্ট সহ্য করিতে পারেন, তাঁহার এমন প্রকৃতি। সতী রমণীর সতীত্বের তেজ, সকল তেজের শীর্ষস্থানীয়। সেবাব্রতে নৈতিক বলই নিতান্ত প্রয়োজনীয়। এইরূপে দেখা যায় যে, বিশ্বসেবাব্রতে রমণী পুরুষের সহায় হইতে পারেন। এই ব্রতসাধনে স্ত্রীলোকের বিলক্ষণ সামর্থ্য আছে। কিন্তু এই মহাব্রত বালক বালিকার ক্রীড়ার বিষয় নহে। ইহাতে প্রবৃত্ত হইতে হইলে জীবন উৎসর্গ করিতে হয়, সংসারের সকল মায়াপাশ ছিন্ন করিতে হয় ও ঐহিক সুখ সম্পদ, বিলাস বাসনা, সকলই বিসর্জ্জন দিতে হয়। নিজের জন্য কিছু রাখিলে চলে না। প্রকৃত ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন না করিলে এই ব্রত সম্যক্‌রূপে উদ্‌যাপন করা যায় না। রমণী এই ব্রতে নিযুক্ত হইতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে চিরকুমারী বা ব্রহ্মচারিণী হইতে হইবে। তাঁহার যে প্রীতি সাধারণতঃ ক্ষুদ্র পরিবারমধ্যে আবদ্ধ থাকিত, তাহা সমস্ত বিশ্বসংসারে পরিব্যাপ্ত করিতে হইবে। বিশ্বসংসারকে তিনি এত স্নেহ করিবেন যে, সেই স্নেহ যেন সকল বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিতে পারে। গাম্ভীর্য্য, ধৈর্য্য, প্রফুল্লতার সহিত কুমারী বা ব্রহ্মচারিণী যখন পরহিতব্রতে জীবন উৎসর্গ করেন, তখন তাঁহার কি স্বর্গীয় শোভাই হয়! রমণী তখন দেবী হন। এইরূপ দুই এক জন দেবী যে জাতির মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন, সেই জাতি ধন্য হইয়া যায়।

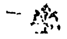
সংসারের সুখরাশির প্রতি বীততৃষ্ণ হইয়া প্রাণের সমস্ত আগ্রহ ঈশ্বরপ্রেমে এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধনে নিয়োগ করিতে পারিলে, তবে বিশ্বসেবা সহজ হয়। যাহার হৃদয় কাঁদে, সে ত চুপ করিয়া থাকিতে পারে না। এইজন্য হৃদয়ের সদ্ভাবগুলির বিশেষ চর্চ্চা রাখিতে হয়। নরনারী উদার উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত না

হইলে এই মহাব্রতের দায়িত্ব বুঝিতে পারিবেন না।

আমাদের দেশে এইরূপ মহানুভব রমণী অতি অল্পই আছেন, যাঁহার হৃদয় স্বজাতি বা অপর জাতির দুঃখ-দুর্গতি দেখিয়া কাঁদিতে শিখিয়াছে। অন্তঃপুরের সংকীর্ণতার মধ্যে আজীবন বদ্ধ থাকিয়া বহির্জগতের সংবাদ রাখা অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অধুনা উচ্চ শিক্ষার ফলে ভারতরমণীগণ সর্ব্বদা নানা প্রকার হিতকর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে সমর্থ হইতেছেন, তথাপি তাঁহারা এখনও সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ। বিশ্বসেবার ভাব উন্মেষিত করিতে হইলে তাঁহাদের মধ্যে আরও বিদ্যা ও ধর্ম্মশিক্ষার বিশেষ প্রচার হওয়া আবশ্যক।

পাশ্চাত্য দেশসমূহে নরনারী সমস্ত মানবজাতির সহিত সহানুভূতি করিতে এবং স্বাধীন ভাবে সকল বিষয়ের চিন্তা ও কার্য্য করিতে সমর্থ। এই কারণেই তাঁহারা এত উন্নত।

বিদেশীয় বিশ্বহিতৈষী নরনারীর কথা মনে হইলে হাউয়ার্ডের নাম সর্ব্বাগ্রে স্মৃতিপথে উদিত হ। তাঁহার নাম সভ্য জগতে সর্ব্বত্র সুপরিচিত। ইউরোপীয় কারাসংস্কাররূপ মহৎ কার্য্যে তিনি জীবন সমর্পণ করিয়াছিলেন। ভগিনী ডোরা ও কুমারী ফ্লরেন্স নাইটিঙ্গেল্ রমণীজাতির গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন। ইহাঁরা দয়ার অবতার, এ কথা বলা যায়। ইহাঁদের নাম স্মরণ করিলে স্ত্রীজাতির উপর গভীর শ্রদ্ধার উদয় হয়। তাঁহারা যেরূপ বিশ্বসেবাব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা অতি বিস্ময়কর। অবলার শক্তিতে যে পৃথিবীর কত মঙ্গল সাধিত হইতে পারে, তাহা তাঁহাদের জীবনে সুন্দররূপে প্রমাণিত হইয়াছে। দয়া দাক্ষিণ্যাদি গুণে সৈনিকপুরুষদিগের জীবনের দুরবস্থা পরিবর্ত্তন করায়, তাহাদের যুদ্ধক্ষেত্রে সেবা শুশ্রূষায়, হাঁসপাতালের সেবিকা-দল প্রস্তুত করায়, স্বাস্থ্যের নিয়ম সম্বন্ধীয় জ্ঞান সাধারণ্যে প্রচার করায় এবং শ্রমজীবিগণের সাধারণ উন্নতি সাধনেই কুমারী নাইটিঙ্গেল্ আত্মজীবন সমর্পণ করিয়াছিলেন। তিনি নারিজাতির বিশেষ মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণী হইয়া সকল দেশের স্ত্রীজাতির অবস্থার বিশেষ সংবাদ রাখিতেন। তিনি রুষ ও ইংলণ্ডের সমরকালে ক্রীমিয়া প্রদেশে যাইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে আহত সৈনিকদিগের সেবা শুশ্রূষা করিয়াছেন। যখন যে কোন জনহিতকর কার্য্যের প্রস্তাব হইয়াছে, তাহাতেই তাঁহার সহানুভূতি দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। তাঁহার বিশ্বপ্রেমে সকলে মোহিত হইয়াছে। তাঁহার নাম সর্ব্বত্র সম্মানের সহিত উচ্চারিত হইয়া থাকে। তিনি নিজ জীবনে প্রীতি ও পবিত্রতার সাধন করিয়া সেই প্রীতি এবং সেবার ভাব পাপী, তাপী, দরিদ্র নরনারীর দুর্গতি হরণের জন্য প্রসারিত করিয়াছিলেন। ভগিনী ডোরা আমরণ ব্রহ্মচর্য্য ব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন। তাঁহার ধন ছিল, অতুল সৌন্দর্য্য ছিল, জীবনের বিলাসময় সুখালোকিত ছবি তাঁহার

সম্মুখে ছিল, তাঁহার শরীর দুর্ব্বল ছিল, তথাপি তিনি যাবজ্জীবন বিশ্বহিতব্রতে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার স্বার্থ-ত্যাগ, ধর্ম্মভাব, অমায়িকতা, প্রীতি এবং দৃঢ়তার কথা পাঠ করিলে মনে হয় তোরা মানবী নহেন, দেবী? হাঁসপাতালের রোগীদিগের শুশ্রূষাই তাঁহার জীবনের মূল কর্ত্তব্য ছিল। তিনি আপনার জীবনকে রোগীদিগের আশ্রমের ধাত্রীর পদবীতে শিক্ষিত করিয়াছিলেন। তিনি এই কার্য্যের জন্য যেরূপ অক্লান্ত পরিশ্রম, অমিত অধ্যবসায় এবং গভীর প্রীতি প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, তাহা সকলেরই অনু-করণীয়। ইহাঁদের আদর্শ জীবন চক্ষুর সম্মুখে অবিরত বর্ত্তমান থাকিলে মানুষ দেবতা হইয়া যায়।

বিশ্বসেবা নানা প্রকারে সাধিত হইতে পারে। রোগীদিগের আশ্রম, দরিদ্র পরিশ্রমাক্ষম ব্যক্তিগণের সাহায্য-সভা, বিধবা এবং অনাথ বালক বালিকাদিগের আশ্রম, কারাসংস্কার সভা, জ্ঞান-বিস্তার-সভা, অত্যাচার-প্রতীকার-সভা, প্রভৃতি বিবিধ উপায়ে জনসাধারণের হিতসাধন করা যাইতে পারে। স্ত্রীলোকেরা সেবা শুশ্রূষা দ্বারা জনহিতব্রতের অনেক সাহায্য করিতে পারেন। রোগীদিগের আশ্রমের অধিকাংশ কর্ত্তব্য রমণীর দ্বারাই উত্তম-রূপে সাধিত হইতে পারে। রোগীর শয্যা-পার্শ্বে রমণী যেরূপ সাহায্য করিতে পারেন, পুরুষ সেরূপ পারে না। শোকার্ত্তকে সান্ত্বনা দান, স্ত্রীলোকের দ্বারা উত্তমরূপে হইতে পারে। রমণী যদি বিশ্বসেবাব্রতে দীক্ষিত হইয়া দরিদ্রপল্লি, অন্তঃপুর, প্রভৃতি পরিদর্শন করিতে পারেন, তাহা হইলে কত হতভাগ্য নরনারীর দুঃখরাশি কমিয়া যায়। রমণী শান্তিরূপিণী, তাঁহার শক্তিতে বিশ্বের দুঃখ পরাস্ত হইয়া যাইতে পারে।

শিশুজীবন ও কিণ্ডার গার্টেন।

সর্ব্বপ্রথম বাধ্যতা—উহা শৈশবাবস্থায় বিদ্যাশিক্ষার একান্ত উপযোগী। শিশুকে শিক্ষা দিবার সময় বাধ্যতা ব্যতীত পিতা-মাতা কিরূপে তাহাকে শাসনে রাখিবেন? কিন্তু উহা সন্তানের প্রতি প্রেম ও বিশ্বাসের ফল স্বরূপ হওয়া উচিত। সেই জন্য শিশুকে এরূপ বশীভূত করিতে হইবে যে, অবাধ্যতা কাহাকে বলে তাহা সে জানিবে না। শিশুকে বাধ্য করিবার জন্য শিশুর প্রতি যত আদেশ ও নিষেধ করা যায়, তাহার উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। উহাদিগের প্রতি অতিরিক্ত প্রভুত্ব দেখান উচিত নহে, এবং সকল বিষয়ে নিজের সামঞ্জস্য রাখিতে হইবে।

পিতা মাতার ইচ্ছা ও আজ্ঞা শিশুদিগের হৃদয়ে রাজবিধির ন্যায় হওয়া উচিত, তাহা







হইলে তাহারা প্রেম ও শ্রদ্ধার সহিত উহা পালন করিবে। যে যে বিষয়ে পিতা মাতার আদেশ ও নিষেধ থাকিবে, তাহা স্পষ্টরূপে খুলিয়া বলিতে হইবে। শিশুকে মিষ্ট কথায় বশ করিবার আশায় সর্ব্বদা তাহাকে স্তোকবাক্য বলিয়া তাহার স্বভাব বিকৃত করা উচিত নহে। শিশুকে এরূপ ভাবে শিক্ষা দিতে হইবে যে, তাহার নিজের স্বতন্ত্র মত থাকিলেও সে পিতা মাতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কখন কোন কাজ করিতে না পারে। কোনও কার্য্য করিতে নিষেধ করিয়া অল্পক্ষণ পরে শিশুর আবদারে বিরক্ত হইয়া পুনরায় সেই কাজ করিতে আদেশ দিলে, সে ভাবিবে ঐরূপ করিলে পিতা মাতার অনুমতি পাইব। অতএব আর তাহার ভয় থাকিবে না।

প্রত্যেক শিশুকে তাহার পুষ্টিসাধনের উপযুক্ত যথেষ্ট স্বাধীনতা দেওয়া আবশ্যক। ক্রমাগত তাহাকে আজ্ঞা বা নিষেধ করিলে তাহার মনে গোলমাল বাধে, সে কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়মে চলিতে অক্ষম হয়। অন্য দিকে উহাতে শিশু ভাবে যে, তাহার প্রতি অবিচার করা হইতেছে। আর অনেক সময় আদেশ ও নিষেধের কথা এক সঙ্গে বলাতে সে তাহার ক্ষুদ্র মনে কোন্‌টী উত্তম ও কোন্‌টী আবশ্যক তাহা বুঝিতে পারে না। শিশুর মনে বিচার ও অবিচারের ধারণা এরূপ দৃঢ় শিকড় বাঁধিয়া থাকে যে, সে পিতা মাতার কোন্ আজ্ঞাটী উচিত, আর কোন্‌টী অনুচিত, তাহা অনায়াসে বুঝিতে পারে ও অন্যায় আদেশ পালন করিতে অস্বীকার করে। সুতরাং যতক্ষণ শিশু নিজের ইচ্ছামত চলিলে তাহার নিজের বা অন্যের অপকারের সম্ভাবনা না থাকে, ততক্ষণ তাহাকে বাধা না দিয়া তাহাকে ইচ্ছামত খেলিতে ও চলিতে দেওয়া উচিত। তৎসঙ্গে ইহাও তাহার মনে দৃঢ় অঙ্কিত করা উচিত যে, পিতা মাতা কোন কর্ম্ম করা অন্যায় বিবেচনা করিলে সে হাজার আবদার করিলেও কখন তাহাতে অনুমতি পাইবে না। শিশুর যে সকল দোষ বড় হইলে আপনাপনি চলিয়া যাইবে, সে তখন যে সকল বিষয়ে ভাল মন্দ বিবেচনা করিয়া কার্য্য করিতে শিখিবে, সে সকল দোষ ও বিষয় লইয়া তাহাকে বৃথা জ্বালাতন করা ঠিক নহে। ইহার মধ্যে শিষ্টাচার একটী বিষয়। বাল্যকালে শিশুকে নম্র ও ভক্তিমান্ হইতে শিক্ষা দিতে পারিলে, ভবিষ্যৎ জীবনে শিশু শিষ্টাচার ও অমায়িকতা প্রকাশ করিতে শিখিবে। শিশুকে, কি ছোট কি বড়, সকল লোককে এরূপ সমান ভাবে দেখিতে শিখাইতে হইবে যে, সে উহা দেবতার আজ্ঞার ন্যায় মানিবে। শিশুদিগকে ধনী ও সম্পত্তিশালীর প্রভেদ না শিখাইয়া নিজের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া প্রবীণ, বৃদ্ধ ও জ্ঞানী লোকদিগকে মান্য করিতে শিক্ষা দিতে হইবে। শিশুর সম্মুখে কখন পরনিন্দা, ঝগড়া বা তর্ক করা যেন না হয়। কোন প্রকার অশ্লীল ভাব বা বাক্য




তাহাদের কর্ণে প্রবেশ করিয়া ঐ নির্ম্মল আত্মাকে যেন মলিন না করে। কিছুতেই ঐ পবিত্র আলোকময় মনটিকে যেন সন্দেহ ও বিষাদপূর্ণ না করে।

স্বার্থপরতা শিশুদিগের একটী সাধারণ দোষ। শিশুদিগকে সর্ব্বদা অন্যান্য শিশুদের সঙ্গে খেলিতে দিলে ও মাতার অপরিসীম প্রেম দ্বারা তাহাকে ভাল বাসিতে শিখাইলে শিশু আপনা আপনি সঙ্গিপ্রিয় হইবে ও ছোট ভাই ভগিনীদিগকে স্নেহ করিতে শিখিবে। অপরিচিত লোকের সম্মুখে বা পাঁচজনের কাছে শিশুদিগকে শান্ত রাখিবার ইচ্ছা হইলে, তাহাদিগকে পৃথক্ ঘর বা বাড়ীর এক অংশ ছাড়িয়া দেওয়া উচিত। সেখানে তাহারা যেন অবাধে যত ইচ্ছা লাফান, দৌড়াদৌড়ি, খেলা ও শব্দ করিতে পায়, তাহা হইলে অন্য সময়ে মাতার নিকট আসিলে সহজেই তাহারা শান্ত ও স্থির থাকিবে। শিশুকে দিনরাত মাতার চক্ষুর সম্মুখে রাখা উচিত নয়, কারণ তাহা হইলে 'মা বিরক্ত হইবেন' ভাবিয়া সে সর্ব্বদা ইচ্ছামত লাফালাফি করিতে পারে না। শিশু যদি দৈবক্রমে কোন জিনিষ ভাঙ্গিয়া ফেলে,তাহা হইলে তাহাকে শাস্তি না দিয়া তাহাকে ভবিষ্যতে অধিকতর সতর্ক হইতে শিক্ষা দেওয়া উচিত। উহাতে বাল্যকাল হইতে সে সাবধান ও ধীর হইবে। আর যে গৃহস্থ পরিবারে শিশুদিগের জন্য একটী স্বতন্ত্র ঘর দিবার সুবিধা নাই, তাঁহারা সকালে ও বৈকালে উঠানে বা ছাদের উপর শিশুদিগকে ছাড়িয়া দিবেন। বাড়ীর নিকট যদি কোন শিশু-বিদ্যালয় থাকে, তাহা হইলে শিশুদিগকে তথায় পাঠাইয়া দিলে তাহারা অনেক সঙ্গী ও খেলিবার স্থান পাইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইবে।

শিশুদিগকে অবাধে খেলিতে দেওয়া তাহাদিগর দুষ্টামি থামাইবার ঔষধ। উহার অভাব হইলেই তাহারা অতিরিক্ত দৌরাত্ম্য করিয়া থাকে, জিনিষপত্র ভাঙ্গে ও সকলকে অস্থির করিয়া তুলে। সেই নিমিত্ত শিশুর কার্য্য করিবার শক্তিকে কোন না কোন কার্য্যে বা ক্রীড়ায় সর্ব্বদা নিযুক্ত রাখা উচিত। মাটির ঘর প্রস্তুত, কানামাচি বা লুকাচুরি খেলা প্রভৃতি দ্বারা ইহা অতি সহজেই সম্পন্ন হইতে পারে।

ভিকারিণী।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

পত্নীর উদ্দেশে।

গভীরা রজনী। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। নৈশ গগনের নৈশ অন্ধকার ভেদ করিয়া মধ্যে মধ্যে সৌদামিনী হাসিতেছিল। ক্রমে আকাশমণ্ডল কৃষ্ণ নীরদমালায় আবৃত হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে প্রকৃতি আপনার ভয়াবহ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া প্রলয়-ঘোর-গর্জ্জন করিতে আরম্ভ করিল। সুযোগ বুঝিয়া প্রবলবেগে ঝটিকা প্রবাহিত হইল। অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত বৃক্ষাদির সহিত যুদ্ধ করিয়া প্রভঞ্জন আপনার সহযোগিনী বৃষ্টিকে ডাকিল। মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। এই প্রকৃতির ঘোর দ্বন্দের সময় ঝড় বৃষ্টি মাথায় করিয়া একটী যুবক ঊর্দ্ধশ্বাসে গ্রামের দিকে ছুটিতেছিলেন। তিনি ঘনান্ধকার প্রযুক্ত মধ্যে মধ্যে বিপথগামী হইতেছিলেন, কিন্তু বিদ্যুতালোকে আপনার গন্তব্য পথ যতদূর সম্ভব নির্ণয় করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কিছুদূর এই ভাবে অগ্রসর হইতে না হইতেই সহসা অবলার কণ্ঠনিঃসৃত অস্ফুট করুণ ক্রন্দন-ধ্বনি তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। তিনি আপনার গন্তব্য পথ ভুলিয়া গেলেন, এবং যেদিক হইতে সেই শব্দ শ্রুত হইতে-ছিল দ্রুতপদে সেই দিকেই অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ক্রমে নির্জ্জন প্রান্তরের উপকণ্ঠে উপস্থিত হইয়া তিনি অনতিদূরে একটী দীপালোক দেখিতে পাইলেন। সেই দীপালোক লক্ষ্য করিয়া শীঘ্রই একখানি নাতিদীর্ঘ কুটীরের দ্বারে উপস্থিত হইলেন। এই কুটীর হইতেই সেই অস্ফুট-শ্রুত বিলাপধ্বনি উত্থিত হইয়াছে মনে করিয়া তিনি তাহার দ্বারে আঘাত করিলেন। অনর্গলাবদ্ধ দ্বার অমনি খুলিয়া গেল। একটী নবীনা রমণী বর্ত্তিকা হস্তে দ্বারদেশে আসিয়া অপরিচিত ব্যক্তির মুখাবলোকন করিয়া যেন কিছু অপ্রতিভ হইলেন। আগন্তুক দীপালোকে যুবতীর রূপলাবণ্য দেখিয়া মোহিত হইলেন। রমণী ষোড়শবর্ষীয়া যুবতী। গৌরবর্ণ দেহলতাটী যৌবনহিল্লোলে হিল্লোলিত, উষাকাশের সুকুমার অরুণ-প্রভার ন্যায় লাবণ্যব্যঞ্জক রূপরশ্মি যুবতীর সর্ব্বাঙ্গ ফুটিয়া বাহির হইতেছিল। তাহার আলুলায়িত নিবিড় কৃষ্ণ-কুন্তল-রাজি পৃষ্ঠোপরি পতিত হইয়া অনিন্দ্য সুন্দর দেহলতাটী আরও সুন্দর করিয়া তুলিয়াছিল। যুবতী হঠাৎ একজন অপরিচিত ব্যক্তির সম্মুখে উপস্থিত হওয়ায় বড়ই লজ্জিতা হইলেন। তাঁহার মুখমণ্ডল আরক্তিম হইয়া উঠিল, লজ্জায় মুখ অবনত করিয়া রহিলেন। যুবকও একাকিনী যুবতীর গৃহদ্বারে আসিয়া বড়ই অপ্রতিভ

হইলেন। যুবক লজ্জিত হইয়া বলিলেন, "কোনও বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে আমি এখানে আসিয়াছি, অপরাধ লইবেন না"। রমণীসুলভ লজ্জাভারে তাঁহার মুখখানি আরও অবনত হইল। তিনি নীরবে মাটির দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার উত্তর দিবার কোন সম্ভাবনা না দেখিয়া আগন্তুক আবার বলিলেন, "আমি অদূরবর্ত্তী গ্রামাভিমুখে যাইতেছিলাম, অবলার কাতর কণ্ঠস্বর শ্রবণে তাঁহার আশু বিপদ মনে করিয়া তাঁহারই উদ্ধারকল্পে সেই কণ্ঠস্বর লক্ষ্য করিয়া এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছি, আমার ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করিবেন"। এইবার তরুণী উত্তর করিলেন, তিনি বীণাবিনিন্দিত স্বরে আগন্তুকের কর্ণকুহরে অমৃত ঢালিয়া বলিলেন, "গৃহে আমি একাকিনী, কাজেই উপযুক্ত অতিথিসৎকার করিতে পারিতেছি না। আপনি ঐখানে বসিয়া কিছুক্ষণ বিশ্রাম করুন; পিতা বোধ হয় এখনই গৃহে প্রত্যাগমন করিবেন। তিনিও অবলা নারীর করুণস্বরে বিপদ ভাবিয়া তাঁহার উদ্ধারার্থে বাহির হইয়াছেন"। এই কথা বলিয়া রমণী বর্ত্তিকাটী সেই স্থানে রাখিয়া গৃহাভ্যন্তরে চলিয়া গেলেন। যুবক বিশ্রামার্থ তথায় বসিয়া রহিলেন। সুন্দরীর সেই অমৃততুল্য মধুর কণ্ঠস্বর যেন তাঁহার হৃদয়ের প্রতি তন্ত্রীতে বাজিতেছিল। তিনি নীরবে বসিয়া সেই কাতর কণ্ঠধ্বনির কথা ভাবিতে লাগিলেন।

ক্রমে ঝড় বৃষ্টি থামিয়া গেল। আকাশ পরিষ্কার হইল। শুক্লপক্ষের দশমীর চন্দ্র নক্ষত্রপরিবেষ্টিত হইয়া হাসিতে লাগিল। অমল ধবল জ্যোৎস্না-স্নাত নিশীথিনী হাস্যময়ী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া সেই পরম পিতা পরমেশ্বরের অশেষ শিল্পনৈপুণ্যের নিদর্শন দেখাইতে লাগিল। যুবক বসিয়া কি ভাবিতেছেন, এমন সময়ে বাহিরে কাহার পদশব্দ শ্রুত হইল। তিনি ভাবিলেন বোধ হয় গৃহস্বামী আসিতেছেন। অপর পার্শ্বের দরজায় করাঘাত শুনা গেল। কে যেন বাহির হইতে ডাকিলেন, "কমল, কমল"! ভিতর হইতে দরজা খুলিয়া গেল। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ গৃহে প্রবেশ করিবামাত্র কমলিনী পিতার নিকট আগন্তুকের কথা জ্ঞাপন করিলেন। বৃদ্ধের নাম জীবনস্বামী, তিনি আপনার সিক্ত পরিধেয় বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া আগন্তুকের সমীপবর্ত্তী হইলেন। আগন্তুক তাঁহাকে দেখিবামাত্র আসন হইতে গাত্রোত্থান করিয়া যথাবিহিত অভিবাদন করিলেন। জীবনস্বামী তাঁহাকে সম্ভাষণপূর্ব্বক বলিলেন, "মহাশয়! আপনার পরিচয় পাইলে বড়ই সুখী হই।" আগন্তুক আপনার যথাযথ পরিচয় দিয়া তাঁহার তথায় আগমনের কারণ আদ্যোপান্ত সমস্ত জীবনস্বামীর নিকট বলিলেন। অনন্যমনে সেই সকল কথা শুনিয়া জীবনস্বামী বলিলেন, "আমি এবং আমার একমাত্র কন্যা কমলিনী ভয়ানক ঝড় বৃষ্টির আড়ম্বরে নিদ্রোত্থিত হইয়া ঐরূপ রমণীকণ্ঠনিঃসৃত স্বর শুনিতে পাই।




ঐ স্বর শুনিবামাত্র প্রকৃতির এই মল্লযুদ্ধের কালে কমলিনীকে একাকিনী কুটীরে রাখিয়া শব্দ লক্ষ্য করিয়া কুটীরের বাহির হই। অনেক অনুসন্ধান করিলাম কিন্তু কোথাও কোন চিহ্ন পাইলাম না, তাই নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসিলাম।" এইরূপ দুই জনে অনেক কথাবার্ত্তা হইল। বৃদ্ধ জীবনস্বামী কথা প্রসঙ্গে তাঁহার নিকট এ কথাও ব্যক্ত করিলেন যে, তাঁহার যুবতী কন্যা তখনও অবিবাহিতা। তাহার বিবাহ বিষয়ে একটী বিষম অন্তরায় থাকাতে তিনি সর্ব্বদাই চিন্তিত আছেন। যুবকের নাম হেমচন্দ্র। তিনি বৃদ্ধের বিমর্ষভাব দেখিয়া বলিলেন "মহাশয়! আপনার কন্যার বিবাহের বয়স অতিক্রান্ত হইয়া গিয়াছে অথচ আজও অবিবাহিতা, ইহার কারণ কি? পাঠকপাঠিকাগণ যদি এই মুহূর্ত্তে কমলিনীর মুখখানি দেখিতে পাইতেন, তবে দেখিতেন যে, তাঁহার প্রস্ফুটিত কমলবৎ নয়নদ্বয় নিশার শিশিরাভিসিক্ত ফুল্ল নলিনীদলবৎ অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়াছে। জীবনস্বামী উত্তর করিলেন, "সে বিষম অন্তরায় আর কিছু নহে, কমলিনী যাহাকে ভালবাসে, তাহাকে না পাইলে আর কাহাকেও বিবাহ করিবে না, ইহাই তাহার প্রতিজ্ঞা।"

হেম। সেই সৌভাগ্যবান্ পুরুষ কে, তাহা জানিতে পারি কি?

জীবন। আমি তাহাকে কোন দিন দেখি নাই, চিনি না, তাহার নাম কি তাহাও জানি না, সুতরাং কিরূপে আপনাকে তাহার পরিচয় দিব? শুনিয়াছি সে নিরুদ্দেশ।

হেম। আপনি কি নিজে খুঁজিয়াছিলেন?

জীবন। তাহাকে কখনও দেখি নাই, তাহার পরিচয়ও জানি না, তাহার বাসস্থান কোথায় তাহাও জানি না, সুতরাং অনেক চেষ্টা করিয়াও তাহার কোনও সন্ধান পাইলাম না।

হেম। আপনার কন্যাও কি তাহার কোনও পরিচয় অবগত নহেন?

জীবন। তাহা জানি না, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে সে কোনও উত্তর দেয় না, উপরন্তু কাঁদিয়া আকুল হয়। সেই জন্য আমিও তাহাকে বিশেষ পীড়াপীড়ি করি না।

হেম। তাহার সহিত আপনার কন্যার কোথায় সাক্ষাৎ হয়?

জীবন। আমি তীর্থপর্য্যটন মানসে বালিকা কমলিনীকে আমার এক বিশ্বস্ত বন্ধুর বাড়ীতে রাখিয়া যাই। তখন তাহার বয়স দ্বাদশ বৎসর। সেই সময়েই নাকি কমল একটী যুবকের প্রণয়দৃষ্টিতে পতিত হয়। ক্রমে তথায় উভয়েই উভয়ের প্রতি আসক্ত হয়। কমলিনী গোপনে তাহাকে পতিত্বে বরণ করে। যুবক কমলিনীর মনের ভাব বুঝিতে পারিল। পাছে এই গুপ্ত প্রণয়ে আমি কমলিনীর উপর অসন্তুষ্ট হই, এই ভয়ে যুবক বহু কষ্টে আত্মদমন করিয়া কমলিনীকে অনেক সান্ত্বনা দিয়া সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিয়াছে। সেই হইতেই যুবক নিরুদ্দেশ।

(ক্রমশঃ)

নূতন সংবাদ।

১। সম্প্রতি শুনা যাইতেছে, বিলাতের রয়েল জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটীর সভ্যপদে স্ত্রীলোকগণ স্থান প্রাপ্ত হইবেন এরূপ মত প্রকাশিত হইয়াছে।

২। বঙ্গদেশের বালিকাদিগকে কিরূপ প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য এই বিষয় নির্দ্ধারণ করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট এক কমিটি স্থাপন করিয়াছেন। মিঃ নেথান এই কমিটির সভাপতি এবং শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর, প্রেসিডেন্সি বিভাগের কমিশনর মিঃ কমিং, বেথুন কলেজের লেডী প্রিন্সিপাল, ঢাকার ইডেন স্কুল ও কলিকাতার ট্রেনিং স্কুলের লেডী প্রিন্সিপাল, ডায়োসেসিয়ান কলেজের লেডী প্রিন্সিপাল, ভিক্টোরিয়া ইউনাইটেড মিশন ট্রেনিং কলেজের ও কৃষ্ণনগর ট্রেনিং কলেজের লেডী প্রিন্সিপাল, মিস আউগস, মিস উইলিয়ামসন, শ্রীমতী জে, সি, বসু, মিস্ মুর, শ্রীমতী পি, মুখার্জ্জী, শ্রীমতী এস, সি, মুখার্জ্জী, শ্রীমতী পি, চাটার্জ্জী, নবাব আলি চৌধুরী, ডাক্তার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, আনন্দচন্দ্র রায়, পি, কে, সেন প্রভৃতি কমিটির সভ্য নিযুক্ত হইয়াছেন।

৩। লেডী হার্ডিঞ্জের বিপৎপাতে ভারতীয় নারীদিগের প্রাণে যে আঘাত লাগিয়াছে ও এই বিপদে তাঁহার যে অসাধারণ ধৈর্য্য প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা দেখিয়া যে শ্রদ্ধার উদ্রেক হইয়াছে, তাহা প্রকাশ করিবার জন্য নানাস্থানে সভা হইতেছে। বঙ্গের নারীগণ মিলিত হইয়া লেডী হার্ডিঞ্জ মহোদয়াকে এক পত্র প্রেরণ করিয়াছেন।

৪। এইরূপ শুনা যাইতেছে যে, ভারতসচিব ১০৲ টাকা মূল্যের স্বর্ণমুদ্রা ভারতবর্ষে প্রচলন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন।

৫। জার্ম্মাণ অধ্যাপক হ্যান্সটেটিলেন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা দ্বারা জানিতে পারিয়াছেন যে, পুষ্পের সঙ্গীত-অনুভূতিশক্তি আছে। সুমিষ্ট সুরে পুষ্প বিকশিত ও উহার বিপরীত সুরে মুদ্রিত হইয়া থাকে।

৬। জার্ম্মাণ পণ্ডিত ওল্ডেনবার্গ সাহেব ও ফরাসী মহিলা সুজানি কারপেলি কলিকাতার বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ দেখিতে গিয়াছিলেন। শ্রীমতী সুজানি পিতামাতার সহিত ভারতে বেড়াইতে আসিয়াছেন, ইহাঁর বয়স সতের আঠার বৎসর। ইনি এদেশে একান্নবর্ত্তী পরিবার-প্রথা দর্শনে পরম প্রীতি প্রকাশ করিয়াছেন। বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ তাঁহার ও ওল্ডেনবার্গ সাহেবের সম্বর্দ্ধনা করেন। শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয় শ্রীমতী সুজানি ও ওল্ডেনবার্গ সাহেব মহোদয়কে পুষ্পমাল্যে ভূষিত করিয়াছিলেন। শ্রীমতী

[সুজানি সুমধুর ইংরাজী ভাষায় এদেশের] গুণকীর্ত্তন করেন। ইনি সংস্কৃত পড়েন।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের ইংরাজী গীতাঞ্জলীর প্রথম সংস্করণ লণ্ডনে ছয় সপ্তাহের মধ্যেই সমস্ত বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ শীঘ্র প্রকাশিত হইবে।

জার্ম্মণীতে এক বৃহদাকারের কামান নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহাতে যে গোলা ব্যবহার করা হইবে, তাহার এক একটীর ওজন ২৭৷৷৹ মণ।

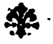
৯। মটর জাহাজ নির্ম্মাণ করিবার জন্য এক কোম্পানী গঠিত হইয়াছে। ইহার মূলধন এক কোটী পঞ্চাশ লক্ষ টাকা।

সমালোচনা।

পোষ্যপুত্র—শ্রীমতী অনুরূপা দেবী প্রণীত। মূল্য ১।৹ আনা। ইহা একখানি সামাজিক উপন্যাস। লেখিকা পিতৃচরণে গ্রন্থখানি উৎসর্গ করিয়াছেন। পুস্তকখানিতে বর্ত্তমান সময়ের চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। চরিত্র-চিত্র অঙ্কনে লেখিকা সিদ্ধহস্ত। ইহাতে সকল চরিত্রগুলিই বেশ ফুটিয়াছে। শান্তি ও হেমেন্দ্রের চিত্র অতি সুন্দর হইয়াছে। রজনী বাবুর আদর্শও অতি মহৎ ও শিক্ষণীয়। সর্ব্বসাধারণে 'পোষ্যপুত্র' যে আদরণীয় হইবে সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। বঙ্কিম বাবুর ন্যায় এ পর্য্যন্ত কেহ উপন্যাস লিখিতে পারেন নাই, আমরা আশা করি এই প্রতিভাশালিনী লেখিকা সেই পথ অনুসরণ করিয়া যশস্বিনী হইবেন।

মানস প্রসূন বা মায়াবতী—সাধনা-রচয়িত্রী প্রণীত। মূল্য ১৲ টাকা। প্রকাশক শ্রীঅতুলকৃষ্ণ রায়, উকীল হাইকোর্ট। প্রকাশক তাঁহার নিবেদন-পত্রের মধ্যে লিখিয়াছেন, রচয়িত্রী এই কাব্যখানি পুণ্যতীর্থ হরিদ্বারে রচনা করেন এবং কাব্যচ্ছলে হিন্দুধর্ম্মের সারতত্ত্ব সমুদায় ইহাতে বিশদভাবে প্রকাশ করিয়াছেন।

কাব্যখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া যারপর নাই আনন্দ লাভ করিয়াছি। এইরূপ সরল, সরস ও চিত্তাকর্ষক কাব্য বঙ্গসাহিত্যে দুর্লভ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কাব্যখানি উপন্যাসের ন্যায় একটী সুন্দর গল্প লইয়া রচিত। লেখিকার নূতন করিয়া পরিচয় দিবার আবশ্যক নাই, ইনি 'সাধনা' প্রকাশ করিয়া সাহিত্য-জগতে সুপরিচিত হইয়াছেন। সাধনার ন্যায় মানসপ্রসূন-রচনাতেও তিনি সিদ্ধ হইয়াছেন।



বামারচনা।

অন্তরতম।

তুমি যে আমার নিকটে রয়েছ
ফিরে তা দেখিনি কভু,
বৃথা অন্বেষণে দুয়ারে দুয়ারে
ফিরেছি প্রভু!
বিশ্বের মাঝে আপনারে লয়ে
পড়েছিনু একাধারে,
বুঝিতে পারিনি এত ব্যাকুলতা
কাহারে পাবার তরে।
সম্মুখে যাহা কিছু পাইয়াছি আঁকড়ি
ধরিতে গিয়া,
নিমেষে নিমেষে তাহাদেরই সাথে
ভাঙ্গিয়া গিয়েছে হিয়া।
তথাপি তাদের আপন জানিয়া
বাসিয়া ছিলাম ভাল,
শেষে দেখি হায় কোথা চলে যায়
সবই আলেয়ার আলো।
ব্যথাভরা প্রাণ কারে দিব দান
দিনু তাই তব পায়,
আজিই এ চিত্ত তৃপ্ত হইল শান্তির
সুধাশায়।
শান্ত শরীরে, অচল চরণে বসিনু
আপন ঘরে,
তোমার বিশ্বমোহন মূরতি
হেরিনু নয়নভরে।
অন্তরে আছ অন্তরে নাই
আজ বুঝিয়াছি স্বামী,
অন্তরতম অন্তরেই রহ
এই শুধু যাচি আমি।

শ্রীমতী সরসীবালা দেবী

শ্রীগৌরাঙ্গ।

১

নীরব নীস্তব্ধ এবে নদীয়ানগর।
নীরব নিশীথ রাতি, ছড়ায়ে বিমল ভাতি,
হাসিতেছে শশধর গগন উপর।

২

নদীয়ার গৃহে গৃহে নিদ্রিত সবাই।
করি নাম সঙ্কীর্ত্তন, নিদ্রিত ভকতগণ,
হায়রে! জানেনা কেহ পালাবে নিমাই!

৩

কপট নিদ্রায় মগ্ন গোরা মনোহর।
পতিপদ ধরি বুকে, বিষ্ণুপ্রিয়া মনসুখে
নিদ্রা যায় পতিপাশে হয়ে অকাতর।

৪

জানেনাক অভাগিনী আজি তার শেষ!
হৃদয়ে হানিয়া বাজ, প্রাণেশ তাহার আজ
চলে যাবে চির তরে কাঁদাইয়া দেশ।

